সিগমা ফোর্স

দ্য সেভেন্থ প্লেগ

জেমস রলিন্স

রূপান্তর- মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
আফরানুল ইসলাম সিয়াম

ADEE

বাইবেলে বর্ণিত মহামারীগুলোর ঘটনা কি সত্যি?
যদি তাই হয়, তাহলে আবার কি দেখা দিতে পারে তাদের প্রাদুর্ভাব? বিশ্বব্যাপী?
সুদানের মরুভূমিতে উধাও হবার দুই বছর পর, আচমকা উদয় হলেন ব্রিটিশ প্রফেসর হেনরি ম্যাককেব। প্রায় উন্মত্ত ভদ্রলোকের ফিসফিস করে বলা গল্প কোন সভ্য কানে পৌছাবার আগেই মারা গেলেন বেচারা। ময়নাতদন্তে দেখা গেল অদ্ভুত এক ব্যাপার। প্রফেসরকে কেউ মমি বানাতে শুরু করেছে...
...জীবন্ত অবস্থাতেই!

আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য লন্ডনে নিয়ে আসা হলো তার দেহ। ঠিক তখনই মিশর থেকে জানা গেল গা শিউরানো এক সংবাদ। যে চিকিৎসক-দলটা প্রফেসরের ময়নাতদন্ত করেছিল, তারা অজানা রোগে আক্রান্ত হয়েছে! আর সেই রোগটা অপ্রতিরোধ্য গতিতে বিস্তার হচ্ছে কায়রো জুড়ে।
বিপদের আশঙ্কায় প্রফেসরের এক সহকর্মী যোগাযোগ করল তার অনেক দিনের বন্ধু, পেইন্টার ক্রোর সাথে। জানা গেল, বাইবেলে বর্ণিত সেই দশটি মহামারীর সত্যতা প্রমাণের জন্য মরুভূমিতে পা রেখেছিলেন প্রফেসর। মহামারীর প্রকোপ বাড়ার সাথে সাথে একটাই প্রশ্ন জাগল সবার মনে... ...আবারও কি পৃথিবী দেখা পেতে যাচ্ছে ওই মহামারীগুলোর?

ISBN 978 984 9244 03 5

জেমস রোলিন্স

বর্তমান সময়ের একজন বিশ্ববিখ্যাত জনপ্রিয় লেখক। মূলত অ্যাডভেঞ্চার ও থ্রিলারধর্মী বই লেখার জন্য তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। লেখালেখি শুরু করার আগে তিনি পেশায় পশু চিকিৎসক ছিলেন। প্রায় ১০ বছর চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার পর লেখালেখির জন্য সেখান থেকে অবসর নেন।

অ্যাডভেঞ্চার বই লেখার পাশাপাশি বাস্তব জীবনেও তিনি বেশ অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী। রোলিন্স একজন সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত স্কুবা ডাইভার; বিভিন্ন উপন্যাসে পানির নিচের বর্ণনা তিনি নেহাত কল্পনা থেকে উপস্থাপন করেন না। এব্যাপারে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। এছাড়াও শিক্ষানবিশ হিসেবে বিভিন্ন গুহায় অভিযান চালিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অভিযান করে তিনি তাঁর উপন্যাসের জন্য বাস্তবধর্মী স্থান নির্বাচন করে থাকেন। যার ফলে রোলিন্সের উপন্যাসগুলোতে বাড়তি মাত্রা যোগ হয়।

তাঁর লেখা *সিগমা ফোর্স* সিরিজ পুরো বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ৪০টির বেশি ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বাস করছেন।

দ্য সেভেন্থ্ প্লেগ

দ্য সেভেন্থ প্লেগ

জেমস রলিন্স

রূপান্তরঃ মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
মোঃ আফরানুল ইসলাম

উৎসর্গ

আবার বাবা ও মা রোনাল্ড আর মেরি অ্যানকে
তাদের অনুপ্রেরণার জন্য, সমর্থনের জন্য এবং কীভাবে ভালোবাসতে হয়-তা
শেখাবার জন্য
.মৃত্যুর ওপারেও একসাথেই আছেন তারা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বইটির উৎকর্ষতার পেছনে রয়েছে অনেকের অবদান। তাদের সাহায্য, পথ-নির্দেশনা, সমালোচনা, উৎসাহ এবং সবচেয়ে বড় কথা, তাদের বন্ধুত্ব ছাড়া যা কখনওই সম্ভব হতো না। আমার সমালোচক দলটাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই, হাতে গোণা কয়েকজন পাঠককে নিয়ে গড়া এই দলটা আমার প্রাথমিক সম্পাদক। আমাকে আরও ভালো করার জন্য যারা বকাঝকা করতে দ্বিধা করেন না- স্যালি অ্যান বার্নস, ক্রিস ক্রো, লী গ্যারেট, জেন ও'রিভা, ড্যানি গ্রেসন, লিওনার্ড লিটল, জুডি প্রে, ক্যারোলিন উইলিয়ামস, ক্রিশ্চিয়ান রাইলি, টোড টড, ক্রিস স্মিথ এবং অ্যামি রজার্স। সেই সাথে বিশেষ ধন্যবাদ স্টিভ পেরিকে, এমন অসাধারণ সব মানচিত্র এঁকে দেবার জন্য। ডেভিড সিলভিয়ানকে ধন্যবাদ, ওকে ছাড়া আমি এগোতে পারতাম না। এই পাতাগুলোর মাঝে ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক যেসব লেখা দেখতে পাবেন, তার অনেকগুলোর জন্য ধন্যবাদ পাবে চেরি ম্যাককার্টার! হার্পারকলিনসের সবাইকে ধন্যবাদ, আমাকে দেখে শুনে রাখার জন্য। তাদের মাঝেও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হচ্ছে মাইকেল মরিসন, লিঅ্যাট স্টেহলিক, ড্যানিয়েল বার্লেট, কেইটলিন হারি, জশ মারওয়েল, লিন গ্রেডি, জিঅ্যান রেইনা, রিচার্ড অ্যাকুয়ান, টম এগনার, শন নিকোলস এবং অ্যানা আমিরা অ্যালিসি-এর নাম। সব শেষে আলাদা করে ধন্যবাদ জানাই বইটির আলোর মুখ দেখার পেছনে যাদের সরাসরি অবদান আছেঃ আমার সম্পাদক, লাইসা কেইউসখ ও তার বান্ধবী প্রিয়াঙ্কা কৃষ্ণা; আমার এজেন্ট, রাস গ্যালেন এবং ড্যানি ব্যারোর (সেই সাথে ওর মেয়ে হেদার ব্যারোর)।

সব শেষে বলতে চাই, এক বইতে যে সব তথ্য বা বর্ণনা সংক্রান্ত ভুল আছে, তার সব দায়ভার আমার .একান্তই আমার।

মানচিত্রঃ

নীল নদের বেসিন

কায়রো
নীল
মিশর
লুক্সর
খার্তুম
নীল নদ
সুদান
তানা হ্রদ
দক্ষিণ
সুদান
ইথিওপিয়া
হোয়াইট নীল
উগান্ডা
কঙ্গো
কেনিয়া
সোমালিয়া
রোয়ান্ডা
তানজানিয়া

গ্রিনল্যান্ড
(ডেনমার্ক)
থুল এয়ার বেস
বাফফিন বে

গ্রিনল্যান্ড
(ডেনমার্ক)
কা না ডা
ইউ. এস. এ.

ইতিহাসের পাতা থেকে

অতঃপর মোজেস তার অনুসারীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই দিনটার কথা স্মরণ রেখো, যে দিন তোমরা মিশর থেকে, দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছ। এই সেই দিন, যেদিন প্রভু তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন তার ক্ষমতা

এক্সুডাস ১৩ঃ৩

বাইবেলে অনেক কম গল্পই আছে যেগুলো মোজেসের গল্পের চাইতে বেশি ভীতিপ্রদ। চাই কাগজে লিখে হোক বা পর্দায় দেখিয়ে, এই গল্প বারবার আমরা শুনতে বা দেখতে পাই। জন্মের পরপর নল-খাগড়ার বাক্সে করে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল তাকে, বিধির খেলায় স্থান পেয়েছিলেন ফারাওয়ের কন্যার কোলে। আবার বয়সকালে সেই ফারাওয়ের পুত্রের-ই মুখোমুখি হতে হয়েছিলেন। মোজেস তাই কিংবদন্তীর এক চরিত্র। ইহুদী সম্প্রদায়কে দাসত্বের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি মিশরে নামিয়ে এনেছিলেন দশটা অভিশাপ। এরপর সমুদ্রকে দুইভাগ করে চল্লিশ বছর ধরে ঘুরে ফিরেছেন মরুভূমিতে। টেন কমান্ডমেন্টস বা দশ ঐশী আদেশ এনে দাঁড়া করিয়েছিলেন আইনের নতুন এক পদ্ধতি।

কিন্তু আসলেই কি ঘটেছিল এসব? অনেক ইতিহাসবিদ, এমনকি অনেক ধর্মীয় নেতাও মিশর-ত্যাগের গল্পকে সত্য বলে মেনে নেননি। তাদের কাছে গল্পটা আসলে রূপক, ঐতিহাসিক সত্য নয়। সন্দিহান প্রত্নতত্ত্ববিদরা বলেন, গল্পটা সত্যি হলে মিশরীয় উৎস থেকে ওই মহামারী বা মিশর-ত্যাগের সমর্থনে কোন উপাত্ত পাওয়া যায় না কেন?

তবে নীল নদের অববাহিকায় আবিষ্কৃত কিছু আধুনিক আবিষ্কার কিন্তু অন্য কথা বলে। আসলেই কি মোজেসের গল্পের সত্যতা আছে? মিশর-ত্যাগের ঘটনা কি সত্যি সত্যি ঘটেছিল? অলৌকিক ঘটনা আর অভিশাপগুলো? আশা করি এই বইয়ের পাতাগুলোর মাঝে সেই সত্যটা আপনারা আবিষ্কার করতে পারবেন। এখানকার প্রতিটা তথ্যই গ্রহণযোগ্য উৎস থেকে নেয়া। যেমন ইসরায়েল শব্দটা পাওয়া যায় রামেসিস দ্য গ্রেটের সন্তানের স্মৃতিস্তম্ভে!

প্রশ্ন হলো, যদি মিশরে সত্যি সত্যি ওই অভিশাপ .ওই মহামারীগুলো ঘটে থাকে, তাহলে কি সেটা আবার ঘটতে পারে?

এবার পুরো বিশ্বজুড়ে?

উত্তরটা ভয় জাগানিয়া হলেও সত্য .হ্যাঁ।

বৈজ্ঞানিক নথি থেকে

আমরা যা আশা করি, তা হলো জলবায়ু। যা পাই, তা আবহাওয়া।
–মার্ক টোয়েন (অসমর্থিত সূত্রমতে)

আস্তে আস্তে উত্তপ্ত হচ্ছে পরিস্থিতি-শুধু বৈশ্বিক উষ্ণতাই বাড়ছে না, সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এ ব্যাপারে হওয়া নানা আলোচনার উত্তপ্ততাও! জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত বিগত বছরগুলোর তথ্য কি সত্যি?এই প্রশ্নের জায়গা এখন করে নিয়েছে অন্য আরেক প্রশ্ন-কেন জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে এবং কীভাবে এটাকে থামানো যায়?

এমনকি কয়েক বছর আগেও যারা এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করতেন, তারাও আস্তে আস্তে মেনে নিচ্ছেন। মানবেন না-ই বা কেন? দুনিয়া জুড়ে গলতে শুরু করেছে হিমবাহ, গ্রিনল্যান্ডের বরফ চোখের পলকে উধাও হয়ে যাচ্ছে, এমনকি তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে সমুদ্রের জলধারার! গত কয়েক বছরের আবহাওয়ার পরিবর্তনও কি লক্ষণীয় নয়? কোথাও খরা হচ্ছে তো হচ্ছেই, আবার কোথাও বন্যায় ভেসে যাচ্ছে সবকিছু। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারির একটা রিপোর্ট অনুসারে, আলাস্কা সেবার দেখেছে তার ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উষ্ণ শীতকাল। স্বাভাবিকের চাইতে দশ ডিগ্রী ফারেনহাইট বেশি ছিল সেই মে মাসের তাপমাত্রা। আর্কটিকের আইস-ক্যাপ নিয়ে সংগঠিত এক হিসাব থেকে আমরা এখন জানি, সর্বকালের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছিল তার পরিমাণ।

তবে এসবের চাইতে ভয়ানক যে প্রশ্নটা নিয়ে এই বইতে আমি লিখেছি তা হলো, এরপর কী হতে যাচ্ছে? উত্তরটা অবাক করে দেবে যে কাউকে। অথচ শক্ত প্রমাণ এবং বিজ্ঞান তার পেছনে থাকলেও, এই উত্তরটা নিয়ে পারতপক্ষে কেউ কথাই বলতে চায় না! পাঠক, শুনলে আপনারাও চমকে যাবেন, কেননা এসব আগেও ঘটেছে! বিশ্বাসী হন বা অবিশ্বাসী, আগে থেকে জেনে রাখার সুবিধা হলো, আগে-ভাগে প্রস্তুত হয়ে থাকা যায়।

আসুন, আমাদের এই গ্রহের ভবিষ্যতটা জেনে নেই।

এপিগ্রাফ

প্রভু ঈশ্বর মোজেসকে বললেন, 'অ্যারনকে বলো, 'হাতে তুলে নাও তোমার লাঠি, হাত বাড়িয়ে দাও মিশরের সমস্ত পানি, সমস্ত জলাধার–নদী আর পুকুরের প্রতি; যেন মিশরের সমস্ত জল পরিণত হয় রক্তে, চাই তা কাঠের পাত্রে রাখা হোক .বা হোক পাথরের পাত্রে।' '

এক্সুডাস ৭ঃ১৯

মিশরের জন্য দানিয়েল কেবলই একটা নদী নয়।

–মার্ক টোয়েন

প্রারম্ভ
বসন্ত, ১০২৪ বি.সি.
নুবিয়ার মরুভূমি, দক্ষিণ মিশর

প্রধান যাজিকা নগ্ন হয়ে বালুর উপর শুয়ে আছেন; তিনি জানেন-সময় সমাগত। লক্ষণগুলো একে একে ফুটে উঠতে শুরু করেছে, আস্তে আস্তে সম্ভাবনা পরিণত হয়েছে নিশ্চয়তায়। পশ্চিমে এক বালুঝড় যেন সূর্যকে স্পর্শ করার আগ্রহে লাফিয়ে উঠছে, মধ্য দুপুরেও অন্ধকার হয়ে এসেছে সবকিছু। থেকে থেকে হচ্ছে বজ্রপাত।

শত্রুপক্ষ এসে পড়েছে প্রায়।

প্রস্তুতি হিসেবে সাবাহ তার দেহের সব লোম চেঁছে ফেলেছেন, এমনকি রঙ করা চোখের পাতার উপরের ভ্রূটুকুও আর নেই। মরুভূমির গভীর থেকে বেরিয়ে আসা নদীর উভয় শাখার পানিতেই গোসল সেরেছেন তিনি। শাখা দুটো এসে জড়ো হয়েছে যেখানে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন এখন। এই মোহনাকে হেকা খাসেশেট-এর প্রাচীন সম্রাটরা ডাকতেন নাহাল বলে। কল্পনার চোখে নদীটার অগ্রগতি দেখতে পেলেন সাবাহ, দেখলেন কীভাবে সাপের মতো এঁকেবেকে ওটা লুক্সর, থিবস, মেমফিস হয়ে সমুদ্রের সাথে মিলতে ছুটছে।

ওসব এলাকা কখনও চোখে দেখেননি তিনি, তবে গল্প শুনেছেন প্রচুর।

আমাদের আদি বাসস্থানের গল্প, যেখানে সব সবুজের সমারোহ। নাহালের প্লাবন হয় যেখানে নির্দিষ্ট সময় অন্তর। সুখে-শান্তিতে যেথায় বাস করে মানুষ।

ওখান থেকেই পালিয়ে এসেছে সাবাহের গোত্র, তা-ও প্রায় একশো বছরের বেশি হলো। মহামারী, ক্ষুধা, মৃত্যু আর অত্যাচারী এক ফারাওয়ের হাত থেকে পালাতে হয়েছে তাদের। ওই ব-দ্বীপের অন্যান্য গোত্র আশ্রয় নিয়েছে পূব দিকের মরুভূমিতে। যতদূর সাবাহ জানেন, ওখানকার কিছু এলাকা দখল করে নিজেদের সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু ওর নিজের গোত্র এসেছে এদিকে, নদী ধরে আরও দক্ষিণে। জেবা নামক গ্রামের কাছে বাস করে তারা। হোরাসের সিংহাসন বা ওয়েটজেস-হোর নামক জেলায় ওটার অবস্থান, মিশরের উচ্চভূমিতে।

সেই অন্ধকার আর মৃত্যুর সময়ে তার গোত্র চিরতরে ছেড়ে এসেছে তাদের আদি নিবাস। মিশরীয় সাম্রাজ্যের হাত এড়াতে একেবারে নুবিয়ান মরুভূমির ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে। এই গোত্রটা শিক্ষিতদের গোত্র। অগণিত জ্ঞানী, লিপিকার, যাজক-যাজিকা আর জ্ঞানের ধারক আছেন ওদের মাঝে। মহামারীর পর যে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ইতিহাস সাথে করে নিয়ে পালিয়েছেন তারা। সেই সময় বর্বর এক জাতি দখল করে নিয়েছিল মিশর, ব্রোঞ্জের রথ আর উন্নতমানের অস্ত্র হাতে থাকায় তাদের সে কাজে খুব একটা কষ্ট হয়নি।

তবে সেই অশুভ সময়ের পরিসমাপ্তি হতে আর বেশি দেরী নেই।

আবার মাথা তুলতে শুরু করেছে মিশর। হানাদার বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে গড়তে শুরু করেছে তাদের বিজয়ের নানা নিশান। এমনকি এদিকেও রওনা হয়েছে তারা!

'হেমেত নেজার ' সাবাহের নুবিয়ান সহকারী, টাবর নামের এক যুবক বলল। ছেলেটা সম্ভবত ওর মাঝে চলতে থাকা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আভাস পেয়েছে। তাই হয়তো হেমেত নেজার .ঈশ্বরের সাহায্যকারিণী হিসেবে ওর দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিতে চাইল সে। 'আমাদের এখুনি যেতে হবে।'

উঠে দাঁড়ালেন সাবাহ।

টাবরের চোখ পশ্চিম থেকে ধেয়ে আসা ঝড়ের দিকে। তবে উত্তর দিকের আকাশের মেঘের ছোঁয়া নজর এড়াল না সাবাহের। নাহালের পঞ্চম জলপ্রপাতের পাশের কোন গ্রাম মিশরীয় সেনাবাহিনীর রোষের শিকার হয়েছে, বুঝতে পারলেন তিনি। এখানে এসে পৌঁছাতে তাদের আর বেশি সময় লাগবে না।

তার আগেই গুপ্ত সঙ্ঘের সবাইকে নিয়ে প্রায় এক শতাব্দী ধরে রক্ষা করে আসা গোপন জ্ঞানটা লুকিয়ে ফেলতে হবে ওকে। ঈশ্বরের অন্য যেকোন আশির্বাদের মতো যেটা লুকিয়ে আছে এক অভিশাপের ভেতর।

এক হাজার দিন ধরে চলছে তার প্রস্তুতি। শুরু হয়েছে মিশরীয়দেরকে গ্রামের পর গ্রাম জয় করে এগোতে দেখে। পবিত্রকরণের নানা পদ্ধতির দিকেই বেশিরভাগ মনোযোগ ছিল সবার। ঈশ্বরের আশির্বাদ ধারণের পাত্র হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হলে যার কোন বিকল্প নেই।

একদম শেষে এই পরিবর্তনের জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে সাবাহকে। কেননা তাকেই সঙ্ঘের অন্য ভাই-বোনদের প্রস্তুত করতে হয়েছে। গত এক বছরের মাঝে কোন দানাদার শস্য মুখে পর্যন্ত তোলেননি মহিলা; খেয়েছেন শুধু বাদাম, জাম, গাছের বাকল আর রেসিন মিশ্রিত চা। সময়ের সাথে সাথে তার দেহের সব মাংস শুকিয়ে লেগে গিয়েছে হাড়ের সাথে, নারীত্বের প্রতীক-রূপী স্তন আর নিতম্ব শুকিয়েছে সবার আগে। বয়স মাত্র ত্রিশের কোঠায় হলেও, টাবরের সাহায্য ছাড়া এখন আর এক পা-ও এগোনো সম্ভব না তার পক্ষে।

লিলেনের রোবটা গায়ে চড়িয়ে মোহনার কাছ থেকে সরে আসতে শুরু করলেন তিনি। ঝড়টা চোখের সামনেই তীব্র গতিতে এগিয়ে আসছে। সাবাহ যেন টের পাচ্ছিলেন সেই ঝড়ের বিচ্ছুরিত শক্তি, আস্তে আস্তে সারা মরুভূমিতে ছড়িয়ে পড়ছে সেই তাপ। বাতাসে ভাসছে তার গন্ধ, হাতের রোমকূপগুলোতেও সেগুলোর অস্তিত্ব অনুভব করছেন তিনি। ঈশ্বর চাইলে, এই বালুঝড় তাদের পায়ের ছাপ লুকিয়ে ফেলবে। সেই সাথে ঢেকে দেবে তাদের সেরা সৃষ্টিটাকেও

.তবে এখন জরুরী হচ্ছে সেই পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছানো।

মন থেকে ওসব ভাবনা সরিয়ে দিয়ে এক পায়ের সামনে আরেক পা ফেলার প্রতি মনোযোগী হলেন সাবাহ।

কেন যেন তার মনে হচ্ছে, নদীর ধারে একটু বেশিই সময় কাটিয়ে ফেলেছেন টাবরকে সাথে নিয়ে যখন তিনি দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানটায় পা রেখেছেন, তখন তাদেরকে ধরে ফেলেছে উন্মত্ত বালুঝড়!

'তাড়াতাড়ি করুন, মাননীয়া।' তাড়া দিল টাবর, হাত বাড়িয়ে তুলল সাবাহকে। বলতে গেলে এখন তাকে বয়েই নিয়ে যাচ্ছে ছেলেটা।

আমি ব্যর্থ হবো না

এক মুহূর্ত পরেই নিজেদেরকে তারা আবিষ্কার করলেন বেলেপাথর খোদাই করে বানানো সেই অত্যাশ্চর্যের পেটে। লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার, চারিদিকে ছায়ার উন্মাদনা। যতই এগোচ্ছেন, ততই শিল্পীদের অসাধারণ যত্ন আর প্রতিভার ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ প্রায় সত্তর বছর আগে বানানো এই অত্যাশ্চর্য দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন।

লম্বা লম্বা দাঁতরূপী পাথর আর পাথুরে জিহ্বা পার হয়ে এগিয়ে যেতে তাকে সাহায্য করল টাবর অসাধারণ দক্ষতায় প্রায় আসলের মতো করেই বানানো হয়েছে ওগুলো। সামনে দু'টি পথ উন্মুক্ত হয়ে আছে। একটা সরাসরি পাকস্থলীতে চলে গিয়েছে, অন্যটা উঠা-নামা করতে করতে হারিয়ে গিয়েছে বুকের ভেতরে।

পরের পথটা ধরে এগোতে লাগলেন তারা।

চলতে চলতে মানসচোখে যেন ভূ-গর্ভস্থ অত্যাশ্চর্যের পুরোটা একসাথে দেখতে পেলেন সাবাহ। অনেক আগেই খোদাই করা হয়েছে এই জায়গাটা, মহিলাদের দেহাভ্যন্তরের অনুকরণে। পাহাড়ের নিচে শুয়ে আছে সেই শিল্পকর্ম; বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই। কেননা এই পাথুরে মহিলার ত্বক হচ্ছে মাটি মানব দেহের অভ্যন্তরের সমস্ত আঁক-বাঁক নিপুণ দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তোলা হয়েছেঃ যকৃত, বৃক্ক, মুত্র-থলী, মগজ-কিছুই বাদ যায়নি।

বলা যায়, পাহাড়ের নিচে নিজেদের জন্য পাথুরে দেবতাকে বানিয়ে নিয়েছে তার গোত্র। চাইলে এর ভেতরে বাসও করতে পারে তারা। আলাদা করে রাখতে পারে সেই বস্তুকে, যা সবার থেকে দূরে রাখতেই হবে!

আমাকে শক্ত হতে হবে . হতে হবে ঈশ্বরের আশির্বাদের ধারণ-পাত্র।

সমানের পথটা আবারও দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। তার বুকে যেমন শ্বাসনালী দুইভাগে ভাগ হয়ে এগিয়ে যায়, ঠিক তেমনি। বাঁ দিকের পথ ধরে এগোলেন তারা। এই পথটা একটু নিচু বলে মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। তবে বেশিক্ষণ এই কষ্ট করতে হবে না তাদের।

আচমকা শেষ হয়ে গেল পথ, নিজেদেরকে বিশাল এক গুহার অভ্যন্তরে আবিষ্কার করলেন সাবাহ। দুইপাশে পাথরের পাঁজরের উপর ভর করে মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক শিরদাঁড়া।

ঘরটার ঠিক মাঝখানে দেখা যাচ্ছে একটা পাথরের হৃদপিন্ড। আকারে ওটা সাবাহের চারগুণ! অন্য সবকিছুর মতো এই হৃদপিন্ডও নিখুঁতভাবে বানানো। এমনকী সবগুলো রক্তনালীও দেখা যাচ্ছে।

আগে থেকেই ওখানে উপস্থিত থাকা নুবিয়ান ভৃত্যদের দিকে তাকালেন তিনি, হাঁটু গেঁড়ে আছে প্রত্যেকেই। অপেক্ষা করছে তারই আবির্ভাবের।

পাথুরে পাঁজরের হাড়ের দিকে নজর গেল সাবাহের। ওগুলোর মাঝে মাঝে রয়েছে অনেকগুলো প্রকোষ্ঠ, এখন দেখা যাচ্ছে না। সদ্য-নির্মিত পাথর দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে ওগুলোকে। ওর সঙ্ঘের ভাই ও বোনেরা ওই প্রকোষ্ঠগুলোতে যার যার শেষ বিশ্রামের জন্য প্রবেশ করেছে। নিশ্চয়ই চেয়ারের উপর বসে আছে তারা, দেহগুলো শেষ পরিবর্তন সমাপ্ত করে পরিণত হয়েছে ঈশ্বরের আশির্বাদের ধারণ-পাত্রে।

আমিই শেষ . . .আমিই শেষ ঈশ্বরের আশির্বাদ-প্রাপ্ত।

নজর সরিয়ে হৃদপিন্ডের দিকে তাকালেন তিনি। ছোট একটা দরজা রাখা হয়েছে ওতে, ভেতরে প্রবেশের জন্য। সঙ্ঘের সর্বোচ্চ সম্মান এই ব্যবস্থা।

টাবরের হাত নিজের উপর থেকে সরিয়ে শেষ পদক্ষেপগুলো একাই ফেললেন সাবাহ। দোরগোড়ায় এসে মাথা নিচু করে পা রাখলেন ভেতরে। পাথুরে দেয়ালের ঠান্ডা স্পর্শ তাকে আমন্ত্রণ জানাল। সামনেই একটা রুপালী চেয়ার তার জন্য অপেক্ষা করছে। ওটায় বসার সাথে সাথে সেই একই ঠান্ডা স্পর্শ অনুভব করলেন তিনি। তার একপাশে ল্যাপিস লাজুলি নির্মিত একটা পাত্র, পানিতে টুইটুম্বুর হয়ে আছে। পাত্রটাকে তুলে নিয়ে কোলের উপর রাখলেন সাবাহ।

দরজায় দেখা গেল টাবরকে, কথা বলতে পারছে না কষ্টে। কিন্তু চেহারা দেখে মনের অনুভূতি ঠিক বুঝতে পারলেন তিনি। দুঃখ, আশা আর ভয়ে পরিপূর্ণ ছেলেটার মন। তার নিজের ভেতরেও সেই অনুভূতি হচ্ছে। সেই সাথে রয়েছে কিছুটা সন্দেহও। কিন্তু সেসব পাত্তা না দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'শুরু করো।'

দুঃখ এবার পুরোপুরি দখল করে নিল ছেলেটার চেহারাকে। কিন্তু নড করে উধাও হয়ে গেল সে। সেই জায়গা দখল করে নিল আরেকজন ভৃত্য। মাটি ও খড় নির্মিত ইট দিয়ে সে ঢেকে দিতে লাগল দরজাটাকে। অন্ধকারের চাদর যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করছে সাবাহকে। তবে পুরোপুরি করার আগেই পাত্রটা তুলে নিলেন তিনি। আধো আলো. আধো অন্ধকারে পানির হালকা উজ্জ্বল ভাবটা তার নজর এড়াল না, প্রায় রক্ত লাল দেখাচ্ছে এখন পানিটুকু। হাতে কী ধরে আছেন, তা ভালোভাবেই জানেন সাবাহ-নাহাল থেকে আনা পানি। নীল নদের পানি যেখানে রক্তে পরিণত হয়েছিল, সেখানকার। অনেক আগে সংগ্রহ করা হয়েছিল এই পানিটুকু, তারপর থেকে তার সঙ্ঘই সেটা সংরক্ষণ করে আসছে।

শেষ ইটটা গাঁথা হতেই, এক চুমুকে পানিটুকু পান করে নিলেন সাবাহ। বাইরে থেকে কাদা লেপার আওয়াজ ভেসে আসছে। সেই সাথে আসছে কাঠ জড়ো করার আওয়াজও।

চোখ বন্ধ করে ফেললেন সাবাহ, এরপর কী হবে তা জানেন।

কল্পনার চোখ দেখতে পেলেন, আগুন ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে কাঠে।

আস্তে আস্তে গরম হয়ে ওঠা মেঝে সেই কল্পনার সত্যতা প্রমাণে ব্যস্ত। বাতাস গরম হয়ে উঠল প্রায় সাথে সাথেই, আর্দ্রতাটুকু উধাও হয়ে গেল। সাবাহের মনে হলো-তিনি বুঝি বাতাস নয়, উত্তপ্ত বালুতে শ্বাস নিচ্ছেন!

কিন্তু চুপ করে রইলেন তিনি। বাইরে যারা উপস্থিত ছিল, তাদের এতক্ষণে চলে যাবার কথা। এই অত্যাশ্চর্যে প্রবেশ করার সব পথ বন্ধ করে দেবে তারা। চলে যাবে এই এলাকা ছেড়ে। ঝড়ের আড়ালে উধাও হয়ে যাবে যেন।

চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল তার, তবে নিচে পড়ার আগেই বাষ্প হয়ে যাচ্ছে। ফাটা ঠোঁট দিয়ে এখন বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে ব্যথার চিৎকার। আচমকা অন্ধকার চিরে হালকা একটা আভা দেখা গেল, তার কোলে রাখা পাত্রটা থেকে আসছে সেই আভা।

ব্যথার তীব্রতায় ভ্রম হচ্ছে কিনা, জানেন না সাবাহ। তবে সেই আভাটুকু যেন তাকে স্বস্তি পৌঁছে দিচ্ছে...যেন শক্তি যোগাচ্ছে শেষ কাজটা করার। অল্প যেটুকু পানি অবশিষ্ট ছিল, সেটাও পান করে ফেললেন তিনি। প্রাণদায়িনী পানিটুকু তার ঠোঁট থেকে গলা...গলা থেকে পৌঁছে গেল পাকস্থলীতে।

পাত্রটা যখন হাত থেকে নামিয়ে রেখেছেন, তখন ভেতরে উত্তাপ তীব্রতর থেকে তীব্রতম হচ্ছে। অথচ ব্যথাকে অগ্রাহ্য করে হাসলেন তিনি। জানেন, নিজের ভেতরে কাকে স্থান দিয়েছেন।

আমি আপনার আশির্বাদের ধারণ-পাত্র হে প্রভু...চিরতরের জন্য।

রাত ৯: ৩৪ ই.এস.টি.
মার্চ ২, ১৮৯৫
নিউ ইয়র্ক সিটি

এতক্ষণে উট এল পাহাড়ের নিচে

অনিচ্ছুক সঙ্গীকে সাথে নিয়ে স্যামুয়েল ক্লেমেন্স-যিনি কিনা তার ছদ্মনাম, মার্ক টোয়েন হিসেবে বেশি পরিচিত-গ্রামেসারি পার্কের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। একদম সামনে গ্যাসলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে দ্য প্লেয়ার্স ক্লাবের নামফলক। ওই ক্লাবের সদস্য তারা দু'জনেই।

হাসি-ঠাট্টা, আর আনন্দময় সময় কাটাবার হাতছানি দেখতে পেয়ে চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন টোয়েন। তার মুখের সিগারটা থেকে ঘন ধোঁয়া বেরিয়েই আবার হারিয়ে যাচ্ছে রাতের আঁধারে। 'নিকোলা, তোমার কী মনে হয়?' পেছন ফিরে বন্ধুকে বললেন তিনি। 'আমার পকেট ঘড়ি আর পাকস্থলী ঘোষণা দিচ্ছে যে ক্লাবে এরইমধ্যে খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। আর তাছাড়া, সিগারের সাথে কিছুটা ব্র্যান্ডি হলে মন্দ হয় না।'

মার্ক টোয়েনের প্রায় বিশ বছরের ছোট, নিকোলা টেসলার পরনে একটা প্রাচীন স্যুট। ওটার দুই কনুইয়ের কাছের কিছুটা জায়গা আবার রঙচটা। বারবার মাথার কালো চুলে হাত বুলাচ্ছেন তিনি, আর চারপাশে নজর বুলাচ্ছেন। নার্ভাস হলে তার কথায় সার্বিয়ান টানটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'স্যামুয়েল, রাত অনেক হয়েছে। আমার অনেক কাজও বাকি। নাটক দেখিয়েছ, সেজন্য ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু এখন ফেরা দরকার।'

'বাজে বোকো না তো! সবসময় এত কাজ করা মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর।'

'তাহলে তো তোমার মাথা খুব চালু হবার কথা .কাজ-টাজ তো কিছুই নেই!'

চোখে বিষ ঢেলে বন্ধুর দিকে তাকালেন টোয়েন। 'বলেই যখন ফেললে তো শোন-এই মুহূর্তে একটা বই নিয়ে ব্যস্ত আমি এখন।'

'কাহিনি আন্দাজ করি দাঁড়াও-হাক ফিন আর টম সয়্যার আবার ঝামেলায় জড়িয়েছে?'

'তা জড়ালে তো বেঁচেই যেতাম!' মুচকি হাসি দেখা গেল টোয়েনের চেহারায়। 'আমার পাওনাদারদের একটু ঠান্ডা করতে পারতাম।'

আগের বছরই নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করেছেন টোয়েন, অবশ্য কথাটা খুব একটা বেশি মানুষ জানে না। নিজের সব বইয়ের স্বত্ব তিনি তার স্ত্রী, অলিভিয়ার নামে দিয়ে দিয়েছেন। পরবর্তী বছরটা কাটাবেন দুনিয়া জুড়ে টাকার বিনিময়ে বক্তব্য দিয়ে।

টাকা-পয়সার প্রসঙ্গ ওঠায়, ফিকে হয়ে এল তার আনন্দ। অবশ্য নিজের জন্য না, নিকোলার জন্য। টোয়েন জানেন, তার বন্ধুরও টাকা-পয়সার টানাটানি চলছে। কোন সন্দেহ নেই, নিকোলা টেসলা অসম্ভব প্রতিভাবান একজন মানুষ। একই সাথে আবিষ্কারক, ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার এবং পদার্থ বিজ্ঞানী তিনি। কিন্তু টাকা-পয়সার মামলায় একেবারেই কাঁচা।

'আচ্ছা চলো, এক গ্লাস পান করলে খুব একটা ক্ষতি হবে না।' নিকোলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন।

হিসহিস করে জ্বলতে থাকা গ্যাসলাইটের নিচে এসে উপস্থিত হলেন তারা। কিন্তু ভেতরে ঢোকার আগেই ছায়ার মধ্যখান থেকে তাদের দিকে এগিয়ে এল এক অবয়ব।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' বললেন লোকটা। 'তুমি এখানে আসবে বলে শুনেছিলাম।'

অবাক হয়ে গেলেন টোয়েন, তবে লোকটাকে চিনতে অসুবিধা হলো না। 'আরে, স্ট্যানলি! এখানে কী করছ! আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি এখনও ইংল্যান্ডে আছ!'

'গতকাল ফিরে এসেছি।'

'দারুণ! চলো, তোমার প্রত্যাবর্তনের আনন্দে দুই গ্লাস হয়ে যাক। তিনটা হলে তো আরও ভালো!'

দুই বন্ধুকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলেন টোয়েন, কিন্তু স্ট্যানলি তাকে থামিয়ে দিলেন।

'আমার জানামতে,' বললেন তিনি। 'তুমি থমাস এডিসনকে চেন?'

'হুম .চিনি।' ইতস্তত করতে করতে জবাব দিলেন টোয়েন। নিকোলা আর থমাসের মাঝে যে গোলমাল আছে, তা তার অজানা নেই।

'রাজার আদেশে আমার লোকটার সাথে কিছু কথা বলা দরকার।'

'তাই?'

'আমি সাহায্য করতে পারি?' পাশ থেকে বলে উঠলেন টেসলা।

পরস্পরের সাথে অপরিচিত দুই ভদ্রলোককে পরিচয় করিয়ে দিলেন টোয়েন। 'নিকোলা, ইনি হচ্ছেন হেনরি মর্টন স্ট্যানলি। অতি সত্বর স্যার উপাধি পেতে যাচ্ছেন বলে শুনলাম। নিজে একজন অভিযাত্রী সে। সেই সাথে আফ্রিকার গহীনে হারিয়ে যাওয়া ডেভিড লিভিংস্টোন নামে পরিচিত আরেক অভিযাত্রীকে খুঁজে বের করার জন্য বিখ্যাত।'

'আহ।' বললেন নিকোলা। 'মনে পড়েছে। এই লিভিংস্টোন নিশ্চয় ড. লিভিংস্টোন?'

গুঙিয়ে উঠলেন স্ট্যানলি।

'আর ইনি হচ্ছেন নিকোলা টেসলা। এডিসনের বরাবর তো হবেই, সম্ভবত তার চাইতে বেশি প্রতিভাবান।'

পরিচয় পেয়ে ছোট ছোট হয়ে গেল স্ট্যানলির চোখ। 'আমার চিনতে পারা উচিৎ ছিল।'

লাল হয়ে গেল নিকোলার মলিন গাল।

'তো,' টোয়েন জানতে চাইলেন। 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবার তোমার ঘাড়ে কী চাপাল শুনি?'

কমতে শুরু করা ধূসর চুলে হাত বুলালেন স্ট্যানলি। 'তুমি তো জানোই, লিভিংস্টোন নীল নদের উৎস খুঁজতে গিয়ে আফ্রিকায় হারিয়ে গিয়েছিল। আমিও ওই উৎস খোঁজার জন্য কয়েকবার মাঠে নেমেছি।'

'তোমার মতো আরও অনেকেই নেমেছে।'

ভ্রু কুঁচকে ফেললেন স্ট্যানলি, তবে কিছু বললেন না।

'তারপর?' চাপ দিলেন টোয়েন।

বন্ধুকে কাছে টেনে পকেট থেকে একটা ছোট জিনিস বের করে আনলেন স্ট্যানলি। ছোট্ট একটা ভায়াল, ভেতরে কালো তরলে ভর্তি। 'ডেভিড লিভিংস্টোনের সম্পত্তির ভেতর থেকে এই জিনিসটা পেয়েছি আমরা। এক নুবিয়ান যোদ্ধার ছেলেকে বাঁচিয়েছিল ডেভিড। সেই যোদ্ধা উপহার হিসেবে ওকে দিয়েছিল এক প্রাচীন তালিসমান। ছোট পাত্রটা মোম দিয়ে সিল করা ছিল, ওটার দেহে খোদাই করা ছিল অসংখ্য হায়ারোগ্লিফ। যাই হোক, ওই তালিসমানের ভেতরে যে

পানি পাওয়া গিয়েছিল, এই ভায়ালে সেটাই আছে। ওই নুবিয়ান যোদ্ধার দাবী ছিল, এই পানিটা নীল নদের!'

শ্রাগ করলেন টোয়েন। 'তো? তাতে কী যায় আসে?'

এক পা পিছিয়ে এসে ভায়ালটাকে আলোতে ধরলেন স্ট্যানলি। ভেতরের তরলটুকুর রঙ উজ্জ্বল লাল বলে মনে হলো।

'লিভিংস্টোনের লেখা অনুসারে, এই পানির বয়স হাজার বছরেরও বেশি। যখন নীল নদের পানি রক্তে পরিণত হয়েছিল, তখন সংগ্রহ করা হয়েছিল এটি।'

'রক্তে পরিণত হয়েছিল মানে?' জানতে চাইলেন নিকোলা। 'ওল্ড টেস্টামেন্টের সেই মহামারীর কথা বলছেন?'

হাসলেন টোয়েন। তার সন্দেহ, স্ট্যানলি ওদেরকে বোকা বানাতে চাইছেন। 'তোমার দাবী, মোজেস যখন নীল নদের পানি রক্তে পরিণত করলেন, তখনকার সময়ের নমুনা এটা?'

'জানি কথাটা কেমন শোনাচ্ছে।' স্ট্যানলির চেহারা গম্ভীর।

'অসম্ভব একটা-'

'রয়্যাল সোসাইটির বাইশ জন মানুষ মারা গিয়েছেন। ওই তালিসমান যখন প্রথম খুলে ল্যাবে নিয়ে পরীক্ষা করা হয়, তখন মৃত্যু বরণ করেছেন তারা।'

চুপ হয়ে গেলেন টোয়েন।

'কীভাবে মারা গেলেন?' কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভাঙলেন টেসলা। 'বিষ ছিল নাকি?'

মলিন হয়ে গিয়েছেন স্ট্যানলি। এই ভদ্রলোক ভয়ঙ্কর সব প্রাণীর মোকাবেলা করেছেন, প্রাণঘাতী জ্বরকে দেখিয়েছেন কাঁচকলা, নরখাদক অসভ্যরা তাকে রুখতে পারেনি। অথচ সেই মানুষের চেহারায় এখন ভয়ের আভা!

'বিষ না।'

'তাহলে?'

গাম্ভীর্য অটুট রেখে স্ট্যানলি জবাব দিলেন। 'অভিশাপ। প্রাচীন এক প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন তারা। এই পানিটুকু যে মিশরীয়দের উপর মহান প্রভুর অভিশাপ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি আমরা একে না থামাই, তাহলে সামনে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে-তা এক ঈশ্বরই জানেন।'

'আমাদের কী করণীয়?' জানতে চাইলেন টোয়েন।

নিকোলার দিকে ফিরলেন স্ট্যানলি, 'আমার সাথে ইংল্যান্ডে আসুন।'

'কেন?' আবারও জানতে চাইলেন টোয়েন।

'পরবর্তী মহামারীটাকে থামাবার জন্য।'

পর্ব এক

মমিকরণ

এক

বর্তমান সময়
২৮ মে, সকাল ১১:৩২ ই.ই.টি.
কায়রো, মিশর

করোনারের অনিশ্চিত ভঙ্গি দেখে ডেরেক র‍্যাঙ্কিন বুঝতে পারল-কিছু একটা ঘাপলা আছে। 'লাশটা দেখান।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে মর্গের এলিভেটরের দিকে ইঙ্গিত করল ড. বাডাউই। 'আসুন আমার সাথে।'

করোনারের পিছু পিছু এগোনোর ফাঁকে নিজের দুই সঙ্গীর দিকে তাকাল ডেরেক। জানে না, ব্যাপারটা তাদের উপর কী রকম প্রভাব ফেলবে। দু'জনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মেয়েটার নাম সাফিয়া আল-মায়াজ, জেন ম্যাকেবের চাইতে এক মাথা উঁচু। আজ সকালে একটা প্রাইভেট জেটে চেপে লন্ডন থেকে কায়রো এসেছে সবাই, এখন এগোচ্ছে শহরের মর্গের দিকে।

একুশ বছর বয়সী জেনের প্রতি স্নেহ-সুলভ ব্যবহার করছে সাফিয়া। ডেরেকের নজর স্থির হলো তার উপর, প্রশ্ন করছে চোখের ভাষায়-মেয়েটা নিজেকে সামলাতে পারবে তো?

বড় করে শ্বাস নিয়ে মাথা নাড়ল সাফিয়া। পেশায় ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কিউরেটর সে। চার বছর আগে যোগদান করা ছেলেটা কাজ করে তার জুনিয়র হিসেবে। জৈব-প্রত্নতত্ত্ববিদ্যায় দক্ষ ডেরেকের দায়িত্ব-দাঁত, কঙ্কালতন্ত্র, পেশী ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাচীন আমলের মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তদন্ত করা। অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানও তার কাজের আওতায় পড়ে। এর আগে লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের সাথে কাজ করার সময় ইউরোপের ব্ল্যাক ডেথ, আয়ারল্যান্ডের মহা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নিয়েও তদন্ত করেছে সে।

ডেরেকের বর্তমান কাজ হলো-নীল নদের ষষ্ঠ জলপ্রপাত থেকে উদ্ধার করা কতগুলো মমির ব্যাপারে অনুসন্ধান করা। সুদানের ওই জায়গাটাতে নতুন একটা বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। এমনিতে অবশ্য জায়গাটা নিয়ে কারও আগ্রহ ছিল না। তবে বাঁধের কাজ শুরু হওয়ার পর সুদান আর্কিওলজিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির মাথায় ভূত চেপেছে-ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগেই ওই অঞ্চল থেকে যতটুকু সম্ভব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো উদ্ধার করতে হবে। এ কাজে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সাহায্য চেয়েছে তারা। অনেক দিন ধরেই কাজ চলছে। প্রজেক্টের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত-

প্রাচীন লিপি খোদাই করা বেশ কিছু মূল্যবান পাথর ছাড়াও, একটা ছোট-খাটো নুবিয়ান পিরামিডের মোট তিনশো নব্বইটা টুকরো উদ্ধার করা হয়েছে।

তবে বলা হয়ে থাকে, জায়গাটা অভিশপ্ত। দুই বছর আগে, একটা গোটা সার্ভে টিমসহ প্রজেক্টের প্রধান রিসার্চার উধাও হয়ে যান। কয়েক মাস অনুসন্ধানেও কিছু জানতে না পারায়, বাধ্য হয়ে খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে দেয়া হয়। সার্ভে টিমের প্রায় অর্ধেক লোক স্থানীয় সুদানিজ। অবশ্য আরব বিদ্রোহী ও ডাকাত অধ্যুষিত এরকম একটা এলাকায় অনুপ্রবেশ করা সিদ্ধান্তটাও সঠিক ছিল না। ভুলের মাশুল সম্ভবত নিজেদের জীবনের বিনিময়ে চুকাতে হয়েছে তাদের। এখনও কোন বিদ্রোহী গ্রুপ দায় স্বীকার করেনি যদিও।

ঘটনাটার পর নড়ে-চড়ে বসে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ। একগুঁয়েমির জন্য 'কুখ্যাত' হলেও, নিজ কর্মক্ষেত্রে টিম লিডার প্রফেসর হ্যারল্ড ম্যাককেবের প্রচুর নাম-ডাক। ডেরেকের শিক্ষক হওয়ার পাশাপাশি, লন্ডন ইউনিভার্সিটির বৃত্তি-লাভের ব্যাপারেও সহায়তা করেছিলেন ভদ্রলোক। খুব ভালো সম্পর্ক ছিল দু'জনের। তার নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়েই এই কাজে আগ্রহী হয় ডেরেক।

তাই আজ যখন প্রফেসরের মৃত্যুসংবাদ কানে এল, বিচলিত না হয়ে পারেনি সে। কিন্তু তিনজনের এই দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যের তুলনায়, তার কষ্টটুকু আসলে কিছুই না।

এলিভেটরে ঢুকে পড়েছে জেন ম্যাককেব, হ্যারল্ড ম্যাককেবের মেয়ে। হাত দুটো আড়াআড়ি ভঙ্গিতে বুকে ধরা। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে নাকের নিচে আর কপালে। মর্গ বিল্ডিং-এর শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারেনি একটুও। তবে ডেরেক জানে, এই ঘামের কারণ গরম নয় দুশ্চিন্তা।

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই মেয়েটার হাত স্পর্শ করল সাফিয়া। 'জেন, তুমি বরং এখানেই থাক। তোমার বাবাকে আমি ভাল করেই চিনি। শনাক্ত করার কাজটা আমি একাই সারতে পারব।'

মাথা নেড়ে তাকে সমর্থন জানাল ডেরেক। সামনে এক পা বাড়িয়ে দিয়েছে, দরজা বন্ধ হতে গেলে আটকাবে।

কঠিন হয়ে এল জেনের দৃষ্টি। 'না। কাজটা আমাকেই করতে হবে। দুটো বছর ধরে উত্তরের খোঁজে আছি। বাবার কথা ভাইয়ের কথা

মেয়েটার গলা ধরে এসেছে। বিব্রতবোধ করল সাফিয়া। জানে, নিখোঁজ হওয়ার সময় হ্যারল্ড ম্যাককেবের সাথে তার ছেলেও ছিল। ছয় বছর আগে জরায়ু ক্যান্সারে মা মারা যাওয়ার পর, একইসাথে বাবা আর ভাইকে হারিয়ে অকুল সাগরে পড়ে জেন।

এগিয়ে গিয়ে এলিভেটরের দরজা বন্ধ করে দিল মেয়েটা। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল সাফিয়ার মুখ দিয়ে।

ডেরেক জানত, এরকমই একটা উত্তর দেবে জেন। বাবার স্বভাব পেয়েছে ও মেধার পাশাপাশি একগুঁয়েমিও আছে সমান তালে। প্রফেসর ম্যাককেবের সাথে পরিচয়ের পরপরই জেনের সাথে পরিচয় হয় তার। একই ইউনিভার্সিটিতে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট করছিল ষোলো বছর বয়সী মেয়েটা। আর উনিশ বছরেই পেয়ে যায় নৃতত্ত্বে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি। এখন যুক্ত আছে একটা পোস্ট-ডক্টরাল প্রোগ্রামে। ঠিক যেন বাবার প্রতিচ্ছবি।

চলতে শুরু করেছে এলিভেটর। দুই সঙ্গিনীর মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছে না ডেরেক। প্রত্নতত্ত্বের ব্যাপারে দু'জনেরই ব্যাপক আগ্রহ। সাফিয়ার গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা। মাথার লম্বা কালো চুলগুলো অর্ধেক ঢাকা পড়েছে স্কার্ফের নিচে। পরনে কালো রঙের ঢোলা পায়জামা আর নীলচে ফুলহাতা ব্লাউজ। মৃদুভাষী হলেও নেতৃত্বদানের জন্য উপযুক্ত। পান্নার মতো সবুজ, শীতল চোখের দৃষ্টি থমকে দিতে পারে যে কোন পুরুষকে।

অন্যদিকে, গায়ে-গতরে বাবার মতো স্কটিশ ধাঁচ পেয়েছে জেন। ববকাট চুলগুলো ব্যক্তিত্বের মতোই আগুন-রঙা। তবে পথে-প্রান্তরে ঘুরে গায়ের চামড়া তামাটে করে ফেলেছিলেন প্রফেসর, অধিকাংশ সময় ল্যাবে থাকায় সে সুযোগটা জেন পায়নি। তাই এখনও ফর্সাই আছে ও, শুধু নাকের ডগা আর গালের দুই পাশে মেয়েলী লালচে আভা।

ঝাঁকি খেয়ে থামল এলিভেটর। দরজা খুলে যেতেই জীবাণু-নাশকের গন্ধ ধাক্কা মারল নাকে। প্যাসেজওয়ে ধরে সামনে থেকে পথ দেখাচ্ছে ড. বাডাউই। ছোট-খাটো গড়নের লোকটার পরনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ল্যাবকোট। ভাব দেখে মনে হচ্ছে- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ঝামেলাটা ঘাড়ের উপর থেকে ফেলতে চাইছে।

হলওয়ের শেষ মাথায়, একটা ছোট ঘরে ঢুকল করোনার। অনুসরণ করছে বাকিরা। ঘরের একেবারে মাঝখানে, ইস্পাতের টেবিলের ওপর একটা লাশ ঢেকে রাখা।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে সামনে বাড়ল করোনার, দৃষ্টি ডেরেকের দিকে। 'মনে হয়, আপনার আগে দেখা উচিত। মেয়েরা আপাতত বাইরে থাকুক।'

'না,' প্রতিবাদ করল জেন। 'আমাকে নিশ্চিত হতে হবে, লাশটা বাবার কি না।'

মেয়েটার মনোভাব উপলব্ধি করতে পারছে ডেরেক। দুই বছর বেশ দীর্ঘ সময়। অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে থাকতে সে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে। এবার মুক্তি চায়।

'চলুন, দেখা যাক।' বিড়বিড় করে বলল সাফিয়া।

মাথা নেড়ে টেবিলের দিকে এগোল করোনার। প্লাস্টিকের শিটটা তুলতেই বেরিয়ে এল লাশের ঊর্ধ্বাঙ্গ।

আঁতকে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল ডেরেক। এই লাশটা হ্যারল্ড ম্যাককেবের হতেই পারে না! অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, যেন শত শত বছর ধরে বালির নিচে পড়ে ছিল লাশটা। চোয়াল আর পাঁজরে হাড়ের গায়ে বসে গিয়েছে চামড়া। কোথাও একরত্তি মাংস নেই। চামড়ার রঙটাও কেমন যেন চকচকে, যেন বার্নিশ করা হয়েছে।

তবে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠতেই খুলিতে লেগে থাকা ধূসর, লালচে চুলের দিকে আটকে গেল ডেরেকের নজর। গাল আর থুতনির দাড়িও একই রঙের। মুখের আদলটাও বেশ পরিচিত।

জেনও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। অস্ফুট কাতরোক্তি বেরিয়ে এল তার গলা বেয়ে। 'বাবা!'

পিছিয়ে এসে সাফিয়ার বুকে মুখ গুঁজল মেয়েটা, ফোঁপাচ্ছে অনবরত। তবে সাফিয়ার ভঙ্গি স্থির। ভ্রূ কুঁচকে লাশটার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

তার মনের কথা ধরতে পেরেছে ডেরেক। করোনারের উদ্দেশ্যে বলল, 'দিন দশেক আগে, মানে খোঁজ পাওয়ার সময়, প্রফেসর ম্যাককেব নাকি জীবিত ছিলেন?'

মাথা নেড়ে সায় দিল ড. বাডাউই। 'যাযাবরদের একটা পরিবার তাকে মরুভূমিতে খুঁজে পায়, রুফা শহরের এক কিলোমিটার দূরে। ঠেলাগাড়িতে করে তাকে শহরে নিয়ে আসা হচ্ছিল। কিন্তু পৌঁছানোর আগেই মারা যান প্রফেসর।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না,' সাফিয়া মন্তব্য করল। 'লাশটা দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ পুরনো।'

ডেরেকও কথাটার সাথে একমত। তবে আরেকটা ব্যাপারটা ওকে খোঁচাতে শুরু করেছে। 'আপনি বলেছেন, দুই দিন আগে ট্রাকে করে লাশটা এখানে আনা হয়। প্লাস্টিকের শিট দিয়ে ঢেকে দেয়ার পর কেউ এটা স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। গাড়িটাতে কি রেফ্রিজারেটরের ব্যবস্থা ছিল?'

'না। কিন্তু মর্গে আনার পর লাশটা কুলারে রাখা হয়।'

সাফিয়ার দিকে তাকাল ডেরেক। 'মৃত্যুর পর প্রায় দশদিন গরম পরিবেশে ছিল লাশটা। কিন্তু পচনের কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। এমনকী চামড়ায় একটা ভাঁজ পর্যন্ত না!'

একমাত্র ক্ষত বলতে শুধু পোস্টমর্টেমের লম্বা কাটা দাগটা। লন্ডন থেকে আসার পথে করোনারের পাঠানো রিপোর্টে চোখ বুলিয়েছে ডেরেক। মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি, অতিরিক্ত গরম আর পানিশূন্যতাকেই সম্ভাব্য কারণ হিসেবে

বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত-প্রফেসরের ম্যাককেবের নিরুদ্দেশ সংক্রান্ত আসল কাহিনির ছিটেফোঁটাও এই পরীক্ষায় ধরা পড়েনি।

নীরবতা ভাঙল সাফিয়া। 'ওই যাযাবরদের ব্যাপারে কিছু জানা গিয়েছে? মৃত্যুর আগে প্রফেসর তাদের কিছু বলেননি? তার ছেলে কিংবা দলের বাকিদের সম্পর্কে?'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল লোকটা। 'খুব অসুস্থ আর দুর্বল ছিলেন তিনি। তাছাড়া যাযাবর লোকগুলো আরবী ছাড়া আর কিছু জানে না।'

'বাবা ভালোই আরবী বলতে পারতেন।' জোর দিল জেন।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল করোনার। 'একটা ব্যাপার রিপোর্টে লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। যাযাবরদের একজন জানিয়েছে, প্রফেসর নাকি বলছিলেন-কোন এক দানব তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।'

ভ্রূকুটি করল সাফিয়া। 'দানব?'

শ্রাগ করল ডক্টর। 'ওই যে বলছিলাম .পানিশূন্যতায় ভুগছিলেন তিনি। ওই অবস্থায় ভ্রম হওয়াটাই স্বাভাবিক।'

'আর কিছু?'

'আর বিড়বিড় করে একটাই শব্দ উচ্চারণ করছিলেন শুধু।'

'কী?'

জেনের উপর স্থির হলো করোনারের নজর। 'জেন।'

নিজের নাম শুনে কেঁপে উঠল মেয়েটা। সাফিয়া তাকে শান্ত করার সময়টুকু লাশটা ভালোভাবে দেখার কাজে ব্যয় করল ডেরেক। শক্ত হয়ে গিয়েছে চামড়া। টেনেটুনে দেখা গেল, বেশ মোটাও। হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে আঙুলের নখ।

বাডাউইর দিকে ফিরল ডেরেক। 'রিপোর্টে তো লেখা ছিল, লাশের পেটে একই আকারের বেশ কিছু ছোট ছোট পাথরের টুকরো পাওয়া গিয়েছে।'

'হ্যাঁ। কোয়েল পাখির ডিমের সমান।'

'গাছের বাকলও নাকি ছিল?

মাথা নেড়ে সায় দিল করোনার। 'মনে হয়, খিদের জ্বালায় সামনে যা পাচ্ছিলেন তাই মুখে ঢোকাচ্ছিলেন তিনি।'

'আরও একটা কারণ থাকতে পারে।'

'কী?' জানতে চাইল সাফিয়া।

পিছিয়ে এল ডেরেক। 'এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। তবে সবার আগে, মস্তিষ্কের একটা স্ক্যান করাব আমি।'

'কী ভাবছ তুমি?' জোর দিল সাফিয়া।

'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, মমিকরণ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন প্রফেসর ম্যাককেব।'

ভ্রূ কুঁচকালো বাডাউই। 'তা কীভাবে সম্ভব? আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, মৃত্যুর পর কেউ লাশটাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি।'

মাথা নাড়ল ডেরেক। 'ভুল বুঝছেন আপনি। আমি বলিনি তাকে মৃত্যুর পর মমি করা হচ্ছিল।' এই পর্যন্ত বলে তাকাল সাফিয়ার দিকে। 'প্রক্রিয়াটা তার বেঁচে থাকার সময়ই শুরু হয়েছে!'

বিকেল ৪:৩২

পাঁচ ঘণ্টা পর . .

কম্পিউটার স্ক্রিনের উপর ঝুঁকে আছে ডেরেক। মাথার উপরের জানালা দিয়ে একটা এম.আর.আই. স্যুইট দেখা যাচ্ছেঃ লম্বা টেবিলের উপর বিশালাকৃতি সাদা ম্যাগনেটিক টিউব।

রাজনৈতিক জটিলতায় আগামীকালের আগে প্রফেসরের মৃতদেহ ইংল্যান্ডে নেয়া সম্ভব না। তাই লাশটা পচতে শুরু করার আগেই কাজে নেমেছে ডেরেক। চামড়ার বায়োপ্সিসসহ চুলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের সময় কেটে বের করা অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোও নিয়ে নেয়া হয়েছে করোনারের কাছ থেকে, ডিম আকৃতির পাথরের টুকরো এবং পরিপাক না হওয়া গাছের বাকলও সেসবের ভেতর আছে। পার্শ্ববর্তী হাসপাতালের এম.আর.আই. ফ্যাসিলিটি ব্যবহারের অনুমতি যোগাড় করে দিয়েছে লোকটা নিজেই।

দ্বিতীয় স্ক্যান রিপোর্টে চোখ বুলাল ডেরেক। পর্দায় প্রফেসর ম্যাককেবের মাথার লম্বচ্ছেদের একটা প্রতিকৃতি ফুটে আছে। ক্রানিয়ামের উত্তল অংশ, নাকের ফুটো, অক্ষি-কোটর সব ধরা পড়েছে শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র আর রেডিয়ো ওয়েভের কারসাজিতে, বাদ যায়নি কিছুই। কিন্তু মস্তিষ্কটাকে দেখাচ্ছে বিবর্ণ ধূসর পদার্থ-রূপে, এমনটা সে আশা করেনি।

'প্রথম রিপোর্টটাই তো ভালো ছিল,' মন্তব্য করল সাফিয়া।

মাথা নেড়ে সায় দিল ডেরেক। প্রথম স্ক্যানে সেরেব্রামের জাইরাই ও সালকাইসহ আরও কিছু বিস্তারিত জিনিস ধরা পড়েছিল। নিশ্চিত হওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার স্ক্যান করার সিদ্ধান্ত নেয় সে। কিন্তু এবারের রিপোর্ট আগেরটার চাইতেও ধোঁয়াশাময়।

সোজা হয়ে দাঁড়াল ডেরেক। 'বুঝতে পারছি না, এই ত্রুটিটা কি এম.আর.আই মেশিনের? নাকি ময়নাতদন্তের সময় মস্তিষ্কে কোন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে .

'আরেকবার স্ক্যান করবে নাকি?'

মাথা নাড়ল ডেরেক। সেই সুযোগ নেই। ইতিমধ্যে মর্গে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে প্রফেসরের মৃতদেহ। 'লাশে পচন ধরার আগেই যা করার করতে হবে। করোনারকে সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড সংগ্রহ করতে বলে দিয়েছি। সেই সাথে মস্তিষ্কটা বের করে নিয়ে ফরমালিনে সংরক্ষণ করে রাখা হবে। লন্ডনে ফিরে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব।'

ভ্রূকুটি করল সাফিয়া। 'জেন এসবের ব্যাপারে জানে তো?'

'হ্যাঁ। হোটেলে ফেরার আগে তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছি।'

বাবার লাশ শনাক্ত করার পর, দরকারি কাজগুলো সারতে সারতে আরও যেন নেতিয়ে পড়ছিল মেয়েটা। ওই অবস্থাতেই যা যা করতে চায়, তা সংক্ষেপে মেয়েটাকে জানায় ডেরেক। জেনও বাধা দেয়নি। আসলে তারও উত্তর চাই। তবে ব্যাপারটা নিজে তদারকি করার মতো দৃঢ়তা পাচ্ছিল না। ডেরেক যদি তার হয়ে কাজটা করতে চায়, তাতে ক্ষতি কী!

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সাফিয়া। 'তাহলে তো আপাতত আর কিছু করার নেই।'

মাথা নাড়ল ডেরেক। 'মর্গে গিয়ে দেখি সব ঠিকঠাক-ভাবে চলছে কি না। আপনি বরং জেনের কাছে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা

ফোন বেজে ওঠার আওয়াজে ছেদ পড়ল কথায়। টেকনিশিয়ান কানে তুলে নিল রিসিভার, অল্প কয়েকটা কথা বলে বাড়িয়ে দিল ডেরেকের দিকে। 'করোনার ফোন করেছেন। আপনার সাথে কথা বলতে চান।'

ভ্রূ কুঁচকে রিসিভারটা কানে ঠেকাল ডেরেক। 'ড. র‍্যাঙ্কিন বলছি।'

'তাড়াতাড়ি আসুন,' হড়বড় করে বলল বাডাউই। 'একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে।'

প্রশ্ন করেও বিস্তারিত কিছু জানা গেল না। শুধু বলা হলো, তাড়াতাড়ি মর্গে পৌঁছাতে।

রিসিভার নামিয়ে ব্যাপারটা সাফিয়াকে ব্যাখ্যা করল ডেরেক।

'আমিও যাচ্ছি তোমার সাথে।'

তড়িঘড়ি করে হাসপাতাল থকে বেরিয়ে এল দু'জন। মর্গটা এখান থেকে দুই ব্লক দূরে। বেশ কিছুক্ষণ বিল্ডিং-এর ভেতরে থাকার পর সূর্যের আলো সরাসরি চোখে লাগছে। বাতাসও বেশ গরম।

'ডেরেক,' সাফিয়া বলল। 'তুমি বলেছিলে, প্রফেসরের সাথে অদ্ভুত কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে। মৃত্যুর আগে মমিকরণ মানে কী?'

নিশ্চিত হওয়ার আগে মুখ খুলতে চাচ্ছে না ছেলেটা। 'প্রমাণ নেই কোন, শুধুমাত্র আমার ধারণা বলতে পারেন।'

'তবুও,' জোর দিল সাফিয়া। 'বুঝিয়ে বলো।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ডেরেক। 'আত্ম-মমিকরণ বলা হয় ব্যাপারটাকে, যেখানে জীবিত ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় মৃত্যুর পর শরীরটাকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে কাজ করে। জাপান, চীনসহ পূর্বদিকের অনেক দেশে এসবের প্রচলন আছে। এমনকি ভারত আর মধ্যপ্রাচ্যেও কিছু কিছু গোষ্ঠীতে নিয়মটা দেখা যায়।'

'কিন্তু এ তো আত্মহত্যা!'

'তা-ও বলা যায়। কিন্তু ব্যাপারটা প্রধানত আধ্যাত্মিক, অমর হওয়ার পন্থা। এসব মানুষদের ধারণা-এতে বিশেষ শক্তি ভর করবে মমিগুলোতে।'

নাক দিয়ে ঘোঁত জাতীয় আওয়াজ করল সাফিয়া।

শ্রাগ করল ডেরেক। 'ধারণাটা কিন্তু বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত, বিচ্ছিন্ন কিছু না। ক্যাথলিকরাও মনে করে, সাধুবাদের অন্যতম প্রমাণ হলো মৃত্যুর পরেও দেহ সংরক্ষিত থাকা।'

ফিরে তাকাল সাফিয়া। 'তা বুঝলাম। কিন্তু কেউ কীভাবে নিজেকেই মমি বানায়?'

'প্রক্রিয়াটা অবস্থানভেদে ভিন্ন। তবে সাধারণ কিছু নিয়ম আছে। সর্বপ্রথম-কাজটা বেশ সময়সাপেক্ষ, বছরের পর বছরও লাগতে পারে। শুরুর কাজ হলো দানাদার সব খাবার পরিত্যাগ করা। টিকে থাকতে হয় শুধুমাত্র বিশেষ কিছু বাদাম, পাইন ফল, জাম এবং রেসিনসমৃদ্ধ গাছের বাকলের উপর। জাপানে প্রক্রিয়াটা পরিচিত মোকুজিক্যু নামে, এই পদ্ধতি অনুসরণকারী লোকদের ডাকা হয় সোকুশিনবুতসু, যার মানে-'রক্ত-মাংসের বুদ্ধ'।'

'করোনারের জানাল-লাশের পেটে গাছের বাকল পাওয়া গিয়েছে। তার ভিত্তিতেই কি এসব ভাবছ?'

'হ্যাঁ,' সায় দিল ডেরেক। 'তাছাড়া প্রফেসরের পেটে পাথরের ছোট ছোট টুকরোও ছিল। সোকুশিনবুতসু মমির পেট এক্স-রে করে পাথরের টুকরোর অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে।'

'কিন্তু এভাবে কি মৃত্যুর পর দেহ সংরক্ষণ সম্ভব?'

'বলা হয়ে থাকে-এসব লতা-গুল্ম, রেসিন ইত্যাদি মৃত্যুর পর লাশের গায়ে জন্মানো ব্যাকটেরিয়ার বিস্তারে বাধা দেয়। কাজ করে ফরমালিনের মতো সংরক্ষণকারী তরল হিসেবে।'

চিন্তায় ডুবে গেল সাফিয়া।

'শেষ ধাপে নিজেদের কোন একটা বদ্ধ জায়গায় আটকে ফেলে লোকগুলো। তবে সেখানে বাতাস চলাচলের মতো ছোট ফাঁক রাখা হয়। জাপানে ভিক্ষুরা নিজেদের আবদ্ধ করে ফেলার পর, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অবিরাম একটা ঘণ্টা বাজাত। ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ হয়ে গেলেই, বাইরে থাকা সহযোগীরা বাতাস চলাচলের পথ আটকে

দিয়ে সিল করে দিত জায়গাটা। তিন বছর পর খুলে দেখা হতো, ভিক্ষু সফল হয়েছে কি না।'

'তারপর?'

'তারপর লাশটা সঠিক উপায়ে রক্ষিত আছে দেখতে পেলে ধোঁয়ায় শুকানো হতো, যাতে সংরক্ষণ প্রক্রিয়া আরও পাকাপোক্ত হয়।'

'তোমার মতে, হ্যারল্ডও এই পথ অনুসরণ করছিলেন?'

মাথা নাড়ল ডেরেক। 'কিংবা হয়তো তাকে বাধ্য করা হচ্ছিল। তবে যেটাই হোক না কেন, প্রক্রিয়াটা শেষ করতে পারেননি প্রফেসর। লাশ দেখে যতদূর ধারণা করতে পারছি, খুব সম্ভবত অনাহার শুরু করার পর মাত্র দুই কি তিনমাস পেরিয়েছে।'

'তোমার ধারণা সঠিক প্রমাণ হলে, সার্ভে টিমটাকে কে বা কারা অপহরণ করেছিল, এ ব্যাপারে ধারণা পাওয়া যাবে।'

'হ্যাঁ। এটাও জানা যাবে, বাকিরা এখনও জীবিত আছে কি না। হয়তো বন্দি বানানো হয়েছে জেনের ভাই রোরিসহ সবাইকে। একই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ওরাও। সমাধানটা তাড়াতাড়ি বের করতে পারলে হয়তো জীবিত উদ্ধারও করা যাবে।'

কেঁপে উঠল সাফিয়ার ঠোঁটজোড়া। 'ওগুলো কেমন গাছের বাকল, সেটা বের করতে পারবে?'

'আশা করি পারব।'

কথা বলতে বলতে মর্গে পৌঁছে গিয়েছে দু'জন। সদর দরজা পেরিয়ে উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। বাইরের তুলনায় এখানকার আবহাওয়া শতগুণ শীতল। ওদের দেখতে পেয়ে লবি ধরে এগিয়ে এল সবুজ পোশাক পরা ছোট-খাটো এক মহিলা। 'ড. বাডাউই সরাসরি তার কাছে নিয়ে যেতে বলেছেন আপনাদের।'

মহিলার চোখে ফুটে ওঠা ভয়ের আভাস পেল ডেরেক। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ নয়, এ ভয়ের কারণ অন্য কিছু। তাড়াতাড়ি এগোনোর প্রয়াস পেল সে।

আরও এক সেট সিঁড়ি পেরিয়ে মর্গের অন্য প্রান্তে, একটা অবজার্ভেশন রুমে হাজির হলো সবাই। জায়গাটা প্যাথলজি ল্যাবের মতো দেখতে। জানালার ওপাশে, ঘরের একেবারে মাঝখানে একটা স্টিলের টেবিল। উপর থেকে ঝুলছে হ্যালোজেন ল্যাম্প। হাসপাতাল আর মর্গ দুটোর সাথেই কায়রো ইউনিভার্সিটি স্কুলের মেডিসিন বিভাগের সম্পৃক্ততা আছে। সম্ভবত এই ঘরটা ময়নাতদন্তের ক্লাসরুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তবে এখন বাইরের লোক বলতে শুধু ডেরেক আর সাফিয়া। ল্যাবে টেবিলের উপর ঝুঁকে আছে ছোট একটা দল। সবার পরনে ল্যাব-কোট, সেই সাথে মুখ ঢাকা

মাস্কে। ওদের দু'জনকে দেখতে পেয়ে মুখের সামনে একটা ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন তুলে ধরল বাডাউই। জানালার উপর লাগানো স্পিকারে ভেসে এল তার কণ্ঠ।

'কাহিনি কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে প্রফেসরের মস্তিষ্ক বের করার আগে আমার মনে হয়, ব্যাপারটা আপনাদের দেখা উচিত। পাশাপাশি সবকিছু রেকর্ডও করে রাখা হচ্ছে।'

'কী হয়েছে?' গলা চড়িয়ে প্রশ্ন করল ডেরেক। তবে চেঁচানোর দরকার ছিল না। হাত তুলে জানালার পাশে ইন্টারকমের দিকে ইঙ্গিত করল পথ দেখিয়ে নিয়ে আসা মহিলা। এগিয়ে গিয়ে আবারও প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করল সে।

দলের বাকিদের টেবিলের সামনে থেকে সরে যেতে ইশারা করল বাডাউই। ষাট বছর বয়সী প্রত্নতত্ত্ববিদের দেহ হ্যালোজেন ল্যাম্পের নিচে পুরোপুরি নগ্ন, শুধু কোমরের উপর ছোট এক টুকরো কাপড় রাখা। টেবিলটা ঈষৎ কাত করা, যেন জানালা দিয়ে লাশটার মাথা পরিষ্কার দেখা যায়।

'ইতিমধ্যে আপনার কথা অনুযায়ী সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড সংগ্রহ করেছি,' ব্যাখ্যা করল বাডাউই। 'তারপর নজর দেই মস্তিষ্কের দিকে।'

মাথা ঢেকে রাখা কাপড়ের টুকরোটা সরিয়ে দিল করোনার। দেখা গেল, ইতিমধ্যে মাথার পেছনের চামড়া আলাদা করে খুলির হাড়ও কেটে ফেলা হয়েছে। আলতো হাতে উত্তল হাড়ের টুকরোটা তুলে নিল বাডাউই। এদিক দিয়েই বের করে আনা হবে মগজ।

চোখের কোনা দিয়ে সাফিয়ার দিকে তাকাল ডেরেক। উদ্দেশ্য-দৃশ্যটা তার উপর কোন প্রভাব ফেলছে কি না দেখা। মোটামুটি শান্তই আছে কিউরেটর। প্রতিক্রিয়া বলতে শুধু মুঠো হয়ে গিয়েছে দুই হাত।

হাড়ের খণ্ডটা একপাশে রেখে সরে দাঁড়াল করোনার। হ্যালোজেনের আলোয় ডেরেক দেখতে পেল, ফাঁক ঠেলে যেন বেরিয়ে আসছে মেনিনজিয়াল টিস্যুর পরতে পরতে সাজানো প্রফেসরের মস্তিষ্কের গোলাপি-ধূসর অংশ।

আনমনা হয়ে গেল ছেলেটা। এই তাহলে তার গুরুর সব প্রতিভার উৎস। কত রাত একসাথে জঙ্গলে কাটিয়েছে তারা, কত শত কথাবার্তা-সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক অভিযান থেকে শুরু করে ফুটবল বিশ্বকাপ একগুঁয়েমির পাশাপাশি লোকটার মনে দয়ামায়ারও কমতি ছিল না। সেই সাথে ছিল স্ত্রী আর দুই সন্তানের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা।

এখন আর সেসবের কিছুই নেই .

এসব ভাবতে ভাবতে বাডাউইর বলা প্রথম কয়েকটা শব্দ শুনতে পেল না ডেরেক। ' দেখুন।'

নিজের দলের একজনের উদ্দেশ্যে ইশারা করল করোনার। এগিয়ে গিয়ে সার্জিক্যাল ল্যাম্পের সুইচ বন্ধ করে দিল লোকটা। অন্ধকার নেমে এল ঘরে।

কয়েকবার চোখ পিটপিট করল ডেরেক। মাথায় ঢুকছে না, কেন আলোটা নিভিয়ে দেয়া হলো। পরক্ষণেই চোখের সামনে দেখতে পেল অভাবনীয় দৃশ্যটা। সাফিয়াও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। আঁতকে উঠে এক পা পিছিয়ে এল সে।

অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে প্রফেসরের খুলির ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে থাকা মেনিনজিয়াল টিস্যুসহ মস্তিষ্কের অংশটুকু কেমন যেন একটা গোলাপি আভা ছড়াচ্ছে।

'আগে আরও উজ্জ্বল ছিল,' ব্যাখ্যা করল বাডাউই। 'এখন একটু কম।'

'এরকম কেন হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল সাফিয়া। ডেরেকের মনেও উঁকি দিচ্ছে একই প্রশ্ন।

পথে আসতে আসতে সাফিয়াকে বলা কথাগুলো মনে করল ডেরেক। আত্ম-মমিকরণ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাওয়া লোকেদের ধারণা ছিলঃ বিশেষ ক্ষমতার ধারণ-পাত্র হিসেবে নিজেদের শরীরকে কাজে লাগানো।

এই কি সেই বিশেষ শক্তি?

তার দিকে ফিরে তাকাল সাফিয়া। 'অনেক হয়েছে, আর কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়। এখনই লাশটা ব্যাগে ঢুকিয়ে সিল করে দেয়া হোক। লন্ডনে ফিরতে হবে।'

তার কণ্ঠে ফুটে ওঠা উদ্বেগ উপলব্ধি করতে পারছে ডেরেক। 'কিন্তু কাজটা তো আগামীকালের আগে করা সম্ভব না।'

'আমি ব্যবস্থা করছি,' আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দিল সাফিয়া।

'তবুও,' জোর দিল ডেরেক। 'চোখের সামনে যা দেখলাম, পুরোটাই ব্যাখ্যার অতীত। সামনে এগোতে হলে সাহায্য প্রয়োজন হবে।'

দরজার দিকে ফিরল সাফিয়া। 'সাহায্য করতে পারবে, পরিচিত এমন একজন আছে।'

'কে?'

'এক পুরনো বন্ধু . আগে থেকেই ওর কাছে আমি ঋণী।'

দুই
৩০ মে, সকাল ১১:৪৫ ই.ডি.টি.
ওয়াশিংটন ডি.সি.

ডেস্কের পেছনে বসে স্মৃতিচারণ করছে পেইন্টার।

মনিটরে ফুটে আছে সাফিয়া আল-মায়াজের ছবি। শেষ দেখা হয়েছিল এক দশক আগে, রাব-আল খালির উষর মরুভূমিতে। পুরনো স্মৃতিগুলো দোলা দিয়ে যাচ্ছে মনে। বিশেষ করে মেয়েটার হাসি এতদিন পর কথা-বার্তা হওয়ায় সাফিয়া নিজেও খুশি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

তখন সিগমার সাধারণ ফিল্ড এজেন্ট ছিল পেইন্টার। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে দক্ষ এবং সেই সাথে সাবেক স্পেশাল ফোর্স সৈনিকদের নিয়োগের মাধ্যমে, ডারপার অধীনে সবেমাত্র গোড়াপত্তন হয়েছে এই এজেন্সির। ডিরেক্টরের পদে ছিলেন শন ম্যাকনাইট।

এক দশক পর, আজ ডিরেক্টরের আসনে পেইন্টার স্বয়ং। সেই সাথে পাল্টেছে আরও অনেক কিছু।

হাত তুলে নিজের কানের দিকে ইঙ্গিত করল সাফিয়া, পেইন্টারের পাকা চুলের দিকে নজর। 'নতুন কী যেন দেখা যায়!'

নিজেও একই ভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করল পেইন্টার। মাথার দু'পাশে, কানের উপর সাদাটে রঙ ধারণ করেছে একগোছা চুল। হঠাত দেখলে মনে হয়-বকের পালক গুঁজে রেখেছে কানের উপরের খাঁজে।

ভ্রূকুটি করল সিগমা ডিরেক্টর। 'যতদূর জানি, চেহারাতেও বয়সের ছাপ পড়েছে।'

সে হাত নামানোর আগেই আরও একটা পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করল সাফিয়া। 'আরে ওটা কী? বিয়ের আঙটি নাকি!'

মুচকি হাসল পেইন্টার। 'হ্যাঁ। কেউ একজন দয়া করে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে আরকি

'তোমাকে পেয়ে সে ভাগ্যবতী।'

'উল্টোটাই বরং সত্যি,' হাত নামাতে নামাতে মন্তব্য করল সিগমা ডিরেক্টর। 'ওমাহা কী করছে আজকাল?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সাফিয়া। ড. ওমাহা ডান এক আমেরিকান প্রত্নতত্ত্ববিদ, ওর স্বামী। 'ভাই ড্যানিকে নিয়ে ভারতে এক অভিযানে গিয়েছে ও, সে-ও প্রায় মাস-

খানেক হলো। যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু জায়গাটা বেশ প্রত্যন্ত, নেটওয়ার্ক পৌঁছায়নি এখনও।'

'এজন্যই তাহলে আমার কথা মনে পড়ল,' কপট রাগের ভঙ্গি করল পেইন্টার। 'বিকল্প হিসেবে!'

'না,' কুশল বিনিময় শেষ হতে এবার কাজের কথা তুলল সাফিয়া। 'তোমার সাহায্য চাই।'

'অবশ্যই পাবে,' সোজা হয়ে বসল পেইন্টার। 'কী হয়েছে বলো।'

'সুদানের উত্তরাংশে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একটা উদ্ধার প্রকল্পের ব্যাপারে হয়তো শুনেছ।'

অন্যমনস্কভাবে গাল চুলকাল পেইন্টার। কোথায় যেন শুনেছে খবরটা। 'সম্ভবত সম্প্রতি কোন একটা ঝামেলা হয়েছিল ওখানে, তাই না?'

মাথা নেড়ে সায় দিল সাফিয়া। 'মরুভূমিতে আমাদের একটা সার্ভে টিম হারিয়ে গিয়েছে।'

এবার মনে পড়েছে সিগমা ডিরেক্টরের। খবরটা সম্পর্কে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট কানে এসেছিল। 'যতদূর মনে পড়ছে, দলটা বিদ্রোহীদের হাতে পড়েছিল বলেই সবার ধারণা।'

ভ্রূকুটি করল সাফিয়া। 'হুম, আমরাও সেরকম ভেবেছিলাম। কিন্তু দশ দিন আগে, দলটার প্রধান, প্রফেসর হ্যারল্ড ম্যাককেব, হঠাত করেই মরুভূমিতে আবির্ভূত হন। আমার পূর্বপরিচিত ছিলেন ভদ্রলোক, অনেকটা বন্ধুর মতোই বলা যায়। তবে হাসপাতালে আনার আগেই মারা যান তিনি। প্রায় এক সপ্তাহ পর আঙুলের ছাপের মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিত করে কর্তৃপক্ষ। দু'দিন আগে লাশটা নিয়ে আমি মিশর থেকে ফিরেছি।'

'তার মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করছি।'

মাথা নিচু করে ফেলল সাফিয়া। 'ভেবেছিলাম ওখানে গেলে হয়তো নিখোঁজ সার্ভে টিমের বাকি সদস্যদের কোন হদিস পাব। দলের সাথে প্রফেসরের ছেলেও ছিল।'

'পেয়েছ কিছু?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটা। 'না। উল্টো ঘটনা আরও জট পাকিয়েছে। হ্যারল্ডের লাশটা অদ্ভুত এক অবস্থায় পাই আমরা। সাথে থাকা মিউজিয়ামের এক সহকর্মীর মতে-আত্ম-মমিকরণ নামক কোন একটা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন প্রফেসর, যাতে মৃত্যুর পরও লাশটা অবিকৃত থাকে।'

ভ্রূ কুঁচকে মনিটরের দিকে তাকাল পেইন্টার। মাথায় ভিড় জমিয়েছে একগাদা প্রশ্ন, কিন্তু সাফিয়াকে নিজে থেকেই সব বলতে দেয়া উচিত এখন।

'কোষীয় নমুনা সংগ্রহ-সহ আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি আমরা। চেষ্টা করছি এ কাজে ব্যবহৃত লতা-গুল্মের পরিচয় বের করতে। এতে হয়তো ঘটনাটা কোন এলাকায় ঘটছিল, সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।'

বুদ্ধিমতী মেয়ে   মনে মনে ভাবল পেইন্টার।

'তবে ময়নাতদন্তের সময় প্রফেসরের মস্তিষ্ক এবং প্রধান স্নায়ুতন্ত্রে আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা গিয়েছে।'

'কী?'

'নিজেই বরং দেখে নাও,' বলে কম্পিউটারের কীবোর্ডে হাত রাখল সাফিয়া। 'একটা ভিডিয়ো পাঠাচ্ছি। ফুটেজটা কায়রোর মর্গ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।'

ডাউনলোড হওয়ার সাথে সাথে ভিডিয়োটা চালু করল পেইন্টার। অডিও নেই, তবে দৃশ্যগুলো মোটামুটি পরিষ্কার। একটা স্টিলের টেবিল দেখা যাচ্ছে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক-করোনার সম্ভবত, বাকিদের সরিয়ে দিয়ে ক্যামেরাম্যানকে কাছে আসার ইশারা করল। টেবিলে শুয়ে আছে প্রফেসরের লাশ, খুলির কাটা অংশ দিয়ে মগজ উঁকি মারছে। ঘরটা অন্ধকার হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে দেখা গেল এক আশ্চর্য দৃশ্য।

থমকে গেল পেইন্টার। 'আমি কি ঠিক দেখলাম? মনে হলো, খুলির ভেতরের অংশগুলো যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছে!'

'হ্যাঁ,' সায় দিল সাফিয়া। 'ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেছি আমি। অবশ্য সময়ের সাথে সাথে কমে এসেছে জ্বলজ্বলে ভাব, আগে নাকি আরও উজ্জ্বল ছিল।'

ভিডিয়ো দেখা শেষ হলে ঘাড় সোজা করল পেইন্টার। 'এসবের কারণ ধরতে পেরেছ?'

'না। নমুনার পরীক্ষা এখনও চলছে। আমাদের ধারণা-স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, কোন ধরনের জৈবিক অথবা রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে এসেছিলেন হ্যারল্ড। জিনিসটা যা-ই হোক না কেন, পরিস্থিতি ক্রমাগত খারাপের দিকে এগোচ্ছে।'

'কেন?'

'দুটো কারণে। প্রথমত, আজ সকালে করোনার ড. বাডাউইকে ফোন করেছিলাম আমি। কয়েকটা রিপোর্ট আমাদের কাছে পাঠাতে ভুলে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। তখনই জানতে পারি, তিনি এবং তার ময়না-তদন্তকারী দলের বাকি সদস্যরা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন   উচ্চমাত্রার জ্বর, বমি আর পেশীর খিঁচুনি।'

মনে মনে মাঝখানের সময়টুকু হিসাব করে নিল পেইন্টার। 'আটচল্লিশ ঘণ্টা

'খুলি কাটার আট ঘন্টার মধ্যেই প্রথম উপসর্গ হিসেবে জ্বর দেখা দেয়। এখন তাদের বাড়ির লোকজনও একই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। আক্রান্তদের আলাদা করে রাখতে বলেছি, কিন্তু ইতিমধ্যে কয়জন আক্রান্ত হয়েছে সেই সম্পর্কে আমাদের কাছে সঠিক কোন তথ্য নেই।'

কায়রোর জনসংখ্যার ব্যাপারে পেইন্টারের বেশ ভালো ধারণা আছে। ওরকম ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এরকম একটা রোগ সামলানো মুশকিল হবে।

সাথে সাথে একটা কথা খেলে গেল সিগমা ডিরেক্টরের মাথায়। 'সাফিয়া, তুমি এখন কেমন বোধ করছ?'

'ভালো। ময়নাতদন্তের সময় ল্যাবে ছিলাম না আমি। লাশের ওই অদ্ভুত অবস্থা দেখার পরপরই সবকিছু সিল করে ফেলার আদেশ দেই।'

'আর লন্ডনে পৌঁছানোর পর?'

একটু বিমর্ষ দেখাল সাফিয়ার চেহারা। 'সতর্ক ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। তবে হিথ্রো বিমানবন্দরের কাস্টমস জানিয়েছে: নড়া-চড়ার সময় লাশ বহনকারী বাক্সটার ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু কায়রোতে না লন্ডনে, তা সঠিক জানা যায়নি।'

পেইন্টারের পেটে যেন দলা পাকিয়ে উঠল। হিথ্রো আর কায়রো, দুটোই পৃথিবীর ব্যস্ত বিমানবন্দরগুলোর কাতারে পড়ে। দূষণ বাইরে ছড়িয়ে পড়লে বড় ধরনের বিপদ হবে।

সাফিয়াও ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারছে। 'এখানকার ল্যাবে লাশটা নিয়ে সর্বপ্রথম কাজ করা দুই টেকনিশিয়ানও প্রাথমিক উপসর্গ দেখাচ্ছে। ওই দুই টেকনিশিয়ানকে তো বটেই, ওরা যাদের সাথে পরবর্তীতে দেখা করেছে, তাদেরকেও কোয়ারেন্টাইনে পাঠিয়েছি। দুই বিমানবন্দরেই কাজে লাগানো হয়েছে গণস্বাস্থ্য এজেন্সিকে, তারা নিশ্চিত করবে মালামাল বহনের সাথে সম্পৃক্ত কেউ হঠাত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ করছে কি না। তবে রাজনৈতিক মারপ্যাঁচের কারণে ভয় হচ্ছে, আদৌ কী আমাকে কিছু জানানো হবে!'

'দেখছি কী করা যায়,' ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে পেইন্টারের মগজ। কিছুদিন আগেই রোগ-জীবাণু ছড়ানোতে বিমানবন্দরের ভূমিকা শীর্ষক এম.আই.টির একটা রিপোর্ট পড়েছে সে। দু'হাজার নয় সালে, সোয়াইন ফ্লু-তে পৃথিবীব্যাপী তিন লক্ষ মানুষ মারা যায়। তার সূত্রপাতও এভাবেই হয়েছিল।

জড়িয়ে আসছে সাফিয়ার গলা। 'আ আমার আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।'

তাকে শান্ত করার প্রয়াস পেল পেইন্টার। 'তোমার তো কোন দোষ নেই। যতটুকু সম্ভব, তুমি করেছ। লাশটা সিল করার বুদ্ধিটা না দিলে অবস্থা আরও খারাপ হত।'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'তবুও খারাপ লাগছে। কিন্তু এই দূষণ ছড়িয়ে পড়তে দেখার পর আন্দাজ করতে পারছি, কেন নিজের শরীরকে মমি করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিলেন হ্যারল্ড।'

'কেন?' জানতে চাইল সিগমা ডিরেক্টর। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে, সাফিয়ার অনুমানগুলো বেশিরভাগ নির্ভুল হয়।

'সম্ভবত নিজের মাথা ভেতর যা আছে, সেটাকে আটকে রাখার জন্য। মমি হয়ে গেলে অবিকৃত থাকবে তার মৃতদেহ। আর এই অদ্ভুত জিনিসটাও সংরক্ষিত থাকবে মমির মাথার ভেতর।'

আরেকটা কথা মনে পড়ল পেইন্টারের। 'পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার পেছনে তুমি দুটো কারণের কথা বলেছিলে অন্যটা কী?'

সরাসরি স্ক্রিনের দিকে তাকাল সাফিয়া। 'আমার মনে হয়, ব্যাপারটা আগেও ঘটেছে।'

বিকেল ৫:০২ বি.এস.টি.
লন্ডন, ইংল্যান্ড

কথাটা হজম করার জন্য পেইন্টারকে এক মুহূর্ত সময় দিল সাফিয়া, তারপর আবার শুরু করল। 'হ্যারল্ডের ফিরে আসার খবর পাওয়ার পর, তার সব ধরনের রেকর্ড নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করি আমি এমনকি মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হাতে লেখা কিছু জার্নালও। ভেবেছিলাম, তার ওভাবে নিখোঁজ হওয়া আর হঠাত ফিরে আসার একটা কারণ আন্দাজ করতে পারব।'

'কিছু বুঝতে পেরেছ?'

'সম্ভবত '

'কী?'

'প্রথমত তোমাকে বুঝতে হবে, সাধারণ প্রত্নতাত্ত্বিকদের চেয়ে ভিন্ন ছিলেন হ্যারল্ড। প্রতিষ্ঠিত মতবাদগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পছন্দ করতেন তিনি, বিশেষ করে মিশর-সংক্রান্ত ব্যাপারে। এরকম উদ্ভট আচার-ব্যবহারের জন্য যেমন প্রশংসিত ছিলেন, তেমনি ছিলেন ঘৃণিতও। নিজের ব্যাপারে অন্যদের আলোচনা-সমালোচনা শুনতেন ঠিকই, কিন্তু ধারে-কাছে ঘেঁষতে দিতেন না কাউকে।'

পুরনো স্মৃতি মনে করতে গিয়ে হাসি ফুটে উঠল সাফিয়ার মুখে। হ্যারল্ডের মতো আর কাউকে দেখেনি কখনও সে। মতের মিল না হওয়া সত্ত্বেও বাবার পিছু পিছু সব জায়গায় যেত তার ছেলে রোরি। প্রায়ই চোখে পড়ত, ক্রমাগত তর্ক করছে পিতা-পুত্র। তবে কথা কাটাকাটি হলেও ছেলের জন্য গর্ব ফুটে থাকত হ্যারল্ডের চোখে।

বাস্তবতা মনে পড়তেই ঠোঁট থেকে মুছে গেল হাসি।

দু'জনই হারিয়ে গিয়েছে

নিজেকে সামলাল সাফিয়া। শোককে শক্তিতে পরিণত করতে হবে এখন। হ্যারল্ডের ছেলে যদি এখনও বেঁচে থাকে, তাহলে তাকে উদ্ধার করা তারই দায়িত্ব। দীর্ঘ দু'বছর আশা করে আছে জেন, বাবা আর ভাই এখনও জীবিত। তার জন্য হলেও অন্তত সত্যিটা খুঁজে বের করা উচিত।

পেইন্টারের গলা শুনে সাফিয়ার সম্বিত ফিরল। 'অতীতের সাথে প্রফেসর হ্যারল্ডের কী সম্পর্ক?'

প্রসঙ্গে ফিরে এল সে। 'মিশর-সংক্রান্ত ব্যাপারে তার ব্যাপক আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে এক্সোডাসের প্রাচীন কাহিনি সম্পর্কে। এমনকি এসব নিয়ে সহকর্মীদের সাথেও আলোচনা করতেন তিনি।'

'এক্সোডাস? মিশর থেকে ইহুদিদের নিয়ে মোজেসের সেই মহা-প্রস্থান?'

নড করল সাফিয়া। 'অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, কাহিনিটা নিছক একটা ঐতিহাসিক গল্পের চেয়ে বেশি কিছু নয়।'

'আর প্রফেসর?'

'তিনি একমত ছিলেন না। তার ধারণা, সব সত্যি। যুগের পর যুগ ধরে মানুষের মুখে মুখে চলে আসা গল্পটা হয়তো কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছিল।' বলে টেবিলে স্তূপ করে রাখা হ্যারল্ডের ফিল্ড জার্নাল, সহকর্মীদের বর্ণনা ইত্যাদির দিকে ইঙ্গিত করল সাফিয়া। 'আমার মনে হয়, নিজের মতবাদের পক্ষে সমর্থন আদায় করার জন্যই সুদান অভিযানে বেরিয়েছিলেন প্রফেসর।'

'ওখানে কেন?'

'উনি যে হ্যারল্ড .সবার চেয়ে আলাদা! অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদ যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সিনাই পেনিনসুলার দিকে যায়, তিনি কাজের জন্য বেছে নিয়েছেন দক্ষিণ দিক। তার ধারণা ছিল, নীল নদের তীর ধরে ইহুদিদের ছোট কোন দল ওদিকে পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারে।'

'আচ্ছা, ঠিক করে বলো-কী খুঁজছিলেন তিনি?'

'প্লেগের কোন চিহ্ন, বিশেষ করে নীলের পার্শ্ববর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে পাওয়া মমিগুলোর ভেতর। প্রাচীন রোগ-বিশারদ ড. ডেরেক র‍্যাঙ্কিনকে মূলত এজন্যই নিয়োগ দেন হ্যারল্ড।'

চেয়ারে হেলান দিল পেইন্টার। 'আর এখন, দু'বছর পর তিনি নিজেই মরুভূমিতে উদয় হলেন অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত হয়ে। শুধু তাই না, সাথে আবার আত্ম-মমিকরণ নামক কী একটাও নাকি জুটেছে। এসবের মানে কী?'

মাথা নাড়ল সাফিয়া। 'জানি না।'

'কিন্তু তুমি তো বললে, এসব দূষণ-ফূষণ নাকি আগেও ঘটেছে। তুমি কি তাহলে প্রাচীন মিশরের সেই প্লেগের কথা বলছ?'

'না,' হ্যারল্ডের একটা জার্নাল হাতে তুলে নিল সাফিয়া। বের করল আগেই চিহ্নিত করে রাখা একটা অংশ। 'অভিযানে বেরোনোর আগে, ওই এলাকার রোগ-জীবাণু সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন প্রফেসর। তখনই এখানকার আর্কাইভে প্রখ্যাত অভিযাত্রী স্ট্যানলি আর লিভিংস্টোনের সাথে সম্পৃক্ত কিছু একটা খুঁজে পান তিনি। তারা দু'জনই নীল নদের উৎস খোঁজার জন্য চষে বেড়িয়েছেন সুদানের গভীরে।'

'যতদূর মনে পরে ' মাথা চুলকাল পেইন্টার। 'জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিলেন লিভিংস্টোন, পরে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।'

'নিখোঁজ হওয়ার ছয় বছর পর, স্ট্যানলি তাকে ট্যাঙ্গানিকা লেকের পাড়ে অবস্থিত একটা আফ্রিকান গ্রাম থেকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করেন।'

'কিন্তু এসবের সাথে প্রফেসর ম্যাককেবের অভিযানের সম্পর্ক কোথায়?'

'এই দু'জনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন হ্যারল্ড। আফ্রিকা অভিযান না, বরং তাদের পরবর্তী কাজের ব্যাপারে।'

'কেন? কী এমন করেছেন তারা?'

'১৮৭৩ সালে মৃত্যুর আগপর্যন্ত আফ্রিকাতেই ছিলেন লিভিংস্টোন। হ্যারল্ডের আকর্ষণের মূল কারণ-ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার আগে তার মৃতদেহটাকে মমি করে ফেলে স্থানীয়রা।'

'তার দেহটাকে মমি করে ফেলা হয়েছিল?'

মাথা নেড়ে সায় দিল সাফিয়া। 'তারপর লাশটা ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে সমাহিত করা হয়।'

'আর স্ট্যানলি?'

'তিনি ব্রিটেনেই ফিরে আসেন। এক ওয়েলস মহিলাকে বিয়ে করার পর যোগ দেন পার্লামেন্টে। তার জীবনধারার প্রেক্ষিতেই ভদ্রলোকের প্রতি আকৃষ্ট হন হ্যারল্ড।'

'কেন?'

'তোমাকে বুঝতে হবে স্ট্যানলির নাম, যশ সবই লিভিংস্টোনের সাথে জড়িত। আফ্রিকায় মারা যাওয়ার পর, স্ট্যানলিকে তার উত্তরাধিকার হিসেবে মনোনীত করা হয়। তাই লিভিংস্টোনের অভিযানে উদ্ধারকৃত তালিসমানের বেশিরভাগ ব্রিটিশ মিউজিয়ামের করায়ত্ত হলেও, কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রয়ে যায় স্ট্যানলির এস্টেটে। উনিশ শতকে এস্টেটটা লুপ্ত হওয়ার পর অবশেষে ঘুরে-ফিরে

সবকিছুর ঠাঁই হয় মিউজিয়ামেই। ওখানকার একটা তালিসমান হ্যারল্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।'

'কী ছিল ওটা?'

'একটা তালিসমান বাচ্চার প্রাণ বাঁচানোর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ লিভিংস্টোনকে এক আদিবাসী উপহার দেয় জিনিসটা, গায়ে খোদাই করা মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ। আর আদিবাসীদের মতে, নীল নদের জলরাশি রক্তে পরিণত হওয়ার সময়কার পানি ভরা আছে ওটার ভেতর।'

'রক্তে পরিণত হওয়া মানে?' অবাক হলো পেইন্টার। 'মোজেসের আমলের কথা বলছ?'

সাফিয়া জানে, সিগমা ডিরেক্টরের এই প্রতিক্রিয়ায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রথমবার শোনার পর, তার নিজের অবস্থাও সেরকমই হয়েছিল। 'অনেক রকম ব্যাখ্যাই দাঁড় করানো যেতে পারে। লিভিংস্টোন ছিলেন স্বনামধন্য খ্রিষ্টান মিশনারি। হতে পারে, তাকে খুশি করার জন্য তালিসমানের সাথে ঐতিহাসিক ঘটনাটা জুড়ে দেয় আদিবাসীরা। তবে হায়ারোগ্লিফের স্বকীয়তার কারণে হ্যারল্ড মনে করতেন, আসলেই জিনিসটার সাথে প্রাচীন মিশরের সম্পৃক্ততা আছে।'

'তবে বর্তমান ঘটনার সাথে ওই তালিসমানের কী সম্পর্ক?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সাফিয়া। 'লিভিংস্টোনের ব্যক্তিগত কাগজপত্র ঘেঁটে হ্যারল্ড জানতে পারেন, জিনিসটা অভিশপ্ত।'

'অভিশপ্ত?'

'হ্যাঁ। মিউজিয়ামের অধিকারে আসার পর তালিসমানটা খুলে দেখা হয়। কয়েকদিনের মাঝে অদ্ভুত রোগে ভুগে মারা যায় প্রজেক্টে কাজ করা কর্মচারীদের সবাই। প্রফেসর তার জার্নালে জ্বর-সংক্রান্ত উপসর্গের কথা লিখে গিয়েছেন।'

'কায়রোতে ধরা পড়া রোগটার মতোই মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল পেইন্টার। তারপর কী হলো?'

'এতটুকুই জানি,' জবাব দিল সাফিয়া। 'বিস্তারিত অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন প্রফেসর। কিন্তু বাইশজন মানুষের মৃত্যুর পরও তেমন বিশেষ কিছু নির্ণয় করা যায়নি।'

'ব্যাপারটা সন্দেহজনক। মনে হয়, কেউ সব তথ্য-প্রমাণ মুছে ফেলেছে।'

'হ্যারল্ডের তাই ধারণা। কর্তৃপক্ষও একই কথা ভেবেছিল। ব্যাপারটার সাথে স্ট্যানলির সম্পৃক্ততা সন্দেহ করে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রয়্যাল সোসাইটির সামনে আনা হয় তাকে।'

'কেন?'

'কারণ মৃত্যুর আগপর্যন্ত তার সাথে লিভিংস্টোনের যোগাযোগ ছিল।'

ভ্রূকুটি করল পেইন্টার। 'লিভিংস্টোনের লাশটাকেও তো মমি করা হয় তারপর?'

সাফিয়াও পাল্টা ভ্রূ কুঁচকাল। 'হুম, হয়তো তার মৃত্যুর সাথেও কোন রহস্য জড়িয়ে আছে।'

'মানে?'

'হ্যারল্ডের মতো একই ঘটনা লিভিংস্টোনের সাথেও ঘটে থাকতে পারে। হতে পারে, তার ওই মমিকরণ প্রক্রিয়াও মৃত্যুর আগেই শুরু হয়েছিল।' বলে শ্রাগ করল সাফিয়া। 'রেকর্ডে শুধু লেখা, মমি করা অবস্থায় ইংল্যান্ডে পৌঁছায় লিভিংস্টোনের মৃতদেহ। তাই হয়তো সবাই ধরে নেয়, মৃত্যুর পরই কাজটা করা হয়েছে।'

'ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। তবে ধরে নিলাম, তোমার ধারণা সত্যি। তাহলে ?'

'আশা করি এর ফলে হ্যারল্ড আর সার্ভে টিমের বাকিরা কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল, তা জানতে পারব। সম্ভবত কিছু একটা আবিষ্কার করেছিলেন প্রফেসর, সেটাই তাদের ওই পথে পরিচালিত করে।'

'দূষণ বেড়ে গেলে কিন্তু জায়গাটা খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয়তাও বাড়বে,' সরাসরি সাফিয়ার চোখের দিকে তাকাল পেইন্টার। 'সাহায্যের জন্য আমি কী করতে পারি, বলো।'

'যতটুকু তোমার পক্ষে করা সম্ভব,' মেয়েটার চোখে ফুটে উঠেছে ভীত দৃষ্টি। 'কেন জানি আমার মনে হচ্ছে, ঝামেলার পাহাড়ের সবেমাত্র চূড়াটা নজরে এসেছে।'

সায় দিল পেইন্টার। 'হয়তো তোমার কথাই সত্যি।'

'হাতে সময় কম। হ্যারল্ডের ফিরে আসার প্রায় দুই সপ্তাহ হতে চলল।'

হ্যাঁ-বোধক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল পেইন্টার। 'তার মানে, আস্তে আস্তে মুছে আসছে প্রফেসরের মরুভূমির ট্রেইল।'

'জেন, হ্যারল্ডের মেয়েও আমার সাথে আছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়ার আশায় বাবার ব্যক্তিগত কাগজপত্র ঘাঁটছে সে। কাজে নেমেছে গণস্বাস্থ্য কর্মচারীরা, রোগটার কারণ খতিয়ে দেখছে।'

'তোমাকে সাহায্য করার জন্য লন্ডনে একটা দল পাঠাচ্ছি আমি,' পেইন্টার বলল। 'সুদানের ব্যাপারটাও দেখতে হবে, কোত্থেকে এভাবে উদয় হলেন প্রফেসর ম্যাককেব

সাফিয়া বুঝতে পারল, সিগমা ডিরেক্টরের মাথার কলকব্জা কাজ করতে শুরু করেছে। আবার কিছু বলার আগেই অফিসের দরজা খোলার আওয়াজ হলো।

চেয়ার ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাল সাফিয়া। জুনিয়র এক কিউরেটর এসেছে, নাম ক্যারল ওয়েন্টজেল। 'কী হয়েছে তো .?'

কথা শেষ করার আগেই মেয়েটাকে ধাক্কা মেরে দৃশ্যপটে হাজির হলো এক অচেনা আগন্তুক। হাতের উদ্যত অস্ত্র সরাসরি তার বুকের দিকে তাক করা।

চমকে উঠল সাফিয়া। তবে দেরি হয়ে গিয়েছে।

পরপর দু'বার গর্জে উঠল অস্ত্র। বুকে যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়েছে, খাবি খেতে খেতে টেবিলে ঝুঁকে পড়ল সাফিয়া। হাত উঁচু করছে মনিটরে ফুটে থাকা পেইন্টারের ছবির উদ্দেশ্যে, সাহায্য চাইছে যেন।

আবারও গুলির আওয়াজ। এবারের লক্ষ্য কম্পিউটার মনিটর। কানের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে, কাঁচে মাকড়শার জাল এঁকেছে বুলেট। সাথে সাথে কালো হয়ে গিয়েছে স্ক্রিন।

কালো হয়ে আসছে সাফিয়ার পৃথিবীটাও .

তিন

৩০ মে, রাত ৬:৩৪ বি.এস.টি.
অ্যাশওয়েল, হার্টফোর্ডশায়ার, ইংল্যান্ড

নিজ পরিবারের কুটিরে, নিজেকেই অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে জেন ম্যাককেবের। চিলেকোঠার ভূতগুলো যেন পেয়ে বসেছে ওকে। ছোট, দমবন্ধ করা জায়গাটার যেদিকেই তাকাচ্ছে না কেন, অনুপস্থিত সদস্যদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে মেয়েটার। ওই যে, কোনায় থাকা ঘুণ ধরা ওয়ারড্রোবে এখনও রয়েছে ওর মায়ের কাপড়। এক পাশে জড়ো করা রাখা ওর ভাই, রোরির পুরাতন সব খেলার সরঞ্জামঃ ধুলো পড়া ক্রিকেট বল, হাওয়া অর্ধেক বেরিয়ে যাওয়া ফুটবল, এমনকী হাইস্কুলে পড়ার সময় কেনা রাগবি জার্সিটাও আছে।

তবে এসবের চাইতেও ওকে বেশি জ্বালাচ্ছে আরেকটা ছায়া। যে ছায়ার মালিক বেঁচে থাকা অবস্থায় কখনও তার নিচ থেকে বেরোতে পারেনি ওরা। সেই মালিক এখন মৃত, কিন্তু তবুও মাথার উপরে ঝুলছে সেই ছায়া। পুরো জায়গাটা জুড়ে ভেসে রয়েছে ওর বাবার ব্যক্তিত্ব! চিলেকোঠা ভর্তি অগণিত বাক্স। কিছু কিছু তো ভদ্রলোকের সেই বিশ্ববিদ্যালয় দিনের! অনেক বই এবং ফিল্ড জার্নালও আছে।

ড. আল-মায়াজের অনুরোধে, এরইমধ্যে বেশ কিছু বাক্স খুঁজে দেখেছে ও। বিশেষ করে যেগুলো সবচেয়ে কম নোংরা, সেগুলো। ওগুলোর ভেতরেই আছে মরুভূমিতে ওর বাবার হারিয়ে যাওয়ার দুই-তিন বছর আগের সব লেখা। বাক্স নামিয়ে ডেরেক র‍্যাঙ্কিনের হাতে তুলে দিয়েছিল জেন। ছেলেটা রান্নাঘরে ওগুলো নিয়ে যাবার পর, একসাথে সবগুলো বাক্স ঘেঁটে দেখেছে ওরা। যদি রোরি বা তার বাবার কোন হদীস মেলে!

কোন লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না, কিন্তু একা একা বসে থাকার চাইতে তো ভালো! বলা যায়, পিতার মৃত্যু এবং তার দেহের এই অবস্থাকে মেনে নেয়ার একটা প্রয়াস ছিল এই কাজটুকু।

পিছু ফিরে লাভ নেই, এগিয়ে যেতে হবে সামনে।

আড়মোড়া ভাঙল জেন, তাকিয়ে রইল ছোট চিলেকোঠাটার জানালা দিয়ে বাইরে। ওই যে, অদূরেই দেখা যাচ্ছে অ্যাশওয়েল গ্রামটাকে। মধ্যযুগীয় কুটির আর কাঠ-প্লাস্টারের ছাদ নির্মিত দালানের এক অদ্ভুত মিশ্রণে তৈরি জায়গাটা। এত উপর থেকে গ্রামের চার্চটার টাওয়ার দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। ওটার ইতিহাস সেই চোদ্দো শতাব্দীর। বাতাসে ভেসে আসা সুর শুনতে পেল সে। প্রতি বছর অ্যাশওয়েলে

একটা গানের অনুষ্ঠান বসে, গত দশ দিন ধরে চলছে এ বছরেরটা। আজকেই শেষ রাত।

প্রাচীন টাওয়ারটার দিকে মন দিল জেন। একে-বেঁকে উঠে গিয়েছে ওটার সিঁড়ি; একদম উপরে রয়েছে তীক্ষ্ণ চূড়া, যেন আকাশের দিকে ইঙ্গিত করছে। নয় বছর বয়স যখন ছিল ওর, তখন বাবা একবার ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেয়ালে আঁকা মধ্যযুগীয় গ্রাফিতিগুলো দেখিয়েছিলেন পরম আগ্রহে। ওটার নিচে ল্যাটিন ও ইংরেজিতে লেখা ছিল সেই তেরো শতাব্দীর ভয়ঙ্কর ব্ল্যাক মহামারী-এর কথা।

ছোট বেলায়, কয়লা দিয়ে এরকম অনেক ছবি সে নিজেও এঁকেছে। কাজটা করার সময় মনে হতো, বহু শতাব্দী আগে মৃত্যু বরণ করা চিত্রকরের সাথে কোন এক বন্ধনে জড়িয়ে গিয়েছে সে। হয়তো এরকম মুহূর্তগুলোই পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য উৎসাহ জাগিয়েছে ওকে, প্রত্নবিদ্যাকে বেছে নিয়েছে পেশা হিসেবে।

জানালা থেকে অন্যদিকে নজর সরাল জেন। চার্চে দেখা একটা চিত্রের নকল নজরে পড়ে গেল ওর। এই চিত্রটার সাথে অবশ্য ব্ল্যাক প্লেগের কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য এই মুহূর্তটার সাথে পুরোপুরি মানিয়ে যায়।

'সুপ্যারবিয়া প্রেসিডিট ফ্যালাম,' ল্যাটিন শব্দগুলো উচ্চারণ করল ও।

অহংকার-ই পতনের মূল।

বাবাকে ভালবাসে জেন, তাই বলে ভদ্রলোকের চারিত্রিক দুর্বলতাগুলো তার নজর এড়ায়নি। বড় একগুঁয়ে ছিলেন তিনি, নিজ বিশ্বাসের ব্যাপারে গোঁড়া। অহংকার বলতে গেলে ছিল তার মজ্জাগত। জেন জানে, শুধু জ্ঞানার্জন নয়, এই অহংকারও বাবার মরুভূমিতে অভিযান চালাবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী। বাইবেলে বর্ণিত এক্সোডাসের সত্যতা প্রমাণের ব্যাপারে তার যে অদম্য আগ্রহ আছে, সেজন্য সহকর্মীদের কাছে অনেক কথা শুনতে হয়েছে তাকে। দুনিয়ার সামনে নিজেকে শক্ত হিসেবে উপস্থাপন করতেন তিনি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিজের তত্ত্বকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন-শুধু মাত্র ইতিহাসের খাতিরেই নয়, নিজের আহত অহংবোধকে চাঙ্গা করার জন্যও।

দেখ, বাবা, তোমার এই অহংকার কী পরিণতি বয়ে এনেছে .শুধু তোমার না, রোরির-ও!

মুহূর্তের জন্য দুঃখকে হারিয়ে ওকে দখল করে নিল রাগ। কিন্তু আরও একটা অনুভূতি মাথা-চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে ওর ভেতরে-অপরাধবোধ। পারিবারিক কুটিরে ফিরে না আসার একটা কারণ এই অনুভূতি। বলতে গেলে পরিত্যক্তই থাকে জায়গাটা, আসবাবগুলো ঢাকা থাকে কাপড়ে। লন্ডন থেকে অ্যাশওয়েলে আসতে

ট্রেনে এক ঘন্টার বেশি সময় লাগে না, তবুও একটা স্টুডিও-অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে নিয়েছে শহরে। নিজেকে বুঝিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় কাছে হয় বলেই করেছে কাজটা। কিন্তু নিজের মনকে কি আর ভুল বোঝানো যায়? এখানে ফেরার কথা ভাবলেই কষ্টে ভরে উঠে বুকটা। খুব বড় ধরনের প্রয়োজন না হলে তাই আসে না। এই যেমন এখন, ড. আল-মায়াজের অনুরোধে এসেছে।

রান্নাঘর থেকে চিৎকার ভেসে এল একটা, 'কিছু একটা পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে!'

অতীতের স্মৃতির হাত থেকে ছাড়া পাবার আনন্দে, তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল জেন। পার্লারটা পার হয়ে ছোট রান্নাঘরে প্রবেশ করবে, এমন সময় আবিষ্কার করল-ডেরেক সবগুলো পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার চিলেকোঠায় অনেকক্ষণ কাটাবার পর আলোতে এসে দেখতে অসুবিধা হচ্ছে ওর। পিট-পিট করে চোখ পরিষ্কার করে নিল সে।

ডেরেক বসে রয়েছে রান্নাঘরের টেবিলে। কনুইয়ের কাছে জড়ো হয়ে আছে বই আর জার্নালের একটা স্তূপ, আর টেবিল জুড়ে ছড়িয়ে আছে ইতস্তত কাগজ। জ্যাকেট খুলে রেখেছে ছেলেটা, হাত গোটানো। জেনের চাইতে ছয় বছর বড় যুবক। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়-ই ওকে নিজের ছত্রছায়ায় নিয়ে এসেছিলেন বাবা। অনেকের মতো এই ছেলেটাও তার বাবার ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড আকর্ষণ এড়াতে পারেনি। মাঝে মাঝেই ডেরেক আসত এই কুটিরে, কখনও কখনও রাতও কাটাত।

তখন অবশ্য এই অযাচিত আগন্তুকের আগমনকে ভালো চোখেই দেখত জেন। বিশেষ করে যখন থেকে ওর মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন থেকে। ডেরেকের সাথে কথা বলা সবসময়ই সহজ মনে হতো। জেনের কথা শোনার মতো যখন অন্য কেউ ছিল না, তখনও ছেলেটা মন দিয়ে শুনত। তবে রোরি ব্যাপারটাকে ওর মতো সহজে নিতে পারেনি। ওর মনে হতো, এই যুবক এসেছে ওর পিতার মনোযোগ কেড়ে নিতে। সম্ভবত সেই সাথে তার অর্জনেও ভাগ বসাতে!

এই মুহূর্তে চামড়া দিয়ে বাঁধানো একটা আর্কাইভের উপর ঝুঁকে আছে ডেরেক। চামড়ার ভাঁজ দেখে বোঝা যাচ্ছে, এই জিনিস প্রফেসর ম্যাককেবের লেখা হতেই পারে না। প্রফেসরের চাইতেও অনেক বেশি বয়স তার। ছেলেটার চেহারার উপর নজর পড়ল জেনের, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি দেখা যাচ্ছে। মিশর থেকে ফেরার পর, দু'জনের কেউ খুব একটা ঘুমাতে পারেনি।

'কিছু খুঁজে পেলে?' জানতে চাইল সে।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ডেরেক, বড়-সড় আর্কাইভটা তুলে ধরে বলল, 'আমার ধারণা, এই জিনিসটা তোমার বাবা গ্লাসগোর কোন লাইব্রেরী থেকে চুরি করেছিলেন!'

'গ্লাসগো?' ভ্রু কুঁচকে তাকাল জেন। ওর মনে পড়েছে, সুদানে যাবার আগে বেশ কয়েকবার স্কটল্যান্ড ঘুরে এসেছিলেন বাবা।

'দেখো,' আহ্বান জানাল ডেরেক।

একটুকরা কাগজ ব্যবহার করে আর্কাইভের নির্দিষ্ট একটা জায়গা চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল ও। সামনের দিকে ঝুঁকে যাওয়া মাত্র ছেলেটার দেহের গন্ধ নাকে এসে লাগল জেনের। সুগন্ধি ব্যবহার করেছে ডেরেক, অথবা তার শ্যাম্পুর গন্ধও হতে পারে। ওর নাক থেকে চিলেকোঠার সোঁদা বাতাস সরাতে সাহায্য করল গন্ধটা।

'ট্যাগ দেখে যা বুঝলাম,' বলল ডেরেক। 'বইটা এসেছে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের লিভিংস্টোন আর্কাইভস থেকে। বিশিষ্ট এই অভিযাত্রীর অধিকাংশ লেখা সেখানেই রয়েছে। এই বিশেষ আর্কাইভটায় রয়েছে তার লেখা নানা চিঠি ও বর্ণনা। জাম্বেজি নদীতে তার প্রথম অভিযান থেকে শুরু করে নীল নদের উৎস খোঁজার দিন পর্যন্ত! তোমার বাবা যে জায়গাটা দাগ দিয়ে রেখেছে, সেখানে লিভিংস্টোনের সাথে হেনরি মর্টন স্ট্যানলির চিঠি আছে। আফ্রিকার গহীন অঞ্চল থেকে ভদ্রলোককে এই স্ট্যানলিই উদ্ধার করে এনেছিলেন।'

কৌতূহলী জেন ডেরেকের পাশে এসে দাঁড়াল। 'কী লেখা আছে চিঠিতে? বাবা এত আগ্রহী হলেন কেন?'

শ্রাগ করল ডেরেক। 'অধিকাংশই অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে-যেন দুই বন্ধু কিছু একটা নিয়ে আলোচনা করছে। তবে এই দাগ দেয়া পাতাগুলো দেখো, ওগুলোতে লিভিংস্টোনের হাতে আঁকা কিছু ছবি আছে। এই পাতাটা বিশেষভাবে দাগ দিয়ে রেখেছেন তোমার বাবা। আমার নজর কেড়েছে এই ছোট পোকাটার নাম। দেখ।'

কাগজের দিকে মন দিল জেন।

Ateuchus sacer

লিভিংস্টোন যে দক্ষতার সাথে ছবিগুলো এঁকেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। একটা ছবিতে পাখা ছড়ানো, একটায় ছড়ানো না। ওটার বৈজ্ঞানিক নাম উচ্চঃস্বরে পড়ল জেন, '*Ateuchus sacer.* বুঝলাম না। এই গুবরে পোকা গুরুত্বপূর্ণ কেন?'

'কেননা এই নাম দিয়েছেন খোদ চার্লস ডারউইন।' ভ্রু কুঁচকে মেয়েটার দিকে তাকাল ডেরেক। 'একে আদর করে তিনি ডাকতেন-'মিশরীয়দের পবিত্র পোকা' বলে।'

আচমকা বুঝতে পারল জেন, 'ওহ্।'

'আজকাল একে ডাকা হয় *Scarabaeus sacer* বলে।' জানাল ডেরেক।

বাবার আগ্রহের কারণ কিছুটা বুঝতে পারছে জেন। প্রাচীন মিশরীয়রা এই পবিত্র গুবরে পোকার পূজা করত। কারণ একটাই-বিষ্ঠাকে ছোট ছোট বলে পরিণত করার অদ্ভুত এক ক্ষমতা ছিল এদের। তাদের বিশ্বাস, এই কাজটার সাথে দেবতা খেপরি-সকাল বেলায় যিনি নাম ধারণ করেন রা-তার কাজের মিল পাওয়া যায়। তিনিও আকাশে বলের মতো করে ঠেলে নিয়ে যেতেন সূর্য গোলককে। মিশরীয় সাহিত্য ও চিত্রশিল্পের সব জায়গায় গুবরে পোকার কোন না কোন উল্লেখ পাওয়া যায়।

পুরাতন বইটার আরও কাছে চলে এল জেন। 'লিভিংস্টোনকে দেয়া তালিসমানটা নিয়ে বাবা গবেষণা করতেন, তাই তার ডায়েরীতে থাকা মিশরের সব উল্লেখ নিয়ে মাথা ঘামাবেন-এতে আর আশ্চর্য কী?' চেয়ারে ফিরে গেল সে। 'কিন্তু গ্লাসগো থেকে বই চুরি করবেন কেন? এমন বিশ্বাসঘাতকতা তো তার করার কথা না!'

'আমি জানি না। আরও কয়েকটা পাতায় দাগ দেয়া আছে। মনে হচ্ছে, যে সব স্কেচে কোন ধরনের অক্ষরও আছে, সেগুলোর দিকে বেশি নজর ছিল তার।' বইটা বন্ধ করে জার্নালের দিকে হাত বাড়াল ডেরেক। 'অদ্ভুত ব্যাপারটা হচ্ছে, সুদানে যাবার আগের কয়েকটা মাস তিনি তালিসমান নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন! অথচ আমাকে একবারের জন্যও বলেননি! শুধু বলেছিলেন, সুদানের অভিযান থেকে পাওয়া মমিগুলোর মাঝে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল কিনা তা দেখতে।'

'তেমন কিছু পেয়েছিলে?'

'নাহ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডেরেক। 'মনে হয়েছিল, তোমার বাবার ভরসার প্রতিদান দিতে ব্যর্থ হয়েছি!'

ছেলেটার কনুই স্পর্শ করল জেন। 'দোষ তোমার না। বাবা সবসময় চাইতেন .নাহ, ভুল বললাম। এক্সুডাসের তত্ত্বটা যে সত্য-তা দেখাবার জন্য তার কোন না কোন প্রমাণ দরকার ছিল।'

তবুও অসন্তুষ্টির ভাবটা গেল না ডেরেকের চেহারা থেকে। আবার জার্নালটা খুলল সে। 'তালিসমানটার ব্যাপারে অনেক কিছু লিখে রেখেছিলেন তিনি। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ সব ধ্বংস করে দিয়েছে। যাই হোক, জিনিসটার কয়লা দিয়ে আঁকা একটা প্রতিকৃতি রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। সেই সাথে ওটার ভেতরে হায়ারোগ্লিফে লেখা শব্দগুলোরও। এই জার্নালে আছে সব।'

পাতাটা দেখাল ডেরেক, পিতার হাতের লেখা পরিষ্কার চিনতে পারল জেন। তালিসমানটার কয়লা দিয়ে আঁকা প্রতিকৃতির একটা ফটোকপিও আছে ওখানে।

'আরিয়াবোলস, মানে তেল রাখার পাত্র বলে মনে হচ্ছে।' জেন মন্তব্য করল। 'দুই মাথা দেখা যাচ্ছে। একপাশে সিংহের মুখ, অন্য পাশে এক মিশরীয় মহিলার। অদ্ভুত!'

'হাতে লেখা বর্ণনা অনুযায়ী, পাত্রটা বানানো হয়েছিল মিশরীয় পদ্ধতিতে, নীলকান্তমণির মতো নীল রঙা কাচের প্রলেপ ছিল সাথে।'

'হুম .তেমনটাই হবার কথা .বিশেষ করে যেসব পাত্র বানানোই হয় পানি ধরার জন্য, সেসব এভাবেই বানানো হয়।' মিশরীয় পদ্ধতিতে বানানো মৃৎপাত্রে কাঁদা, সিলিকা আর কোয়ার্টজের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। শুকিয়ে যাবার পর জিনিসটার সাথে মাটির চাইতে কাচের মিল পাওয়া যায় বেশি। 'আকার কেমন ছিল?'

'এখানকার লেখা অনুসারে, ছয় ইঞ্চি মতো লম্বা। ভেতরে তরল ধরে প্রায় এক পাইন্ট। জাদুঘরের ওরা পাথরের মুখবন্ধটাকে খুলে ফেলতে বাধ্য হয়েছিল। ওটা আবার জায়গামতো লাগান ছিল শক্ত, রেসিনের মতো মোম দিয়ে।'

'ফলশ্রুতিতে ওই আরিয়াবোলস পরিণত হয়েছিল পানি-অভেদ্যতে।'

মাথা ঝাঁকাল ডেরেক। 'পাতার নিচে লেখা জিনিসটা দেখ। তোমার বাবা ভেতরে আঁকা হায়ারোগ্লিফটা তুলে দিয়েছেন।'

বই দেখার দরকার পড়ল না, দেখার সাথে সাথেই চিনতে পারল জেন, 'ইটেরু।'

'হুম .নদী।'

'নীল নদকেও এই নামেই ডাকত তারা।' কপাল ঘষল মেয়েটা। 'তালিসমানটা তাহলে লিভিংস্টোনকে যে স্থানীয়রা দিয়েছিল, তাদের কথা সত্যি!'

'হুম, ভেতরের পানিটা নীল নদ থেকেই এসেছে।'

'শুধু তাই না, তখন সেটা রক্তে পরিণত হয়েছিল।' জেন মনে করিয়ে দিল কথাটা। 'মোজেসের সেই দশ মহামারীর প্রথমটা।'

'ভালো কথা, এটা দেখ।' বলে একটা পাতা ওল্টালো ডেরেক। জেনের বাবা ওখানে দশটা মহামারীর তালিকা করেছেন।

১) পানি রক্তে পরিণত হওয়া
২) ব্যাঙের লোকালয়ে উপদ্রব
৩) উকুনের অসহনীয় অত্যাচার
৪) মাছির আক্রমণ
৫) পশুদের রোগ
৬) চর্মরোগ
৭) শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত
৮) পঙ্গপালের আক্রমণ
৯) তিন দিন টানা অন্ধকার
১০) প্রথম সন্তানের মৃত্যু

তালিকাটা সাজানো হয়েছে ঘটনাক্রম হিসেবে। কিন্তু কেন যেন সাত নাম্বার মহামারীটাকে দাগ দিয়ে রেখেছেন ওর বাবাঃ শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত।

মেয়েটার ভ্রু কুঁচকানি নজর এড়াল না ডেরেকের। 'কিছু বুঝলে?'

'নাহ।'

আচমকা বেজে উঠল কুটিরের ফোন, চমকে উঠল দু'জনেই।

বিরক্ত দেখাল জেনকে। ওর ধারণা, ড আল-মায়াজ ফোন করেছেন। উত্তরের জন্য চাপ দিতে চাইছেন ওদেরকে। কিন্তু উত্তর বলা যায়-এমন কিছুই বের করতে পারেনি, উল্টো উন্মোচিত হয়েছে নতুন আরও রহস্য। এগিয়ে গিয়ে পুরনো দিনের ফোনটা তুলে ধরল ও। হ্যালো বলতে যাবে, তার আগেই ত্রস্ত একটা কণ্ঠ জানতে চাইল, 'জেন ম্যাককেব?'

'হ্যাঁ। কে বলছেন?'

'আমার নাম পেইন্টার ক্রো।' দ্রুত বলে চলছে কণ্ঠটা, আমেরিকান টান স্পষ্ট। 'আমি সাফিয়া আল-মায়াজের বন্ধু। এক ঘন্টার কিছু আগে, জাদুঘরে ওর উপরে হামলা হয়েছে?'

'মানে? কীভাবে?' তথ্যটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে জেনের।

'বেশ কয়েকজন মারা গিয়েছে। যদি তোমার বাবার সাথে সম্পর্কজনিত কোন কারণে আক্রমণটা ঘটে থাকে, তাহলে এরপর তোমার উপরেই হবে হামলা। জলদি নিরাপদ কোথাও চলে যাও।'

'কিন্তু-'

'যা বলছি শোনো, থানা খুঁজে বের করে সেখানে আশ্রয় নাও।'

কাছে-ধারে ওরকম জায়গা বলতে হয় লেচওয়ার্থ, আর নয়তো রয়স্টোন। কিন্তু জেনের সাথে গাড়ি নেই। ট্রেনে চড়ে এসেছে ওরা দুইজন।

'তাহলে লোকজন আছে, এমন কোথাও যাও।' ফোন দাতা সাবধান করে দিল কথাটা শুনে। 'মানুষ-জনের মধ্যে থাকো। আমি সাহায্য পাঠাচ্ছি।'

ততক্ষণে কিছু একটা আঁচ করতে পেরে উঠে দাঁড়িয়েছে ডেরেক। 'কোন সমস্যা?'

বিস্ফারিত চোখে যুবকের দিকে তাকিয়ে রইল জেন, মনের ভেতর চিন্তার ঝড় খেলা করছে। 'আমি .একটা পাব আছে, কাছেই। নাম দ্য বুশেল অ্যান্ড স্ট্রাইক।' ঘড়ির দিকে নজর গেল ওর। সাতটা বেজেছে অনেক আগেই, এতক্ষণে পাবটা লোকে গিজগিজ করার কথা।

'সেখানেই যাও! এখুনি!' কেটে গেল ফোন।

লম্বা একটা শ্বাস নিল জেন, ভয় দূরে রাখার চেষ্টা করছে।

ফোন কর্তার কথা যদি ঠিক হয় তো

টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'ডেরেক, জার্নালটা নিয়ে নাও। গ্লাসগোর ওই আর্কাইভটাও। আর কোনটা যদি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়ে, সেটাও নাও।'

'কী ব্যাপার?'

ডেরেককে সাহায্য করতে করতেই উত্তর দিল জেন, 'আমরা মহাবিপদে পড়ে গিয়েছি!'

রাত ৭ঃ১৭

জেনের জন্য দরজা ধরে রেখেছিল ডেরেক। কী হচ্ছে, তা কিছু বুঝতে পারছে না যুবক। সবকিছুই অবাস্তব মনে হচ্ছে।

জেন পোর্চ পার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ছেলেটা। আগাছা-বহুল সামনের বাগান দেখতে পাচ্ছে মেয়েটা, সেই সাথে নিচু দেয়ালের ওপাশটাও। সূর্য এখনও ডোবেনি, তবে ডুবু-ডুবু করছে। ছায়া এসে পড়েছে রাস্তায়।

'কী হয়েছে?' আবারও জানতে চাইল যুবক। 'কে হামলা করবে তোমার ওপর?'

ভয় পাবার মতো কিছু নজরে পড়ল না জেনের, তাই ইস্পাতের ছোট দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল সে। 'আমি জানি না, হয়তো কেউ-ই না! সম্ভবত ড. আল-মায়াজকে যারা আক্রমণ করেছে, তারাই!'

জেনের পিছু নিল ডেরেক, এক সাথে দুইজনে পা রাখল রাস্তায়। বন্ধু আর সহকর্মীদের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে, কিন্তু সেই সাথে জেনকে নিরাপদে রাখার প্রতিজ্ঞাটাও হয়েছে আরও দৃঢ়।

'ওই ফোন দাতার কথা বিশ্বাস করা যায়?' জানতে চাইল সে।

ওর দিকে তাকাল জেন, প্রশ্নটা ওকেও নাড়া দিয়েছে। 'আমার .আমার তো তা-ই মনে হয়। কেউ আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইলে কী আর জন-সম্মুখে থাকতে বলত?'

তা তো বটেই

'আর তাছাড়া,' বলল জেন। 'দুই-গ্লাস গলায় ঢালতে পারলে ভালোই লাগবে। স্নায়ুকে শান্ত করতে হবে তো!' মুচকি হাসল সে, হাসি ফিরিয়ে দিল ডেরেকও।

'ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করবে যখন,' বলল সে। 'প্রথমটা নাহয় আমিই কিনে দেব। হাজার হলেও, আমি একজন ডাক্তার।'

চোখে দুষ্টামি নিয়ে মন্তব্য করল জেন, 'হুম, কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের!'

'উহু, জৈব-প্রত্নতত্ত্বের।' ঠিক করে দিল ডেরেক। 'খাঁটি ডাক্তারের মতোই।'

চোখ উল্টে ইশারা করল যেন, 'তাহলে চলুন, ডাক্তার সাহেব, এগোনো যাক।'

অল্প কিছুক্ষণ হাঁটার পরে, স্থানীয় পাবের পেছনের গলিতে চলে এল ওরা। দ্য বুশেল অ্যান্ড স্ট্রাইক পাবটা মিল স্ট্রিটের উল্টোদিকেই। সেন্ট মেরি'স চার্চ ও তার চারপাশের বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে পাবটা।

কাছাকাছি চলে এসেছে বলে মনে হচ্ছে, গোধূলি এরইমাঝে নেমে এসেছে পাবের পেছনের প্যাটিওতে। টেবিলগুলো প্রায় ভর্তি, পেছনের খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছে ভেতরের গুঞ্জন।

পরিচিত লয় এবং হাসির আওয়াজ ডেরেকের সব ভয় ধামা-চাপা দিয়ে দিল। অচেনা ভয়কে আর খুব একটা আতঙ্ককর বলে মনে হচ্ছে না। দ্য বুশেল অ্যান্ড স্ট্রাইকে প্রায়ই আসত সে, জেনের বাবার সঙ্গী হয়ে। কখনও কখনও সারা রাত কাটিয়ে কুটিরে ফিরত পরদিন ভোরে।

মনে হচ্ছে, যেন ঘরে ফিরে এসেছে।

এক মহিলার গানও শুনতে পাচ্ছে সে। রাস্তা পার হয়ে প্রতিধ্বনি এতদূরেও আসছে। মনে পড়ে গেল ওর-আজকে অ্যাশওয়েল অনুষ্ঠানের শেষ দিন।

পাবটা যে খদ্দেরে ভর্তি হয়ে আছে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

পরিস্থিতির বিচারে, ব্যাপারটা ওদের জন্য যে ভালো তাতে কোন সন্দেহ নেই!

হাসি-ঠাট্টার আওয়াজ শুনে, সে যেন চলার গতি আরও বাড়িয়ে দিল। কোন ধরনের আক্রমণ ছাড়াই, নিরাপদে পাবটার পেছনের দরজায় এসে উপস্থিত হলো ওরা। কিছুক্ষণের মাঝেই দেখা গেল, দু'জনে সামনে দুটো পানীয় নিয়ে বসে আছে। কয়েকজন স্থানীয় খদ্দের জেনকে চিনতে পেরে এগিয়ে এসে সান্ত্বনা জানাল। প্রফেসর ম্যাককেবের উধাও হয়ে যাওয়া, আবার কয়েক বছর ফিরে আসার ঘটনাটা খবরের কাগজে বড় বড় করে ছাপা হয়েছে।

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিল জেন, সামনের দিকে ঝুঁকে আছে ওর কাঁধ, মানুষের এই আচমকা আগ্রহ ওর ঠিক হজম হচ্ছে না। প্রতি মুহূর্তে কী হারিয়েছে-সে কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। অভদ্রের মতো আচরণ করল না বটে, কিন্তু মুখে ধরে রইল কাষ্ঠ একটা হাসি। এক পর্যায়ে ডেরেক অন্যদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এল। মানুষ-জনের সদয়, কিন্তু অস্বস্তিকর মনোযোগের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়াল যুবক।

সেই সাথে এক চোখ রেখেছে সামনের দরজার দিকে। যে-ই ঢুকুক না কেন, ক্লান্ত চোখে দেখছে তাকে। অনুষ্ঠানের জন্য স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ আসছে পাবে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর যুবকের সন্দেহ হতে লাগল-ফোন দাতা ভুল করেনি তো আবার! কেননা, শত্রুর কোন চিহ্নই ধরা পড়ছে না ওর চোখে।

আচমকা সামনের দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ভেতরে প্রবেশ করল কেউ একজন, অস্থির দেখাচ্ছে।

'আগুন!' বাইরের দিকে ইঙ্গিত করে চিৎকার করতে শুরু করল আগন্তুক।

এক মুহূর্ত পর দেখা গেল, খদ্দেররা সবাই পাবের বাইরে অবস্থান নিয়েছে। তারাও আগন্তুকের মতো একইভাবে চিৎকার করছে!

জেন আর ডেরেকও পিছু পিছু বেরিয়ে এসেছে। জনস্রোতে আলাদা হয়ে গেল দু'জন।

'জেন!' চিৎকার করে ডাকল সে।

রাত নেমেছে ততক্ষণে, হঠাত করে কমে গিয়েছে তাপমাত্রাও। অন্ধকার রাস্তার ঠিক মধ্যখানে হোঁচট খেল বেচারা। এদিকে কিছুটা দূরেই দেখা যাচ্ছে আগুনের উজ্জ্বল জিহ্বা, অন্ধকার ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে সেই আগুনের আভায়।

হায়   .হায়!

অবশেষে জেনকে দেখতে পেল সে, ওর থেকে কয়েক গজ সামনেই আছে মেয়েটা। তবে পিঠ দিয়ে আছে এদিকে, কনুই দিয়ে ধাক্কা-গুঁতা মেরে জেনের কাছে পৌঁছে গেল ও। প্রফেসর ম্যাককেবের মেয়ের চেহারায় ভয়ের ছায়া পরিষ্কার। সম্ভবত সে-ও ওই ধোঁয়া আর আগুনের উৎপত্তি স্থল চিনতে পেরেছে।

'আ   .আমাদের বাড়ি।' বিড়বিড় করে বলল সে।

শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরল ডেরেক।

'কেউ একজন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।'

চারপাশে নজর বুলালো ডেরেক, সন্দেহজনক কিছু যদি চোখে পড়ে! আগুনের আভায় চারপাশকে মনে হচ্ছে যেন নরকের কোন টুকরা। দূর থেকে ভেসে আসছে ফায়ার সার্ভিসের অ্যালার্ম, পরিস্থিতিকে যেন আরও ঘন করে তুলেছে সেটা।

'এখান থেকে সরতে হবে,' জেনকে উদ্দেশ্য করে বলল ও।

কেউ যদি সত্যি সত্যি কুটিরে আগুন ধরিয়ে দেয়, তাহলে নিশ্চয়ই প্রফেসরের সব গবেষণাপত্র জ্বালিয়ে দেবার জন্যই দিয়েছে। আচমকা কাঁধে ঝোলানো জার্নাল আর আর্কাইভ ভর্তি ব্যাগটাকে আরও বেশি ওজনদার বলে মনে হচ্ছে। ভেতরের কাগজগুলোর গুরুত্ব হঠাত করেই বেড়ে গিয়েছে বহুগুণ। তবে সেটা নিয়ে বেশি চিন্তা করছে না ও। প্রতিপক্ষের আসল লক্ষ্য ঠিক বুঝতে পারছে যুবক।

প্রফেসর ম্যাককেবের মেয়ে!

জেনকে ঘুরিয়ে দিল ডেরেক, আগুনের দিক থেকে সরিয়ে নিল তার দৃষ্টি। 'আমাদের-'

আচমকা কেউ একজন আঁকড়ে ধরল যুবকের কাঁধ, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল তাকে। অবাক ডেরেক পিছিয়ে গেল কয়েক পা। জেনের সামনে ঝুঁকে আছে বিশাল বড় এক অবয়ব। দেখে মনে হয়, কোন ছোট্ট বাচ্চার দুঃস্বপ্ন থেকে উঠে এসেছে লোকটা।

তাই বলে তো আর ডেরেক পিছিয়ে আসতে পারে না। আক্রমণকারীকে উদ্দেশ্য করে লাফ দিল ও-জান দিয়ে হলেও রক্ষা করবে জেনকে।

বিশালদেহী লোকটার হাতের এক আলতো ঝাপটাই যথেষ্ট। ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল বেচারা। আছড়ে পড়ল রাস্তায়। ঝাপসা চোখে দেখল, জেনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বিশালদেহী।

না

চার
৩০ মে, দুপুর ৩:৫৪ ই.ডি.টি.
ওয়াশিংটন ডি.সি.

বসকে এর আগে এতটা উদ্বিগ্ন হতে আর কখনও দেখেনি ক্যাট ব্রায়ান্ট। সিগমা ভূ-গর্ভস্থ অফিসের একটা কক্ষে ওর আস্তানা, সেখান থেকে যোগাযোগের হাব দেখা যায় পরিষ্কার। জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে, ডিরেক্টর ক্রো ওখানেই ঘোরাঘুরি করছে। ইউ-আকৃতিতে সাজানো অনেকগুলো স্টেশন আর কম্পিউটারের মনিটরের আলোতে দেখা যাচ্ছে তার পদচারণা।

'মনে হচ্ছে, মেঝে ফুটো করে নিচে ঢুকে যাবেন!' মন্তব্য করল ক্যাটের স্বামী। 'এক কাজ করো, ভদ্রলোকের কফির পরবর্তী কাপটায় কয়েকটা ভ্যালিয়াম গুলিয়ে দাও!'

'জানি ঠাট্টা করছ, মঙ্ক। তবে কাজটা সত্যি সত্যি করতে হতেও পারে!'

চিবুকের একটা ছোট ক্ষতে হাত বুলাল ক্যাট। নার্ভাস হলেই কেন জানি মেয়েটার হাত চলে যায় ওখানে। এই মুহূর্তে অবশ্য অস্থিরতার কারণ অন্য-কেবল নানা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ফোন কল আদান-প্রদান করে শান্তি হচ্ছে না ওর। আরও কিছু করতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু ডিরেক্টরের ডান হাত হওয়ায়, নিজের কাজের গুরুত্ব সে ভালো ভাবেই জানে। নেভির ইন্টেলিজেন্সের কাছ থেকে ভাঁড়িয়ে ওকে সিগমায় আনা হয়েছে, বিশ্বে এই কাজে ওর মতো দক্ষ খুব কমই আছে।

'কায়রো থেকে আর কোন খবর এসেছে?' জানতে চাইল মঙ্ক।

'ভালো কোন খবর আসেনি।'

স্বামীর দিকে তাকাল ও। মঙ্ক কক্কালিস মাত্র কয়েক ইঞ্চি খাটো ওর চাইতে, কিন্তু দেহ বুলডগের মতোই শক্তিশালী। মাথা সব সময় কামিয়ে রাখে; অনেক আগে থেকেই নাকটা ভাঙা, একদিকে বেঁকে আছে। চার ঘণ্টা আগের কথা, এসব যখন আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছিল-মঙ্ক তখন ব্যস্ত ছিল স্থাপনার ব্যায়ামাগারে। এখনও ব্যায়ামের পোশাক পরে আছে সে। যে কেউ দেখলেই বলবে, স্পেশাল ফোর্সে বহুদিন কাটিয়ে এসেছে মঙ্ক। কিন্তু ওই রুক্ষ দেহের আড়ালে যে চরম বুদ্ধিদীপ্ত একটা মনন আছে, তা খুব কম মানুষই ধরতে সক্ষম।

মেডিসিন আর বায়োটেকনোলজিতে লোকটার দক্ষতার দাম দিতে শিখেছে সিগমা-ডারপাও। তবে তাদের জন্য মঙ্ক আসলে পরীক্ষার বস্তু হিসেবেই বেশি দামী। আগের একটা মিশনে হাত হারাতে হয়েছে ওকে, তারপর নকল হাত লাগিয়ে কাজ চালাচ্ছে। প্রতিবার নতুন নতুন প্রযুক্তি যোগ হয় নকল হাতটায়। এখন যেটা

আছে, সেটার আঙুল ইচ্ছা হলেই নাড়াতে পারে মঙ্ক! এখনও তাই করছে, সম্ভবত নতুন এক সংযোজনের সাথে পরিচিত হয়ে নিচ্ছে। 'ক্যাট, ভালো খবর না মানে?'

'কায়রো জুড়ে এখন কেবলই বিশৃঙ্খলা!'

'কোয়ারান্টাইনের কী খবর?'

ঘোঁত করে জবাব দিল মেয়েটা। 'কায়রোর চিকিৎসা ব্যবস্থা আগে থেকেই দুর্বল। জরুরি চিকিৎসা সেবার কথা নাহয় বাদ-ই দিলাম! এক বোতল পানি নিয়ে দাবানল থামাবার চেষ্টা করে দেখেছ কখনও? কাজটা তেমনই হবে!'

'ইংল্যান্ডের কী খবর?'

'এখন পর্যন্ত-'

আচমকা একটা লাল পর্দা ভেসে উঠল ক্যাটের মনিটরে, সিডিসি থেকে এসেছে ওটা। দ্রুত নজর বুলিয়ে নিল একবার।

মঙ্ক দেখতে পেল, স্ত্রীর দেহ শক্ত হয়ে উঠেছে। 'খারাপ খবর?'

'হুম। কায়রো ও লন্ডন বিমানবন্দরের অনেকেই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।' মঙ্কের দিকে তাকাল ও। 'সেই সাথে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একজন বিমানবালাও।'

'পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।'

'এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না যে এরা মিশরের মর্গের সেই রোগটাতেই আক্রান্ত হয়েছে। তাই বলে অবশ্য চুপচাপ বসে থাকা চলবে না। দেশে-বিদেশে বেশ কয়েকটা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করতে হবে আমাকে।'

মাথা নাড়ল ক্যাট। এসব কাজ করতে গেলেই সম্মুখীন হতে হয় আমলাতান্ত্রিক জটিলতায়। আবারও চিবুকের ক্ষতটা স্পর্শ করল সে। কী-বোর্ডের দিকে নজর দিল আবার।

এদিকে পেইন্টারের হাঁটা-চলা বন্ধ হয়নি। ক্যাট জানে-ওর বস পারলে এখনি লন্ডনে চলে যেত, সিগমার কমান্ডে থাকত না! ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আক্রমণ চালানো লোকগুলোর পিছু ধাওয়া করত।

ডিরেক্টরের সাথে সাফিয়া আল-মায়াজের ইতিহাস ভালো মতোই জানে ক্যাট। এই মহিলা তার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পেইন্টার যেন বুঝতে পারল ক্যাটের চিন্তা-ভাবনা। ড. আল-মায়াজের শেষ কলটা আবার চালাল ও।

ভিডিয়োটা এরইমধ্যে চারবার দেখে ফেলেছে ক্যাট। ওতে দেখা যাচ্ছে, সাফিয়ার উপর আক্রমণ চালিয়েছে মুখোশ পরা কেউ একজন। একটা ট্রাঙ্কুলাইজার গান দিয়ে গুলি করা হয়েছে মেয়েটাকে। তারপর সাধারণ পিস্তল দিয়ে গুলি করে নষ্ট করে ফেলেছে ক্যামেরা। সেই একই অস্ত্র ব্যবহার করে খুন করা হয়েছে জাদুঘরের দুইজন কর্মচারীকেও। তাদের মাঝে এক যুবতীও আছে, ভিডিয়োতেও দেখা যাচ্ছে সেই লাশ।

পুলিস গিয়ে সাফিয়াকে পায়নি!

এদিকে কমিউনিকেশন রুমে, ভিডিয়োটাকে ফ্রিজ করে দিয়েছে পেইন্টার। সাফিয়ার চেহারা দেখা যাচ্ছে ওতে।

'মেরে ফেলতে চাইলে, ওখানেই খুন করে রেখে যেতে পারত,' ফিসফিস করে বলল বলল মঙ্ক। 'কিছু একটা চায় মনে হয়, সেজন্যই তুলে নিয়ে গিয়েছে।'

'যখন সেটা পেয়ে যাবে, তখন?' জানতে চাইল ক্যাট।

চেহারা বিকৃত করল মঙ্ক। 'আশা করি, তার আগেই আমরা তাকে উদ্ধার করতে পারব।'

মনিটরের কোনায় থাকা ঘড়িতে সময় দেখে নিল ক্যাট। 'গ্রে এখনও এসে পৌঁছেনি কেন? তোমাদের লন্ডনে যাবার জেট আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর উড়াল দেবে।'

শ্রাগ করল মঙ্ক। 'হাসপাতালে আছে, ভাই ও বাবার সাথে। সরাসরি বিমানবন্দরে যাবে।'

'ওর বাবার কী অবস্থা?'

'খুব একটা ভালো না।' নকল হাতটা মাথার উপর বুলালো মঙ্ক। 'কিন্তু আসল ঝামেলা তো ওর ভাই!'

বিকাল ৪ঃ১৪

ঝামেলা যেন পিছু ছাড়তেই চাইছে না।

পিতার বিছানার পাশে বসে আছে কমান্ডার গ্রেসন পিয়ার্স।

হলি ক্রস হাসপাতাল থেকে অনেকগুলো পরীক্ষা করিয়ে কিছুক্ষণ আগেই ফিরে এসেছে ওরা। এই মুহূর্তে আছে দক্ষ একটা নার্সিং সেন্টারে। অ্যাম্বুলেন্সের যাত্রাটাও কষ্ট দিয়েছে বৃদ্ধকে।

নার্সকে কাজ করতে দেখে স্মৃতির অতলে হারিয়ে গেল গ্রে। রুক্ষ স্বভাবের টেক্সান লোকটাকে অনেক খুঁজে দেখতে পাচ্ছে না বাবার মধ্যে। দুর্ঘটনায় একটা পা হাঁটু থেকে কাটা পড়ার পরও, নিজেকে আত্মানির্ভরশীল হিসেবেই দেখতে পছন্দ করতেন তিনি। জীবনের প্রায় পুরোটাই বাবার সাথে ঠোকাঠুকি করে কাটিয়েছে গ্রে। দু'জনই গোঁড়া, আত্মসম্মানবোধে ছাড় দিতে চায় না। গ্রে-র বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পেছনে এই ঠোকাঠুকিই দায়ী। এরপর আর্মি .রেঞ্জার হয়ে সিগমাতে ফিরে আসা।

বসে বসে বৃদ্ধ বাবার চেহারার ভাঁজগুলো যে মানচিত্র বানিয়েছে, সেটাই দেখছে এখন গ্রে। ভরাট চেহারাটা শুকিয়ে গিয়েছে, চোখগুলো যেন বসে গিয়েছে গর্তে।

শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, নার্সের বালিশ গুছিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা দেখে আপনমনে হাসল যুবক। অন্য সময় হলে বকাবকির বন্যা বইয়ে দিতেন জ্যাকসন পিয়ার্স। বাচ্চাদের মতো করে কেউ তার সেবা করুক-সেটা তিনি চান না। অথচ এখন বেরিয়ে এল কেবলই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস। অনেক বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বাবা।

তার হয়ে গ্রে কথা বলল, নার্সকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিল সে। 'আর দরকার নেই, ধন্যবাদ। আমার বাবা এসব পছন্দ করেন না।'

তরুণী মেয়েটা পিছিয়ে এল এক পা, গ্রে-র দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন ওনার সেন্ট্রাল লাইনটা পরিষ্কার করা হয়নি।'

এক বার গলার পাশে গিয়ে শেষ হওয়া নলটার দিকে তাকাল গ্রে। তারপর ঘড়ি দেখে বলল, 'দুই-এক মিনিট পরে আসা যায় না?'

আমার হাতে এই এক কি দুই মিনিট সময়ই আছে।

জলদি এয়ারফিল্ডে পৌঁছানো দরকার ওর। দরজার দিকে একবার তাকাল তাই। কেনি কোথায়?

গ্রে ভাবল, নিশ্চয়ই ওর ভাই হলি ক্রস থেকে আসার পথে কোথাও থেমেছে! স্বাধীনতার সময়টাকে যতটা বেশি বাড়ানো যায় আরকি। গ্রে চলে যাচ্ছে বলে, 'বাবার দায়িত্ব' গিয়ে পড়ছে কেনির ঘাড়ে। যত সময় বাড়ছে, দায়িত্বটা ততই ওজনদার হচ্ছে!

অধৈর্য ভঙ্গিতে নতুন ঘরটা এক পলক দেখে নিল গ্রে। বেসরকারী হলেও, ভেতরের সাজ-সজ্জা খুব একটা বেশি না। ওয়ার্ডরোব আছে একটা, রোগীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য ঘরের মাঝেই রয়েছে পর্দা, সেই সাথে বিছানার পাশে একটা টেবিল। এই ঘরটাই পরবর্তী ছয় সপ্তাহের জন্য বাবার বাড়ি হতে চলেছে।

গত মাসে পা পিছলে আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন তিনি, কর্তিত পায়ের কাটা জায়গাটায় তাই বড় ধরনের ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। ইমার্জেন্সী রুমে গিয়ে সেলাই করাবার পর, সব কিছু ঠিক আছে বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু দেখা গেল, জ্বর এসেছে তার। যাচ্ছে না। ডাক্তাররা ধারণা করেছিলেন, ক্ষতের কারণে হাড়ে প্রদাহ হয়েছে, সেই সাথে কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছে রক্তেও। বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক না। আরও একবার অপারেশন এবং কিছুদিন হাসপাতালে থাকার পর, বাবাকে এখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। মুখে না খাইয়ে, শিরাপথে ছয় সপ্তাহ অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হবে।

হয়তো সেটাই ভালো হয়েছে, অনুতপ্ত গ্রে ভাবল। অন্তত এখানে চব্বিশ ঘণ্টা তার উপর নজর রাখার মতো কেউ না কেউ থাকবে।

কেনিকে আর যাই বলা যাক, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী বলা যায় না।

বিছানা থেকে শ্লেষ্মাজড়িত একটা কণ্ঠ শোনা গেল। 'আমি যেতে প্রস্তুত।'

পিতার দিকে ফিরল গ্রে। 'তোমাকে এখানেই থাকতে হবে বাবা, ডাক্তারের নির্দেশ।'

ওর বাবার রোগ অনেক বেড়ে গিয়েছে। বর্তমানের উপর এখন কেবল একটা আবছা ধারণা আছে তার। অনেক দিন ধরেই আলঝেইমারে ভুগছেন তিনি।

গত বছর, ঝুঁকি নিয়েই বাবার জন্য পরীক্ষাধীন একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল গ্রে। অবাক হয়ে খেয়াল করেছিল, কাজ করেছে নতুন সেই ওষুধ! মাথার *পেট* স্ক্যান করে দেখা গেল, নতুন করে আর কোন পরিবর্তন আসছে না! বাবার অবস্থার অবনতিও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়-ওষুধটা রোগের বিস্তার থামাতে পারলেও, যা ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তার প্রতিকার দিতে পারল না। ফলে বাবা মোটামুটি সুস্থ হলেও, রোগাক্রান্ত হবার আগের অবস্থায় আর কোনদিনই ফিরে যেতে পারবে না। পরিপূর্ণ সুস্থতা আর অসুস্থতার মাঝখানে কোথাও আটকা পড়ে গেলেন তিনি।

আবার কথা বলে উঠলেন বাবা। এবার আরও জোরালো কণ্ঠ, 'তোমার মাকে দেখতে চাই।'

লম্বা শ্বাস নিল গ্রে। বেশ কিছুদিন আগেই ওর মা মারা গিয়েছেন। অনেকবার বাবাকে সে কথা শুনিয়েছে গ্রে, এর কিছুটা যে তিনি মনে রাখতে পেরেছেন-সেটাও পরিষ্কার। মাঝে মধ্যেই এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেন বাবা, অথবা মা-র ব্যাপারে কোন গল্প শোনান। মুহূর্তগুলোকে হৃদয়ের মণিকোঠায় নিয়ে রাখত গ্রে। কিন্তু যখন বাবা খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েন-যেমন এখন পড়েছেন-তখন আর সে কথা মনে থাকে না।

পিতার ঘাড়ের কাছে গেল গ্রে। আরেকবার সত্যটা বলবে, না তাকে এই ধারণাটুকু নিয়ে শুয়ে থাকতে দেবে তা বুঝতে পারছে না। কিছুই না করে বাবার সমুদ্র-নীল চোখের দিকে তাকাল সে। ওই চোখের তারায় সুস্থতার ছাপ।

'বাবা .?'

'আমি যেতে প্রস্তুত, বাছা।' শব্দগুলো আবারও উচ্চারণ করলেন তিনি। 'আমি .আমি হ্যারিয়েটের শূন্যতা মেনে নিতে পারছি না। আবারও ওকে দেখতে চাই।'

থমকে গেল যেন গ্রে। ওর পিতার সাথে বিছানায় শুয়ে থাকা ক্লান্ত লোকটাকে মেলাতে পারছে না। সবসময় পৃথিবীর বিরুদ্ধে বুক চেতিয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। মাথা নত করেননি এমনকী নিজের ছেলের সামনেও!

ও কিছু একটা বলার আগেই, দমকা হাওয়ার মতো ঘরে প্রবেশ করল কেনি। দুই ভাইয়ের মাঝে মিল লক্ষণীয়। দুই জনেই সমান লম্বা, ঘন-কালো চুল আর

ওয়েলশবাসীদের মতো ত্বক। পার্থক্য শুধু উদরের মধ্যস্থানে। গ্রে একেবারে ছিমছাম শরীরের, কেনির পেটে চর্বির একটা আস্তর। সফটওয়্যার কোম্পানীতে কাজ করে ছেলেটা, পার্টি করেই কেটে যায় সময়।

৭-এগারোর লোগো আঁকা একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ তুলে ধরল কেনি। 'বাবার জন্য কিছু ম্যাগাজিন নিয়ে এসেছি। একটা স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড, আর গলফ ডাইজেস্ট। সেই সাথে কিছু খাবারও আছে। চিপস আর ক্যান্ডি।'

বিছানার পাশে আরেকটা চেয়ার টেনে ধপাস করে তাতে বসে পড়ল কেনি-মনে হলো যেন ম্যারাথন দৌড় শেষ করে এসেছে। ভাইয়ের দেহে হুইস্কির গন্ধ পেল গ্রে।

দরজার দিকে ইঙ্গিত দিল কেনি। 'গ্রে, তুমি যেতে পারো। বাকিটা আমি দেখছি। বাবার যেন যথার্থ দেখ-ভাল হয়, সেটা নিশ্চিত করব।' ভাইয়ের কণ্ঠে অনুযোগের সুর শুনতে পেল গ্রে। 'কাউকে না কাউকে তো কাজটা করতে হবে।'

দাঁতে দাঁতে চাপল গ্রে। কেনির জানা আছে, ওর ভাই সরকারের হয়ে কাজ করে। কিন্তু সিগমা বা গ্রে-র কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে জানাবার অনুমতি নেই। যাই হোক, যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল গ্রে। ঠিক তখনই কঠোর চোখে ওর দিকে তাকালেন বাবা, সেই সাথে মাথা নাড়লেন আলতো করে। বুঝতে পারল ও।

তার একটু আগে বলা কথাটা কাউকে জানাতে নিষেধ করছেন বাবা।

অসুবিধা নেই .আরেকটা রহস্য নাহয় গোপনীয়তার তালিকায় যোগ হলো।

বিছানার পাশে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল গ্রে। নিজের কাছেই অদ্ভুত ঠেকল ব্যাপারটা। মানুষজনের সামনে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা খুব একটা প্রকাশ করে না তারা কেউই।

আলতো করে ওর পিঠে চাপড় দিলেন বাবা। 'যাও, খেল দেখাও।'

'অবশ্যই।' অতীতের কিছু ঝামেলার কারণে গ্রে-র চাকরীর আসল রূপ জানেন বাবা। 'ফিরে এসে দেখা হবে।'

সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়াল গ্রে। যেকোন মিশনের আগে উত্তেজনা বয়ে যায় ওর শরীরে, এখনও তাই হচ্ছে। রেঞ্জার্সে কাটানো দিনগুলো ওকে শিখিয়েছে, কীভাবে চুপচাপ বসে থাকা থেকে এক মুহূর্তে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়। সৈনিক হবার অর্থই তো তাই-যখনই সময় হবে, কালক্ষেপণ না করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

এখন সময় হয়েছে।

দরজার দিকে এগোল গ্রে, কিন্তু পেছন থেকে কথা বলে উঠলেন বাবা। পুরনো সেই মানুষে পরিণত হয়েছেন যেন তিনি। শক্তিশালী কণ্ঠে বলছেন, 'কথা দাও।'

বাবার দিকে তাকাল গ্রে, ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইল, 'কী প্রতিজ্ঞা?'

পলক ফেললেন বাবা, অনেক কষ্টে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে উঠে বসলেন তিনি। পরক্ষণেই আবার আবার পড়লেন বিছানায়, বিভ্রান্তি আবারও গ্রাস করে নিয়েছে তাকে।

'বাবা?' জানতে চাইল গ্রে।

দুর্বল হাতটা নড়ে উঠল, চলে যেতে বলছে ওকে।

সেই সাথে যোগ দিল কেনি। 'ঈশ্বর! দেখো, গেলে যাও! বাবাকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও।'

হাত মুঠো করে ফেলল গ্রে, কোন কিছু ধ্বংস করতে চাইছে ওর মন। কিন্তু তা না করে ঘুরে দাঁড়াল ও, বেরিয়ে পড়ল ঘরটা থেকে। স্থাপনাটার বাইরে পার্ক করে রেখেছে ইয়ামাহা ভি-ম্যাক্স মোটর সাইকেল। ছয় ফুট লম্বা দেহটা ওটার উপরে স্থাপন করে, পরে নিল হেলমেট। ইঞ্জিন চালু করে কিছুক্ষণ গজরাতে দিল ওটাকে। এরপর শুরু করল পথ চলা।

বাবার উচ্চারিত কথাগুলো এখনও ওর কানে বাজছে।

কথা দাও।

কথাটার অর্থ বুঝতে পারছে না গ্রে। অপরাধবোধ আবারও পেয়ে বসল ওকে। বাবাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যাচ্ছে বলে .আর ছেড়ে যাচ্ছে এই কারণে স্বস্তি পাচ্ছে বলে! পিতার স্বাস্থ্যের অবনতির সাথে এতদিন ধরে লড়াই করার পর, আর পারছে না গ্রে। তাই অস্তিত্ব আছে, এমন কিছু একটার সাথে লড়তে চাচ্ছে ও। এমন কিছু, যেটাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়!

সেজন্যই বুঝি ক্যাটের সাথে, সিগমা কমান্ডে যোগাযোগ করল ও। 'আমি রওনা দিয়েছি, মিনিট পনেরো লাগবে।'

হেলমেটের ভেতরে এসে উত্তর দিল মেয়েটার কণ্ঠ। 'মঙ্ক তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। মিশন সংক্রান্ত সব তথ্য ওর কাছেই পাবে।'

ডিরেক্টর আগেই অল্প কথায় সব বলে দিয়েছে। এই মিশনে পেইন্টারের ব্যক্তিগত আগ্রহ আছে। তাই গ্রে-কে লন্ডনে নেতৃত্ব দিতে বলেছে সে।

'ওখানকার কী পরিস্থিতি?' জানতে চাইল কমান্ডার।

'জাদুঘর বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে, সিকিউরিটি ক্যামেরায় কিছু ধরা পড়েনি। এই মুহূর্তে পুলিস আশেপাশে খানা-তল্লাশি চালাচ্ছে।'

'সম্ভাব্য আরেকটা টার্গেটের কী খবর?'

'জেন ম্যাককেব? এখন পর্যন্ত কোন খবর নেই।'

গতি বাড়িয়ে দিল গ্রে। বুঝতে পারছে, প্রতি ক্ষণে পরিস্থিতি আরও বাজে হচ্ছে। কিন্তু কপাল খারাপ, লন্ডনে সকালের আগে পৌঁছাতে পারবে না।

এজন্যই পেইন্টার ধারে-কাছে থাকা দু'জন সিগমা অপারেটিভকে পাঠিয়ে দিয়েছে। এদের একজন ছিল লিপজিগ, জার্মানিতে, কনফারেন্স যোগ দিয়েছিল। অন্যজন মারাকাশে, মধ্যপ্রাচ্য থেকে চুরি করে আনা নিদর্শন বিক্রি নিয়ে তদন্তে ব্যস্ত।

অদ্ভুত এক জুটি দু'জনের। কিন্তু প্রয়োজন কী আর চাহিদা-যোগান মেনে আসে?

এয়ারফিল্ডটা নজরে পড়ল ওর। জুটির দুই সদস্যের চেহারার ভেসে উঠল ওর মানসপটে।

ওদের সামনে যে দাঁড়াবে, ঈশ্বর তার মঙ্গল করুক।

অবশ্য সেই মুহূর্ত আসার আগেই, ওদের পক্ষে একে-অন্যকে খুন করে ফেলা অসম্ভব না!

পাঁচ

৩০ মে, রাত ৯:২২ বি.এস.টি.
অ্যাশওয়েল, হার্টফোর্ডশায়ার, ইংল্যান্ড

নিশ্চয়ই এত বোকা না লোকটা

জো কোয়ালস্কির কব্জি আঁকড়ে ধরে, লোকটার বৃদ্ধাঙ্গুলির নিচে অবস্থিত স্নায়ুতে চাপ দিল সেইচান। চিৎকার করে জেন ম্যাককেবের হাত ছেড়ে দিল বিশালদেহী লোকটা।

আঁতকে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল যুবতী। সে পালাতে শুরু করার আগেই পথ আটকে দাঁড়াল সেইচান। দুই হাত উঁচু করে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল, 'মিস ম্যাককেব, আমি দুঃখিত। তোমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইনি।'

দুই আক্রমণকারীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল জেন। ওদের চারপাশে লোকের কমতি নেই, তবে কেউ ওর উপরে হওয়া আক্রমণটা লক্ষ করেছে বলে মনে হলো না। অবশ্য করার কথাও না, সবার মনোযোগ আগুনের দিকে।

সাইরেনের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে অন্ধকার গ্রাম জুড়ে। ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেল সেইচান। 'আমাদেরকে পেইন্টার ক্রো পাঠিয়েছেন...তোমাদেরকে নিরাপদ কোন স্থানে নিয়ে যাবার জন্য।'

এখনও কব্জি ডলছে জেন, সেইচানের কথায় কোন ভাবান্তর হয়নি ওর। এখনও চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে কোয়ালস্কির দিকে। লোকটাকে দেখে স্টেরয়েড নেয়া খেলোয়াড় বলে মনে হয়। ছয় ফুটের উপর লম্বা দেহটার কিলবিলে মাংসপেশী ঢাকতে ব্যর্থ হয়েছে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা চামড়ার ডাস্টার। তারচেয়ে ভয়াবহ দৃশ্যটা ফুটে আছে লোকটার মুখে, ক্ষত চিহ্ন দিয়ে ভর্তি! ভ্রু কুঁচকে আছে, মোটা ঠোঁট। ভয়াবহতা আরও বাড়িয়ে তুলেছে ভাঙা নাক আর চৌকানা চোয়াল।

এই মুহূর্তে অবশ্য ঘুম ঘুম চোখে তাকিয়ে আছে কোয়ালস্কি। 'আমিও দুঃখিত।' থাবার মতো হাতটা নাড়াল সে। 'দেখলাম, তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছ। আরেকজন তোমাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে।'

পেছন দিকে তাকাল জেন। 'ডেরেক

ডাক শুনে ভিড় ঠেলে যেন এগিয়ে এল একটা লম্বা দেহ। ভাঙা নাক থেকে ঝরছে রক্ত, চোখ ফুলতে শুরু করেছে। জেনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, মেয়েটাকে রক্ষা করার জন্য বদ্ধপরিকর।

ছেলেটাকে এগোতে দিল সেইচান। ডেরেক র‍্যাঙ্কিনকে চিনে ফেলেছে, আসার আগে ছবি দেখেছিল মিশন ব্রিফের সময়।

কোয়ালস্কির দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল ডেরেক, তবে এক নজর দেখে নিল মেয়েটাকে। 'ঠিক আছ?' জানতে চাইল সে।

মাথা দুলিয়ে সায় জানাল জেন।

সামনে এগিয়ে এল সেইচান। 'আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে।'

এতক্ষণে ওর দিকে নজর গেল প্রত্নতত্ত্ববিদের। থমকে গেল যেন ছেলেটা। একবার ওর দিকে আর আরেকবার কোয়ালস্কির দিকে তাকাল ডেরেক। 'তো .তোমরা কারা?'

উত্তর দিল জেন। 'এদেরকে নাকি ফোনে কথা বলা লোকটা পাঠিয়েছে!'

'দেখে যেমনই মনে হোক,' ওদেরকে নিশ্চিত করার প্রয়াস পেল সেইচান। 'আমরা সাহায্য করার জন্য এসেছি।'

প্রমাণ দেখাবার জন্য একটা ছবি বের করে আনল সে, পেইন্টার পাঠিয়েছে। ওটা সে এগিয়ে দিল জেনের দিকে। যুবতী মেয়েটা ছবি নিয়ে রাস্তার আলোর কাছে হেঁটে গেল, সঙ্গী হলো ডেরেকও। সাফিয়া আল-মায়াজের সাথে পেইন্টারের একটা ছবি। দু'জনেই হাসছে, বয়স কম দেখাচ্ছে তাদের।

'আমাদের বস ইনি,' ব্যাখ্যা করল সেইচান। 'ড. আল-মায়াজকে কয়েক বছর আগে সাহায্য করেছিলেন।'

চোখ তুলে তাকাল ডেরেক। 'এই লোকের ছবি আমি সাফিয়ার অফিসে দেখেছি। একবার তাদের দেখা হবার গল্প বলেছিল আমাকে, তবে আমার ধারণা- অনেক কাট-ছাঁট করেছে।' সন্দেহ দূর হতে শুরু করল ওর চেহারা থেকে।

'তাই বলে ওদেরকে বিশ্বাস করব?' ছেলেটার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল জেন।

ধোঁয়া আর আগুনের দিকে ফিরে তাকাল ডেরেক। 'আর কোন বিকল্পও তো নেই। তবে আগেই বলে নিচ্ছি,' এবার কোয়ালস্কির দিকে ওর নজর। 'এরপর থেকে হ্যালো বললেই চলবে।'

'যাই বলো,' বুকের উপর দুই হাত বেঁধে দাঁড়াল জেন, হাবভাবে ফুটে উঠেছে কাঠিন্য। 'আমি কিন্তু-'

আচমকা সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেইচান, জেনকে শুইয়ে দিল একপাশে। ঠিক সেই মুহূর্তেই সাইরেনের শব্দ ভেদ করে ভেসে এল গুলির আওয়াজ। ব্যাংককের রাস্তা এবং ফোনম পেনাহ-এ কাটানো দিনগুলো ওর ইন্দ্রিয়কে প্রখর করে তুলেছে। খুব কমই ওটা ভুল পথে পরিচালিত করে প্রাক্তন এই গিল্ড আততায়ীকে।

উঠে পড়তে চাইল জেন, কিন্তু বাধা দিল সেইচান। 'মাথা নিচু করে থাকো।' জ্যাকেটের নিচ থেকে বের করে এনেছে সিগ সয়্যার। ভাবী আততায়ীর অবস্থানের

দিকে অস্ত্রটা তাক করল সে। এদিকে গুলির আওয়াজে শোরগোল শুরু হয়েছে জনতার মাঝে। সেই সুযোগে আড়াল নিয়েছে আক্রমণকারী।

ডেরেককে নিজের দেহ দিয়ে সুরক্ষা দিচ্ছে কোয়ালস্কি। পরনের ডাস্টারের ভেতর থেকে বের করে এনেছে নিজের অস্ত্র। দেখে নাক কাটা শটগান মনে হলেও, ওটা আসলে একটা পিযার। হোমল্যান্ড সিকিউরিটির অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টের ডিযাইন করা নতুন অস্ত্র। বাকশট ভর্তি বারো গজ শেল না ছুঁড়ে, ওটা ছুঁড়ে দেয় পাইযোইলেক্ট্রিক ক্রিস্টাল। গুলি ছোঁড়া মাত্র খুলে যায় শেলটা, বর্ষিত হয় বিদ্যুতায়িত স্ফটিক। পঞ্চাশ গজ রেঞ্জ ওটার; মানুষ হত্যা করা না গেলেও, যেকোন একটা স্ফটিক সাধারণ আকৃতির মানুষকে নড়া-চড়ায় অক্ষম করার জন্য যথেষ্ট।

আশ্চর্যের কথা, বন্দুক প্রিয় লোকটা কিনা একটা গুলিও ছোঁড়েনি!

ভালো হয়েছে .ভিড়ের উন্মাদনা আর উস্কে দিতে চাচ্ছি না। অন্তত এখনই না।

জেনকে সরিয়ে নিতে লাগল সেইচান, যোগ দিল কোয়ালস্কি আর ডেরেকের সাথে। ভিড়ের মাঝে আরও অস্ত্রধারী থাকতে পারে, তাই সতর্কতা কমাল না। আফসোসের কথা হলো, প্রতি মুহূর্তে বাহনের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যেতে হচ্ছে ওদের। কয়েক মিনিট আগে মোটরসাইকেল পার্ক করে দ্য বুশেল অ্যান্ড স্ট্রাইক পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছে ওদের।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল ডেরেক।

'নিরাপদ কোথাও,' চারদিকে নজর বুলাল সেইচান। 'এখানে একেবারে অরক্ষিত হয়ে আছি।'

পাথুরে একটা পুরাতন চার্চের দিকে ইঙ্গিত করল জেন, ওটার সামনে পাথরের নির্মিত একটা বেড়া। এখান থেকে প্রাঙ্গণে ঝুলতে থাকা কিছু সাদা রোবও দেখা যাচ্ছে। 'আজ রাতে কোরাল ইভেনসং হবে!'

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল সেইচান, বোঝেনি কিছুই।

'এর মানে,' ব্যাখ্যা করল ডেরেক। 'জায়গাটা লোকজনে ভর্তি হয়ে যাবার কথা।'

চলবে

সেদিকেই এগিয়ে গেল সেইচান, অস্ত্রটা জ্যাকেটের আড়ালে ঢেকে রেখেছে। 'পেছন দিয়ে বেরোবার কোন পথ আছে?' জানতে চাইল সে।

'উত্তর দিক দিয়ে বেরোন যায়।' জানাল জেন। 'চার্চের পেছনে কবরস্থান আছে, ওদিকে যাওয়া সম্ভব।'

'রাতের বেলা কবরস্থানে!' ঘোঁত করে উঠল কোয়ালস্কি। 'কবর দেখিয়ে দিক, শুয়ে পড়ি! শুধু শুধু মানুষ-জনকে কষ্ট দেয়ার কী দরকার?'

লোকটাকে পাত্তা দিল না সেইচান, বেড়ার গেট দিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়ল। 'তারপর?'

'পরের এলাকাটুকুকে পার্কই বলা যায়। কয়েকটা ঝর্ণাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে।' উত্তর দিল জেন। 'তবে ওগুলোর পর জলাভূমি, সেখান থেকে প্রায় পৌনে এক মাইল পর স্টেশন রোড। ওই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলে গাড়ি পেতে সমস্যা হবে না।'

মাথা দোলাল সেইচান।

খারাপ না পরিকল্পনাটা।

ঘড়ি দেখল ডেরেক। 'এক ঘণ্টা মতো সময় আছে হাতে। এরপর আর লন্ডনে যাবার ট্রেন ধরা যাবে না।'

নাহ, একেবারেই মন্দ না পরিকল্পনাটা!

গতি বাড়িয়ে দিল সেইচান। 'তাহলে চলো, ট্রেনটা ধরা যাক।'

চার্চে আসলেই ভিড় করেছে অনেকে। একই সাথে উত্তেজনা আর দুশ্চিন্তা নিয়ে কিচিরমিচির করছে তারা। চার্চের ভেতর থেকে ভেসে আসছে অর্গানের আওয়াজ। সমবেত জনতার চিন্তা হচ্ছে, আজ রাতে অনুষ্ঠান হবে কি হবে না। ফায়ার ট্রাকের সাইরেন ছাপিয়ে সমবেত সঙ্গীত শোনাটা কষ্টকরই হয়ে দাঁড়াবে।

ভেতরে পা রাখা অভ্যন্তরীণ ডিযাইন দেখে নিল সেইচান। বাঁ দিকে টাওয়ারে ওঠার খিলান দেয়া সিঁড়ি, ডান দিকে একটু এগোলেই বড়সড় একটা প্রার্থনার বেদি। মোমের আলোয় যীশু খ্রিষ্টকে এখান থেকেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মানুষের মেলা বসেছে যেন, একে-অন্যের সাথে আলাপচারিতায় মত্ত তারা।

বিপদের আশঙ্কা কম বুঝতে পেরে, লক্ষ্যের দিকে নজর দিল সেইচান। চার্চের অন্য মাথায় দেখতে পেল খোলা দরজা। তার ওপাশেই রাতের অন্ধকার।

ওটা নিশ্চয়ই উত্তরের দরজা।

সেদিকেই ইঙ্গিত করল জেন। 'ওই যে।'

হাঁটতে শুরু করল সেইচান, কিন্তু হট্টগোলের আওয়াজ ওর নজর সরিয়ে দিল অন্য দিকে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ভিড়ের ভেতর থেকে রাগান্বিত প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে। পরক্ষণেই তা ঢেকে গেল ইঞ্জিনের কর্কশ চিৎকারে। সাথে সাথে দুই পাশে ভাগ হয়ে গেল সেইচানের দলটা।

ভাগ্যিস হয়েছিল। কেননা খোলা দরজা দিয়ে ঠিক সেই মুহূর্তেই দুইজনকে পিঠে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল একটা মোটরসাইকেল! আরোহীর হাতে পিস্তল, সামনে ঝুঁকে থাকা ড্রাইভারের কাঁধের উপর রেখে ওদের দিকেই তাক করে আছে।

বাধ্য হয়েই ঘোরানো সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করল সেইচান। 'কোয়ালস্কি, সবাইকে নিয়ে উপরে উঠে যাও।'

সায় দিয়ে কাজে নেমে পড়ল বিশালদেহী লোকটা। তবে এক মুহূর্তের জন্য পিছু ফিরে বলল, 'আর তুমি?'

কোন জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সেইচান। একদম কাছের বেঞ্চ লক্ষ্য করে লাফ দিল সে। ওটাকে পা দিয়ে উলটে দিয়েই আশ্রয় নিল পেছনে। পুরু কাঠের আড়াল পাওয়া মাত্র হাতের সিগটা তাক করল মোটরসাইকেলের দিকে। ইঞ্জিনের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চারপাশে। আচমকা ব্রেক কষল চালক, পাথুরে মেঝেতে দেখা গেল ফুলকি।

সিঁড়ির দিকে অস্ত্র তাক করল আরোহী।

কোয়ালস্কি নিশ্চয়ই ধরা পড়ে গিয়েছে!

বাইকের পেছন থেকে নেমে পড়ল অস্ত্রধারী, নিশ্চয়ই পাকড়াও করতে চায় শিকারকে। হেলমেটের ঠিক নিচে তাক করেই গুলি ছুঁড়ল সেইচান। অস্ত্রের হুঙ্কারে ঢাকা পড়ে গেল ইঞ্জিনের চিৎকার। কেঁপে উঠল অস্ত্রধারী, গলা থেকে রক্ত ঝরছে সমানে। মেঝের উপর আছড়ে পড়ল সে।

অস্ত্রটা চালকের দিকে ঘোরাবার আগেই, লোকটা ঘুরে বসল। পায়ের কাছে থাকা হোলস্টার থেকে একটা অ্যাসল্ট রাইফেল বের করে ইচ্ছামত গুলি ছুঁড়ল সেইচানের উদ্দেশ্যে। আড়াল নেবার জন্য সেকেন্ডের ভগ্নাংশটুকু পেল কেবল মেয়েটা।

পুরু কাঠের বেঞ্চে এসে ঠক ঠক করে লাগতে শুরু করল গুলি। আড়াল থেকে সেইচান দেখতে পেল, চালক লোকটা বাইক থেকে নেমে ওটার আড়ালেই আশ্রয় নিয়েছে।

লোকটার পা তাক করে গুলি ছুঁড়ল সেইচান। কিন্তু কেউ কি আর গুলি খাওয়ার জন্য বসে থাকে? বাইকের আড়ালেই সে এগিয়ে চলছে সিঁড়ির দিকে। গালি দিয়ে উঠল সেইচান, তবে সেই সাথে লোকটার দক্ষতার প্রশংসা না করেও পারল না।

চাপের মুখে ভালোই খেল দেখাচ্ছে, এ নবীশ হতেই পারে না।

সঙ্গীদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল সেইচান, ছুটে গেল টাওয়ারের দিকে। অস্ত্রের তাক কিন্তু সরায়নি। তবে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার আগেই, নতুন করে শুরু হলো হট্টগোল।

অনেকগুলো ইঞ্জিনের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, আস্তে আস্তে বেড়েই চলছে তা।

আওয়াজের উৎসের দিকে চলে গেল ওর নজর। পোর্চের ওদিক থেকে অন্ধকার অনেকগুলো অবয়ব এদিকেই ছুটে আসছে।

এসে গিয়েছে ব্যাক-আপ .তবে বিপক্ষের!

অনেক কাজ করতে হবে ওকে এখন, তারপরও এক মুহূর্তের জন্য টাওয়ারের দিকে তাকাল সেইচান। আততায়ী হারিয়ে গিয়েছে ভেতরে, ধাওয়া করছে কোয়ালস্কিদের, নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য পূরণ না করে থামবে না। অথচ ওদেরকে সাহায্য

করার জন্য কিছুই করার নেই সেইচানের। এদিকটা পরিষ্কার রাখতে হবে ওকে, নইলে পালাবার আর কোন আশা থাকবে না।

লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করে নিল ও নিজেকে, তবে তার আগে মনে মনে সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে একটা কথা বলে নিল:

কোয়ালস্কি, গাধামি করো না।

রাত ৯:৪৪

টাওয়ারের বাঁকানো সিঁড়ির দেয়াল ধরে উঠে যাচ্ছে জেন। গুলির আওয়াজে কেঁপে উঠছিল ওর অন্তরাত্মা, এখন এই নিরেট পাথর পেয়ে যেন আস্তে আস্তে ফিরে পাচ্ছে নিজেকে। স্থানীয়ভাবে উত্তোলন করা চুনাপাথর দিয়ে বানানো হয়েছে টাওয়ারটা। শত শত বছর হলো ঝড়-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার কাছেই যেন শক্তি চেয়ে নিচ্ছে মেয়েটা।

আঙুলের ছোঁয়ায় টের পাচ্ছে মধ্যযুগে খোদাই করা লেখাগুলোও। এসবের লেখকরা মহামারী, যুদ্ধ আর মঙ্গার সামনে মাথা নত করেনি।

আমাকেও তেমন শক্ত হতে হবে।

পিতার কথা মনে হতেই শক্ত হয়ে গেল জেনের দেহ। শুধু তার জন্যই নয়, রোরিও জন্যও শক্ত হতে হবে ওকে।

যদি রোরির বেঁচে থাকার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে খোঁজ করব আমি।

চলার গতি বাড়িয়ে দিল জেন ম্যাককেব।

ডেরেক চলছে সামনে সামনে, আর জেনের পেছনে রয়েছে কোয়ালস্কি নামধারী বিশালদেহী লোকটা। 'এই জিনিস আর কত দূর?' জানতে চাইল সে।

'একেবারে বেলফ্রাই, মানে ঘণ্টা রাখার জায়গা পর্যন্ত।' উত্তর দিল জেন। বলেই উপরের দিকে তাকাল মেয়েটা। গ্রাম্য জীবনের সাথে ঘণ্টা ধ্বনি বলতে গেলে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। প্রায় এক শতাব্দী ধরে পনেরো মিনিট পর-পর বাজানো হয় ওটা। কিন্তু এখন অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাতের বেলা ঘণ্টার শব্দ যেন কম হয়, সেই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

তুলনামূলক অনেক আধুনিক এবং নতুন একটা শব্দ নিচ থেকে ভেসে এল। বেশ কয়েকটা ইঞ্জিনের গুঞ্জন কানে শুনতে পেল ওরা। মনে হচ্ছে যেন দানবেরা ধেয়ে আসছে সিঁড়ি ধরে। মাথা বাঁকিয়ে নিচের দিকে তাকাল আমেরিকান লোকটা, সহকর্মীর জন্য দুশ্চিন্তায় বিকৃত হয়ে আছে মুখ।

'কী করব আমরা?' জানতে চাইল ডেরেক।

অস্ত্র দুলিয়ে সামনের দিকে ইঙ্গিত করল কোয়ালস্কি। 'যেতে থাকো, একেবারে উপর পর্যন্ত। আমরা ওখানেই আশ্রয় নেব। ঝামেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের নিরাপদেই-'

গুলির আওয়াজ ভেসে এল ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে।

মুখ কুঁচকে ধপ করে মাথা নিচু করে ফেলল কোয়ালস্কি, ওর মাথার কাছেই এসে আঘাত হানল একটা বুলেট। 'দৌড়াও!' চিৎকার করে উঠল লোকটা।

ডেরেককে সাথে নিয়ে নির্দেশ পালন করল জেন। এদিকে অন্ধের মতো পেছন দিকে গুলি ছুঁড়ছে কোয়ালস্কি। বাকশটটা ছড়িয়ে গেল চারপাশে, দেয়ালের সাথে বাড়ি খেয়ে তৈরি করল নীলচে আলোর বন্যা।

চমকে গিয়ে আরেকটু হলেই পিছলে পড়েছিল জেন। ওকে আঁকড়ে ধরল ডেরেক। 'ধরেছি তোমায়, জেন।'

'ওটা কী-'

'আমি জানি না, জানার ইচ্ছাও নেই। আপাতত চলো, এগোন যাক।'

ওর হাত ধরে উপরে উঠতে শুরু করল ছেলেটা। চিন্তিত মুখভাব জানান দিচ্ছে, এই মুহূর্তে ডেরেকের চিন্তা কেবল একজনকে নিয়েই। নিজের জীবন নিয়ে ভয় পাচ্ছে না সে, পাচ্ছে জেনের জীবনকে নিয়ে।

ওকে নিশ্চিত করার জন্যই যেন ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল জেন।

কাছেই, নিচ থেকে ভেসে আসতে থাকা ইঞ্জিনের আওয়াজ থমকে গেল আচমকা। এখন শব্দ বলতে কেবল ওদের দলটার হাঁপানোর আওয়াজ। নিচের দিকে নজর চলে গেল জেনের।

শব্দের এই আচমকা অনুপস্থিতি কি ভালো? নাকি মন্দ?

রাত ৯:৫০

চুরি করা মোটর সাইকেলটায় নিচু হয়ে ঘাসের উপর দিয়ে ছুটছে সেইচান। হেডল্যাম্পের আলো নেভানো, ওর পেছনে ছুটন্ত মোটর সাইকেলগুলোর অবস্থাও একই।

কিছুক্ষণ আগের কথা, শত্রুপক্ষের বাইকগুলো চার্চের দক্ষিণ দিয়ে যাচ্ছিল। সুযোগ বুঝে গুলি করে ফেলে দেয়া আরোহীর হেলমেটটা মাথায় চাপিয়েছিল সেইচান। তারপর ফেলে যাওয়া বাইকটায় চেপে বসে, ছুট লাগিয়েছে উত্তরের দরজার দিকে। খোলা দরজা ধরে বেরিয়ে যাবার শেষ মুহূর্তে বাইকটাকে বাঁকিয়ে নিল ও, দেখতে পেল-তিনটা মোটর সাইকেল চার্চের ভেতরে প্রবেশ করছে।

আধো ছায়া-আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল সেইচান, ঘোঁত করে দৃষ্টি আকর্ষণ করল নিজের দিকে। হেলমেট পরে আছে বলে ওর কণ্ঠ সহজে বুঝতে পারার কথা না। শত্রুপক্ষ এখন ইংরেজি জানলেই হয়।

'এদিকে!' চিৎকার করল সে। 'ওরা এদিকে গিয়েছে!'

পরমুহূর্তেই বাইক ঘুরিয়ে সোজা চালিয়ে দিল সে।

চার্চের পেছনের অন্ধকার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকাল সেইচান, পেছনের ওরা ঠিকঠাক মতোই আসছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও।

তিনটা বাইক, হেডল্যাম্প বন্ধ করে ছুটছে, ছড়িয়ে গিয়েছে ঘাসের উপর।

ওদের পেছনে, চার্চের ছাদেরও ওপারে, আগুনের আলো দেখা যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত কারও নজর গোলাগুলি আর হট্টগোলের উপর পড়েছে বলে মনে হয় না।

সেটাই ভালো

বেসামরিক লোক সামনে পড়লে সমস্যা সেইচানের-ই। হাতের কাজের দিকে মনোযোগ দিল সে। সামনেই একটা নিচু, ঘাসে ঢাকা টিলা। ওটার সামনে থাকা লনটা দুইশো গজ সামনে গিয়ে মিশেছে গাছের একটা কালো সারিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেইচানের, সামনের রাস্তাটুকু ছোট ছোট পাথর আর কবর দিয়ে ভর্তি।

জেনের বর্ণনা দেয়া কবরস্থানে এসে পৌঁছেছে ওরা।

গতি না কমিয়েই করবস্থানের দিকে মোটর সাইকেল ছোটাল সেইচান। অন্ধকারে যাওয়াটা কষ্টকর হবে, কিন্তু উপায় কী? চেষ্টা করল প্রতিবন্ধকতা এড়াবার। সবগুলো না পারলেও, এগিয়ে যেতে অসুবিধা হলো না তেমন।

রিয়ার ভিউ মিররের দিকে সুযোগ বুঝে তাকাল মেয়েটা; অন্যদের বিশ্বাস- এখনও শিকারের পেছনেই আছে তারা। তাই ছুটছে ওকে অনুসরণ করেই। কবরস্থানে ওদের ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর ব্রেক কষে ঘুরিয়ে ফেলল হ্যান্ডেলবার। শত্রুর দিকে মুখ করে দাঁড় করালো বাইক।

বৃদ্ধাঙ্গুলির এক খোঁচায় জ্বালিয়ে দিল বাইকের হেডলাইট। চোখ ধাঁধানো আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল চারপাশ। অনুসরণরত বাইকের চালকরা উজ্জ্বল আলোয় অপ্রস্তুত হয়ে গেল, মার্বেলের প্রতিবন্ধকগুলো এড়াতে পারল না।

কবরের ভেতর আছড়ে পড়ল একটা বাইক, আরোহী ছিটকে গেল দেয়ালের উপর। ঘাড়টা অদ্ভুত ভঙ্গিতে বেঁকে আছে, যেখানে পড়ল ওখানেই রইল দেহটা।

আরেকজন আছড়ে পড়ল কবর-ফলকের উপরে, চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। মোটর বাইকের উপর থেকে নিজেকে সরিয়ে, গড়ান দিল ঘাসে। দেহটা থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সেইচান, তারপর একটা গুলি ছুঁড়ে তার নড়া-চড়া বন্ধ করে দিল চিরতরে।

তৃতীয় চালক অবশ্য তার দক্ষতা দেখাল যথার্থভাবে। আলোর পথ থেকে সরে লম্বা বাঁক ঘুরে ছুটে এল সেইচানের দিকে।

শত্রুর দিকে গুলি ছুঁড়ল সেইচান। কিন্তু মোটর বাইকটা এঁকেবেঁকে ছুটছে বলে লাগাতে পারল না। গাল দিয়ে উঠে বাইক ঘোরাল মেয়েটা, অনুসরণ করল ধাবমান আক্রমণকারীকে। কিছুক্ষণের মাঝেই নিজেকে সামলে নিয়ে আক্রমণ করবে চালক-এই ভয়ে সেইচান নিজেই আক্রমণ করে বসল।

কবরস্থান নিরাপদেই পার হয়ে গেল তৃতীয় চালক। সামনে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে সিটের উপর ঘুরে বসল সে। পরক্ষণেই অস্ত্র তুলে খালি করে ফেলল সেইচানের বাইক লক্ষ্য করে।

চালককে ঘুরতে দেখেই সাবধান হয়ে গিয়েছিল সেইচান, মাথা নিচু করে উইন্ডশীল্ডের আড়ালে চলে গেল সে। ওর দুই দিকের মাটিতে মাথা কুটল একের পর এক গুলি, একটা তো সামনের ভেন্ডারে বাড়ি খেয়ে সরে গেল দূরে। গতি বাড়িয়ে সে-ও এঁকেবেঁকে ছুটতে শুরু করল, প্রতিপক্ষের জন্য লক্ষ্যস্থির করাটাকে কঠিন করে তুলতে চায়। কিন্তু ভাগ্য সঙ্গ দিল না ওকে, আচমকা একটা বুলেট ছুটে এসে টুকরো টুকরো করে ফেলল হেডল্যাম্প। অন্ধকার নেমে এল সাথে সাথে, কিছুক্ষণের জন্য কিছু দেখতে পেল না সেইচান।

বাধ্য হয়েই গতি কমাল সে, কিন্তু দেরী হয়ে গিয়েছে তা-ও।

ওর সামনে আচমকা যেন বিস্ফোরিত হলো একটা সুপারনোভা! হারিয়ে গেল পৃথিবী, ডুবে গেল সাদা আলোয়। কী হয়েছে তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে সেইচান। ওর ইটই পাটকেল বানিয়ে ছুঁড়ে মারা হয়েছে।

ওকে বিভ্রান্ত করে পাওয়া এই সময়টুকুকে কাজে লাগাবে শত্রুপক্ষ-এই ভয়ে গতি বাড়িয়ে উজ্জ্বলতার দিকে যেন ঝাঁপ দিল মেয়েটি। অস্ত্রটা বের করে এনে গুলি ছুঁড়ল উৎস তাক করে। কাজ হলো প্রথম গুলিতেই, চোখ শান্ত করা অন্ধকার নেমে এল চারপাশে। কিন্তু আফসোসের কথা, মোটর সাইকেলের উপর নেই কোন আরোহী। সে তখন একটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে আছে, মাত্র কয়েকগজ দূরে।

মুখোমুখি সংঘর্ষ নিশ্চিত টের পেয়ে, বাইক মাটিতে নামিয়ে দিল সেইচান। যন্ত্রটার টায়ার ছুটে গেল প্রতিপক্ষের বাইকের দিকে। একেবারে শেষ মুহূর্তে সরে গেল সেইচান। কালক্ষেপণ না করে জড়তাটুকু কাজে লাগিয়ে উঠে দাঁড়াল, পরক্ষণেই আবার ঝাঁপ দিল পাশের বনের ভেতর।

একটা অ্যাশ গাছের সাথে পিঠ ঠেকাবার পর শান্ত হলো সেইচান।

শত্রু কোথায়?

যেকোন আওয়াজের জন্য কান পেতে রইল মেয়েটাঃ পাতার ঘষঘষানি, ডাল ভাঙার আওয়াজ। থেকে থেকে পানির ছলকাবার আওয়াজ ভেসে আসছে। জেনের কথা মনে পড়ে গেল ওর, আশপাশেই কোথাও আছে ঝর্ণা।

সেদিক থেকেই ভেসে এল একটা উচ্চ আওয়াজ, তারপর আরেকটা।

শত্রু নিশ্চয়ই পালাবার চেষ্টা করছে।

আওয়াজের দিকে এগিয়ে গেল সেইচান। প্রতিপক্ষ নতুন করে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে কিনা, তা জানে না। হয়তো আরেকটা অ্যাম্বুশের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। তাই সতর্কতার সাথে এগোল সে, ধরে নিয়েছে যে আওয়াজটা ওর নজর সরাবার জন্যও করা হলেও হতে পারে। আবার ফাঁদে ফেলার জন্যও হতে পারে।

অন্ধকার সয়ে আসছে মেয়েটার চোখে, তাই একটা নুড়ি বিছানো পথ দেখতে পেল। সম্ভবত ঝর্ণার দিকে এগিয়ে গিয়েছে ওটা। আচমকা সামনে, গাছের ভেতর থেকে, কিছু একটার ঝলক দেখা গেল। আরও কয়েকগজ এগোবার পর টের পেল, পানির ধারে এসে পড়েছে। ওটার কালো তলে প্রতিফলিত হচ্ছে চাঁদ-তারার আলো। পুকুরটার আকার কম করে হলেও একটা ফুটবল মাঠের সমান হবে। ধারে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ কয়েকটা বেঞ্চ।

আচমকা একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল ওর চোখে।

ছায়াময় একটা অবয়ব দৌড়ে যাচ্ছে পানির উপর দিয়ে, ছোট-খাটো কোন ঢেউ পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে না পানিতে।

কীভাবে সম্ভব?

আরও ভালোভাবে নজর দিল সেইচান। সারি বাঁধা ধাপ দেখতে পেল ও, পানির তলের প্রায় সমতলেই আছে। ধার ধরে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত গিয়েছে পুকুরটার, সম্ভবত দর্শনার্থীদের পার হবার উপায় হিসেবে বানানো হয়েছে।

কাছেই, পানিতে ভাসছে একটা হেলমেট। শত্রু নিশ্চয়ই পার হবার সময় পাশে ফেলে দিয়েছিল ওটা।

অস্ত্র তুলে ধরল সেইচান, কিন্তু এতক্ষণে প্রায় পার হয়ে গিয়েছে অবয়বটা। অন্ধকার বনের আড়ালে হারিয়ে গেল সে, তবে একেবারে শেষ মুহূর্তে পিছু ফিরে তাকাল। পুকুরের পানিতে প্রতিফলিত চাঁদের আলোতে শত্রুর দেহ-মুখ সেইচান দেখতে পেল পরিষ্কারভাবেই!

অবাক হয়ে থমকে গেল সে।

শত্রু আসলে কমবয়সী এক মেয়ে, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলগুলো বরফকেও লজ্জা দেবার মতো সাদা। দূর থেকেও পরিষ্কার দেখতে পেল সেইচান-মেয়েটার অর্ধেকটা চেহারা ট্যাটুর আড়ালে হারিয়ে গিয়েছে প্রায়। তারপরই ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল সে।

একবার ভাবল প্রাক্তন গিল্ড আততায়ী, পিছু নেবে কিনা। কিন্তু ঝুঁকি বেশি হয়ে যায়।

কানে আসা নতুন একটা আওয়াজ ওর হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল।

চার্চের টাওয়ার থেকে ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে আসছে, ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। এই আওয়াজের মাঝে নেই কোন সুর, কোন তান। আছে শুধু সতর্কধ্বনি।

সেদিকে তাকাল মেয়েটা। কানের উপর সংঘটিত এই অত্যাচারের হোতা কে তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে।

কোয়ালস্কি

রাত ১০:০৪

'তাড়াতাড়ি!' তাড়া দিচ্ছে বিশালদেহী আমেরিকান।

টাওয়ারে ওঠার সিঁড়ির একদম উপরে বসে আছে কোয়ালস্কি, থেকে থেকে নিচের দিকে ছুঁড়ছে ওর বিচিত্র শটগানের গুলি।

রিলোড করতে করতে গম্ভীর মুখে ডেরেকের দিকে তাকাল ও, হাত তুলে দেখাল দুটো আঙুল।

আর মাত্র দুই বার গুলি করতে পারবে।

পরিস্থিতির দাবী বুঝতে পেরে, ডেরেক সর্বশক্তিতে ঘণ্টাটাকে মেঝে দিয়ে গড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস পেল। উৎকণ্ঠায় দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর, অবশ্য দম বন্ধ হবার পেছনে চারশো পাউন্ডের বেশি ওজনের এই ঘণ্টাটাকে ঠেলাও দায়ী হতে পারে।

মাত্র কয়েক মিনিট আগেই বেলফ্রাই-এ এসে উপস্থিত হয়েছে ওদের দলটা। উপরের তলার পুরোটাই এই বেলফ্রাই। সেই তলার অধিকাংশ জায়গা দখল করে নিয়েছে একটা বিশাল কাঠ-নির্মিত ঘণ্টা রাখার ফ্রেম। ওতে চার্চের ছয়টা ঘণ্টা স্থান পেয়েছে, সবচেয়ে বয়স্কটা বানানো হয়েছিল সেই সতেরো শতাব্দীতে। নানা আকারের ঘণ্টাগুলোর প্রত্যেকটার সাথে ঝুলছে দড়ি।

কোয়ালস্কি গুলি ছুঁড়ে ব্যস্ত রেখেছে আক্রমণকারীকে। সেই সুযোগে জেনের সাথে মিলে ও একটা ঘণ্টা মুক্ত করার কাজে ব্যস্ত ছিল।

নির্দেশটা কোয়ালস্কিরই; কেন করতে হবে সেই ব্যাখ্যা দিয়েছে মাত্র একটা বাক্যে।

আমার একটা পরিকল্পনা আছে।

তাই ডেরেক খুঁজে বের করেছে একটা মই, আর জেন বের করে এনেছে টুলবক্স। কষ্টে-সৃষ্টে, ভাঙা নাকের ব্যথা আর রক্তক্ষরণ অগ্রাহ্য করে, একটা ছোট

ঘণ্টা খুলে ফেলেছে ডেরেক। তারপর দুইজনে মিলে সেটাকে এখন ঠেলে আনছে আমেরিকানের দিকে।

সিঁড়ির নিচ থেকে আরেকটা গুলির আওয়াজ ভেসে এল, প্রত্যুত্তর দিল কোয়ালস্কি।

আর একটা মাত্র গুলি বাকি আছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ওদের সাথে যোগ দিল কোয়ালস্কি। একসাথে ঘণ্টাটাকে ঠেলে তারা নিয়ে এল সিঁড়ির একেবারে উপরের ধাপের কাছে।

পরিকল্পনাটা বুঝতে আর বাকি রইল না।

'পালাবার সময় হয়েছে!' ডেরেকের দিকে তাকিয়ে বলল কোয়ালস্কি।

একসাথে তিনজনে ঠেলা দিল ঘণ্টাটাকে, সিঁড়ির ধাপে বাড়ি খেতে খেতে নিচে নামতে লাগল ওটা। সেই সাথে জন্ম দিল কান ফাটানো আওয়াজের।

ইঙ্গিতে ঘণ্টাটা দেখাল কোয়ালস্কি। 'যাও!'

সবার সামনে ছুটতে শুরু করল বিশালদেহী, তার পিছু জেন আর সবার শেষে ডেরেক। তবে ছোটা শুরু করার আগে মেঝেতে পড়ে থাকা চামড়ার ব্যাগটা নিতে ভুলল না। বুঝতে পারছে যে ঘণ্টাটা হয়তো সিঁড়ি থেকে হটিয়ে দেবে আক্রমণকারীকে, কিন্তু শয়তানটা তো চার্চের ভেতরেও অপেক্ষা করতে পারে!

কোয়ালস্কির পরিকল্পনা কিন্তু আলাদা...

ঘণ্টার আওয়াজ অনুসরণ করে নামছে ওরা। ডেরেকের চোখে অনেকটা নিচে, ছুটন্ত একটা অবয়ব ধরা পড়ল। ব্যাপারটা কোয়ালস্কির নজর এড়ায়নি। অবশিষ্ট গুলিটা ছুঁড়ে দিল ও। অনেকগুলোই ব্যর্থ হলো, তবে কয়েকটা গিয়ে আছড়ে পড়ল আততায়ীর পিঠে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল লোকটা।

আরেকটা বাঁক ঘুরতেই, চোখের সামনে এসে যেন উপস্থিত হলো আক্রমণকারী। বেচারা জ্ঞান হারায়নি বটে, তবে নড়তে চড়তে অক্ষম প্রায়। অনেক কষ্টে মাথা ঘুরিয়ে উপর দিকে তাকাল সে। দেখতে পেল, চারশো পাউন্ড ওজনের একটা তামার বস্তু পাথরের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে নেমে আসছে নিচে।

ওটাই ছিল তার দেখা শেষ দৃশ্য।

যেন কিছুই হয়নি, এমনভাবে নিচের দিকে ছুটে চলল ঘণ্টাটা।

'দেখো না,' জেনকে সাবধান করে দিল যুবক।

কোয়ালস্কি অবশ্য থামল, আততায়ীর রাইফেলটা নিয়ে বলল, 'যেতে থাকো!'

লোকটার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পেল ডেরেক। নিচে কী দেখতে পাবে, সেই ভয়ে আছে বিশালদেহী। একেবারে শেষ পর্যন্ত ঘণ্টাটাকে অনুসরণ করে গেল ওরা। নিচে নেমেও থামল না ওটার দৌরাত্ম্য। কয়েকটা বেঞ্চ ধ্বংস করে তারপর থামল।

টাওয়ারের ভেতরেই দাঁড়িয়ে রইল ওদের দলটা। ডেরেক আর জেনকে পেছনে টেনে রাখল কোয়ালস্কি, বিপদের আশঙ্কায় নজর বুলালো চার্চের ভেতরে। দেখতে পেল, ভীত একদল লোক আশ্রয় নিয়েছে অর্গানের পেছনে।

দূর থেকে ভেসে আসছে সাইরেনের আওয়াজ। দক্ষিণ থেকে ভেসে আসা ধোঁয়া প্রবেশ করছে খোলা দরজা দিকে। সেদিকে তাকাল ডেরেক। আগুন নিশ্চয়ই ছড়িয়ে পড়ছে।

তীক্ষ্ণ একটা শীষ ওদের মনোযোগ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল। উত্তরের পোর্চ থেকে একটা অবয়ব ছায়ার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

কোয়ালস্কির সহযোগী মেয়েটা

'অনেক ঝামেলা তো করলে,' বলল সে। 'এবার চলো, পালানো যাক।'

সামনে এগিয়ে গেল জেন। 'এরচেয়ে সুমধুর বাক্য সারাদিনে আর শুনিনি।'

ছয়
৩১ মে, সকাল ৭:২২ বি.এস.টি.
মিল হিল, ইংল্যান্ড

কেউ একজন সব প্রমাণ লোপাট করে দিতে চাইছে!

সামনে পুলিশের বাঁধা, মুখ বিকৃত করে আগুনে জ্বলতে থাকা মেডিকেল ল্যাবের দিকে তাকিয়ে আছে গ্রে। ব্রিটিশ ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল রিসার্চ-এর একটি অংশ দ্য ফ্রান্সিস ক্রিক ইন্সটিটিউট। লন্ডনের একেবারে শেষ মাথায়, মিল হিলে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠান। স্থাপনাটির ঠিক মাঝখান দিয়ে একটি ইটের ভবন উঠে গিয়েছে উপরে, সাথে চারটি সুবিশাল অংশ ডানার মতো ছড়িয়ে আছে চারপাশে। উত্তর-পশ্চিম দিকের জানালা থেকে গলগল করে বের হচ্ছে কালো ধোঁয়া, দমকল বাহিনী প্রাণপণে চেষ্টা করছে আগুন নেভাতে, যন্ত্র দিয়ে পানি ছিটিয়ে চলেছে অনবরত।

ব্রিটিশ এয়ার বেসে জেট বিমান থামতেই পেইন্টারের সতর্কবাণী পেয়েছে গ্রে এবং মঙ্ক। সরাসরি মিল হিলে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দু'জনকে। একজনের সাথে দেখা করতে বলা হয়েছে ওদের, যে কিনা সাহায্যে আসতে পারে।

ত্রিশ মিনিট ধরে অপেক্ষা করছে ওরা। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বেড়েই চলেছে গ্রে-র বিরক্তি। এগিয়ে যেতে চায় সে, এই বিস্ফোরণের মূল হোতাকে খুঁজে বের করতে চায়, সেই সাথে অ্যাশওয়েলে হামলাকারী দলটাকেও। জেন ম্যাককেবের উপর হওয়া হামলার কথা জেনেছে সে, শুনেছে-সেই হামলা প্রতিহত করেছে সেইচান এবং কোয়ালস্কি। লন্ডনের একটি সাধারণ হোটেলে আশ্রয় নিয়েছে পুরো দল, ওদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে গ্রে।

রেডিয়ো ইয়ারপিস থেকে নিজের প্রস্থেটিক হাত সরাল মঙ্ক।

'কী খবর?' জিজ্ঞাসা করল গ্রে।

'খবর খুব একটা সুবিধার না; যা ভয়, পেয়েছিলাম তাই হয়েছে। ক্যাট নিশ্চিত করেছে যে,' ধোঁয়ার দিকে ইশারা করল মঙ্ক, 'দেহ, নমুনা .সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।'

মাথা নাড়ল গ্রে, প্রফেসর ম্যাককেবের দেহ সংরক্ষিত হয়েছিল ওখানকার বায়োহ্যাযার্ড ল্যাবে। মমিকৃত দেহটা থেকে রোগের জীবাণুকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছিল কর্মকর্তারা।

ভ্রূকুটি করল মঙ্ক, 'কিন্তু এক বুড়োর দেহটাকে পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য এতকিছু? অনেকের শরীরেই তো আছে জীবাণুটা! ক্যাটের কথামতে, অনেক রোগী মৃত্যু বরণও করেছে।'

ভোরের আকাশে ছেয়ে থাকা ধোঁয়ার দিকে তাকাল গ্রে, 'জীবাণু ধ্বংসের জন্য ওসব করেনি শত্রু, সূত্র ধ্বংস করার জন্য করতে বাধ্য হয়েছে।'

'মানে?'

'রোগের স্বরূপ সন্ধান ছাড়াও আরেকটা কাজ চলছিল ওখানে। ম্যাককেবের পাকস্থলীর উপাদান, যেমন অদ্ভুত গাছের কান্ড, এসব সূত্র থেকে তাকে কোথায় বন্দি করে রাখা হয়েছিল-তা বের করা চেষ্টা চলছিল। অনুসন্ধানীদলের অন্যরাও হয়তো আটকে আছে ওখানে।'

প্রফেসরের ছেলেও আছে এই তালিকায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মঙ্ক, 'যে অন্ধকারে ছিলাম, সে অন্ধকারেই আমরা ফিরে গেলাম আবার!'

'শুধু তাই না, সাফিয়ার অপহরণকারীর সন্ধানও পাইনি আমরা।'

প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে হামলাকারীরা কোন সূত্র রেখে যায়নি। একইভাবে, অ্যাশওয়েলে নিহত শত্রুদের তল্লাশি করেও পাওয়া যায়নি কিছু। তবে আততায়ীদের আঙুলের ছাপ এবং ছবি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে; অবশিষ্ট এবং একমাত্র জীবিত আক্রমণকারীকে ধরার জন্য গরু-খোঁজা খোঁজা হচ্ছে। দেখামাত্রই আটক করা হবে তাকে।

তবে খুব একটা ভরসা পাচ্ছে না গ্রে। এই ঘটনার পিছনের কালপ্রিটের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে ভালোমতোই ধারণা আছে। লোকটার যে রয়েছে পর্যাপ্ত অর্থ, সেটাও পরিষ্কার! প্রফেসর ম্যাককেবকে ঘিরে ঘনীভূত রহস্যের সব সূত্র মুছে দিতে চায় কেউ।

কিন্তু কেন? এবং কেন অপহৃত হয়েছে ড. আল-মায়াজ? জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নয়তো? নাকি কী জেনেছে মেয়েটা তা আবিষ্কারের জন্য?

গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা নজর এড়িয়ে যাচ্ছে গ্রে-র, কিন্তু খুব চেষ্টা করেও বুঝতে পারছে না-ঠিক কী সেটা! সিগমায় তাকে নেওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো-ধাঁধাঁর টুকরো টুকরো অংশ জোড়া দেওয়া এবং নানান বিষয়ের মাঝে একটা ছক খুঁজে বের করার ওর অদ্ভুত গুণ। কিন্তু এই দক্ষতারও রয়েছে সীমাবদ্ধতা।

এখন যেটা উপলব্ধি করতে পারছে...

মাথা ঝাঁকাল গ্রে, জানে আরও টুকরো প্রয়োজন এই ধাঁধাঁ মেলাবার জন্য।

রাস্তার ওপাশের ইন্সটিটিউটের দিক থেকে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে একজন, এই মেয়েটার ছবিই পাঠিয়েছিল ক্যাট। নাম, ড. ইলিয়ারা কানো। সিগমার

ইন্টেলিজেন্স এক্সপার্ট হওয়ায়, পুরো বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে আছে ক্যাটের পরিচিত মানুষ। এই ব্রিটিশ মেয়েটার সাথে ক্যাটের সম্পর্ক কী, তা জানতে চেয়েছিল গ্রে। কিন্তু রহস্যময় কণ্ঠে ক্যাট জানায়, পরে কখনও ব্যাখ্যা করবে সব .সময় পেলে

ড. কানোর বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, গ্রে-র বয়সী প্রায়। পরনে জিন্সের প্যান্ট, আধ খোলা সাদা জ্যাকেট, গলায় উজ্জ্বল প্রবালের মালা। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, দেহের গড়নও বেশ আকর্ষণীয়। মেয়েটা বারো বছর বয়সে বাবা-মার সাথে নাইজেরিয়া থেকে এসেছে, রোগ-বিস্তার সংক্রান্তবিদ্যায় পি.এইচ.ডি. করেছে। এই বিদ্যায় মহামারীগুলো নিয়ে গবেষণা করা হয়। দ্য আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড অ্যাডভাইসরি সার্ভিস নামক একটি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সে।

মেয়েটা সম্ভবত সারারাতই জেগে ছিল, তবুও অবসাদগ্রস্ত মনে হচ্ছে না তেমন। ড. কানোর কালো দুই চোখে খেলা করছে উজ্জ্বলতা; অবশ্য আমেরিকান দু'জনের দিকে তাকাতেই ছোট ছোট হয়ে গেল চোখ।

'তুমি নিশ্চয়ই কমান্ডার পিয়ার্স।' বলল মেয়েটা, কণ্ঠে ব্রিটিশ টান, এরপর মঙ্কের দিকে ফিরে হাসল, 'এবং তুমি কুখ্যাত ড. কক্কালিস, তোমার ব্যাপারে অনেক কিছুই বলেছে ক্যাট।'

'তাই বুঝি?' হাত বাড়িয়ে দিল মঙ্ক। 'মনে হচ্ছে, বাড়িতে গিয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখার উপর আবার একটা কোর্স করতে হবে আমাকে।'

হেসে হাত মেলাল ইলিয়ারা, 'চিন্তা করো না, সব ভালো ভালো কথাই বলেছে সে।' শ্রাগ করল সে। 'দুই-একটা ছাড়া।'

'এই দুই-একটা নিয়েই তো আমার দুশ্চিন্তা।'

মূল আলোচনায় সরাসরি চলে এল গ্রে, 'ক্যাট বলল-তুমি নাকি আমাদের মোটামুটি একটা স্বচ্ছ ধারণা দিতে পারবে এসবের ব্যাপারে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইলিয়ারা, পুড়তে থাকা ল্যাবের দিকে চিন্তিত নজর ওর। 'তা সম্ভবত পারব না। বড়জোর কিছু উত্তর দিতে পারি, কিন্তু সেই উত্তরগুলো আরও বেশি প্রশ্নের জন্ম দেবে।'

'যে অবস্থা, তাতে যেকোন উত্তরই সাদরে গ্রহণ করব।'

মাথা নেড়ে সম্মতি দিল মঙ্ক।

অনুসরণ করার ইশারা দিল ইলিয়ারা, 'আমার গাড়িটা একেবারে কোনার দিকে পার্ক করা।'

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল গ্রে, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'ক্যাট বলেনি কিছু?' ভ্রূকুটি করল মেয়েটি। 'জেন ম্যাককেবের সাথে আমার কথা বলাটা খুব জরুরি।'

'কেন?'

'ক্যাট জানিয়েছে আমাকে, পিতার পুরনো কিছু কাগজপত্র রক্ষা করতে পেরেছে জেন। ওই কাগজ থেকে জানা যায়-এই রোগ এই দেশে আগমন এবারই প্রথম নয়!'

এক শতাব্দী আগে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ছড়িয়ে পড়া মহামারীর কথা জানা আছে গ্রে-র। অন্য সবার সাথে মিলিত হতে আগ্রহী হলেও অভিজ্ঞতা ওকে শিখিয়েছে-সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। মেয়েটাকে ক্যাট চেনে বটে, কিন্তু ওর কাছে সে অপরিচিত। তাই, গাড়িতে পৌঁছানোর আগেই ব্যাখ্যা দাবী করল গ্রে। হাত দিয়ে বাঁধা দিল মেয়েটাকে গাড়ির দরজা খুলতে।

'এই রোগের ইতিহাস কেন এত জরুরী?'

অধৈর্য নজরে তাকাল ইলিয়ারা, যেন এই প্রশ্ন করে অপরাধ করেছে গ্রে। 'তুমি শুনেছ কিনা জানি না। আমি নিজেই ঘণ্টাখানেক আগে জেনেছি! কায়রো মিশরের নানা শহরে বেড়েই চলেছে এই রোগের প্রকোপ। লন্ডনে রোগটার ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি আমরা, কিন্তু হয়তো দেরি করে ফেলেছি ইতিমধ্যেই। কায়রো এয়ারপোর্ট হয়ে এসেছে যারা, তাদের অনেকের কাছ থেকেই নতুন নতুন রোগীর খবর পাওয়া যাচ্ছে। একই উপসর্গ-জ্বর এবং দৃশ্য ভ্রমের কথা বলছে আক্রান্তরা।'

বাঁধা দিল মঙ্ক। 'দৃষ্টি ভ্রম?'

নড করল ইলিয়ারা, 'রোগের নতুন একটা উপসর্গ, মৃত-প্রায় রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। আমাদের বিশ্বাস, মস্তিষ্কের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এই উপসর্গ দেখা দিতে পারে।'

এক পা এগিয়ে গেল মঙ্ক। চিকিৎসা শাস্ত্রে দক্ষ বলে এই খবর শুনে আগ্রহী হয়ে উঠল সে, আরও বিস্তারিত শুনতে চাইল।

'কিন্তু' বাঁধা দিল গ্রে, .অতীতের ঘটনার সাথে বর্তমানের কী সম্পর্ক?'

গুণতে শুরু করল ইলিয়ারা, 'আমরা খবর পেয়েছি-বার্লিন, দুবাই, ক্রাকাউ আক্রান্ত হয়েছে। নিউইয়র্কে তিনজন এবং ওয়াশিংটনে একজন আক্রান্ত হওয়ার খবরও এসেছে।'

মঙ্কের দিকে চিন্তিত চোখে তাকাল গ্রে।

'কিন্তু সবচেয়ে খারাপ অবস্থা কায়রোর, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে ওখানে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়েছে।' গ্রে-র হাত সরিয়ে দিল ইলিয়ারা, মুখোমুখি হয়ে বলল। 'কেন অতীত ইতিহাস জানতে চাইছি আমি? কারণ উনিশ

শতকে, আমার সহকর্মীরা রোগের সংক্রমণ রোধ করতে পেরেছিল। প্রফেসরের কাগজে যদি এর কোন সূত্র থাকে, তবে পরিস্থিতি আরও বিগড়ে যাওয়ার আগেই সমাধান পাওয়া যাবে।'

'ঠিক।' একমত হলো মঙ্ক।

স্থির হয়ে দাঁড়াল গ্রে, 'কিন্তু তুমি-ই কেন?' জোর দিল সে। 'কেন নিজ থেকে এই বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছ তুমি? '

কাঁধ ঝুলে গেল মেয়েটার, আকাশের কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠা ধোঁয়ার দিকে ইশারা করল সে। 'কারণ, মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল বিশ্বাস করে আধুনিক বিজ্ঞানে। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কপি, ডি.এন.এ. বিশ্লেষণ, জিনোম ম্যাপিং-এসব দিয়েই জীবাণুর প্রতিষেধক খুঁজবে ওরা। কেননা শতাব্দী আগের বিজ্ঞানীদের কাজের প্রতি ভরসা নেই ওদের।'

নড করল মঙ্ক, 'এমন অনেককেই চিনি আমি। শুধুমাত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না যারা, ওরা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়।'

'একদম ঠিক, এই কারণেই আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড অ্যাডভাইসরি সার্ভিসে জড়িত হয়েছি আমি।' ব্যাখ্যা করল ইলিয়ারা।

'কাজ কী এই প্রতিষ্ঠানের?' জানতে চাইল গ্রে।

'ব্রিটিশ ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের সাথে যুক্ত এই শাখা। অব্যাখ্যাত ঘটনার অনুসন্ধান করা আমাদের কাজ, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক রহস্যগুলো। জাদুঘরের নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে সূত্র খুঁজে বের করি আমরা। আধুনিক বিজ্ঞান যেখানে ব্যর্থ হয়, সেখানে কাজে লাগতে পারে এসব প্রণালী।'

ভ্রূ উপরে উঠাল মঙ্ক, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও! মল্ডার বা স্কালি নামে কেউ কাজ করে নাকি তোমাদের সাথে?'

হাসল ইলিয়ারা। গাড়ির দরজা খুলে বলল, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। সত্য সামনেই আছে-খুঁজলেই পাবে।'

চোখ পাকাল গ্রে, কিন্তু চালকের আসনে বসল মেয়েটা।

দেঁতো হাসি ফুটে উঠল মঙ্কের মুখে, 'এজন্যই ক্যাট পছন্দ করে ওকে।'

ওর দিকে তাকাল গ্রে, 'কেন?'

'আমাদের মতোই পাগলাটে এই মেয়ে।'

সকাল ৮:৩৯

এক হাতে চোখ ডলল ডেরেক, অন্য হাতে হাই ঠেকাল। রান্নাঘরের টেবিলে ছড়িয়ে আছে বই, জার্নাল, কাগজপত্র-যেসব নিয়ে এসেছিল ম্যাককেবের কুটির থেকে।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু না কিছু তো অবশ্যই আছে এখানে।

সারারাত এই কথাটাই বারবার ভেবেছে সে, ঘুমাতেও পারেনি তেমন। অ্যাশওয়েল থেকে গত রাতে পালিয়ে আসার পর, লন্ডনের এই শেষ মাথায় ঠাঁই নিয়েছে সবাই। অ্যাড্রেনালিনের প্রভাবে শ্রান্ত প্রায় দেহ, নাকে ব্যান্ডেজ বাঁধা; চুলকাচ্ছে বেশ, তবে ব্যথানাশক ওষুধ সেবন করায় নিয়ন্ত্রণে আছে ওটা।

পাশে ফিরে তাকাল সে, সোফায় ঘুমিয়ে আছে জেন। কাছেই একটি চেয়ারে তন্দ্রায় আছে সেইচান, বুকে ঠেকে আছে চিবুক, কোলের উপর পিস্তল। ডেরেকের ধারণা, বিপদের সামান্যতম চিহ্ন টের পাওয়া মাত্র লাফিয়ে উঠবে মেয়েটা। দলের সর্বশেষ লোক, বিশালদেহী কোয়ালস্কি দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে জানালার পাশে। গতকাল মধ্যরাতে ওরা এখানে এসেছে, হোটেলে উঠেছে মিথ্যা পরিচয়ে। ঝুঁকি নিতে চায়নি কেউ।

নিজের অনুসন্ধানে ফিরে গেল ডেরেক, সামনে চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা লিভিংস্টোনের পুরনো কাগজপত্র। প্রফেসর ম্যাককেবের চিহ্নিত করা আরেকটি চিঠি পেল সে, চিঠিটা স্ট্যানলিকে লিখেছিলেন লিভিংস্টোন। ব্যাঙ্গউইলু হ্রদের তীরবর্তী উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বিবরণ আছে ওখানে। এখানেই নীল নদের উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন লিভিংস্টোন। এই পাতায় লিভিংস্টোনের হাতে আঁকা আরেকটি ছবি আছে-একটি শুঁয়োপোকা এবং প্রজাপতি।

Danaus chrysippus.

যদিও সে পতঙ্গ-বিজ্ঞানী নয়, তবুও এই বিশেষ পতঙ্গ ওর পরিচিত, দানাউস ক্রিসিপাস-এই অঞ্চলের খুব পরিচিত প্রজাতি। প্রাচীন চিত্রকর্মে এই প্রজাপতি বহুবার দেখেছে সে। সাড়ে তিন হাজার বছর বয়সী লুক্সরের মিশরীয় প্রাচীর-চিত্রেও আছে এই প্রজাপতি।

ক্লান্ত চোখ রগড়ে নিল ডেরেক।

কী মানে এসবের?

বইটা আবার উল্টেপাল্টে দেখল সে, পুরনো চিঠিটায় প্রফেসরের আগ্রহের কারণ খুঁজে পেল না। প্রথম ছবিতে ফিরে গেল আবার, জেনকে মিশরীয় গুবরে পোকার ছবিটা দেখিয়েছিল ও।

Ateuchus sacer

মনোযোগ দিতে চাইল সে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি ঘোলা হয়ে এল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও, হাল ছেড়ে দিতে প্রস্তুত।

এসব শুধু মরীচিকার পিছনে অযথা ছুটে চলা-

হঠাতই ব্যাপারটা নজরে পড়ল ওর, সারারাত যা চোখ এড়িয়ে গিয়েছে, ক্লান্তি খুঁজে দিল তা। বিহ্বল ডেরেক চেয়ার ঠেলে দিল পিছনে, আওয়াজটা বেশ জোরেই হলো।

আওয়াজে নড়ে উঠল জেন, মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

বলার জন্য এখনও তৈরি নয় ডেরেক, আগে নিশ্চিত হতে চায়।

আইপ্যাডের দিকে ওর নজর, নিশ্চিত হওয়ার জন্য হোটেলের ওয়াই-ফাই দিয়ে গুগলে সার্চ করল সে।

ঈশ্বর! ভুল যেন না হয়।

জেন কিছু একটা আশংকা করেছিল হয়তো, 'ডেরেক, কী হয়েছে?'

'আমার ধারণা মেয়েটার দিকে তাকাল সে। 'আমি জানি তোমার বাবা কোথায় গিয়েছিলেন।'

রূঢ় কণ্ঠ বলে উঠল পিছনে, 'কেউ একজন আসছে।' জানালা থেকে সরে গেল কোয়ালস্কি। 'যাবার সময় হয়েছে।'

সকাল ৮:৫১

বুক ধুকপুক করছে, নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াল সেইচান। নিজেকে বকল সতর্কতায় ঢিল দেওয়ার জন্য। অনুসরণের সম্ভাব্য সব পন্থা নিয়ে ভাবতে লাগল ও। কিন্তু উত্তর পেল না কোন। গত রাতের আততায়ীর কথা ভাবল সে, মেয়েটার পাণ্ডুর মুখ ভেসে উঠল ওর মানসপটে। এই বিশেষ মেয়েকে অবজ্ঞা করে দেখছে না সেইচান।

সিগ সয়্যার হাতে দাঁড়িয়ে আছে কোয়ালস্কি, 'শান্ত হও, গ্রে আর মঙ্ক কাউকে সাথে করে নিয়ে এসেছে।' জানালার দিকে আবার নিচে তাকাল সে।

হাতের অস্ত্র শক্ত করে ধরে আছে সেইচান, মন চাইছে বিশালদেহী লোকটার উপর এটা ব্যবহার করতে। বড় করে দম নিল ও, বাকি দু'জনের ভয়ার্ত চেহারা দেখে রেখে দিল পিস্তল।

'তোমার পুরোপুরি নিরাপদ।' আশ্বস্ত করল সে। 'আমার সহকর্মীরা দেখা করতে এসেছে, আগেই ওদের কথা বলেছিলাম তোমাদের।'

শুষ্ক ঠোঁট ভিজিয়ে নিল ডেরেক, নড করল। লোকটার আরও ঘনিষ্ঠ হলো জেন, যেন আড়াল খুঁজছে।

টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করল সেইচান, 'গুছিয়ে ফেল সব, আমাদের চলে যাওয়ার সময় হয়েছে।'

'কিন্তু আমি ভাবছি-' কথা শেষ হওয়ার আগেই বাঁধা পেল ডেরেক।

'চলতে চলতেও ভাবা যাবে।' আদেশ করল সে। 'যত বেশি সময় থাকব এখানে, ততই বিপদের আশংকা বাড়বে।'

স্বল্প-সময়ের পরিকল্পনায় ঠিক হয়েছিল-ডেরেক এবং জেনকে সমুদ্র উপকূলবর্তী একটা সেফ হাউজে নিয়ে যাওয়া হবে। জায়গাটা ঠিক করেছেন ডিরেক্টর ক্রো। সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু আশ্বস্ত হওয়ার বদলে আরও চিন্তিত হয়ে পড়ল সেইচান। গ্রেকে আসতে দেখে খুশি হয়েছে সে। ওর সাথে কথা বলতে চায় সেইচান, নিজের সন্দেহের কথা খুলে বলতে চায়।

অসম্ভব একটা সন্দেহ .

অন্ধকার পুকুরে দেখা সেই দৃশ্য এখনও কাঁপুনি তোলে ওর দেহে। চেষ্টা করেও মাথা থেকে দৃশ্যটা তাড়াতে পারছে না সেইচান। ওই মূহুর্তে সহজাত প্রবৃত্তি তাড়া করতে বলছিল; কিন্তু মনে মনে জানে-একেবারেই অরক্ষিত ছিল ও, তাই অযথা ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যেত। তারপরও, হয়তো তা-ই করত সে। কিন্তু গির্জার ঘণ্টা বাজতেই মনে পড়ে গিয়েছিল-এখন আর গিল্ডের আততায়ী নয় ও। আরও অনেক দায়িত্ব এখন ওর কাঁধে-অনেকগুলো জীবন রক্ষার দায়িত্ব ওর উপর। কিন্তু মনের গহীনে জানে-এই শিকার-শিকার খেলা চালিয়ে যেতে চেয়েছিল সে, এমনকী নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও।

ডেরেক এবং জেনের দিকে ওর নজর। ভয় পাচ্ছে দু'জন, তাড়াহুড়ো করে টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। ঘৃণা জেগে উঠল ওর মনে, সহজাত প্রবৃত্তির বশেই। রেগে উঠল সেইচান, ওদের প্রতি এবং নিজের প্রতি।

ঘুরে দাঁড়াল সে।

কী করছি আমি এখানে?

দরজায় টোকার আওয়াজ শোনা গেল, এগিয়ে গেল কোয়ালস্কি। দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানাল অতিথিদের।

প্রথমেই প্রবেশ করল গ্রে, হাসল সেইচানের উদ্দেশ্যে। শান্ত হলো প্রাক্তন গিল্ড এজেন্ট, তবে কিছুটা। রুমে প্রবেশ করেই ভেতরে দ্রুত নজর বুলিয়ে নিল গ্রে। পিছনে প্রবেশ করল মঙ্ক এবং লম্বা কালো এক মেয়ে, আলোচনায় মগ্ন দু'জন।

গ্রেকে একপাশে সরে আসতে ইশারা করল সেইচান, সেফ হাউজে রওনা হওয়ার আগেই পুরো বিষয়টি খুলে বলতে চায় সে। কিন্তু তার আগেই মঙ্কের কণ্ঠ বাধা দিল ওদের।

আতংকিত চোখে লোকটা তাকিয়ে আছে সেইচানের অচেনা মেয়েটার দিকে, 'ওটাই তবে প্রফেসরের মৃত্যুর কারণ?'

উত্তর দিল মেয়েটা, 'হয় ওটা, নয়তো মমিকরণ প্রক্রিয়া। দেহ পুড়ে যাওয়ার আগে গবেষণার জন্য যথেষ্ট সময় পাইনি আমরা।'

ডেরেককে সরিয়ে সামনে এল জেন, চেহারা পান্ডুর বর্ণ ধারণ করেছে। 'কী বললে তোমরা?'

বুঝতে পারল মঙ্ক, কেউ একজন ওদের কথাবার্তা শুনছিল। তোতলাতে লাগল সে, উপলব্ধি করেছে কী ভুল করে ফেলেছে অজান্তে। 'আ .আ .আমি দুঃখিত, মিস ম্যাককেব।'

বাধা দিল গ্রে, ব্যাখ্যা করল, 'তোমার বাবার মৃতদেহ রাখা হয়েছিল যেখানে, ওই স্থাপনা ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়েছে পুরোপুরি।'

এক পা পিছিয়ে গেল জেন, মেয়েটার কাঁধে হাত রেখে শান্ত করার চেষ্টা করল ডেরেক।

'কিন্তু কেন?' মেয়েটির প্রশ্ন।

উত্তর দিল ডেরেক, 'যে কারণে তোমাদের কুটির ধ্বংস করা হয়েছে...সব প্রমাণ ধ্বংস করতে চাইছে কেউ।'

নড করল গ্রে, আরও ব্যাখ্যা দিতে চাইল সে, কিন্তু থামিয়ে দিল জেন।

'আমার বাবার মৃত্যুর কারণ নিয়ে কি যেন বলছিলে তুমি?' অচেনা মেয়েটার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিল জেন।

দৃষ্টি বিনিময় হলো মঙ্ক এবং অচেনা মেয়ের, জেনের দিকে ইশারা করে বলল, 'জানার অধিকার আছে ওর।'

'তাহলে ওকে দেখাই,' কাঁধ থেকে একটা ব্যাগ নামিয়ে রাখল টেবিলে। ভেতর থেকে একটা ল্যাপটপ বের করল সে। 'তবে, আগেই বলছি-এই ফলাফলগুলো সব প্রাথমিক।'

টেবিলের চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল সবাই, গ্রেকে সরিয়ে নিল সেইচান, 'গতরাতের একটা কথা তোমাকে বলতে চাই, এখন পর্যন্ত তা ডিরেক্টর ক্রো-কেও জানাইনি।'

ভ্রূকুটি করল সিগমা কমান্ডার, 'কী?'

চোখে চোখ রাখতে সংকোচ হচ্ছে সেইচানের, তথ্য লুকানোর জন্য লজ্জা পাচ্ছে। সেই সাথে ভয়ও জাগছে মনে, হৃদয়ের অন্তঃস্তলে থাকা ইচ্ছে টের না পেয়ে যায় গ্রে। মেয়েটার পলায়নের দৃশ্য কল্পনা করল সে, পিছনে ফিরে সেইচানকে

চ্যালেঞ্জ করেছিল আততায়ী! চেহারায় কোন ভয় ছিল না, এমনকী ছিল না ক্রোধও। বদলে বন্য স্বাধীনতা উজ্জ্বল হয়ে ছিল, উদ্যত আহ্বান জানাচ্ছিল সেইচানকে। দিন-রাত এই বন্যতাকেই কবর দেওয়ার চেষ্টা করছে ও।

মনে আছে ওর, অচেনা ওই মেয়েটার মতো হতে কেমন লাগে। কেমন লাগে এইভাবে ঝুঁকি নিয়ে চলতে, ভালো এবং মন্দের উর্ধ্বে গিয়ে নিজের জন্য বাঁচতে।

'কী হয়েছে?' বলল গ্রে।

মুখ এখনও নিচের দিকে রেখেছে সেইচান, গ্রে হাত বুলিয়ে দিল মেয়েটার গালে। এক মাসের অধিক সময় আলাদা ওরা দু'জন। গ্রে-র স্পর্শ, দেহের গন্ধ, কাঁধে ফেলা নিঃশ্বাস-সবকিছুর অভাব বোধ করে সে। জানে, প্রচণ্ড ভালোবাসে ওকে লোকটা, গত কয়েক বছর ধরে এই ভালোবাসার জোরেই টিকে আছে সেইচান। কিন্তু গ্রে-র প্রতি ব্যাপারটা অবিচার হয়ে যাচ্ছে না তো? উত্তরটা খুঁজে নিতে ইচ্ছে করেই মারাকাশের অ্যাসাইনমেন্টটা হাতে তুলে নেয় সেইচান।

কিন্তু বদলে মুখোমুখি হতে হলো অতীতের এক দুঃসহ স্মৃতির।

'উল্কি আঁকা যেই মেয়েটা পালিয়েছিল গত রাতে-'

'হুম, কী হয়েছে তার?'

'আমি চিনি ওকে।' সত্যটা বলেই দিল সেইচান। 'আসলে, আমি জানি ওর ব্যাপারে, অনেক কথাই শুনেছি।'

'কীভাবে?'

নজর সরিয়ে নিল না সেইচান, 'গিল্ডের আততায়ী সে।'

সাত
৩১ মে, সকাল ৯:১৪ বি.এস.টি.
লন্ডন, ইংল্যান্ড

অসম্ভব

সেইচানের দেওয়া তথ্য অবাক করল গ্রেকে, কথাটি অবিশ্বাস করতে পারলেই বরং খুশি হতো সে। কিন্তু মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারল ও।

'কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব?' বলল গ্রে। 'গিল্ডকে ধ্বংস করে দিয়েছি আমরা।'

হোটেলের জানালার দিকে মেয়েটার নজর, কণ্ঠে তিক্ততা, 'আমি এখনও আছি! আমিও তো ওই খুনি দলের সদস্য।'

'সদস্য ছিলে এক কালে, এখন তো আর নেই!'

'চাইলেই কী আর অতীতকে ভুলে থাকা যায়?' ঘুরে দাঁড়াল সেইচান, কাঁপছে ওর দেহ। 'সাপের মাথা কেটে ফেলেছি আমরা; কিন্তু কে বলতে পারে-নতুন কোন মাথা গজায়নি ওখানে?'

'গিল্ড একেবারে সমূলে উৎপাটন করেছি আমরা।'

'তাহলে নতুন কোন দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, শূন্যস্থান পূরণ করে নিয়েছে।' গ্রে-র দিকে তাকাল সে, 'যাই হোক, আমার মতো অনেক নিষ্ঠুর আততায়ী রয়েছে গিল্ডের। ছোট থেকেই নৃশংস করে গড়ে তোলা হয়েছে ওদের। কাজ শেষে অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা তাদের মজ্জাগত।'

'নতুন কোন মালিক খুঁজে নিতে পারে ওরা।' স্বীকার করল গ্রে।

'যেমনটা আমি করেছি . ' মন ভেঙে গিয়েছে সেইচানের।

'সেইচান

'একবার এমন কোন দলে নাম লেখালে, পুরোপুরি বের হয়ে আসার কোন উপায় নেই।' দৃষ্টি ফেরাল গ্রে-র দিকে, 'ভালো করেই জানো, এখনও বেশ কয়েকটি দেশের সন্ত্রাসী-তালিকায় আছে আমার নাম। মোসাদ আমার উপর দেখামাত্র খুন করার নির্দেশ জারি করেছে।'

'কিন্তু সিগমা তোমাকে রক্ষা করবে-তা তুমিও জানো।'

দীর্ঘশ্বাস চাপা দিল সে, 'যতক্ষণ আমি কাজে লাগছি, ততক্ষণ করবে।'

'না, কথাটা ঠিক না।'

ফিরে তাকাল সেইচান, 'তোমার তা-ই বিশ্বাস?'

প্রশ্নটা ভাবিয়ে তুলল গ্রেকে, সিগমার অভ্যন্তরীণ লোকদের চেনে ও। এরা কেউ প্রাক্তন গিল্ড এই এজেন্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কিন্তু কথা হলো-তাদের কেউই জানে না ওর লুকানো অতীত। সেই অতীতে আলো পড়লে কী হবে?

উত্তর দেওয়ার আগেই, গ্রে-র কানে এল ড. কানোর কণ্ঠ, 'এই জিনিসের সাথেই লড়ছি আমরা।' ল্যাপটপের উপর ঝুঁকে আছে সে, 'তাই যত দ্রুত সম্ভব থামাতে হবে একে।'

সেইচানের কনুই স্পর্শ করল গ্রে, কথা দিল পরবর্তীতে শেষ করবে আলোচনাটুকু। পরক্ষণেই টেবিলের দিকে রওনা হলো দু'জন।

'কী দেখছি আমরা?' জানতে চাইল ডেরেক, ভালো করে দেখার জন্য চেয়ারে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্যাখ্যা করল ইলিয়ারা, 'স্নায়ুকোষের ত্রিমাত্রিক ছবি, উজ্জ্বল নলাকারগুলো প্রফেসর ম্যাককেবের মস্তিষ্কের নিউরন। চুলের মতো কিছু একটা দিয়ে ঢাকা ছোট বস্তুটা রোগের জীবাণু। স্নায়ুকলা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ওটা।'

'এটা ভাইরাস নয়, ব্যাকটেরিয়া!' আশ্চর্য হয়ে বলল মঙ্ক।

মাথা নাড়ল ইলিয়ারা, 'তুমি ভুল ভাবছিলে, এখনও ভাবছ।'

ভ্রূকুটি করল মঙ্ক, 'কীভাবে?'

'ওটা ভাইরাসও নয়, ব্যাকটেরিয়াও নয়। জীবন্ত সব অণুজীবের থেকে আলাদা এই জীবাণু।'

'তাহলে কী এটা?' জানতে চাইল জেন, পিতার ভাগ্যের কথা আলোচনা করায় কিছুটা বিচলিত।

'আর্কিয়নের শ্রেণীভুক্ত একটি সদস্য এটা।'

'ওহ . ' নড করল মঙ্ক, বুঝতে পেরেছে। কিন্তু বাকি সবার চেহারা বিভ্রান্ত।

ব্যাখ্যা করল ইলিয়ারা, 'জীবনের তিনটা মূল শাখা বা রাজ্য তিনটি। একটা হলো ব্যাকটেরিয়া, সবাই আমরা পরিচিত এর সাথে। আরেকটি হলো ইউক্যারিয়োট:

শ্যাওলা, ছত্রাক, বৃক্ষ, এমনকী আমরাও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ১৯৭৭ এর আগ পর্যন্ত এই বিশেষ ধরনের আর্কিয়নের ব্যাপারে কেউ জানত না, আদিম জগত থেকে অন্যভাবে বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে এসেছে ওটা। প্রাচীনতম জীবসত্তার একটি হলো এই অদ্ভুত জীবাণু।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল গ্রে।

'অযৌন উপায়ে দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে এরা। কিন্তু অন্যান্য সব অণুজীবের চেয়ে এদের জৈব-রসায়ন এবং জেনেটিক সজ্জা সম্পূর্ণ আলাদা। বেশ ক'জন বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীর বিশ্বাস-দুই বিলিয়ন বছর আগেও ছিল এই জীবাণু। অথচ এখনও এর কোষের অভ্যন্তরের উপাদান আমাদের অচেনা।'

অদ্ভুত জীবাণুর দিকে নজর গ্রে-র।

কীসের মুখোমুখি হয়েছি আমরা?

আবারও বলতে শুরু করল ইলিয়ারা, 'অদ্ভুত জেনেটিক সজ্জার জন্য সর্বোচ্চ খারাপ পরিস্থিতিতেও বেঁচে থাকতে পারে জীবাণুটা। এই যেমন উষ্ণ প্রসবণ বা জমাট-বাধা মেরুতে। এমনকি উচ্চ আম্লিক বা ক্ষারীয় পরিবেশেও অসুবিধা হয় না কোন।'

বুঝতে পারল গ্রে, কিছু একটা চলছে মেয়েটার মাথায়। 'এই প্রজাতির বিশেষত্ব কী?'

হাত দুটো প্যান্টের পিছনের পকেটে রাখল ইলিয়ারা, ভ্রূকুটি করল সে। নজর মনিটরে। 'দুর্গম পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার সক্ষমতার জন্য, বিকল্প শক্তি গ্রহণ করে এই জীবাণুগুলো। শ্বেতসার, অ্যামোনিয়া, ধাতব অণু, এমনকী হাইড্রোজেন সালফাইডও ব্যবহার করতে পারে। কিছু কিছু তো সরাসরি কার্বন...এমনকী সূর্যের আলো থেকে শক্তি আহরণ করে।'

'গাছের মতো? সালোকসংশ্লেষণের প্রক্রিয়ায়?' বলল ডেরেক।

'ঠিক সেরকম না। অন্য এক রাসায়নিক প্রক্রিয়া রয়েছে ওটার, নিজেদের প্রজাতিতে অনুপম। কিন্তু যেমনটা বলেছিলাম, সব জীবাণুরই উদ্ভাবনী ক্ষমতা রয়েছে কম-বেশি। আমাদের এই জীবাণুর-ও আছে।'

'কীভাবে বেঁচে থাকে ওটা?' জানতে চাইল গ্রে।

পুরো রুমে চক্কর খেল ওর নজর, 'তোমরা কেউ জিয়োব্যাকটর বা শ্যাওয়ানেলা চেন?'

বড় বড় চোখ করে তাকাল মঙ্ক, 'তুমি বলতে চাইছ যে-'

'ঠিকই অনুমান করেছ তুমি।'

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে এখনও পাহারা দিচ্ছে কোয়ালস্কি, 'আরে বাবা! ঝেড়ে কাশলেই তো হয়।'

বিশালদেহী লোকটার কথায় সম্মতি দিল গ্রে, উত্তরের আশায় তাকাল মঙ্কের দিকে।

বোমা ফাটাল যেন মঙ্ক, 'যে ব্যাকটেরিয়া দুটোর নাম বলেছে ড., সে দুটোই তড়িৎ-খাদক।'

নড করল ইলিয়ারা, 'শুধু এই দুটোই নয়, কমপক্ষে আরও দশটি এমন ব্যাকটেরিয়া আছে। সবগুলোই আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, এমন আরও অগণিত অনাবিষ্কৃত ব্যাকটেরিয়া আছে। কিন্তু অণুজীবটা এই প্রজাতির মধ্যে প্রাচীনতম।'

মুখ বিকৃত করল সেইচান, 'মানে, ওই জীবাণুগুলো খাবার হিসেবে বিদ্যুত গ্রহণ করে?'

'হ্যাঁ, আমরা যেভাবে খাদ্য খাই ঠিক সেভাবেই।' ব্যাখ্যা করল মঙ্ক। 'শ্বেতসার থেকে ইলেকট্রন এ.টি.পি. হিসেবে জমা হয় আমাদের দেহকোষে। কিন্তু এই অণুজীব প্রকৃতি থেকে সরাসরি গ্রহণ করে ইলেকট্রন!'

'উৎস হিসেবে কী ব্যবহার করে?' জানতে চাইল ডেরেক।

শ্রাগ করল ইলিয়ারা, 'খনিজ-পৃষ্ঠ, সমুদ্র-তলদেশের তড়িৎ প্রবাহ ইত্যাদি। নতুন নতুন নমুনা সংগ্রহের জন্য সরাসরি মাটিতে ইলেকট্রন প্রয়োগ করা হচ্ছে, ফলাফল বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।'

ল্যাপটপের পর্দায় গ্রে-র নজর, 'এই নমুনাটাও তাই করে?'

'নিশ্চিতভাবে জানি না। তবে কোত্থেকে এসেছে ওটা, তা জানতে পারলে হয়তো উত্তর দিতে পারব।'

জেন এবং ডেরেককে চোখাচোখি করতে দেখল গ্রে।

কী ব্যাপার?

'আমার জানা মতে,' মুখ খুলল ইলিয়ারা, সবার মনোযোগ ফিরিয়ে এনেছে নিজের দিকে। 'এই জীবাণু দুর্ঘটনাক্রমে প্রফেসরের মস্তিষ্কে চলে আসেনি। শক্তির উৎস আছে, এমন জায়গাতেই মূলত ঘাঁটি গাড়ে এই জীবাণু।'

ব্যাপারটা পুরোপুরি বোধগম্য হলো গ্রে-র, কল্পনায় স্নায়ুকোষের ভেতরে শক্তি প্রবাহের প্রক্রিয়াটা কল্পনা করল ও। 'এই জীবাণুগুলো মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, ভ্যাম্পায়ারের মতো চুষে খায় ইলেকট্রন। ফলে নানান উপসর্গ দেখা দেয় রোগীর।'

'মস্তিষ্ক-ঝিল্লিতে প্রদাহ, দৃষ্টি ভ্রম-সবই এর কারণ।' বলল মঙ্ক।

নড করল ইলিয়ারা, 'হ্যাঁ। কিন্তু অসুস্থতার কারণ আর্কিয়ন-এমন রোগ অতীতে কেউ কখনও দেখেনি। পরিস্থিতি এর চেয়েও খারাপ হতে পারে।'

'মানে?' প্রশ্ন ছুড়ল গ্রে।

'উপযুক্ত পরিবেশে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় ওটা। এজন্যই এত দ্রুত রোগ ছড়াতে সক্ষম। কিন্তু প্রতিটি বিভাজনের সাথে সাথে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে অণুজীবটায়। ফলে পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে ওটা। খুব বেশি তথ্য নেই আমাদের এই ব্যাপারে।'

'তারমানে প্রতিষেধকটার দুটো বৈশিষ্ট্য থাকবে না,' বলল মঙ্ক, 'শুধু জীবাণুমুক্ত করলেই চলবে না, জীবাণুর প্রভাবটাও কমাতে হবে পোষকদেহ থেকে।'

'একদম ঠিক। রোগটার মৃত্যুহার বা ছড়াবার পদ্ধতি আমাদের জানা নেই। তবে ধারণা করে বলি-বায়বীয় মাধ্যমে ছড়ায় জীবাণু। মোটামুটি এটাও বোঝা যাচ্ছে যে মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীও আক্রান্ত হয় এতে।'

'বোঝা যাচ্ছে, তড়িৎ সঞ্চারক যেকোন স্নায়ুব্যবস্থা-ই এর শিকার। কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, এমনকী পোকাও রক্ষা পাবে না জীবাণুর প্রকোপ থেকে। পরিস্থিতি সঙ্গিন হচ্ছে দ্রুত।'

'কতটুকু সঙ্গিন?' জানতে চাইল গ্রে।

উত্তর দিতে চেষ্টা করল ইলিয়ারা, 'সিডিসি মহামারীর জন্য এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের বিপদ-সংকেত ঠিক করে রেখেছে, নিরাপত্তার খাতিরে এবং সর্বসাধারণের সুবিধার্থে প্রচারিত হয় এই সংকেত।'

'হ্যারিকেনের মতো?'

'হ্যাঁ, এই রোগটার ক্ষেত্রে পাঁচ নং বিপদ-সংকেত চলছে।' ঘুরে দাঁড়াল সে, নজর জেনের দিকে। 'তাই জানা প্রয়োজন আমাদের-ব্রিটিশ মিউজিয়ামে লিভিংস্টোনের তালিসমান খোলার ব্যাপারে কী জানতেন ম্যাককেব?'

ডেরেকের দিকে ফিরে তাকাল জেন, কিছু একটা জানে সে।

লোকটাকে জোর করল গ্রে, 'কিছু কী জানা আছে তোমার? '

'প্রতিষেধকের ব্যাপারে কিছু জানি না। তবে প্রফেসর কোথায় গিয়েছিলেন, তা সম্ভবত জানি।' ইতস্ততঃ করে বলল সে।

বিস্ময় চাপা দিতে পারল না গ্রে, 'কী? কীভাবে?'

কাগজের স্তূপের দিকে নজর ডেরেকের, 'দেখাচ্ছি দাঁড়াও।'

সকাল ৯:৫৫

আশা করি, ভুল করিনি আমি অন্তত জেনের খাতিরে

গ্লাসগো লাইব্রেরি থেকে প্রফেসর চুরি করেছিলেন যে বই, সেটা খুলল ডেরেক। মেয়েটার চোখে আশার আলো নজর এল না ওর। ভাইয়ের কথা ভাবছে জেন, আশা করছে এখনও বেঁচে আছে রোরি। ডেরেক জানে না-ওর ধারণা কতটুকু সঠিক

বা ভুল, তবুও চুপ থাকতে চাইছে না। ড. কানোর কথা শোনার পর তো আরও অসম্ভব।

বইটা টেবিলে নামিয়ে রাখল ও, 'আগে সবাইকে বুঝতে হবে, এক্সোডাসের ঘটনার সত্যতা নির্ণয়ের জন্য যেকোন ধরনের তথ্য-উপাত্ত খুঁজে বের করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন প্রফেসর ম্যাককেব।'

ফিল্ড জার্নালটা খুলে আরিয়াবোলসের স্কেচ দেখাল সে। পাত্রের গায়ে আঁকা নীল নদের মিশরীয় হায়রোগ্লিফও আছে ওখানে।

ঝুঁকল ইলিয়ারা, 'এই তালিসমান থেকেই সংক্রমণ ছড়িয়েছিল ব্রিটিশ মিউজিয়ামে।'

'হ্যাঁ, এটাই সেই দুমুখো পাত্র।' বলল ডেরেক। 'অন্তত কাহিনি তো তাই বলে। কথিত আছে, নীল নদের রক্ত লাল পানি জমা ছিল ওটায়। '

'কিন্তু ওসব সত্য হোক বা মিথ্যা,' যোগ করল জেন। 'এমন কাহিনি বাবাকে আকৃষ্ট করতে যথেষ্ট।'

'তাই তো লিভিংস্টোন এবং হেনরি মর্টন স্ট্যানলির চিঠিগুলো প্রফেসরের নজর কেড়ে নিয়েছে।' পুরনো কাগজপত্র মেলল ডেরেক, 'লিভিংস্টোনের জীববিজ্ঞান-সংক্রান্ত চিত্র সংবলিত চিঠিগুলোর প্রতিই আগ্রহী ছিলেন তিনি।'

গুবরে পোকার ছবিটা বের করল ও। 'প্রথমে ভেবেছিলাম, প্রাচীন মিশরের সাথে সম্পর্ক আছে বলে এই কাগজ চিহ্নিত করে রেখেছেন ম্যাককেব। কিন্তু পরে চিত্রে কিছু একটা অসঙ্গতি টের পেলাম আমি। তাই ছবিটার দিকে বিশেষ নজর দেই।'

আইপ্যাডে প্রথমে গুবরে পোকার ছবিটা বের করল ডেরেক, 'তোমরা আসার সময়ই মাত্র কাজটাতে হাত দিয়েছি আমি।'

সবাই ডেরেকের কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল আইপ্যাডের পর্দায়, ঘুরিয়ে সোজা করল ছবিটা।

'এটার কী বিশেষত্ব?' নাক চুলকাতে চুলকাতে জানতে চাইল মঙ্ক।

'পোকাটির পাখার শিরাগুলো দেখে খটকা লাগে আমার, যদিও আমি পতঙ্গ-অঙ্গসংস্থানবিদ্যায় ততটা অভিজ্ঞ নই। কিন্তু একটু ভালো করে দেখো, কী করি আমি।'

আইপ্যাডের আর্ট প্রোগ্রাম দিয়ে পুরো পাখাটাই মুছে ফেলল ডেরেক, শুধু অদ্ভুত শিরাটুকু বাদে।
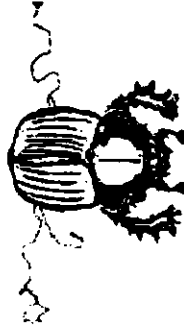
সোজা হয়ে দাঁড়াল গ্রে, 'হায় ঈশ্বর

আমেরিকান লোকটার দিকে ফিরে তাকাল ডেরেক, হয়তো অসঙ্গতি ধরতে পেরেছে সে।

গর্বের সুর জেনের গলায়, 'বাকিটা দেখাও সবাইকে।'

পুরোপুরি সব মুছে নিল সে, জোড়া লাগাল শিরা দুটো।

'নদীর মতো মনে হচ্ছে,' বলল ইলিয়ারা, চোখ ছোট ছোট করে তাকিয়ে আছে ও।

'ওটা যে-সে নদী নয়।' বলল ডেরেক। 'উপরের অংশটুকু দেখুন, ছোট-বড় দুই হ্রদের দিকে নজর দিন।'

'নীল নদের মানচিত্র!' বলল গ্রে, শ্রদ্ধার চোখে তাকিয়ে আছে ডেরেকের দিকে।

আরও নিশ্চয়তা দিতে, স্যাটেলাইটের মানচিত্রটা বের করে দেখাল ডেরেক। নীল নদ এটায় স্পষ্ট বোঝা যায়। দুটো ছবি একসাথে রাখল ও।
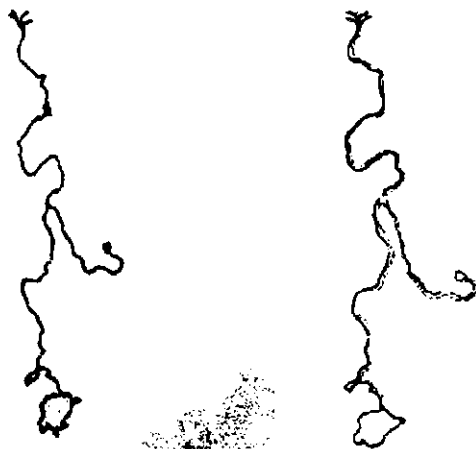
'পুরোপুরি মিলে গিয়েছে।' বলল সে।

তবে, সন্দেহ প্রকাশ করল গ্রে। 'কিন্তু লিভিংস্টোন সেই সময় এমন নিখুঁত মানচিত্র কীভাবে আঁকলেন?'

উত্তর দিল জেন, 'ততদিনে পুরো আফ্রিকার মানচিত্র তৈরি করেছিলেন লোকটা। জাম্বেজি নদীর অনেকটুকুও সেই মানচিত্রের অংশ ছিল। এই কাজের জন্য রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছেন তিনি।'

'সুতরাং বুঝতেই পারছ-ব্যাপারটা অসম্ভব না।' যোগ করল ডেরেক। 'আসলে নীলের অধিকাংশ এলাকাই ততদিনে মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে।'

'কিন্তু লুকিয়ে রাখলেন কেন?' বলল মঙ্ক, 'তা-ও এমন গোপনীয়তার সাথে?'

জবাব দিল ইলিয়ারা, 'অতীতেও হয়েছে এমন, ব্রিটিশ সেনাদের দৌড়াত্মে লুকিয়ে রাখা হতো সব। উদাহরণ স্বরূপ বলি রবার্ট বাডেন পওয়েল, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অফিসারের কথা। পতঙ্গবিদ্যায় দক্ষ তিনি, হাতে আঁকা নানা ছবি দিয়ে মূল বার্তা ঢেকে দিতেন। শত্রুর নাকের ডগায় বসে আদান-প্রদান করতেন তথ্য।'

ভ্রূকুটি করল গ্রে, 'এই নাম পরিচিত লাগছে কেন?'

হাসল ইলিয়ারা। 'কেননা এই ভদ্রলোকই বয় স্কাউট-এর প্রতিষ্ঠাতা।'

হাসল মঙ্ক, 'আগের কথায় ফিরে আসি।' আইপ্যাডের দিকে আঙুল তাক করল ও, 'নীল নদের মানচিত্র এখানে কেন লুকিয়েছেন লিভিংস্টোন, তা পরিষ্কার হচ্ছে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডেরেক, 'সম্ভবত স্ট্যানলিকে গোপন কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন লিভিংস্টোন, কোন নির্দিষ্ট জায়গার বিবরণ।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল সেইচান।

'দেখ, কীভাবে মানচিত্রের ছবিটা দুই ভাগে ভাগ করে মাঝ বরাবর এঁকেছেন। স্ট্যানলির জন্য এই চিত্র বেশ অর্থবহ।'

'কারণ এটা মিশরীয় পতঙ্গ।' বলল গ্রে।

'ঠিক, মিশর নিয়ে দু'জনেরই আগ্রহ ছিল। আমার মনে হচ্ছে, বড় একটা এক্স আঁকা হয়েছে ওখানে। প্রাচীন মিশরের সাথে সম্পৃক্ত কোন মূল্যবান বস্তু আছে চিহ্নিত জায়গাটায়।'

ছবিতে এক্স আঁকাল যুবক।

এক্সের দিকে আঙুল তাক করল ডেরেক, 'সুদানের হাইড্রো-ইলেকট্রিক বাঁধ থেকে বেশি দূর না চিহ্নটা। আমার ধারণা, প্রফেসর ম্যাককেব এই ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভের আড়ালে এলাকাটায় অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন।'

'তার দেহের অবস্থা থেকে আন্দাজ করা যায়,' গ্রে যোগ করল এবার। 'পেয়েওছিলেন কিছু একটা।'

'অথবা, কিছু একটা পেয়েছিল তাকে।' ফোঁড়ন কাটল মঙ্ক।

এগিয়ে এসে প্রফেসর ম্যাককেবের জার্নালের দিকে মন দিয়েছে ইলিয়ারা। একমনে দেখছে দুই মুখো আরিয়াবোলসটার স্কেচ। 'যেটাই হোক, লিভিংস্টোনের তালিসমানে থাকা জীবাণুটা নিয়েই ফিরে এসেছিলেন তিনি।' অন্যদের দিকে তাকাল সে। 'আমরা এখনও নিশ্চিতভাবে জানি না যে তার দলের কেউ বেঁচে আছে কিনা। কিন্তু যদি এই সূত্রগুলো আমাদেরকে রোগের উৎপত্তি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে, তাহলে আশা করা যায় .হয়তো একটা প্রতিষেধকও মিলবে।'

'তাহলে তাই করব আমরা।' শক্ত কণ্ঠে বলল গ্রে।

একমত হলো সবাই, তবে পরিকল্পনাটার একমাত্র সমস্যার দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেইচান। 'খুব ভালো। কিন্তু এখনও আমাদের সামনে একটা রহস্য কুয়াশায় আবৃত হয়ে আছে।'

শান্ত হয়ে এল গ্রে-র চেহারা। 'সাফিয়া আল-মায়াজের কী হলো, তাই তো?'

অপরাধবোধে ভরে গেল ডেরেকের মন। উত্তেজনায় বন্ধুর অপহরণ হবার কথা ভুলেই গিয়েছে।

বুকের উপর হাত বাঁধল জেন। 'আমরা কী করতে পারি?'

'আপাতত কিছুই না,' মেনে নিল গ্রে 'অনেক অনুসন্ধান করেও জাদুঘরে কিছু মেলেনি। তাই এখন যে পথ সামনে খোলা আছে, তাতেই হাঁটতে হবে।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ডেরেক, সাফিয়ার কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় ভরে উঠছে মন। কিন্তু ঠিক বলেছে গ্রে। তাই ওর ক্ষমতায় যা আছে, তাই করল কেবল।

ঈশ্বর, ওকে দেখে রেখো।

আট
৩১ মে, সকাল ১০:০৪ ই.ডি.টি.
সুমেরু দ্বীপপুঞ্জ

হাতটা জানালায় ঠেকাল সাফিয়া, শীতল অনুভূতি সঞ্চারিত হলো কাচের এপাশ থেকেও। কোন গরাদ নেই ঠিকই, কিন্তু বন্দি করে রাখা হয়েছে ওকে। জানালার ওপাশে শুভ্র বরফাচ্ছাদিত ভূমি, আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘ। হাতের কাছে কালো গ্রানাইটের চূড়া, উজ্জ্বল হয়ে আছে শুভ্রসাদা বরফের মাঝে। একটু দূরেই, ঝপ করে নেমে গিয়েছে সেই চূড়া, সমুদ্রে মিশে গিয়েছে।

কোথায় আছি আমি?

হেলিকপ্টারে জেগে ওঠার পর থেকেই এই প্রশ্ন মাথায় ঘুরছে ওর, স্ট্রেচারে বাঁধা ছিল সে তখন; ঝাপসা-ঝাপসা স্মৃতি গেঁথে আছে মস্তিষ্কে। তখনই আবার চেতনা লোপ পায় ওর। হামলা হয়েছিল সাফিয়ার অফিসে, অপহরণ করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে। অজ্ঞান অবস্থায় দেহের জামাকাপড়ও পাল্টে দেয়া হয়েছে ওর, এখন পরনে ধূসর কভারঅল। হাত দুটো ভাজ করল সে, আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। ঘুরে তাকাল সিমেন্ট-ব্লক দিয়ে তৈরি রুমের দিকে। কোনমতে একটা বিছানা, টয়লেট এবং ওয়াশ-বেসিন এঁটেছে। সৌভাগ্যক্রমে হাতঘড়িটা রেখে গিয়েছে লোকগুলো, তৃতীয় বিবাহবার্ষিকীতে ওটা উপহার পেয়েছিল স্বামীর কাছ থেকে। আঁকড়ে ধরল সাফিয়া ঘড়িটা, দেখল-চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে অপহরণের পর।

চার ঘণ্টা ধরে, ধীরে ধীরে সাফিয়া ফিরে পেয়েছে মস্তিষ্কের চিন্তা-ভাবনা করার স্বাভাবিক শক্তি। যদিও মাথা ঘোরাচ্ছে এখনও, মুখ শুকিয়ে আছে। ছাদের ক্যামেরা থেকে নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষ জানতে পেরেছে, জ্ঞান ফিরে এসেছে সাফিয়ার। তবুও কেউ আসেনি এখনও, এমনকী কথাও বলেনি কোন!

কী চায় তারা?

ছোট দরজার নিচে একটা ফোকর, ওটা দিয়ে খাবার দেওয়া হয় বন্দিদের। তবে, এখনও খাবার দেওয়া হয়নি ওকে। চোখ বরাবর ছোট একটা ছিদ্র, এখন অবশ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শীতল কাচের জানালায় নজর ওর, বাইরের দৃশ্য দেখে বোঝার চেষ্টা করছে ঠিক কোথায় আছে। বরফাচ্ছাদিত ভূমি এবং সমুদ্র দেখে ধারণা হচ্ছে, সুমেরুর কাছে কোথাও।

সঠিক সময় পর্যন্ত জানা নেই ওর, তবে গত চার ঘণ্টা ধরে লক্ষ্য করছে সূর্য। কিন্তু ওটা যেন অনড়, জায়গাতেই স্থির আছে। যতদূর বুঝতে পারছে, সুমেরুর উত্তর দিকে কোথাও আছে সে।

গলায় হাত রাখল ও, আরও একটা দৃশ্য এল নজরে। সামনে একশো একর জুড়ে ধাতব জঙ্গল যেন। প্রতিটি অবয়ব প্রায় দশ ফুট লম্বা অ্যান্টেনা, প্রতিটির চূড়ায় ইংরেজি এক্স অক্ষরের মতো একটি ক্রসবিম। পুরো স্থাপনা তারের জাল দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, কোন ধরনের অ্যান্টেনা অ্যারে হবে বলে ধারণা করল সে।

কিন্তু কীসের জন্য?

কমপ্লেক্সের ঠিক মাঝখানে মানব-নির্মিত বিশাল এক গর্ত, কম করে হলেও পৌনে এক মাইল জুড়ে। গর্তটা এই স্থাপনার চেয়েও অনেক প্রাচীন, খুব সম্ভব কোন খনি ছিল এখানে।

তেল, দুর্লভ আকরিক এবং মূল্যবান ধাতুর জন্য এই মেরু অঞ্চল বেশ প্রসিদ্ধ। উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য এই অঞ্চলে বেড়েই চলেছে খননকার্য। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরো বিষয়টি।

কিন্তু কেন? কেন এখানে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে?

পিছনে মৃদু আওয়াজ টের পেল, ঘুরে দেখতে পেল, ক্যামেরার চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে!

সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকাল সে, প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজের ভয় লুকোতে।

উত্তর এবার পাওয়া যাবে!

সকাল ১০:২২

'মেয়েটাকে কাজ করাতে বেগ পেতে হবে,' ভাবল সাইমন। হাত দুটো পিঠের দিকে, আরমানি স্যুটের হাতার পশমি সুতো পেঁচাচ্ছে লোকটা। কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার সময় এই অভ্যাসটা দেখা যায় ওর। এভাবেই কমিটির মধ্যে নিজের কর্তৃত্ব গড়ে তুলেছে সে। এখনও একই ভঙ্গিমায় বন্দির চেহারার দিকে তাকাল, প্রতিদ্বন্দ্বীকে বোঝার প্রয়াস পেল।

শীতল কণ্ঠে, রাশিয়ান টানে পেছন থেকে কথা বলে উঠল কেউ। 'প্রফেসর ম্যাককেবের উপর প্রয়োগ করা পন্থা মেয়েটার উপরেও খাটানো যায়।' মাথা ঘুরিয়ে নিরাপত্তা প্রধানের দিকে তাকাল সাইমন। শক্ত-সামর্থ্য অ্যান্টন মিখাইলোভের পরনে কালো ট্র্যাক-প্যান্ট এবং একই রঙয়ের জ্যাকেট। মাথার সাদাটে সোনালি চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, জেল দিয়ে খুলির সাথে লেপ্টে রেখেছে। কপালের মাঝখানে ইংরেজি ভি আকার ধারণ করেছে চুল। কয়েক মাস সুমেরুতে থাকার ফলে গায়ের

রং পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করেছে, অবশ্য সূর্যের আলোতে থাকলেও খুব একটা পরিবর্তন হতো বলে মনে হয় না। বোন ভালিয়ার মতোই, অ্যান্টনও অ্যালবিনো। তবে অন্যান্য অ্যালবিনোর চেয়ে ওরা দু'জন আলাদা; অন্য সবার চোখ লাল হলেও, ওদের চোখ নীল।

মুখে আঁকা উল্কিটাই অ্যান্টনের একমাত্র কলঙ্ক, উল্কিতে ফুটে উঠেছে একটি অর্ধ-সূর্য। বাকি অর্ধেক ওর বোনের ডান গালে অঙ্কিত।

এই উল্কির মর্মার্থ বের করার বেশ চেষ্টা করেছে সাইমন; কিন্তু ভাই-বোন কারও কাছ থেকেই সন্তোষজনক কোন উত্তর পায়নি। শুধুমাত্র অতীত পেশার ভাসা ভাসা কিছু ব্যাখ্যা ছাড়া কিছুই জানতে পারেনি সে। অতীত মনিবের প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হওয়ার পর, ওদের দু'জনকে নিয়োগ করে সাইমন।

ভাই-বোন দু'জনই নিষ্ঠুর, ধূর্ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেই গুণ-অনুগত। এটুকুই চায় শুধু সাইমন, বেশ চড়া মূল্যও পরিশোধ করে এইজন্য। অবশ্য খরচটা সাইমনের কাছে কিছুই না। ক্লাইফ এনার্জির প্রতিদিনের স্টক ভ্যালু চারশো কোটি থেকে পাঁচশো কোটিতে উঠানামা করে। হোয়ার্টন থেকে লেখাপড়া শেষ না করেই বেরিয়ে পড়ার পর, এই কোম্পানির হাল ধরে ও। নিজের গভীর আবেগ পূরণে বদ্ধপরিকর সাইমন, সেই লক্ষ্য অর্জনের খুব কাছাকাছি চলেও এসেছে।

খুব কাছাকাছি .

আগামী মাসে ওর জন্মদিন, দিনটা স্মরণীয় করে রাখতে বদ্ধপরিকর সাইমন। মাইলফলক সৃষ্টি করতে চায় ও; তাতে যদি পুরো সংগঠনের ভিত্তি নড়ে যায়, তবুও পরোয়া নেই। বড়লোকের খামখেয়ালি বলে উপহাস করা লোকদের দেখিয়ে দিতে চায়-ওরা ভুল, সে সঠিক।

কথাটা ভাবতেই সাইমনের ভেতর দানা বেঁধে উঠল রাগ। কিছু গর্দভ রসিকতা করে রিচার্ড ব্রেনসনের ব্যক্তিগত স্পেসফ্লাইট নির্মাণ নিয়ে, হাসাহাসি করে ইউরি মিলনারকে নিয়ে। রাশিয়ান এই কোটিপতি খুঁজে বের করতে চেয়েছিল জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রশ্নের উত্তর: মহাবিশ্বে কী আছে আরও প্রাণ?

অতীতে এমন বুদ্ধিজীবীদের জন্যই মানবসভ্যতার গতি পাল্টে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, বৈশ্বিক হুমকির কাছে যখন হেরে গিয়েছিল আমেরিকান সরকার, তখন অর্থনৈতিক ঝুঁকি নিয়েছিল হাওয়ার্ড হিউজেস, হেনরি ফোর্ড এবং জন রকফেলার। মাথা উঁচু করেই মোকাবিলা করেছে তারা সব প্রতিকূলতা, সূত্রপাত করেছে প্রযুক্তি-যুগের।

আবারও ঘুরে গেল দুনিয়া। বোকা বনল সরকার, অচলাবস্থা তৈরি করল রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ। বুঝল না কেউ, সামনে ধেয়ে আসছে বিপদ। এখনই উপযুক্ত

সময় .অগ্রসর চিন্তা-ভাবনা নিয়ে নতুন প্রযুক্তিকে এগিয়ে আনার লড়াই শুরু হলো বলে

এমন সব প্রকল্পের গালভরা নামকরণ দিয়েছে নরওয়েজিয়ানরা-স্টোরম্যানগালস্কাপ, যার অর্থ মহৎ ব্যক্তির পাগলামি। উপাধিটা অপমানজনক হলেও, সম্মানের চোখে দেখে সাইমন। অতীত ইতিহাস বলে, পরিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি এই স্টোরম্যানগালস্কাপ। তাই এখনও এমন অগ্রসর চিন্তা-ভাবনার মালিক, মহৎ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে; হতে হবে সরাসরি যেকোন সরকারকে চ্যালেঞ্জ করার মতো সৎ সাহসী। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বদ্ধপরিকর হবে এরা।

আমি নিজেও এদের মধ্যে একজন।

কিন্তু বাঁধাও কম নেই।

মনিটরের পর্দায় চোখ ওর, তাকিয়ে আছে ব্রিটিশ মেয়েটার চোখে, নিয়ে নিল সিদ্ধান্ত।

'যুক্তরাষ্ট্র থেকে জেন ম্যাককেবকে আনতে ব্যর্থ হয়েছে তোমার বোন,' বলল সাইমন, 'তার বদলে পাঠান এই উপহার আমরা বৃথা যেতে দিতে পারি না।'

'জি।'

অ্যান্টনের চোখে ওর নজর, 'মেয়েটাকে বোঝাও, অসম্মতি কতটা ক্ষতি ডেকে আনবে ওর জন্য।'

সকাল ১০:৩৮

দরজা খোলার আওয়াজ শোনা মাত্র সবচেয়ে জঘন্য পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিল সাফিয়া। তবে এক চিকন ব্যক্তিকে রুমে প্রবেশ করতে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গেল সে। লোকটার পরনে ধূসর কভারঅল, ঠিক ওর মতোই।

যুবককে চিনতে পেরে অবাক হলো সে, 'রোরি?'

হ্যারল্ড ম্যাককেবের ছেলে এই যুবক। আগের চেয়েও পান্ডুর হয়ে গিয়েছে ছেলের গায়ের রং, বসে গিয়েছে চোখ, ভেঙে গিয়েছে চোয়াল। মাথার পরিপাটি চুলগুলো এখন এলোমেলো, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা, কোঁকড়া চুলে ছেলেটাকে দেখতে বাচ্চা বাচ্চা লাগছে।

সবুজ চোখে ভীতির ছায়া নজর এড়াল না ওর।

'ড. আল-মায়াজ, দুঃখিত আমি।' পাশেই আরেকটি লোকের দিকে রোরির নজর। আগন্তুক দাঁড়িয়ে আছে দরজায়, পালানোর রাস্তা আটকে রেখেছে। কোমরে একটা পিস্তল গুঁজে রেখেছে লোকটা, কিন্তু ওর চোখ দুটি বেশি ভয়ংকর। মুখে আঁকা উল্কি ভয় পাইয়ে দেয় আরও বেশি।

এই লোক অতীতে খুন করেছে।

তবুও সাফিয়া অবজ্ঞা করল আগন্তুককে, হেঁটে গেল রোরির পাশে, কাঁধ ধরে বলল, 'ঠিক আছ তুমি? কী হচ্ছে এখানে?'

ছেলেটার গায়ের কাঁপুনি টের পেল সে, 'জানি না ঠিক কোথা থেকে শুরু করব, অনেক কিছু বলতে চাই তোমাকে।'

'পরেও বলতে পারবে।' খেঁকিয়ে উঠল আগন্তুক, হাত দিয়ে ইশারা করল, 'যাও, বের হও এখন।'

সাথে সাথেই মেনে নিল রোরি, মার খাওয়া কুকুরের মতো হলো ওর প্রতিক্রিয়া। নির্দেশ পালন করল সাফিয়াও। পিছনে অনুসরণ করল আগন্তুক, একমুহূর্তের জন্যও অস্ত্রের বাট থেকে হাত সরল না ওর। লোকটার কথায় রাশিয়ান সুর এবং বরফে ঢাকা দৃশ্যপটের কথা ভাবল ও।

আমরা কী রাশিয়ার কোথাও আছি? নাকি সাইবেরিয়ার কোন বন্দিশিবিরে?

রোরির কাছাকাছি রইল সাফিয়া, প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে, 'আমরা কোথায় আছি জানো?'

'কানাডা।' রোরির উত্তর শুনে অবাক হলো সাফিয়া। 'সুমেরুর উত্তরের একটি দ্বীপে, নাম এলেসমেয়ার দ্বীপ।'

ভ্রূকুটি করল সাফিয়া, চেষ্টা করছে তথ্যটুকু হজম করতে।

কানাডা কেন?

'আমার ভুলে তোমাকে আনা হয়েছে এখানে।' বিড়বিড় করে বলল রোরি, 'সব আমার দোষ।'

'মানে?'

কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে তাকাল রোরি, গলার আওয়াজ নম্র হলো আরও, 'বাবাকে কাজে বাধ্য করার জন্য আমাকে আনা হয়েছে এখানে। যদি সুদানে ওদের কাজে সাহায্য না করত বাবা

হাত উঁচু করল ছেলেটি

.হাতের কড়ে আঙুলটা নেই।

হায় খোদা!

'বাবার উপায় ছিল না আর,' রোরি বলল ব্যথিত কণ্ঠে। 'আমারও কিছু করার ছিল না। প্রকল্পে সহযোগিতা করতে হয়েছে আমার। নয়তো বাবার ক্ষতি হতো। এমনকী জেনের ক্ষতি করার হুমকিও দিয়েছিল ওরা।'

'ঠিক হয়ে যাবে সব।' বলল সাফিয়া, অপরাধ বোধ ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছে ছেলেটার।

'এরপর পালিয়ে গেলেন বাবা।' কপালে হাতের তালু ঘষছে যুবক, 'কিন্তু এতদিন পর তিনি কেন এমন ঝুঁকি নিলেন, তা জানা নেই আমার।'

একই প্রশ্ন সাফিয়ার মনেও, একটাই সদুত্তর পেয়েছে সে, 'এমন কোনকিছু জানতে পেরেছিলেন তিনি, যা শত্রুদের জানাতে চাননি।'

ছোট ছোট হয়ে গেল রোরির চোখ, 'ওদের তাই বিশ্বাস। বাবার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর, আমার উপর চাপ বেড়ে গেল। বাবার পদে কাউকে প্রয়োজন ছিল ওদের, অভিজ্ঞ মানুষের নাম বলতে বাধ্য করেছে আমাকে। নামের পর নাম বলে গেছি আমি, ওরা তৈরি করেছে তালিকা।'

সব বুঝে গেল সাফিয়া, 'তাহলে আমার নামটাও বলেছিলে তুমি?'

'সবার প্রথমেই বলেছি। অন্য যে কারও চেয়ে বাবার ব্যাপারে অনেক বেশি জানো তুমি।' ক্ষমা-প্রার্থনার দৃষ্টি ছেলেটার চোখে। 'অন্য একজনও বাবার কাজ বোঝে .জেন। কিন্তু যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নেই ওর ..সেই সাথে নিরাপত্তার জন্যও '

কোন ভাই-ই এমন বিপদে বোনকে টেনে আনতে চাইত না।

দুর্ভাগ্যবশত, এ জন্য বিপদে পড়েছে সাফিয়া।

'তোমাকে অপহরণের পর,' বলতে থাকল সে। 'বাবার কাজের সমস্ত প্রমাণ ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছে ওরা, সেই সাথে গবেষণার মূল বিষয়টাকেই নিয়ে এসেছে এখানে।'

'সুদান থেকে? কী কী আনা হয়েছে?' কল্পনায় ঊষর মরুতে হাত নাড়তে দেখল ম্যাককেবকে, 'ওখানেই কী বন্দি করে রাখা হয়েছিল তোমার বাবাকে?'

'আমার তাই ধারণা।' মুখ বিকৃত করল রোরি। 'আরেকটি গবেষকদলের সাথেই ছিলেন তিনি।'

'কী বিষয়ে কাজ করছিলেন-'

'অনেক বকেছ, এবার চুপ হও।' সাবধান করল গার্ড, কণ্ঠে স্পষ্ট সতর্কবাণী।

জানালাবিহীন শুভ্র করিডোরের শেষ মাথায় চলে এসেছে ওরা, সামনে দুই ডালার দরজা।

কার্ড ব্যবহার করে দরজা খুলল উল্কি আঁকা লোকটা, পথ ছেড়ে দিল সে রোরির জন্য। মৃদু হিসহিস শব্দের সাথে খুলে গেল দরজা। ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করল রোরি, ভেতরে লকার এবং বেঞ্চ। পেছনে কাচের দেয়াল, পরের রুমটা আধুনিকতম প্রযুক্তি দিয়ে সাজানো অনুপম এক ল্যাবরেটরি। পরপর বেশ কয়েকটি দরজা, সংক্রমণ রোধের জন্য একপাশে রাখা চুপসে যাওয়া হলুদ বায়োসেফটি স্যুট। ল্যাবের ভেতর স্টেইনলেস স্টিলের নানা সরঞ্জাম, সেই সাথে রেফ্রিজারেশন ইউনিট এবং ফ্রিজার দেয়ালের সাথে লাগানো। বেশিরভাগ বড় বড় যন্ত্র সাফিয়ার অচেনা।

তবুও জানে সে, কেন এখানে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে।

ল্যাবের ঠিক মাঝখানে, কাচ দিয়ে ঘেরাও করা একটি অবয়ব। সিল করা অবস্থায় রয়েছে মলিন কালো সিংহাসন, দেখে মিশরীয় মনে হচ্ছে। দুটো অবয়ব সিংহাসনের দু'পাশে খোদাই করা হয়েছে, একটি সিংহ এবং একটি নারী-খুব সম্ভব মিশরীয়।

তবে সিংহাসনে বসে থাকা নারীদেহটা কেড়ে নিল সাফিয়ার নজর। শুকিয়ে মমি হয়ে গিয়েছে সে, চেয়ারে লেগে থাকা অবয়বটার গা পুড়ে গিয়েছে। মেয়েটির চিবুক ঠেকে আছে বুকে, শুষ্ক দেহটা অদ্ভুত শান্ত।

'কে সে?' জানতে চাইল সাফিয়া।

তিক্ত হয়ে গেল রোরির গলা, 'যার কাছ থেকে উত্তর খুঁজে বের করতে হবে।'

ভ্রূকুটি করল সে, 'এসব কী জন্য? কী হচ্ছে এখানে?'

পেছন থেকে ভেসে এল উত্তর, নতুন এই আগন্তুক উল্কি আঁকা লোকটার পাশে দাঁড়াল। বেশ বয়স হয়েছে ওর, মাথায় ধূসর চুল, পরনে স্যুট। লোকটার চেহারা বেশ পরিচিত, কিন্তু নামটা কোনমতেই মনে আসছে না।

সিল করা বক্সের দিকে নজর লোকটার, 'এই রহস্য সমাধানে সাহায্য দরকার আমার, ড. আল-মায়াজ।'

'যদি না করি?'

হাসল আগন্তুক, দাঁত দেখাল, 'কথা দিচ্ছি, তোমার কোন ক্ষতি করব না।'

রোরির দিকে তাকাল লোকটা, এক পা পিছিয়ে গেল রোরি।

নিজের ভেতর রাগ দানা বেঁধে উঠল সাফিয়ার, কিন্তু কাঠিন্য ধরে রাখল চেহারায়। 'তাহলে বলুন, কী করা হচ্ছে এখানে?'

'ভয় নেই,' হাসল আগন্তুক, 'দুনিয়া বাঁচানোর চেষ্টা করছি আমরা।'

পর্ব দুই

কলম্বাসের ডিম

নয়
২রা জুন, দুপুর ১:১৫, ই.ই.টি.
কায়রো, মিশর

'একটা ভালো আর একটা খারাপ খবর আছে।' বলল মঙ্ক।

স্তূপ করে রাখা যন্ত্রপাতিগুলোর আড়াল থেকে উঁকি দিল গ্রে। অস্ত্র, গোলাবারুদসহ অন্যান্য প্যাকেটগুলো খোলা তাঁবুর নিচে বড় একটি টেবিলে রাখা। ঠিক তার পেছনেই নুড়ি বিছানো রানওয়ে, একটা সি-১৩০ ইউ.এস. মিলিটারি ট্রান্সপোর্ট বিমান অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।

দলটা কায়রো থেকে খার্তুমে যাবে টার্বোপ্রোপ এয়ারক্রাফটে চড়ে, মাত্র দু'ঘন্টার পথ। উত্তর দিক হতে প্রায় হাজার মাইল দূরে অবস্থিত সুদানের এই রাজধানী শহর, প্রলয়ঙ্করী নীল নদের নীল-সাদা স্রোতের সঙ্গমস্থলের অববাহিকার কাছেই।

ওখান থেকে ছড়িয়ে পড়বে আশেপাশের অঞ্চলে, সূত্র খুঁজে চেষ্টা করবে হ্যারল্ড ম্যাককেব সম্পর্কে। হয়তো লোকটা কোথায় ছিল এতদিন, তা জানতেও পারবে। মনে মনে কল্পনা করছে গ্রে, হুমড়ি খেয়ে ছুটে চলছেন প্রফেসর উত্তপ্ত মরুর মধ্য দিয়ে, মৃত প্রায়, অর্ধ-মমিতে পরিণত, মাথার খুলি বইছে ভয়ঙ্কর মহামারি!

কী হয়েছিল বুড়ো লোকটার সাথে?

সেই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে জেনা আর ডেরেক, এয়ারফিল্ডের পাশের হোটেলে আছে ওরা। তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখছে ফিল্ড জার্নাল আর ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র। গ্রে চলে গিয়েছে, কিন্তু পাহারায় রেখে গিয়েছে সেইচান আর কোয়ালস্কিকে।

মিশরের তপ্ত রোদ থেকে চোখ আড়াল করল গ্রে। মধ্যদুপুরে তাপমাত্রা বেড়েছে বেশ, কম করে হলেও প্রায় একশোর কাছাকাছি হবে। তার চোখের সামনেই তাঁবুর নিচে সেঁধিয়ে গেল ড. ইলিয়ারা কানো, আর পিছু পিছু এল মঙ্ক।

'ভালো নাকি খারাপ?' চিন্তিত স্বরে বলল গ্রে, 'ঠিক কোনটা আগে শোনা উচিত হবে, তা বুঝতে পারছি না।'

ঘর্মাক্ত হাতে কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছল মঙ্ক, ঘামে ভেজা মাথার চুল ঝাড়ল। নিজেও বুঝতে পারছে না ঠিক কোত্থেকে শুরু করবে।

ভেতরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ইলিয়ারা, 'এই দুঃখেই আমার বাবা-মা নাইজেরিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছে। রোদে পুড়ে না মরলে, বাকিটা জীবন লন্ডনের বৃষ্টি এবং কুয়াশা নিয়ে কখনোই অভিযোগ করব না আমি।'

ওরা দু'জন গতকাল রাত থেকে আছে নামরু-৩-এ, কায়রোতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাভাল মেডিকেল রিসার্চ ইউনিট এটা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ১৯৪২ সালে টাইফাস মহামারির প্রাদুর্ভাবের কারণে স্থাপিত হয় এই বেস। তখন থেকে এটাই দেশের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহত্তম বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি। প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ রোগ-ব্যাধি নিয়ে গবেষণা এবং প্রতিকার খুঁজে বের করা।

পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়া নতুন এই মহামারীর পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধানের মূল কর্মস্থলে পরিণত হয়েছে এই ইউনিট। রোগটার ছড়িয়ে পড়া রুখতে এবং নিরাময় খুঁজে বের করতে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে সামরিক ডাক্তার এবং বিজ্ঞানীরা। পাশাপাশি এদের সাথে কাজ করছে মিশরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আমেরিকার সি.ডি.সি.।

নতুন এই রোগটার প্রাদুর্ভাব রুখতে নানা বৈজ্ঞানিক ব্রিফিং আয়োজন করা হয়েছে, আর সবগুলোতেই অংশগ্রহণ করছে মঙ্ক আর ইলিয়ারা। অভিজ্ঞ সব গবেষকের সাথে কথা বলছে ওরা এই অদ্ভুত তড়িৎ-খাদক জীবাণু নিয়ে। দু'জনের চোখই লাল টকটকে, বোঝাই যাচ্ছে রাতে বিছানায় পিঠ লাগানোর সৌভাগ্য হয়নি কারো।

'আগে ভালোটাই বলো দেখি!' অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল গ্রে।

কু ডেকে উঠছে ওর মন, বলছে সামনে খুব খারাপ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত জীবনেও শান্তি নেই। গ্রে-কে একটা ভয়েস মেইল পাঠিয়েছে কেনি। বলেছে, সকালে উঠে প্রথমেই যেন ফোন দেয়। ডি.সি.তে সকাল হতে আর এক ঘন্টাও বাকী নেই। কায়রো থেকে সময়ের পার্থক্য ছয় ঘন্টা। হঠাৎ করে এই জরুরি খোঁজ কেন? বাবার কিছু হয়নি তো! কাঁধে যেন বিশাল বড় পাথর চেপে বসেছে গ্রে-র।

একেকবারে একটা করে সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাও.

'ভালো খবরটা হচ্ছে,' বলছে মঙ্ক, 'কয়েকজন রোগী সুস্থ হয়ে উঠছে, অর্থাৎ রোগটা শতভাগ প্রাণঘাতী নয়।'

'কিন্তু এখনও আমরা জানি না কেন সবাই অসুস্থ হয়ে উঠছে।' সতর্ক করল যেন ইলিয়ারা।

'তবুও খবরটা ভালো।' বলল গ্রে।

'কিছুটা ভালো বলা যায়।' মঙ্ক চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকাল ইলিয়ারার দিকে। 'বেঁচে থাকা লোকের সংখ্যা নগণ্য। আক্রান্তদের মৃত্যুর হার শতকরা পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ। আমরা সৌভাগ্যবান, এই হার খুব বেশি বাড়েনি। তবে এক জীবাণুতে সব মানুষ মারা যাওয়ার ঘটনা এমনিতেও বেশ দুর্লভ। এমনকী ইবোলা

ভাইরাসও শতভাগ প্রাণঘাতী নয়। ইবোলা রোগের মৃত্যুহার এই জীবাণুর অনেকটাই কাছাকাছি, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।'

মুখ বিকৃত করল গ্রে।

'কিন্তু এখনও উপসংহার টানার সময় হয়নি।' বলল ইলিয়ারা, 'রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে মাত্র পাঁচদিন আগে। আরও অনেক লোক আক্রান্ত হতে পারে।'

'এই যদি হয় ভালো সংবাদের নমুনা, তবে খারাপটা কী?'

মঙ্ক ফিরল ইলিয়ারা দিকে, উত্তর দিল সে, 'আমরা নিশ্চিত হয়েছি, রোগটা ছড়ায় বাতাসের মাধ্যমে। নিঃশ্বাসের সাথে জীবাণু নাক দিয়ে ঢুকে, স্নায়ু হয়ে চলে যায় মস্তিষ্কে। তখন শুরু হয় মস্তিষ্ক-প্রদাহ। কিন্তু ভয়ের কারণ হচ্ছে, জীবাণুটা মস্তিষ্কে গেড়ে বসার পর দুই ঘন্টা পর্যন্ত কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এজন্যই চিকিৎসা করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।'

হাতের তালু ঘষে বলল মঙ্ক, 'অন্যান্য ছোঁয়াচে রোগের মতো এটাও খুব দ্রুত ছড়ায়। আমাদের আশঙ্কা, খুব দ্রুতই ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়বে এই সংক্রামক ব্যাধি।'

একটুও অবাক হয়নি গ্রে। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে পৌঁছানোর রাস্তার কথা মনে আছে ওর। এমনিতে কায়রো জনবহুল শহর, অথচ রাস্তা-ঘাট তখন পুরোপুরি ফাঁকা ছিল! অল্প যে কয়েকজন লোককে চোখে পড়েছে, সবার মুখে ছিল মাস্ক। কাঁধ ঝুঁকিয়ে খুব দ্রুত হেঁটে গিয়েছে রাস্তা ধরে, একে অন্যের সংস্পর্শেও আসতে চাইছে না যেন! প্রচারিত সংবাদ অনুযায়ী, লোকজন নিজেদের প্রয়োজন ছাড়া বেরুচ্ছে না ঘর থেকে। দাঙ্গা বেঁধে গিয়েছে কয়েক জায়গায়, অনেককেই হত্যা করা হয়েছে অসুস্থতার সন্দেহে। আবার কেউ কেউ ডাকাতিতে বাধা দিতে গিয়ে হয়েছে খুন।

আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে এই রোগটার মতোই মারাত্মক আকারে। এমনকী এখনও, খুব কাছ থেকেই বন্দুকের গুলির আওয়াজ কানে এল গ্রে-র।

'কিন্তু দুর্বোধ্য এক রহস্য দানা বেঁধেছে।' বলল ইলিয়ারা।

'কী সেটা?'

'আশ্চর্যের ব্যাপার হলো-প্রফেসর ম্যাককেবের ময়নাতদন্তে অংশগ্রহণকারীই এই রোগের প্রথম শিকার।'

ওই ঘটনার ভিডিয়োচিত্র স্মরণ করল গ্রে, 'অবাক হওয়ার কী আছে? মর্গের ওই দলটা প্রফেসরের উন্মুক্ত মস্তিষ্কের একেবারে সামনে উপস্থিত ছিল।'

'ঠিক,' বলল ইলিয়ারা, 'আমার ধারণা, এম.আর.আই.-এর তড়িৎচুম্বকীয় প্রবাহের কারণে মস্তিষ্কের জীবাণুগুলো উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। ভিডিয়োতে উজ্জ্বল আভাটা একারণেই দেখা গিয়েছে, এই তড়িৎ-খাদক জীবাণুগুলো তড়িৎ শোষণের

পাশাপাশি তড়িৎ নিঃসরণও করতে পারে। এজন্যই এই প্রজাতি বাড়তি তড়িৎ শোষণ করে এবং সেই তড়িৎ বিচ্ছুরণও ঘটায়।'

'ঠিক,' বলল মঙ্ক, 'আমি কিছু তথ্য ঘেঁটে দেখলাম, গবেষকরা এসব জীবাণুর বাস্তব ব্যবহার খুঁজছেন। ডেনমার্কের এক ল্যাবে এমন জীবাণু দিয়ে তড়িৎ পরিবহণের পরীক্ষা করা হয়েছিল; অনেকটা জীবন্ত তারের মতো করে এগুলো ব্যবহার করা সম্ভব।'

'আর্কিয়নের শরীরতত্ত্ব বেশ হতবুদ্ধিকর।' নড করল ইলিয়ারা, 'জীবাণুগুলোর আকার পরিবর্তনশীল। কয়েকটা জীবাণু একসাথে মিলে গঠন করে সুপারসেল। আবার চুলের মতো সূক্ষ্ম জালিকা দিয়েও পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় এরা।'

জালিকাঅলা কোষ স্মরণ করল গ্রে, যেগুলো ইলিয়ারা দেখিয়েছিল ওকে ল্যাপটপে। কল্পনায় দেখতে পেল-কোষগুলো একে অপরের সাথে জুড়ে যাচ্ছে!

'আমার ধারণা,' ইলিয়ারা বলে চলছে, 'এই জীবাণু কাজটা করতে সক্ষম। রোগীদের হ্যালুসিনেশনের একটা ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় তাহলে। জীবন্ত এই তন্তুগুলো মস্তিষ্ককোষে প্রভাব ফেলে, বিশেষ কারণে সৃষ্টি করে ভ্রমের।'

'কী বোঝাতে চাচ্ছ তুমি?' জানতে চাইল গ্রে।

'এই ভ্রমের মাধ্যমে ভয় জাগিয়ে তোলা হয়, যার কারণে অধিক তড়িৎ প্রবাহিত হয় পোষক মস্তিষ্কে। জীবাণুগুলো খাদ্য পায় বেশি।'

'রাজহাঁসকে জোর করে ডিম পাড়ানোর মতো।' যোগ করল মঙ্ক।

ভাবনাটা উদয় হতেই গ্রে-র পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল।

'তবে,' স্বীকার করল ইলিয়ারা, 'এগুলো সবই আসলে প্রাথমিক ধারণা।'

'সেই সাথে অপ্রমাণিতও,' মূল আলোচনায় ফিরে এল গ্রে। 'একটু আগে একটা রহস্যের কথা বলেছিলে, কিন্তু ব্যাখ্যা করোনি, ড. কানো।'

'দুঃখিত, বলছি।' বলল ইলিয়ারা। 'ময়নাতদন্তকারী দলটাই কিন্তু প্রফেসর ম্যাককেবের সংস্পর্শে আসা প্রথম দল নয়। মরুভূমিতে যাযাবর এক দল প্রথম খুঁজে পেয়েছিল তাকে, ঘন্টার পর ঘন্টা ছিল একসাথে। কিন্তু তাদের কেউ তো আক্রান্ত হয়নি, বরং বহাল তবিয়তেই আছে।'

'যার কোন অর্থই খুঁজে পাচ্ছি না আমরা,' বলল মঙ্ক, 'কেননা রোগটা সংক্রামক!'

'এদের কি এই রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে?'

'আমরা তাই আশা করছি,' বলল ইলিয়ারা, 'পুরো পরিবারকেই নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু ডাক্তাররাও কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি।'

মেয়েটার চোখ জ্বলজ্বল করছে, চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করল গ্রে। 'কিন্তু তোমার কাছে একটা ব্যাখ্যা আছে।'

নড করল মেয়েটা।

মাথার মধ্যে ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে গ্রে-র, মেয়েটার চিন্তাধারা বোঝার চেষ্টা করছে।

কী হতে পারে এর কারণ!

হঠাৎ করেই উত্তরটা খুঁজে পেল সে।

সোজা হয়ে বসল গ্রে, 'তুমি ভাবছ, প্রফেসর ম্যাককেবের দেহের এই অদ্ভুত অবস্থার সাথে এর সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ইলিয়ারা, ঠিক এটাই ভাবছিল ও।

হাসল মঙ্ক, 'অবাক হয়ে গিয়েছ, ইলিয়ারা? আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। এমন কথাবার্তা গ্রে সবসময়ই বলে, মনে হয় যেন মনের কথা পড়ার দুর্লভ গুণ আছে ওর। আসলে সব অনুমান। প্রথম প্রথম আমি নিজেই ভেবে পেতাম না, কীভাবে এত নির্ভুল অনুমান করে সে। কিন্তু সাবধান, কখনও ওর সাথে জুয়া খেলতে যেও না। হেরে ভূত হবে।'

বন্ধুর প্রশংসা কানে তুলল না গ্রে, তবে মস্তিষ্কের ধূসর কোষগুলোকে খাটানো বন্ধ করল না। প্রফেসর ম্যাককেবের মমিকরণ প্রক্রিয়াটা ঠিক খাপ খাচ্ছে না এসবের সাথে। অনুমান করেছিল সে, হয়তো কেউ একজন প্রফেসরকে বন্দি করে মমিকরণ প্রক্রিয়ায় যেতে বাধ্য করেছে। এবং প্রক্রিয়াটা শেষ হওয়ার আগেই পালিয়ে এসেছেন ভদ্রলোক।

কিন্তু অনুমানটা যদি ভুল হয়?

ইলিয়ারার দিকে ফিরে তাকাল গ্রে, 'মমিকরণ প্রক্রিয়া নিজ ইচ্ছায় করেছেন প্রফেসর, কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। তা-ই ভাবছ তুমি?'

'সম্ভবত, বিশেষ করে গত দু'দিন তার মেয়ের সাথে কথা বলার পর তেমনটাই মনে হচ্ছে। লোকটা নিজের বিশ্বাসে যেমন অটল, তেমনি বেশ দয়ালুও। জেনে-শুনে এমন একটা মহামারী মরু থেকে লোকালয়ে বয়ে আনবেন বলে মনে হয় না। তার আগে নিজেই আত্মহত্যা করার কথা।'

'তবে যদি নিজেকে অন্য মানুষের জন্য নিরাপদ মনে করে থাকেন, তাহলে কিন্তু

নড করল মেয়েটা, 'ঠিক তাই। মমিকরণ প্রক্রিয়ার ফলে দেহের সব জীবাণু হয়তো মরে গিয়েছে, কিন্তু একটা জায়গা আছে যেখানে তারা বাঁচতে পারবে।'

'মস্তিষ্কে

'সেখানেই জড়ো হয়েছে জীবাণুগুলো।'

প্রফেসরের খুলিতে আটকে থাকা ভয়ঙ্কর বিপদটা যেন দেখতে পেল গ্রে।

আড়চোখে রানওয়ের দিকে তাকাল ইলিয়ারা, 'হয়তো প্রফেসর ভেবেছিলেন, মরু পার হয়ে চলে আসতে পারবেন জীবিত। তিনি সতর্ক করতে চেয়েছিলেন

আমাদের। হয়তো তাকে যে বন্দি করেছিল, সে আরও বড় কোন হুমকি হয়ে দাঁড়াতে চায়।'

কথাটা মেনে নিল গ্রে, হৃৎস্পন্দন বেড়ে গিয়েছে। সে জানে, পুরো অঞ্চলটা সন্ত্রাসবাদীদের আখড়া। সেইচানকে আক্রমণকারী মেয়েটার কথাও মনে পড়ল, অ্যাশওয়েলের চার্চে হামলা চালিয়েছিল উল্কি আঁকা মেয়েটা। সেই মেয়ের সাথে গিল্ডের সম্পর্ক আছে, আর গিল্ড তো এইসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সন্ত্রাসবাদী কাজে ব্যবহারের জন্য কুখ্যাত। যদি কেউ এই আর্কিয়ন নিয়ে আক্রমণের পরিকল্পনা করে, তবে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

মাত্র একজন পেশেন্ট জিরো-তেই এত এত মৃত্যু আর আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা বিশ্বে।

আর যদি শত্রুরা একদল রোগাক্রান্ত লোক পাঠিয়ে দেয়?

গ্রেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল মঙ্ক, 'ভালো আর মন্দ দুটো খবরই তোমাকে শোনালাম। আসল আতঙ্কের খবর তো এখনও বলিনি।'

'আরও আছে?'

ইলিয়ারার দিকে ফিরে তাক'ল মঙ্ক, 'আমরা তো মাত্র প্রথম মহামারীর কথা জেনেছি, সামনে আরও মহামারী আসছে।'

ঘুরল মেয়েটা, 'কিন্তু কথাগুলো জেনেরও শোনা উচিত।'

দুপুর ১:৪৮

পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে

হোটেল রুমে আছে জেন, সোফার এককোণে বসে টেলিভিশন দেখছে। সামনে দুপুরের খাবার, পড়ে পড়ে বাসি হচ্ছে। দু'হাতের মাঝে ধরা এককাপ কফি, উষ্ণতার যোগান দিচ্ছে কাপটা।

গত কয়েক ঘন্টায়, বি.বি.সি. আর স্থানীয় চ্যানেলগুলো শুধু পাল্টে চলছে ও। মিশরীয় আরবি ভালোই জানা আছে, তাই সহজেই কায়রোর চ্যানেলের কথাগুলো বুঝতে পারছে। নাছোড়বান্দা সাংবাদিকরা রাস্তার বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতা সম্পর্কে খবর শোনাচ্ছে। কিন্তু খবর না দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে ও। এখান থেকেই বাইরের সাইরেনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার, চার তলার জানালা থেকে আকাশে কুন্ডলী পাকানো কালো ধোঁয়া উঠে যেতে দেখছে।

মনে হচ্ছে যেন কেয়ামত শুরু হয়েছে পুরো শহরে।

আর এসব ঘটেছে শুধু আমার বাবার কারণে!

নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে ওর। এখন এসব ওকেই ঠিক করতে হবে। বাব সবসময়ই এই পৃথিবীর জন্য ভালো কিছু করতে চাইতেন, এবং তার সন্তানরাং যাতে সেই পথেই হাঁটে-সেটাই ছিল তার চাওয়া। বাবা বিশ্বাস করতেন, এক্সুডাসে বাণী নিছক রূপক নয়। চাইতেন যেন পুরো পৃথিবীতে উচ্চারিত হয় তার নাম।

অবশ্য, এই ইচ্ছাটা পূরণ হয়েছে বাবার।

সবগুলো খবরেই তার নামটা বলা হচ্ছে বারবার, সাথে দেখানো হচে হাস্যোজ্জ্বল একটা ছবি। এমনকী কয়েকটায় ওর বাবার পুরনো ভিডিয়োচিত্র পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে। পুরনো ছবি দেখে, কণ্ঠ-শুনে আরও কষ্ট বাড়ছে জেনের। একটা ছবিতে হারিয়ে যাওয়া পুরো দলটাকে দেখানো হলো, এক কঠোর-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তরুণও আছে ছবিতে। তরুণটা ওর ভাই, নাম রোরি।

ছবিটা মনে করিয়ে দিল, ওর বাবা ছাড়াও ওই দলের আরও অনেকেই হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

ভাইটির জন্য হাজারবারের মতো প্রার্থনা করলো ও, সে অন্তত জীবিত থাকুক।

কর্কশ হাসির আওয়াজ, জানালার দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে দিল জেনের কোয়ালস্কি হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, কানে ধরে রেখেছে ফোন। ক বলছে ঠিকই কিন্তু তাকিয়ে আছে নিচের রাস্তার দিকে।

'মারিয়া,' ফোনে বলছে কোয়ালস্কি, 'একই মহাদেশে আছি মানি, কিন্তু বাকো সাথে দেখা করার মতো সময় নেই এখন। সে তো বড় হয়ে গিয়েছে, জঙ্গলে অনে বন্ধুও বানিয়েছে।'

আড়ি পেতে সব শুনছে জেন, মনোযোগ সরে যাওয়াতে খুশিই হয়েছে কয়েকদিনের কথা-বার্তায় বিশালদেহী লোকটাকে আরও ভালোমতো জানতে পেরেছে সে। জানে লোকটার প্রেমিকা জার্মানিতে থাকে, বোনের সাথে কাজ করছে কোন একটা ল্যাবে। ছুটি কাটাতে ওখানেই বেড়াতে গিয়েছিল লোকটা, কিন্তু ডাব পড়ায় ওখান থেকে সরাসরি লন্ডনে চলে এসেছে বিশালদেহী আমেরিকান।

লোকটার পার্টনার, সেইচান, পাহারা দিচ্ছে হলওয়েতে।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে সোফায় এসে বসল ডেরেক, পা উঠিয়ে দিল টেবিলে। ছেলেটার পায়ে জুতো নেই, বাম পায়ের মোজাটা বুড়ো আঙুলের কাছে ছেঁড়া। অদ্ভুত কোন কারণে ছেঁড়াটা দেখতে ভালো লাগছে জেনের, ওদের জীবনের বর্তমান বিপর্যয়ের প্রমাণ যেন ওটা।

মেয়েটার নজর দেখে নিজের পায়ের দিকে দেখে সেদিকে তাকাল ডেরেক, ফুটোটা নজরে পড়েছে। পায়ের আঙুল ভাজ করে আড়াল করার চেষ্টা করলো ছেঁড়াটা, দেঁতো হাসি উপহার দিল জেনকে। 'যতদূর মনে পড়ে, জামা-কাপড় গোছানোর সময় পাইনি কেউ-ই।'

হাসল জেন, সাথে হেসে উঠল সে-ও। 'অন্তত পায়ে মোজা তো আছে।'

নিজের খালি পায়ের দিকে তাকাল ও, সরিয়ে নিল পা দুটো।

ধমকের ভান করল ছেলেটা, 'লজ্জা! লজ্জা!'

তীক্ষ্ণ চিৎকারে মনোযোগ সরে গেল ওদের, টেলিভিশনে আরবিতে চেঁচাচ্ছে এক জোব্বা পরা লোক। লোকটা আঙুল তুলে রেখেছে সাংবাদিকের দিকে। স্থানীয় ইমাম, প্রচন্ড ক্ষেপে আছে কারও উপর।

'কী বলছে ক্ষ্যাপাটা?' প্রশ্ন করল কোয়ালস্কি।

ভাষান্তর করল জেন, 'লোকটা বলছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর জনসমাগম এড়িয়ে চলার নিষেধাজ্ঞা না মানতে। বদলে সবাইকে শহরের মসজিদে জমায়েত হতে বলছে। সাথে অসুস্থদেরও নিয়ে আসতে বলছে, সবাইকে নিয়ে প্রার্থনা করতে চাইছে লোকটা। বলছে, চিকিৎসা থেকে অসুস্থদের দোয়া বেশি প্রয়োজন।' মন্তব্য করল ও, 'লোকটা তো বদ্ধ উন্মাদ, হাজার হাজার মানুষকে আক্রান্ত করতে চাইছে!'

সোজা হয়ে বসল ডেরেক, 'লোকটা বিশ্বাস করে-এ রোগ সৃষ্টিকর্তার গজব! আর ক্ষমা প্রার্থনাই এর একমাত্র প্রতিকার।'

কাছ থেকে কথা শুনল জেন, 'লোকটা এখন দাবী করছে, একজন রোগীকে নিয়ে নাকি সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিল সে। সেই রোগী দিব্যচোখে দেখতে পেয়েছে একটা দৃশ্য: সীমাহীন অন্ধকার চারিদিকে, দলে দলে মরছে মানুষ, পাশে বয়ে চলেছে রক্তের নদী। কালো হয়ে আসা আকাশে চমকাচ্ছে বিদ্যুতের ঝলক।'

মাথা নাড়ল ডেরেক, 'খুব বেশি দেরি নেই, খুব শীঘ্রই মানুষ এটাকে বাইবেলের মহামারীর সাথে মিলিয়ে নিবে।'

নিজের বাবার নাম শুনতে পেল জেন, 'চুপ।'

কথাগুলো শোনা মাত্র রক্ত ঠান্ডা হয়ে আসছে ওর।

সোফাতে ঠিক হয়ে বসল ডেরেক, 'টেলিভিশন অফ করো। লোকটা যা ইচ্ছা তাই বকে চলছে।'

'বলছে কী?' জিজ্ঞাসা করল কোয়ালস্কি।

হাতে রিমোট তুলে নিল ডেরেক, বন্ধ করে দিল টেলিভিশনের আওয়াজ।

সোফায় হেলান দিয়ে বসেছে জেন, 'সে বলছে, আমার বাবা সৃষ্টিকর্তার প্রচন্ড ক্ষোভের শিকার। মরুভূমিতে এক্সুডাসের প্রমাণ খুঁজতে গিয়েছিলেন তিনি, আর ফিরে এসেছেন সেই মহামারীকে সাথে নিয়ে। পৃথিবীর মানুষের অবিশ্বাসের শাস্তি দিচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা, অতীতের সেই মহামারীকে আবার ফিরিয়ে এনে।'

ডেরেক তাকাল জেনের দিকে, 'জেন, লোকটা ফালতু, বিপদের সুযোগ নিচ্ছে। তোমার বাবার ভালো খ্যাতি আছে বলেই তাকে টেনে এনেছে কথায়। যখন প্রথম

ওই টিমটা অদৃশ্য হয়ে যায়, তখনও এরা বলেছিল-বিশ্বাসের বদলে বিজ্ঞান খোঁজায় ওই পরিণতি ঘটেছে। আর এখন, নতুন এক কাহিনি ফেঁদে বসেছে।'

ঠাস করে খুলে গেল হোটেলের দরজা, লাফিয়ে উঠল সবাই।

সেইচান ঢুকল ভেতরে, এক হাত কানের ইয়ারপিসে, 'গ্রে আসছে।'

ভ্রূকুটি করল কোয়ালস্কি, 'আমরা কী তবে চলে যাব?'

'না, সাথে মঙ্ক আর ড. কানোও আসবে। নতুন একটা তথ্য পেয়েছে ওরা।'

'কী?' দাঁড়িয়ে পড়ল ডেরেক।

জেনের দিকে ফিরল সেইচান, 'নতুন মহামারী সম্পর্কে।'

এক দৃষ্টিতে টেলিভিশনের পর্দায় তাকিয়ে আছে জেন। ইমাম সাহেব এখন উঠে দাঁড়িয়েছে, চোখ-মুখ লাল করে চেঁচাচ্ছে। পর্দার একপাশে ভেসে আছে ওর বাবার ছবি। ডেরেকের বলা কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে, ধর্মান্ধ লোকগুলোর উন্মাদ বাক্য ওসব।

কিন্তু যদি লোকটার কথা সত্যি হয়?

দশ

২রা জুন, দুপুর ২:০৭, ই.ই.টি.
কায়রো, মিশর

হোটেল রুমে এসেই সবাইকে চিন্তিত দেখল গ্রে। জেন দাঁড়িয়ে আছে, হাত দুটো বুকের কাছে ভাঁজ করে ধরা। ডেরেক দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটার পাশে। ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে সেইচান আর কোয়ালস্কি, দু'জনেই তাকিয়ে আছে শব্দহীন টেলিভিশনের দিকে।

গ্রে-র পেছন পেছন মঙ্ক আর ইলিয়ারা প্রবেশ করল। তাদের দেখে এগিয়ে এল জেন, 'নতুন মহামারীটা কী?'

'বলো ওদের, কথা শেষ হলে জানিও।' সাথের দু'জনকে নির্দেশ দিয়ে পাশের বেডরুমে চলে গেল গ্রে। একটু গোপনীয়তা প্রয়োজন ওর। ঘড়ি দেখে স্যাটেলাইট ফোন হাতে তুলে নিল সে, ডি.সি.তে সকাল আটটা বাজে। ভাইকে ফোন দিতে হবে এখন।

দরজা বন্ধ করে কেনির নাম্বারে ফোন দিল গ্রে, কয়েকবার রিং বাজার পর ধরল ওর ভাই।

'কে . . .কে বলছেন?'

'কেনি, আমি গ্রে।'

'ওহ, হাই।' কেশে গলা পরিষ্কার করল কেনি। 'কয়টা বাজে?'

বিরক্তি বোধ করছে গ্রে, 'ফোন দিতে বলেছিলে। কী হয়েছে? বাবা ঠিক আছেন তো?'

'হ্যাঁ . . .মানে না। জানি না।'

গ্রে কানে চেপে ধরল ফোন, 'কেনি, কী হয়েছে আমাকে বলো শুধু।'

'গতকাল নার্সিং হোম গিয়েছিলাম। বাবা বিশেষ তত্ত্বাবধানে আছেন। ভেতরে ঢোকার আগে আমাকে গ্লাভস, মাস্ক, গাউন-সব পরতে হয়েছে।'

চোখ পাকাল গ্রে, ইতিমধ্যেই বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছে।

'বাবা নতুন এক ধরনের ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়েছেন। রেসিস্ট্যান্ট স্ট্যাফ জাতীয় কিছু একটা।'

বিছানায় বসল গ্রে, 'স্ট্যাফ? এম.আর.এস.এ. না তো?'

'কী?'

'মেথিসিলিন রেসিস্ট্যান্ট স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস।'

'হ্যাঁ, এটাই। ডাক্তাররা পচনের ভয় পাচ্ছেন, তাই কয়েকটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছেন। বাবাকে আরও কয়েকটা দিন থাকতে হবে হাসপাতালে।'

বাহ .বেশ চমৎকার!

'কেমন আছেন তিনি?'

'আমি যখন এসেছিলাম তখন অজ্ঞান ছিলেন। রক্তচাপের সমস্যাটা বেড়েছে। ডাক্তাররা গায়ের একটা দাগকে দীর্ঘক্ষণ একইভাবে শুয়ে থাকার কারণে হওয়া ক্ষত বলে সন্দেহ করছেন।'

আত্মগ্লানিতে ভুগল গ্রে, তার থাকা উচিত ছিল বাবার সাথে। কল্পনা করল, শীর্ণকায় লোকটা শুয়ে আছেন বিছানায়, সারা দেহে মেশিন আর আই.ভি. লাইন লাগানো। পিতার অসহায়ত্ব যেন সংক্রমিত হলো তার মাঝেও।

বাবার বলা শেষ কথাটা এখনও কানে বাজছে।

কথা দাও .

বাবার শেষ কথাটা শুধু একটা অনুরোধ ছিল না, জানে গ্রে। বাবা ওকে বেঁচে থাকতে থাকতে ফিরে যেতে বলেনি। জন্মদাতার আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল ওর।

আমি তৈরি।

কথাটার সাথে বাবার চোখে এক নীরব আকুতি ফুটে উঠেছিল, সঠিক সময়ে যাতে কঠিন সিদ্ধান্তটা নিতে পারে গ্রে।

কিন্তু পারব কি আমি?

'এটুকুই, আর কোনকিছু ঘটলে অবশ্যই জানাবো তোমাকে।' বলল কেনি, ফোন রেখে দিতে চাইছে।

'ধন্যবাদ .বাবার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ, কেনি।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল কেনি, অবশেষে নরম সুরে বলে উঠল, 'তুমি আসার আগ পর্যন্ত আছি, চিন্তা কোরো না।'

ফোন রেখে দিল গ্রে, চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। পাশের রুম থেকে কথার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল সে, লক্ষ করল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটি অবয়ব। অবয়বটা ওর বড্ড পরিচিত।

সেইচান।

'সবকিছু ঠিক আছে?' জানতে চাইল সেইচান।

ফোনটা পকেটে রাখল সে, 'পুরোপুরি না, তবে কিছু করারও নেই আমার।'

অন্তত, এখন না।

কথা দাও

এগিয়ে এল মেয়েটা, কোমর জড়িয়ে ধরল গ্রে-র। গ্রে-র বুকে মাথা রাখল ও, কাছে টেনে নিল ওকে। গ্রে নিজেও জানে মেয়েটা নিজ অতীত ভোলার জন্য নিত্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তবুও, সংগ্রামী সময়ের মাঝের অবকাশটুকু উপভোগ করার প্রয়াস দেখা যায় দু'জনের মাঝেই।

অবশেষে, পাশের ঘর থেকে ডেকে উঠল কেউ।

'গ্রে!' ডাকছে মঙ্ক, 'বাকিটুকু শুনতে চাইলে জলদি এসো।'

সরে দাঁড়াল সেইচান, চোখে তৃপ্তির হাসি, 'অথবা, আমরা এখন পালিয়েও যেতে পারি। এখনই। নজর রাখার সময় ফায়ার এস্কেপ দেখেছি আমি।'

কথাটা রসিকতার ছলে বললেও, মনে মনে তাই চাইছে মেয়েটা। এমনকী সে নিজেও। কী হয় পিঠ ফিরিয়ে নিলে? ফায়ার এস্কেপের সিঁড়ি বেয়ে পালিয়ে গেলে?

কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসার আগেই ঘুরে দাঁড়াল সেইচান, ভয় পাচ্ছে পাছে ওর মনের কথা পড়ে ফেলে গ্রে।

'যাওয়ার সময় হয়েছে।' দরজার দিকে এগোল ও।

অনুসরণ করল গ্রে, দায়িত্ব সর্বদা আগে, এখানকার এবং বাড়িতেও।

কথা দাও .

দুপুর ২:২২

জেনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে ডেরেক, মেয়েটার মন ছেয়ে আছে কালো মেঘে।

গত কয়েক মিনিটে তারা দু'জন পুরো ঘটনাটা শুনেছে মঙ্ক আর ইলিয়ারার কাছে। কিন্তু সব কথার মাঝেও বুঝতে পেরেছে, সূত্র একটাই। জেনের বাবা, প্রফেসর ম্যাককেব।

'তাহলে তুমি ভাবছ, তিনি আমাদেরকে বাঁচাতেই এই মমিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন?' প্রশ্ন করল জেন, কণ্ঠে স্বস্তি।

'ঠিক তাই।' জেনের কাঁধে হাত রাখল ইলিয়ারা, 'কিন্তু তার দেহ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায়, তা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না আমরা।'

'লন্ডনের মেডিকেল ল্যাব ধ্বংস করে দেওয়ার পিছনে এটা একটা কারণ হতে পারে।' বলল মঙ্ক। 'কেউ চায়, এই তথ্য যেন আমরা জানতে না পারি।'

'আরো কয়েকটা মহামারী আসছে বলে উল্লেখ করেছিলে তুমি।' বলল জেন।

'হ্যাঁ, প্রায় নাকের ডগায় চলে এসেছে বলা যায়।' গ্রে আর সেইচানের দিকে ইশারা করল মঙ্ক। 'একেবারে ঠিক সময়ে চলে এসেছ।'

ইলিয়ারার দিকে নড করল গ্রে, 'বলো তুমি কী বোঝাতে চেয়েছিলে?'

মুখ তুলে তাকাল মেয়েটা, বুঝে উঠতে পারছে না ঠিক কীভাবে ব্যাখ্যা করবে পুরো বিষয়টা। 'জিন ড্রাইভ শব্দটা জানা আছে তোমাদের কারও?' সবার শূন্য দৃষ্টি দেখে যা বোঝার বুঝে নিল ও। 'জিকা ভাইরাস?'

ভ্রূকুটি করল গ্রে, 'দক্ষিণ আমেরিকার ভাইরাসটা? যা পুরো যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল?'

'একদম ঠিক।'

রোগটা সম্পর্কে ডেরেকও জানে, নবজাতকের উপর পর্যন্ত প্রভাব পড়ে এতে; বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়।

'যুক্তরাষ্ট্রসহ আরও কয়েকটা দেশ, এই রোগের প্রাদুর্ভাব রুখতে জিন ড্রাইভ টেকনোলজি ব্যবহার করেছিল। নির্দিষ্ট প্রজাতির মশা ছিল এই প্রযুক্তির লক্ষ্য, যে প্রজাতি এই ভাইরাসের পোষক।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল জেন, 'কী এই জিন ড্রাইভ টেকনোলজি?'

'এই পদ্ধতি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা এমন কিছু পরিবর্তন আনেন জিনে, যা পুরো প্রজাতির ওপর প্রভাব ফেলে। ফ্লোরিডার বিজ্ঞানীরা এক ঝাঁক এডিস এজিপ্টি নামক প্রজাতির মশার জিন পরিবর্তন করে দেন। এই প্রজাতির মশাই জিকা ভাইরাসের বাহক। জিন পরিবর্তনের ফলে পুরুষ মশাগুলোর শুক্রাণু থেকে জন্ম নেয় বন্ধ্যা স্ত্রী মশা, ফলে বংশবিস্তার করতে পারে না। এক বছরে এই মশা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ফ্লোরিডা থেকে, সাথে মশাবাহিত জিকা রোগও।'

'কিন্তু একটা জিনিস বুঝলাম না,' বলল ডেরেক, 'এই জিন ড্রাইভ পদ্ধতি কি তুমি এই রোগের জীবাণুর উপর ব্যবহার করতে চাইছ?'

'না।' রুমের সবার দিকে তাকাল ইলিয়ারা, 'এক্ষেত্রে জিন ড্রাইভ টেকনোলজির প্রাকৃতিক সংস্করণের মুখোমুখি হয়েছি আমরা। আর এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্য কোন মশা বা অন্য প্রাণী নয়, বরং আমরা।'

হাতে ল্যাপটপ নিল ইলিয়ারা, 'তোমাদের দেখাই তাহলে।' কম্পিউটার চালু করে বলল ও, 'আর্কিয়ন জীবাণু কীভাবে কাজ করে তা আগেই বলেছি, কিন্তু এই নির্দিষ্ট জীবাণু ভাইরাসের ছোট ছোট কণা নির্গত করতে পারে। কণাগুলোই রোগীকে আক্রান্ত করে তোলে।'

'অনেকটা ট্রোজান হর্সের মতো।' বলল মঙ্ক, 'একবার যদি ঢুকতে পারে ভেতরে, তবে নিজের আসল রূপটা দেখায়।'

'ভাগ্যক্রমে, সবগুলো ভাইরাসই নিরীহ, শুধু একটা ছাড়া। ওটা জিকার সমগোত্রীয় ভাইরাস, এবং বেশ ক্ষতিকরও।'

'কী কী প্রভাব আছে এর?' জিজ্ঞাসা করল গ্রে।

'মায়োসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে,' ব্যাখ্যা করল মহিলা। 'আমাদের দেহের বৃদ্ধি এবং ক্ষত পূরণ হয়ে থাকে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়ায় একটা কোষ বিভাজিত হয়ে অভিন্ন দুটো অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। কিন্তু মায়োসিস বিভাজন হয় জননকোষে, ডিম্বক আর শুক্রাণুতে। এই প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের অর্ধেক জিনেটিক কোড নিয়ে গঠিত হয় কোষ।'

কথাগুলো পছন্দ হচ্ছে না গ্রে-র, 'আমাদের কী ক্ষতি করতে পারে এই ভাইরাস?'

'শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি ক্রোমোজোমের ক্ষতি।' কম্পিউটার থেকে পিছিয়ে এল কানো, 'সব স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতো মানুষেরও এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম আছে, পুরুষের এক্স-ওয়াই এবং নারীদের এক্স-এক্স।'

ল্যাপটপের দিকে ইশারা করল ও, 'এই যে সুস্থ স্বাভাবিক একজোড়া ক্রোমোজোমের ছবি। যেমনটা দেখা যাচ্ছে, ক্রোমোজোম এক্স আকারে ওয়াই থেকে অনেকটাই বড়।'
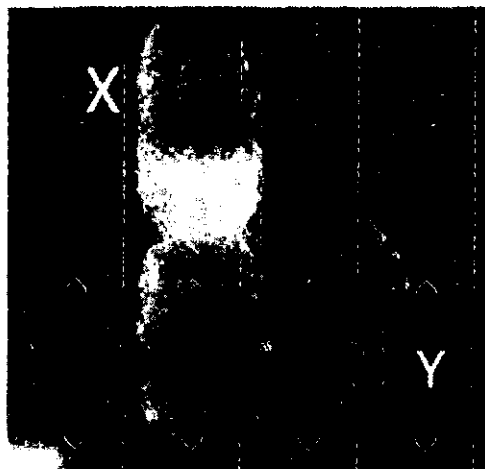
পর্দায় ছোট আরেকটা ক্রোমোজোমের ছবি দেখা যাচ্ছে।

'ভাইরাসটা শুধুমাত্র ক্রোমোজোম ওয়াইকেই আক্রমণ করে। আমি জানি না কেন, হয়তো দুর্বল টার্গেট বলেই।' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ইলিয়ারা, 'যাই হোক, আক্রান্ত ক্রোমোজোমের আকার হয় অনেকটা এমন।'

স্ক্রিনের মাঝে আরেকটা ছবি, ক্রোমোজোমের বড় একটা অংশ উধাও এখানে।

'ওভেন গ্লাভসের মতো লাগছে দেখতে।' লক্ষ্য করল কোয়ালস্কি।

'হ্যাঁ, অনেকটাই তেমন।' বলল ইলিয়ারা।

ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল বিশালদেহী লোকটা, আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পেরে সন্তুষ্ট।

বলে চলল ইলিয়ারা, 'জিনবিদরা বিশ্লেষণ করেছে ক্ষয়প্রাপ্ত ক্রোমোজোম ওয়াইকে। রোগাক্রান্ত পুরুষের জননকোষে থেকে যাবে এই ত্রুটি, ফলে ভবিষ্যৎ সন্তানের ওপর পড়বে এর প্রভাব। মেয়ে সন্তানরা নিরাপদ, এক্স-এক্স ক্রোমোজোম জোড়ের কারণে। কিন্তু ছেলে সন্তানরা ত্রুটিপূর্ণ ক্রোমোজোম ওয়াই নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করবে।'

বিপদের স্বরূপ অনুধাবন করতে পেরেছে ডেরেক, 'অর্থাৎ, ভাইরাস থেকে যদি রক্ষা পেয়ে যাইও আমরা, তবুও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হুমকির মুখে পড়বে!'

এক পা পিছিয়ে গেল জেন, চেহারা পান্ডুবর্ণ ধারণ করেছে।

'কী হলো?' জানতে চাইল ডেরেক

'দশম মহামারী .বাইবেলের টেনন্থ প্লেগ।' অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠল মেয়েটা।

ভ্রূকুটি করল ও, 'তুমি কী বোঝাতে চাইছ?'

টেবিল থেকে পিতার বাইবেল তুলে নিল সে, পাতা উল্টে নির্দিষ্ট এক পাতায় স্থির হলো। জোরে জোরে পড়তে লাগলঃ

এবং, মারা যাবে মিশরে জন্ম নেওয়া সবার প্রথম সন্তান। মারা যাবে ফারাওয়ের প্রথম সন্তান, যে ভবিষ্যতে হতো সেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। মারা যাবে চাকর-দাসীর প্রথম সন্তান, বাদ যাবে না পশুরাও।

বই নামিয়ে রাখল সে, 'বাদ যাবে না পশুরাও।' পুনরাবৃত্তি করল জেন। 'ড. কানো বলেছে, এই জীবাণুগুলো মানুষের পাশাপাশি পশুদেরও আক্রমণ করে।'

'হ্যাঁ, স্নায়ুতন্ত্রে বিদ্যুত থাকলেই হলো।'

'টেনন্থ প্লেগের এটাই তাহলে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।' বলল জেন। 'যেটা পশু আর মানুষ উভয়কেই আক্রমণ করে। প্রাচীন মিশরের কয়েক মাস লেগেছে নীল নদের দূষিত পানির প্রভাব কাটাতে, আর এই জিনেটিক ক্ষতির প্রভাব তো কয়েক বছরেও কমানো সম্ভব নয়। পুরুষ শিশুদের মৃত্যুর ফলেই গড়ে উঠেছে এই দশম মহামারীর ঘটনা, সর্বশেষ অভিশাপ।'

নড করল ইলিয়ারা, তাকিয়ে আছে জেনের কাছ থেকে কিছু শোনার আশায়।

'প্রফেসর ম্যাককেবের নিজস্ব থিওরি ছিল বাকি সব মহামারীর ব্যাপারেও।' যোগ করল ডেরেক, সবার নজর এখন তার দিকে। 'হ্যারল্ডের সাথে নানা সময়ে বাজি ধরেছি আমি, বিষয় বাইবেলের এই দশটি মহামারী। তখনই এমন একটা থিওরি ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি।'

'কী ছিল সেই থিওরি?' জানতে চাইল গ্রে।

ছেলেটা উত্তর দেয়ার আগেই বলে উঠল জেন, 'তিনি বিশ্বাস করতেন, এসবের শুরু নীল নদের পানি দূষিত হয়ে রক্তবর্ণ ধারণ করার সাথে। নানা কারণেই পানির দূষিত হতে পারে-বিশেষ করে শৈবাল, ব্যাকটেরিয়া বা ধাতুর পরিমাণ বেড়ে গেলে তো বটেই।'

একমত পোষণ করল ইলিয়ারা, 'আর এই নাটকীয় পরিবর্তন মধ্যপ্রাচ্যেই বেশি ঘটে। যেমন, ইরানের উরমিয়া হ্রদ প্রতি গ্রীষ্মে টকটকে লাল বর্ণ ধারণ করে। এর কারণ-হ্যালোব্যাকটেরিয়াসিয়ার অতিরিক্ত বৃদ্ধি।' গ্রে-র দিকে ফিরল সে, 'সেটাও একটা আর্কিয়ন জীবাণু।'

'যে রোগটা আমার এখন মোকাবিলা করছি, সেটার মতো।' চোখ ছোট ছোট হয়ে গেল গ্রে-র, 'এমন নজির এখানে তাহলে নতুন নয়!'

'শুধু এখানেই নয়।' সাথে সাথে বলল ইলিয়ারা, 'আরেকটি আর্কিয়নের কারণে গোলাপি বর্ণ ধারণ করে ইউটাহের গ্রেট সল্ট লেক।'

'কিন্তু বাকি নয়টা মহামারীর সাথে এর সম্পর্ক কী?' জানতে চাইল গ্রে।

উত্তর দিল ডেরেক, 'নীল নদ যদি বিষাক্ত হয়ে যায়, তবে উপরওয়ালার সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়াই বাকি মহামারীগুলো ঘটা সম্ভব।'

প্রফেসরের জার্নাল খুলল ও, বের করল দশটা মহামারীর নাম লেখা পাতাটা। আঙুল চালাল তালিকায়, ব্যাখ্যা দিল।

১) পানি রক্তে পরিণত হওয়া
২) ব্যাঙের লোকালয়ে উপদ্রব
৩) উকুনের অসহনীয় অত্যাচার
৪) মাছির আক্রমণ
৫) পশুদের রোগ
৬) চর্মরোগ
৭) শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত
৮) পঙ্গপালের আক্রমণ
৯) তিন দিন টানা অন্ধকার
১০) প্রথম সন্তানের মৃত্যু

'পরের তিন দুর্যোগ-ব্যাঙ, উকুন এবং মাছি-নীল নদের রং পরিবর্তনের পর ঘটেছে। বিষাক্ত পানি থেকে হয়তো নদীর পাড়ে উঠে গিয়েছে ব্যাঙ, মারা পড়েছে

দলে দলে। আকস্মিক হারে ব্যাঙ কমে যাওয়ায় বেড়ে গিয়েছে ব্যাঙের শিকার-মশা, মাছি আর উকুনের সংখ্যা।'

'আর রক্তের মাধ্যমে ছড়ায় এই রোগ। মশা, মাছি আর উকুন এই রোগ ছড়িয়েছে মানুষসহ অন্যান্য সব পশুর মাঝে।' মনে করিয়ে দিল জেন।

'পঞ্চম আর ষষ্ঠ দুর্যোগ?' ডেরেকের দিকে তাকিয়ে বলল গ্রে।

'এগুলোর অন্য ব্যাখ্যা আছে।' পরের তিনটা লেখার ওপর হাত রাখল ডেরেক, 'শিলাবৃষ্টি, পঙ্গপাল আর অন্ধকারের সাথে নীল নদের সম্পর্ক নেই।'

ওর দিকে তাকাল গ্রে, 'তবে কী এর কারণ?'

'গ্রিক দ্বীপের আগ্নেয়গিরি থেরা সাড়ে তিন হাজার বছর আগে অগ্ন্যুৎপাত করেছিল। এর ফলে কয়েক বিলিয়ন টনের ছাই তৈরি হয়েছিল, ছেয়ে গিয়েছিল মিশরের আকাশ। প্রত্নতত্ত্ববিদরা কিন্তু মিশরের মাটি খুঁড়ে লাভার পাথর পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছিল!'

'অথচ মিশরে কোন আগ্নেয়গিরি নেই!' মনে করিয়ে দিল জেন।

আবার বলতে শুরু করল ডেরেক, 'আগ্নেয়গিরির সেই বিস্ময়কর বিস্ফোরণের ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। আবহাওয়াবিদরা প্রমাণ করেছে, গরম ছাই মেঘে জমাট বাঁধলে সৃষ্টি হতে পারে ভয়ঙ্কর ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাতের।'

'হয়তো ছাইয়ের মেঘগুলোর কারণেই অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল মিশরের আকাশ।' বলল গ্রে। 'কিন্তু পঙ্গপালের সাথে এর কী সম্পর্ক?'

'পঙ্গপালের বংশবিস্তারের জন্য স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া আদর্শ।' ব্যাখ্যা দিল জেন, 'বায়ুমন্ডলের পরিবর্তনের কারণে ব্যাপক হারে বংশবৃদ্ধি করতে সমর্থ হয় তারা।'

'যার ফলে দশম মহামারীর সূচনা ঘটে।' বলল ডেরেক। 'হ্যারল্ডের মতে, প্রথম সন্তানরা স্বভাবতই পরিবারের আদুরে হয়, সংসারের বেশিরভাগ খাদ্যই দেওয়া হয় ওদের। তাই, পঙ্গপালের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকা শস্য খেয়ে, ছত্রাকজনিত রোগের কারণে মারা যায় বাচ্চাগুলো।'

জেনের দিকে ঘুরল ইলিয়ারা, 'কিন্তু তোমার বাবাও এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। একই ছত্রাকে আক্রান্ত শস্য বাকিরাও খেয়েছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু প্রথম সন্তানের মৃত্যুবরণের সাথে এর আলাদা সম্পর্ক নেই।'

ল্যাপটপের পর্দায় চোখ ডেরেকের, 'হয়তো এখন আমরা কোন ভালো ব্যাখ্যা পাব, যাতে প্রথমটার সাথে শেষটা জুড়ে দেওয়া যায়।'

পুরো আলোচনায় এই প্রথমবারের মতো জানতে চাইল সেইচান, 'কিন্তু সাত নাম্বার পয়েন্টটা গোল চিহ্ন দেওয়া কেন?' আঙুল দিয়ে দেখালো চিহ্নিত লেখাটা।

শ্রাগ করল ডেরেক, তাকাল জেনের দিকে। মেয়েটা শুধু মাথা ঝাঁকাল।

'জানি না।' বলল সে।

নতুন একটা প্রশ্ন তুলল গ্রে, 'যদি এই জীবাণুই হয় সব মহামারীর কারণ, তবে মিশরীয়রা কীভাবে মোকাবিলা করেছিল এর বিরুদ্ধে?'

উত্তরটা জানা নেই জেনের, 'তখনকার জগত ভিন্ন ছিল, আলাদা ছিল শহরগুলো। রোগটা ওই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল, এবং সময়ের সাথে সাথে হয়তো বিলুপ্তও হয়ে গিয়েছে।'

ভ্রূকুটি করল ইলিয়ারা, ব্যাখ্যাটা পছন্দ হয়নি ওর। 'অন্য কোন কারণ থাকতে পারে .এমন কিছু, ওই মরুভূমিতে যা খুঁজে পেয়েছিলেন প্রফেসর।'

সন্দেহের চোখে মেয়েটার দিকে তাকাল গ্রে, 'তুমি কী ভাবছো ওই প্রাচীন মানুষগুলো এই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছিল? এমনকী এই উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞানও যা খুঁজে পায়নি?'

শ্রাগ করল ইলিয়ারা, 'আগেও এমন ঘটনার প্রচুর নজির আছে, যেমন এম.আর.এস.এ.।'

তীক্ষ্ণ নজরে তাকাল গ্রে, 'এম.আর.এস.এ.-এর কী হয়েছে?'

'যখন এই মারাত্মক জীবাণুটার প্রাদুর্ভাব শুরু হয়, তখন এক গবেষক ওটার প্রতিষেধক বের করেন। ইউনিভার্সিটি অফ নটিংহ্যামের সেই বিশেষজ্ঞ, নয়শ' খ্রিস্টাব্দে রচিত একটি বই থেকে এই ওষুধ পেয়েছিলেন। বইটার নাম ব্যাল্ড'স লীচবুক। মূলত প্রতিষেধকটা রসুন, পেঁয়াজ, পলাণ্ডু, ওয়াইন আর গরুর পাচকরসের এক মিশ্রণ।'

'গরুর পাচকরস?' বিড়বিড় করে বলল কোয়ালস্কি, 'যদি এটা ওষুধ হয়, তবে আমি অসুস্থ থেকে মরে যেতে রাজি।'

বিশালদেহী লোকটার কথা পাত্তা দিল না গ্রে, 'কাজ করেছে?'

'অণুজীববিজ্ঞানীরা এই মিশ্রণ ব্যবহার করে দেখেন, এম.আর.এস.এ.-এর নব্বই শতাংশ ব্যাকটেরিয়া মারা যাচ্ছে।'

'জিনিসটা কাজ করে তাহলে!' বলল গ্রে।

নড করল ইলিয়ারা, 'মিশরীয়রা এমন কোন ওষুধ আবিষ্কার করেনি তা কে বলতে পারে? সামান্যতম সম্ভাবনা থাকলেও আমাদের খোঁজা উচিত।'

ঘড়ি দেখল গ্রে, 'তাহলে এখন আমাদের উঠতে হবে। পনেরো মিনিট পর রওনা দিবে বিমান।'

সবাই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করল।

ডেরেক ব্যাগ গোছাতে লাগল, মঙ্ক ওর পার্টনারকে টেনে নিল একপাশে, 'পেইন্টারের সাথে কথা হয়েছে, তিনি চান আমি আর ইলিয়ারা থেকে যাই কায়রোতে। যাতে করে নজর রাখতে পারি নামরু-৩-এ।'

'বুঝেছি, তোমাদেরকে গ্রাউন্ড জিরোতে সিগমার চোখ এবং কান বানিয়ে রাখতে চাইছেন। এই তো?'

'রাজনৈতিক আর ধর্মীয় ব্যাপারেও মাথা ঘামাচ্ছেন তিনি। খ্যাপাটে হয়ে উঠেছে ধর্মীয় দল, দাবী করছে কেয়ামত সন্নিকটে। যতকিছুই বলো না কেন, শান্ত হবে না এরা।'

'তাহলে তো বেশ বিপদে পড়তে হবে তোমাকে।'

ওর কাঁধে হাত রাখল মঙ্ক, 'তবুও তোমার থেকে ভালো অবস্থানে থাকব আমি।'

'কীভাবে?'

'অন্তত এয়ার কন্ডিশনারের বাতাস তো খেতে পারব।' দাঁত কেলিয়ে হাসছে মঙ্ক।

দু'জনের আলোচনায় বাঁধা দিল সেইচান, 'মঙ্ক, পেইন্টারের সাথে শেষ কখন কথা বলেছিলে? অ্যাশওয়েলের চার্চের সেই খুনি সম্পর্কে কিছু জানিয়েছেন তিনি?'

কথাটা কানে বাজতে থাকল ডেরেকের, বাইরে এমন আরও অনেক খুনি ওঁত পেতে অপেক্ষা করছে ওদের আশায়।

মাথা নাড়ল মঙ্ক, 'ক্যাটের সাথে এখনও কাজ করছেন তিনি। তবে, পেইন্টার আশাবাদী। সাফিয়ার কাছে পৌছানোর একমাত্র সূত্র এই উল্কি আঁকা মেয়েটা।'

চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সেইচানের, 'তাহলে আমার আগেই মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে হবে তাকে।'

এগারো

২রা জুন, দুপুর ৩:২২, ই.ই.টি.
কায়রো, মিশর

হাতের বাইনোকুলার নামিয়ে রেখেছে ভালিয়া মিখাইলোভ, ভাড়া করা রুমের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। আকাশে ভেসে থাকা সি-১৩০ হারকিউলিস ব্যাংক-এর দিকে নজর, বিমানটা দক্ষিণ দিকে রওনা দিচ্ছে। বিমানে ওঠা দলটার উপর গোয়েন্দাগিরি করছিল সে এতক্ষণ, নিশ্চিত হওয়া চাই: জেন আছে ওই গ্রুপের সাথে, নাকি নেই?

সন্তুষ্ট হয়ে ব্লুটুথ রিসিভার ঠোঁটের কাছে নামিয়ে নিয়ে এল ও, 'খার্তুমের দিকে রওনা দিয়েছে এরা।' ছোট ভাইকে জানাল সে।

অ্যান্টনের গলা শুনতে পেল কানে, 'পরিকল্পনামাফিক ঘটছে সবকিছু। মরুভূমি থেকে সহজেই ছিনিয়ে নেয়া যাবে প্রফেসরের মেয়েকে, নির্দিষ্ট জায়গাতে লোক তৈরি থাকবে।'

'ঠিক আছে।'

কথা শেষ হলো ওদের।

গত দু'দিন যাবত মেয়েটার পিছু নিয়েছে ভালিয়া। গিল্ডের সাথে থেকে অনুসরণের অদ্ভুত দক্ষতা অর্জন করেছে সে। এক্ষেত্রে ওর সমকক্ষ খুব কমই আছে। তবে, বিদ্যাটা শেখার সময়কার কিছু স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে পিঠে-কাটা দাগ হয়ে। ওর শিক্ষক ছিল নৃশংস, দেখতে পেলেই পেটাত। তাই সময়ের সাথে সাথে অন্ধকারের একটা ছায়াতে পরিণত হয়েছে ভালিয়া, প্রশিক্ষণ সেই গুণটাকেই বাড়িয়ে দিয়েছে আরও।

নতুন নিয়োগকর্তার সাহায্য এবং নিজের ট্র্যাকিং দক্ষতার ফলে সহজেই টার্গেটকে অনুসরণ করতে পেরেছে মেয়েটি। অ্যাশওয়েলের ট্রেন স্টেশন থেকে কায়রোর হোটেল পর্যন্ত চলে এসেছে টার্গেটের পিছু-পিছু। এই পুরোটা সময় মেয়েটাকে একা পেতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে।

ধৈর্য ধরতে জানে সে, প্রশিক্ষণের সময় অস্থিরতা গায়ে আরও ক্ষত যোগ করত শুধু। ধৈর্যের শিক্ষাটা সেখান থেকেই পেয়েছে ভালিয়া।

কিন্তু আরও একটা কারণে দেরি করছে ও।

মোয়া সেস্ট্রা

একটা রহস্যময়ী মেয়ে, যে তাকে অ্যাশওয়েলে প্রায় ধরে ফেলেছিল। ওর লোকদের সহজেই খুন করে ফেলেছে সেই রহস্যময়ী। মেয়েটার চেহারাটা দেখেছে

সে, কিন্তু চেহারা দেখে নয়, আচরণ আর দক্ষতায় চিনে ফেলেছে ওর আসল পরিচয়। এই মেয়েটা তিন তিন বার দেখেছে ভালিয়াকে, আজ পর্যন্ত যা কেউ পারেনি!

কারণ হতে পারে মাত্র একটা–ওর মতো মেয়েটারও একটা অতীত আছে।

সত্যটা উপলব্ধি করে শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল স্রোত নেমে গেল ওর।

সে জানে মেয়েটার আসল পরিচয়-মেয়েটা ওরই বোন, ওরই ছায়া।

বিশ্বাসঘাতক গিল্ড সদস্যের গল্প শুনেছে ভালিয়া, মেয়েটা গিল্ডের সবচেয়ে দক্ষ সদস্যদের মধ্যে একজন ছিল। ইউরেশীয় বংশজাত মেয়েটার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে পুরো গিল্ড। ওর ভাই এবং ও মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছে।

সৌভাগ্যক্রমে, নিজেকে লুকাতে জানি আমি।

আক্রমণ থেকে একসাথে পালিয়েছে দুই ভাইবোন, খুঁজে নিয়েছে নতুন মালিক। কিন্তু তাই বলে সেই আগের মতো পায়নি সবকিছু।

ওর সব দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী সেই বিশ্বাসঘাতক।

নিজের ভেতর উন্মত্ত রাগ টের পেল, সাথে উত্তেজনাও।

অবশেষে, সত্যিকারের চ্যালেঞ্জটা খুঁজে পেয়েছে ভালিয়া।

নিজের রুমে গেল সে, টেবিলে সাজিয়ে রাখা নানা ধরনের ছুরি। ধারালো ব্লেডগুলো উজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে! সবচেয়ে পুরনো ড্যাগারটা তুলে নিল সে, এটার মালিক ওর নানী। তিনি সাইবেরিয়ার গ্রামে থাকতেন, পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যোগ দেন সামরিক বাহিনীতে। একটা নারী ইউনিটের সদস্য ছিলেন তিনি, ৫৮৮ তম নাইট বোম্বার রেজিমেন্ট। বাইপ্লেন উড়াত দলটা, পোলিকারপোভ পো-২ কুকুরুজনিক মডেলের বিমান। রাতের আঁধারে নিঃশব্দে উড়ে চলত বিমান, ধরা পড়ত না জার্মান নাৎসিদের চোখে। অপ্রস্তুত শত্রুশিবিরে আকস্মিক হামলা চালাত এই দল। ভয়ঙ্কর সব হামলার জন্য তাদের নামকরণ করা হয় নচনায়ে ভেডমাই বা আঁধারের ডাইনী।

হাসল ভালিয়া, জানে নানী কেন ওই রেজিমেন্টের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। পুরনো ছুরিটার তীক্ষ্ণ পাশ আর কালো হাতলটা স্পর্শ করলো সে। হাতলের এই কারুকাজ খোদাই করতে নানীর সময় লেগেছে এক চন্দ্রমাস। এটা একটা অ্যাথেমি, ঐন্দ্রজালিক নানা উপলক্ষে ব্যবহৃত হয় এই ড্যাগার। নানী গ্রামের একজন সম্মানিতা বাবকা, গায়ের ওঝা। জ্ঞান এবং যন্ত্র ভালিয়া, ওর ভাই এবং মাকে দিয়ে গিয়েছেন নানী।

যে উপহার পরবর্তীতে বয়ে এনেছে দুর্ভাগ্য...

গ্রামাঞ্চলে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের প্রভাব অনেক বেশি। কয়েক বছর খরা যেতেই গ্রামের লোক দোষ চাপানোর জন্য কাউকে খুঁজতে লাগল। আর এর জন্য

অদ্ভুত পাভুবর্ণের দুটো সন্তানসহ এক বিধবা নারীর চেয়ে ভালো আর কে হতে পারে! যা হওয়ার তাই হলো, নিজ গ্রাম থেকে পালিয়ে এল ওরা। বাধ্য হয়ে কপর্দকশূন্য মা সন্তানসহ বাঁচতে পরিণত হলো বেশ্যায়। একদিন এক খরিদ্দারের হাতে খুন হয়ে বেঁচে গেল মা, নানীর ড্যাগার দিয়ে লোকটাকে খুন করে প্রতিশোধ নিল ভালিয়া।

জীবন বাঁচানোর ছুরি জীবন নিল মানুষের!

তখন ওর বয়স এগারো আর অ্যান্টনের বারো। রাস্তায় নেমে গেল ওরা, হিংস্রতাই ছিল ওদের একমাত্র পুঁজি। একসময় গিল্ড খুঁজে পেল ওদের, গুপ্তসঙ্ঘের সাহচর্যে হিংস্রতা রূপ নিল দক্ষতায়।

আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে ভালিয়া, মুখের উল্কি ঢাকতে পাউডার লাগাচ্ছে। সে এবং তার ভাই-দু'জনেই নিজেদের চেহারা স্বেচ্ছায় বিকৃত করেছিল, কথা দিয়েছিল বিপদে-আপদে একে অন্যের সাথে থাকার।

কিন্তু কোন কিছুই স্থায়ী নয়, তিক্ততার সাথে স্মরণ করল ও।

নিজের জন্য আরেকজনকে খুঁজে নিয়েছে অ্যান্টন।

প্রতিবিম্ব থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল মেয়েটা, তাকিয়ে আছে অ্যাথেমির দিকে। এই ধরনের ছুরি সাধারণত ব্যবহৃত হয় মোম আর জাদুকরি টোটেমের মধ্যে শক্তিশালী চিহ্ন এঁকে দিতে। কিন্তু সে ব্যবহার করে আরও ভয়ানক কাজে, শিকারের কপালে অভিশপ্ত তৃতীয় নয়ন এঁকে দেয়। চিহ্নটা সেই আদি যুগের, হোরাসের চোখের শৈল্পিক রূপ ।

বিশ্বাসঘাতক মেয়েটার কথা ভাবল সে, ওই মেয়েটার জন্যই ধ্বংস হয়েছে গিল্ড, সে এবং তার ভাই নেমে এসেছে রাস্তায়। কাঠের মধ্যে একটা চিহ্ন এঁকে দিল। প্রতিজ্ঞা করল, বিশ্বাসঘাতকের কপালেও শোভা পাবে এই দাগ।

কাজ শেষ হতেই একবার দেখে নিল ও।

ভাই শপথ রক্ষা করেনি, কিন্তু আমি অবশ্যই নিজের শপথ রক্ষা করব।

বারো
২রা জুন, দুপুর ১১:৪৪ ই.ডি.টি.
ওয়াশিংটন, ডি.সি.

'গ্রে-র দলটা নিরাপদে খার্তুমে নেমেছে।' ডিরেক্টরের অফিসে ঢুকতে ঢুকতে বলল ক্যাট, বেশ কয়েকটা খালি কাপ দেখতে পেয়েছে ডেস্কে।

এক সকালেই এতগুলো!

হাত তুলল পেইন্টার, এক মুহূর্ত সময় চেয়ে নিল নীরবে। হাতা গুটিয়ে একটা মোটা ফাইলে নাক গুঁজে দিয়েছে সে। পিছনে বিশাল তিনটা মনিটরে ভেসে উঠছে নানা ছবি। একটায় বি.বি.সি.র খবর, আরেকটায় ম্যাপ আর সাথে সি.ডি.সি.র বেশ কিছু ডাটা। এবং সবার শেষ মনিটরের দৃশ্যটা ধাঁধায় ফেলে দিল ওকে। দেখে মনে হচ্ছে, কোন অফিসের ওয়েবক্যামের দৃশ্য। কিন্তু অফিস রুমটা উল্টো, পিছিয়ে রাখা একটা চেয়ার, একপাশে আরবি আর ইংরেজি বই রাখা একটা বুকশেলফ।

পরিচিত এক লোক এসে বসল চেয়ারে, চিনতে পেরে দম আটকে এল ক্যাটের।

ওর স্বামী বসে রয়েছে চেয়ারে!

ওয়েবক্যামের দিকে ঝুঁকল মঙ্ক, ওকে দেখতে পেয়ে হাসছে। 'সোনা, দেখ আমি চলে এসেছি।'

পেইন্টারের ডেস্ক পেরিয়ে মাইক্রোফোন এবং পর্দার কাছে গেল ক্যাট, 'কোথায় আছ তুমি?'

রুমটার চারপাশে নজর দিল সে, 'নামরু-৩ থেকে অফিস রুম ধার দিয়েছে একটা। বেসমেন্টে এই অফিস, তবে ফ্যাসিলিটির মেডিকেল লাইব্রেরির কাছে। বেশ কাজে আসছে লাইব্রেরিটা।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল মঙ্ক, পাশে তাকিয়ে শিষ দিয়ে উঠল।

ভ্রূকুটি করল ক্যাট, 'করছটা কী তুমি?'

অন্য একজনকে দেখতে পেল ও পর্দায়।

'হাই, ক্যাট!'

কথা বলছে ড. ইলিয়ারা কানো। মেয়েটার পরনে কোমর পর্যন্ত লম্বা ল্যাব কোট, মাথার গাঢ় চুল স্কার্ফ দিয়ে বাঁধা। একগাদা জার্নাল ধরে রেখেছে সে এক হাতে।

বন্ধুর দিকে ফিরে হাসল ক্যাট, 'ইলিয়ারা, তোমাকে দেখে ভালো লাগলো। আমার স্বামী খুব একটা যন্ত্রণা দেয়নি তো?'

'একদমই না।' যোগ করল সে, 'তবে জেলি-বেবিগুলো সাবাড় না করলে আরও ভালো হয়। এখানে খুব বেশি নেই ওগুলো, স্বভাবতই বেশ দুর্লভ হয়ে উঠছে।'

অনুশোচনার ছিটেফোঁটাও নেই মঙ্কের চোখেমুখে, 'একটাই কথাই বলতে পারি, আমি একটা বড় বাচ্চা।'

আবেগ অনুভব করল ক্যাট, 'মিষ্টি খুব পছন্দ ওর।'

'এজন্যই তো তোমাকে বিয়ে করেছি, আমার চেনাজানা সবচেয়ে মিষ্টি মেয়েটাই যে তুমি।'

আবার শুরু করেছে .

'আমার তরফ থেকে একটা ঘুষি দাও তো ওকে।' বলল ক্যাট।

'পরে কখনও।' জবাব দিল ইলিয়ারা, 'লাইব্রেরি থেকে এসে যদি দেখি ওই ক্যান্ডির বয়ামটা খালি হয়েছে, তাহলে সাথে সাথে দিয়ে দেব নাহয়।'

হাত নেড়ে চলে গেল মেয়েটা।

মঙ্ককে অনেক কিছু বলার আছে ওর, নিজের মেয়ে দুটোর কথা, কতটা তাকে মিস করে ও সেই কথা। মাত্র কয়েকদিনের জন্য চলে গিয়েছে সে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতদিন দেখে না একজন আরেকজনকে! নিজের জীবনে স্বামীর অস্তিত্ব হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ও। পাশে চুপ করে বসে থাকার জন্য হলেও মঙ্ককে প্রয়োজন ওর।

'মিস করি তোমাকে।' বলল মঙ্ক, মুখের হাসি কিছুটা ম্লান হলো।

মঙ্ককে জড়িয়ে ধরতে চায় ক্যাট, কিন্তু এত দূর থেকে তা অসম্ভব। তবুও এক পা এগিয়ে গেল সে, ভুলেই গিয়েছে ঘরে আরও একজন মানুষ আছে।

উঠে দাঁড়াল পেইন্টার, আড়মোড়া ভাঙছে। সারারাত অফিসে ছিল লোকটা, বাড়িতে স্ত্রী না থাকায় ফিরে যায়নি। লিসা গিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ায়, ভাইকে দেখতে।

তবে ক্যাটের সন্দেহ, বাড়ি খালি থাকা একটা উছিলা মাত্র। বিশেষ একটা কারণে বাড়ি ফিরেনি লোকটা। কারণটা সাফিয়া আল-মায়াজ, মেয়েটাকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। যতক্ষণ না পর্যন্ত নিশ্চিত হচ্ছে যে মেয়েটা সুস্থ আছে, ততক্ষণ নড়বে না পেইন্টার।

ওর দিকেই আসছে এখন পেইন্টার, হাই তুলছে বারবার। 'মঙ্ক আছে কায়রোতে, সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে সাহায্য করছে আমাকে। পরে তাকে-'

'-আচমকা ডাক পড়ায় একটু ঘুরে আসতে হয়।' ঠাট্টা করল মঙ্ক। 'যত ঘোরতর বিপদই আসুক না কেন, প্রকৃতির এই ডাকে সবাইকে সাড়া দিতেই হয়।'

'ডাক তবে সময়মতোই এসেছে।' হাসল পেইন্টার, 'যখন ও চলে গিয়েছিল, মস্কোর ইন্টারপোল অফিস থেকে একটা রিপোর্ট পাই আমি। জানি না এসবের সাথে এর কোন সম্পর্ক আছে কিনা, কিন্তু পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে চাই।'

'অবশ্যই,' বলল ক্যাট।

'আপনারা দু'জনই ব্যস্ত মনে হয়।' বলল মঙ্ক, 'এবং দশ মিনিটের মাথায় এখানকার ডিরেক্টরেটের সাথে আমাকেও একটা মেডিকেল ব্রিফিংয়ে অংশ নিতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ কোন খবর জানতে পারলেই জানাবো আমি।'

ক্যাটের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল মঙ্ক, কিন্তু হাতভর্তি করে জেলি-বেবি নিতে ভুলল না।

মাথা নেড়ে পেইন্টারের দিকে ফিরল ক্যাট, 'মস্কো থেকে কী জানতে পারলেন?'

ওর সন্দেহ, সেইচানের দেখা উল্কি আঁকা খুনির সাথে এর সম্পর্ক আছে। মেয়েটা খুব সম্ভব গিল্ডের পুরনো এজেন্ট। গত আটচল্লিশ ঘন্টা ধরে মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে ক্যাট। সেইচান শুধুমাত্র মেয়েটার আচরণ থেকেই চিনতে পেরেছে, সেইচানের মতোই গিল্ডের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ-হিংস্র খুনি সে। সেই খুনির সম্পর্কে সেইচানের বলা কথাটা এখনও কানে বাজছে ক্যাটের।

যদি কখনও সে তোমার গন্ধ পায়, ভেবে নিয়ো তুমি ঠিক তখনই মরে গেছ।

সেইচানের দক্ষতার ফলেই অ্যাশওয়েলে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছে তাদের দল, তবে সিগমার হাত থেকে কোনমতে পালাতে সক্ষম হয়েছে এই খুনি।

কিন্তু এই ভুলটার আর পুনরাবৃত্তি হবে না, কথা দিয়েছে সেইচান।

একটা কাগজ বের করে নিল পেইন্টার, ওর দিকে বাড়িয়ে দিল ওটা। 'ক্যাট, তুমি ঠিকই বলেছিলে। উল্কিটার সত্যিই কোন বিশেষত্ব আছে।'

পৃষ্ঠাতে ছবি রয়েছে উল্কিটার। আক্রমণের পর সেইচান উল্কিটার একটা স্কেচ পাঠিয়ে দিয়েছিল, অনেকটা অর্ধ-সূর্যের মতো দেখাচ্ছে। পাভুবর্ণের মেয়েটাকে খুঁজতে হলে এই উল্কিটা সম্পর্কে জানতে হবে আগে, তারই চেষ্টা করে যাচ্ছে ক্যাট।

চব্বিশ ঘন্টাতেও যখন কোন ফলাফল খুঁজে পেল না ও, তখন আবার নতুন করে ভাবতে বসল। গ্রাফিক্সের সাহায্যে পুরো সূর্য তৈরি করল ছবিটা থেকে।
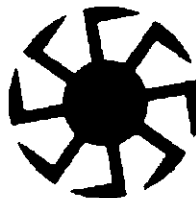
সূর্যের আলোর পাক লেগেছে শেষে, অবয়বটা দাঁড়িয়েছে অনেকটা চাকার মতো। তখন আর সময় লাগেনি ক্যাটের চিনতে। স্লাভিক দেশের কোলাব্রাটের চিহ্ন ওটা, সূর্যের প্যাগান প্রতীক। প্রথমে জাদুবিদ্যায় ব্যবহার ছিল এর, পরে ন্যাশনালিস্টিক এবং নব্য-নাৎসিরাও ব্যবহার শুরু করে।

তথ্যগুলো খাটিয়ে তল্লাশির পরিধি ছোট করে আনল ক্যাট, তল্লাশি চালাচ্ছে শুধু স্লাভিক দেশগুলোতে। ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির সাথে ভালো যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও সাহায্য চেয়েছে কেবল তেরোটা দেশের ইন্টারপোল অফিসে। ছোট শহরের স্থানীয় পুলিশের রেকর্ডগুলোও খতিয়ে দেখতে অনুরোধ করেছে তাদের, কারণ ছোটখাটো কেসগুলো পৌঁছায় না মূল শাখায়। মস্কোর অফিসেও একই অনুরোধ করেছে সে, অতীতে সোভিয়েতের অংশ ছিল ওই স্লাভিক দেশগুলো।

এখন থেকে আরও চব্বিশ ঘন্টা আগেই এই কাজগুলো করেছে ও।

'কোন সূত্র পেয়েছেন?' জিজ্ঞাসা করল ক্যাট, 'বা উল্কি আঁকা মেয়েটার ব্যাপারে কোন তথ্য?'

'না।' মাথা নাড়ল পেইন্টার, মেয়েটার মনের ভেতর জ্বলে ওঠা আশার বাতি দপ করে নিভে গেল।

'তবে?'

'একটা তথ্য পাওয়া গিয়েছে মস্কোতে, এক ছেলের, বয়স ষোলো বছর। ওই ছেলেটার মুখেও এই একই ধরনের চিহ্ন আঁকা ছিল। চুরির অপরাধে আরও এক যুগ আগে ডুব্রোভিটসি শহরে ধরা পড়েছিল সে, তবে জেলে যাওয়ার আগেই পালিয়ে যায় ছেলেটা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্যাট, আরেকটা কানাগলি। 'ডিরেক্টর, এই সূত্র নিয়ে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যাবে না। উল্কির চিহ্নটা নব্য-নাৎসিদের মাঝে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ইন্টারনেটে খোঁজাখুঁজি করলে এমন একশ' পুরুষের চেহারা ভেসে উঠে, কিন্তু কোন মেয়েকে পাওয়া যায়নি।'

'কিন্তু সেই চিহ্নটা যদি অর্ধেক হয়?' বলল পেইন্টার।

এই ব্যাপারটা কিছুটা অস্বাভাবিকই বটে।

'এটা দেখ।' হাতে একটা ফাইল তুলে নিল পেইন্টার, ছেলেটার ছবি ওখানে। ছবির নিচে ছেলেটার অপরাধকর্মের বিবরণও আছে। ছবিতে টোকা দিল পেইন্টার। 'চেনা চেনা লাগছে?'

বাচ্চা ছেলেটার দিকে তাকাল ক্যাট, সাদা চুল, পান্ডুর গায়ের রং মিলে বেশ সুদর্শনই বলা চলে। কিন্তু উল্কিটা চেহারার সব সৌন্দর্য ঢেকে দিয়েছে, বদলে বন্য একটা ভাব ফুটিয়ে তুলেছে।

স্লাভিক ভাষায় লেখা একটা শব্দ আঙুল রাখল পেইন্টার।

альбинос

'এখানে লেখা, ছেলেটা অ্যালবিনো, অর্থাৎ অস্বাভাবিক ফর্সা।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ক্যাটের, মনে পড়ছে সেইচানের বলা মেয়েটার বিবরণ। ‘আচ্ছা, দেখি আর কোন তথ্য পাই কিনা। ছেলেটার নামটা কী?’

‘অ্যান্টন মিখাইলোভ।’

হাত বাড়িয়ে ফাইলটা নিল সে, পেইন্টারের চিন্তিত চাহনি নজর এড়ায়নি।

লোকটার মনের কথা বুঝতে পারল ঝট করে।

সাফিয়ার সময় শেষ হয়ে আসছে।

দুপুর ১২:১০ ই.ডি.টি.
এলেসমেয়ার দ্বীপ

সব আমার দোষ

আত্মগ্লানিতে ভুগছে সাফিয়া, রোরির সামনে দাঁড়াতে পারছে না সে। হ্যারন্ডের সন্তান দাঁড়িয়ে আছে সামনে, পরনে শুধু জাঙ্গিয়া, হলুদ বায়োসেফটি স্যুট পরছে। ওর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল সাফিয়া। ছেলেটার অর্ধনগ্ন অবয়ব এর কারণ নয়, কারণ নিজের লজ্জাবোধ। রোরির এক চোখ বন্ধ, ফুলে বেগুনি রং ধারণ করেছে ওটা।

গতকাল সে কিছুটা চালাকি করেছিল। কঠোর শিডিউল মেনে চলতে বাধ্য করা হয়েছে ওকে। তাই প্রতিবাদ স্বরূপ ইচ্ছা করেই দুর্বল ভঙ্গিতে হেঁটেছে সে। এমনকী প্রফেসর ম্যাককেবের লেখাগুলো পর্যন্ত পড়েনি, হাতে নিয়ে বসে থেকেছে শুধু। পুরোটা সময় এই কয়েদখানা থেকে পালানোর উপায় বের করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু নিষ্ঠুর এক বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছে।

এখান থেকে পালানোর কোন উপায় নেই।

এলেসমেয়ার দ্বীপের এই ঘাটির চারপাশে বরফে আচ্ছাদিত অঞ্চল, উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বরফের সাগর। রাতের বেলা, বরফের ভাঙা-গড়ার আওয়াজ জাগিয়ে রাখে ওকে। শীতকালে থেমে যায় এইসব আওয়াজ, সূর্য ডুবে যায় কয়েক মাসের জন্য, জমে যায় পুরো আর্কটিক মহাসাগর।

এবং সে যদি পালিয়ে যেতে সক্ষমও হয়, তবুও বের হতে পারবে না বরফের এই রাজ্য থেকে। বাইরে ধূসর মেরুভাল্লুকের অভাব নেই, পুরো দ্বীপ জুড়েই শিকার খুঁজে বেড়ায় ওগুলো। আজ সকালেও কয়েকজন শ্রমিক বাইরে অ্যান্টেনা আর ক্যাবল পরীক্ষা করতে বেরিয়েছিল, প্রত্যেকের কাঁধেই বন্দুক দেখেছে সে।

বাইরে প্রায় একশো একর জুড়ে বিস্তৃত লোহার জঙ্গলের কাজটা ওর জানা নেই, স্টেশনের লাইব্রেরির জানালা থেকে দেখেছে ওটা। পুরো যান্ত্রিক কাঠামোটার কেন্দ্রে বিশাল বড় এক রূপালী গোলক, কম করে হলেও বিশ গজ ব্যাস হবে।

রোরির কাছ থেকে এই কাঠামো সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল ও। কিন্তু জবাবে মাথা নিচু করে পাশের পান্ডুর গার্ডের দিকে তাকিয়েছে শুধু ছেলেটা। গার্ডের নাম অ্যান্টন। রোরির মৌনতায় অবাক হয়নি ও, জানে এখানে প্রয়োজন ছাড়া টুঁ শব্দ করার অধিকারও নেই কারও। হাতেগোনা কয়েকজন টেকনিশিয়ান আছে শুধু এখানে, সবাই যে যার ছোট দলেই থাকে। একটা দলের সবার একই রঙয়ের পোশাক পরনে, আর প্রতিটি দলের রয়েছে আলাদা আলাদা রং। ওর ধারণা, এভাবে সবাইকে চিহ্নিত করে রাখা হয়।

বেঞ্চে ভাঁজ করে রাখা ধূসর কভারঅলগুলোর দিকে তাকাল ও, রোরির গায়েও একই রঙয়ের পোশাক। সবাই যেভাবে এড়িয়ে চলছে, তা থেকে নির্দিষ্ট এই রংয়ের তাৎপর্য ধরতে পারল সাফিয়া।

বন্দি!

অথবা, ক্রীতদাসও বলা যায়। জোর করে যাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা হয়।

মাথায় হুড তুলতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল রোরি, চোখের ক্ষতে প্লাস্টিকের ঘষা লেগেছে। গতরাতে ওখানে ঘুষি মেরেছিল অ্যান্টন, ছেলেটা বুঝতেও পারেনি কিছু। পিঠ দিয়ে মাটিতে পড়ে থেকেছিল শুধু, আকস্মিক আঘাতে অবাক হয়েছে বেশ। অ্যান্টনের নজর তখন ওর দিকে, কাটা কাটা স্বরে হুমকি দিয়েছিল সে।

কাল ঠিকমতো কাজ করা চাই।

দ্রুত সাফিয়ার কাজের অগ্রগতি দেখতে চায় সে।

আজ সকালে, তাই যা যা কাজ করতে বলা হয়েছে সেরে রেখেছে সাফিয়া। প্রথমেই পড়তে হয়েছে বায়োসেফটি ল্যাবে কাজ করার নিয়ম-নীতি, সেগুলো মনে আছে কিনা তা আবার পরীক্ষা করে দেখেছে অ্যান্টন। রাশিয়ান লোকটা সন্তুষ্ট হয়েছে।

স্যুট পরতে পরতে মূল নির্দেশগুলো মনে করার চেষ্টা করল আবার।

–সবার জন্য ব্যক্তিগত প্রেশার এয়ার স্যুট পরা বাধ্যতামূলক।

–জীবের নমুনাগুলো ডাবল সিল করে জীবাণুনাশক তরল বা প্রকোষ্ঠ থেকে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

–কাজের জায়গাগুলো রাখতে হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

–বের হওয়ার আগে, গায়ের স্যুট রাসায়নিক তরলের বর্ষণ দ্বারা পরিষ্কার করে নিতে হবে।

এছাড়াও আরও নানা নিয়ম-নীতির ফিরিস্তি দেয়া আছে ওখানে, আর এগুলোর অন্যথা হলে শাস্তি চাপবে রোরির ঘাড়ে।

যদি না কোন ভুলে আমি মারা যাই

হুড তুলে নিজের স্যুটটা সিল করে দিল সাফিয়া, ক্লাস্ট্রোফোবিয়ার ভয় জাগছে মনে। দ্রুতহাতে এয়ার হোসটা বসাল সে জায়গামতো, ঠান্ডা বায়ু টেনে নিল বুক ভরে। কয়েকবার শ্বাস নিতেই স্বাভাবিক হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস।

পাশ থেকে এগিয়ে এল রোরি, ওকে দেখতে নভোচারীদের মতো লাগছে।

'ঠিক আছ তুমি?' রেডিয়োতে বলল ও।

নড করল সে, একটু হয়তো জোরেই।

'তুমি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ,' কেশে উত্তর দিল, 'ঠিক আছি আমি। যাওয়া যাক।'

সে চায় না কেউ ভাবুক-কর্তব্য থেকে পিছপা হতে চাইছে। অ্যান্টি-চেম্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে অ্যান্টন, লোকটার হাত পেছনে। কানে একটা ইয়ারফোন গুঁজে রেখেছে।

কয়েকটা দরজা পার হয়ে, রাসায়নিকের ঝর্নায় ভিজে পৌঁছে গেল ওরা মূল ফ্যাসিলিটিতে। আশেপাশের পরিস্থিতি দেখে বুঝতে পারল, সেই সকাল থেকেই লোকজন কাজ করছিল এখানে। কিন্তু এখন ভেতরে কেবল ওরা দু'জন, বাকিদের চলে যেতে বলা হয়েছে সাফিয়াদের কাজের সুবিধার্থে।

একটা লম্বা সিল করা বক্স রয়েছে সামনে, আর বক্সের ভিতর এক রাজকীয় অবয়ব।

একটা নারীর মমি বসে আছে রূপালি সিংহাসনে, মমির মাথাটা শান্ত ভঙ্গিতে ঝুলে আছে কাঁধ থেকে। প্রথম দেখায় আতঙ্কিত হলেও, ধীরে-ধীরে শান্ত হয়ে এল সাফিয়া। আরও কাছ থেকে মূর্তিটাকে দেখতে চাইছে ও, দূর থেকে টাক মাথাটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। মমির মাথার চুলগুলো পড়ে যায়নি, বরং বিশেষ কোন উদ্দেশে মাথার সব চুল ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে ওর সন্দেহ। মমিটা হয়তো কোন মিশরীয় রাজকন্যার, গায়ে কোন পোশাকও নেই। ভালো করে তাকাতেই লক্ষ করল, গায়ে কোন পশম নেই রাজকন্যার। এমনকী চোখের ভ্রূ পর্যন্ত উধাও!

'ধর্মীয় কোন আচারের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে ওকে।' ফিসফিস করে নিজেকেই যেন বলল সাফিয়া। কিন্তু রেডিয়ো সেই কথাগুলো পৌঁছে দিল সবার কানে।

'আমার বাবাও তাই ভাবতেন।' বলল রোরি, 'এই সমাধি যখন সিল করে দেওয়া হয় তখনও মেয়েটা জীবিত ছিল বলেই বিশ্বাস করতেন তিনি। ওইখানে মাটিতে ছাই পড়ে ছিল, খুব সম্ভব বন্দি অবস্থাতেই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিলো ভেতরে। তীব্র উত্তাপের মাঝেও জীবিত ছিল মেয়েটা।'

'মেয়েটাকে বন্দি করা হয়েছে বলে মনে হয় না। স্বেচ্ছায় সে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে; দেখছ না-কতটা গৌরবের সাথে বসে আছে সিংহাসনে। হাত-পাও বাঁধা নেই, অসহ্য যন্ত্রণার শিকার হয়েছে মহিলা।' দূর থেকে আরও ভালোমতো তাকাল সে, চেয়ারে গা লেগে আছে মমিটার। 'অথচ এই চেয়ার থেকে কখনও ওঠার চেষ্টাটাও করেনি, আগুন-গরম চেয়ারটায় বসেছিল মারা না যাওয়া পর্যন্ত।'

বক্সটার সিল খোলার জন্য এগিয়ে গেল সাফিয়া।

'দাঁড়াও, আমি খুলছি।' বলল রোরি।

নড করে পিছিয়ে গেল সে, ছেলেটাকে কাজ করার সুযোগ করে দিল। গতকাল, প্রফেসর ম্যাককেবের গবেষণার অবশিষ্ট কাগজগুলো দেয়া হয়েছে তাকে। প্রফেসর পালানোর আগে নিজের গবেষণার সব কাগজ পুড়িয়ে দিয়েছেন, চাইছিলেন না কেউ এগুলো দেখুক। কিন্তু সফল হননি তিনি, অবশ্য একেবারে বিফলেও যায়নি চেষ্টাটা। অনেকগুলো কাগজ পুড়ে গিয়েছে, অবশিষ্ট কাগজ থেকে পুরো গবেষণা বুঝতে হলে আরও বিস্তর অনুসন্ধান করতে হবে। সেই দায়িত্বই এসে পড়েছে সাফিয়া আর রোরির কাঁধে।

তবুও, লোকগুলো কিছু একটা গোপন করছে ওর থেকে।

ও জানে না এই মমি কোথা থেকে এবং কীভাবে এখানে এল আর কেনই বা এই মমির এত বেশি গুরুত্ব!

অবশেষে দরজাটা খুলে দিল রোরি।

রাজকন্যার মুখোমুখি দাঁড়াল সাফিয়া, কাছ থেকে তীক্ষ্ণচোখে পর্যবেক্ষণ করছে। দূর থেকে অনেককিছু বোঝা যায়নি যা কাছে আসায় পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। সিংহাসনটি মিশরীয় কারুকার্য খচিত, খোদাই করা সিংহটি গর্জনের ভঙ্গিতে থেমে গিয়েছে। লাজুক ভঙ্গিতে যেন বসে আছে রাজকন্যা!

কিন্তু এর আসল সৌন্দর্য ওর নজর এড়াল না, এই শৈল্পিক কাঠামো এতগুলো বছর পরেও মলিন হয়নি।

আর মেয়েটার পুরো শরীরের লোম চেঁছে ফেলা হয়েছে, হায়ারোগ্লিফ উল্কি আঁকা পুরো দেহে। একেবারে মাথার খুলি থেকে শুরু হয়েছে সেই উল্কি, শেষ হয়েছে পায়ে!

হায় ঈশ্বর!

লেখাটা পড়ার বদলে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল সাফিয়া, সে জানে মেয়েটাকে এভাবে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে অনন্তকাল এই কাহিনিকে পরিব্যাপ্ত করার জন্য। মেয়েটার শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করল সাফিয়া, 'কী হয়েছে তোমার, বলো তো সব আমাকে।'

দুপুর ২:১৩, ই.ডি.টি.
ওয়াশিংটন ডি.সি.

'আরেকটি সূত্র পেয়েছি।' পাশের রুম থেকে বলল জেসন।

ডেস্ক থেকে ঘুরে দাঁড়াল ক্যাট, অফিসের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে সিগমার কমান্ড কমিউনিকেশন নেস্টে। অন্ধকারে জ্বলছে একটা মনিটর, চিফ অ্যানালিস্ট জেসন কার্টারের। ছেলেটা ওর মতোই সাবেক নেভি, শুধু বয়সে একযুগ ছোট। জেসন শুধু একটা ব্ল্যাকবেরি ফোন আর আইপ্যাড ব্যবহার করে ডি.ও.ডি. সার্ভার ভেঙে ফেলেছিল, তাই ওকে ক্যাট নিয়ে এসেছে সিগমাতে। মাথায় সাদা চুল আর ছেলেমানুষি স্বভাব আছে ওর, কিন্তু নিজের কাজে সেরা।

'দেখাও।' পাশে দাঁড়িয়ে বলল ক্যাট। গত তিন ঘন্টা ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে ওরা দু'জন, অ্যান্টন মিখাইলোভের কাছাকাছি আরও তিনজনকে পেয়েছে তবে তিনজনের কেউই আসল লোক নয়।

টার্মিনালের দিকে ঝুঁকল জেসন, 'এই লোকটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।'

'সেই সিদ্ধান্ত আমাকে নিতে দাও।' ধমকের সুরে বলল সে, কিন্তু সাথে সাথেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল, 'সরি।'

'সমস্যা নেই।' হাসিমুখে বলল জেসন, 'কতটুকু চাপে আছ তুমি তা জানি আমি। ডিরেক্টরকেও দেখলাম বেশ .চিন্তিত।'

'আমরা সবাই চিন্তিত।'

নড করল ছেলেটা, 'এটা হয়তো কাজে আসবে।'

একটা পাসপোর্ট আকারের ছবি ভেসে উঠল পর্দায়, পাশে অ্যান্টন মিখাইলোভের ছোটবেলার ছবির বিশেষ রূপ। বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করে বয়স বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে ছবিটায়। ওটাই গ্লোবাল ফেসিয়াল রিকগনিশন ডাটাবেসে পাঠিয়ে দিয়েছিল সে। তবে দুটো ছবি পাঠিয়েছে এক সাথে, একটায় উল্কি আঁকা আর আরেকটা উল্কি ছাড়া। যদিও নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই উল্কি ঢেকে রাখার কথা ছেলেটার, তবুও অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করেছে।

দুটি ছবিই পাঠানোতে নিজের উপর খুশি হলো সে, কারণ পাসপোর্টের ছবিতে ছেলেটার মুখে উল্কি নেই।

তবুও মন দিয়ে দেখল ক্যাট, একই মানুষের ছবি বলেই মনে হচ্ছে। নামটা পড়ল সে, 'অ্যান্থনি ভ্যাসিলিভ।'

ভ্রূকুটি করল জেসন, 'অ্যান্থনি অ্যান্টন। কাকতাল বলে মনে হচ্ছে না। নামটা দিয়ে আরও কিছু তল্লাশি চালিয়েছে আমি। এটা খুঁজে পেয়েছি।' আরেকটা ছবি বের করে দেখাল ও।

একটা কর্মচারীর আইডি।

কোম্পানির নামটা পড়ল ক্যাট, 'ক্লাইফ এনার্জি।'

'এই ফাইল অনুযায়ী, অ্যান্থনি একটা রিসার্চ বেসের সিকিউরিটি প্রধান। বেসটা সুমেরুতে, নাম অরোরা স্টেশন।'

সুমেরু

অবাক হয়ে ভাবছে ক্যাট, ভুল করেনি তো ও! হয়তো নাম আর চেহারার মিলটা শুধুই কাকতাল। ক্লাইফ এনার্জি একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, শক্তি উৎপাদনের বেশ কয়েকটা পেটেন্ট আছে এদের। এই কোম্পানির সি.ই.ও. সাইমন হার্টনেল, দানবীর হিসেবে লোকটার সুখ্যাতি আছে বেশ। এই টেক বিলিয়নিয়ার সৌর, বায়ু বা ভূ-তাপীয় শক্তি ব্যবহারের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। যখন অন্যান্য সব কোম্পানি খেলা বা নিজেদের পিছনে কারি কারি টাকা উড়াচ্ছে, তখন সাইমন একাই নানা জন-হিতৈষি কাজের আয়োজন করছে! মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা দান করেছে সে, বিশেষ করে আফ্রিকায়।

'এই যদি সেই অ্যান্টন মিখাইলোভ হয় থাকে,' বলল ক্যাট, 'তবে ওকে খোঁজার পথে ওই কর্পোরেশনের পরিচয় বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। ক্লাইফ এনার্জি সরকারি নানা কাজের অংশীদার, এমনকী ডারপার সাথেও কয়েকটা প্রজেক্টে যৌথভাবে কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটা। এ হয়তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত লোক নয়।'

জবাব দেওয়ার বদলে লোকটার মেডিকেল ফাইল বের করে আনল চিফ অ্যানালিস্ট।

'ওটার অ্যাক্সেস পেলে কীভাবে তুমি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সে, পরমুহূর্তেই নাকচ করে দিল, 'না, বলতে হবে না। এটা আমাকে দেখাচ্ছ কেন?'

একটা লাইন দেখাল ও, 'সে প্রতিদিন নাইটিসিনোন নেয়।'

'তো?'

ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ হেলথের ওয়েবসাইটে গেল ছেলেটা, একটা লাইন পড়ে শোনাল আবারও। 'এই ওষুধ টাইরোসিন বৃদ্ধি করে, যা আমাদের ত্বকের রং নিয়ন্ত্রক। সহজভাবে বলতে গেলে, অ্যান্থনি একজন অ্যালবিনো।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল ক্যাট।

'এই লোককেই খুঁজছি আমরা।' বলল চিফ অ্যানালিস্ট, 'আরও একটা জিনিস দেখানোর আছে।'

'আরও প্রমাণ আছে তোমার কাছে?'

'প্রমাণের চেয়েও বেশি কিছু।' আবার কিছু একটা টাইপ করল জেসন, তারপর আড়মোড়া ভাঙল। 'তার একটা বোনও আছে।'

মনিটরের পর্দায় আরও একটি ছবি ভেসে উঠতে দেখল সে, ক্লাইফ এনার্জির আরেকটা কর্মচারীর আইডি। ছবিতে একটা মেয়ের কঠোর চেহারা দেখা যাচ্ছে, গায়ের রং পাভুবর্ণের আর মাথার চুল সাদা। এই ছবিতেও কোন উল্কি নেই, তবে মেকআপ দিয়ে উল্কি ঢাকা খুব একটা কঠিন কাজও নয়।

'মেয়েটার নাম ভ্যালমা ভ্যাসিলিভ।' বলল জেসন, 'কিন্তু আমার বিশ্বাস, নামটা তার ভাইয়ের মতোই বানানো।'

মেয়েটার চেহারা দেখে রোমাঞ্চের একটা স্রোত বয়ে গেল ক্যাটের শরীরে।

'ছবিটা সেইচানের ফোনে পাঠিয়ে দাও।' আদেশ করল সে। 'দেখ, চিনতে পারে কিনা। ইউরোপ আর আফ্রিকার পাসপোর্ট সিকিউরিটি অফিসকে সতর্ক করে দাও। খোঁজ নিয়ে দেখ, ইদানীং এই পাসপোর্টের মালিক যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে কিনা। যদি ভ্যালমা আসে এখানে, তবে এখন কোথায় আছে তাও জানতে চেষ্টা করবে।'

নড করল জেসন, ফিরে গেল টার্মিনালে।

যদি সেইচান মেয়েটাকে চিহ্নিতও না করতে পারে, তবুও গ্রে-র দলকে সতর্ক থাকতে হবে।

ঘুরে দাঁড়াল সে, অগ্রগতি সম্পর্কে জানাতে হবে পেইন্টারকে। কিন্তু যাওয়ার আগে আরও একটি নির্দেশ দিয়ে গেল চিফ অ্যানালিস্টকে, 'অরোরা স্টেশন সম্পর্কে সব তথ্য চাই আমি।'

'পেয়ে যাবে।'

অ্যাড্রেনালিনে সওয়ার হয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে ডিরেক্টরের অফিসের দিকে এগোচ্ছে ক্যাট। অফিসের দরজাটা হালকা ভেড়ানো, কিন্তু ভেতর থেকে কথার আওয়াজ আসছে কানে। হাত দিয়ে টোকা দিল দরজায়, 'স্যার?'

ডেস্কে বসে আছে পেইন্টার, চোখ দেয়ালের মনিটরে। হাত দিয়ে ইশারা করল সে, 'এসো, ক্যাট।'

আরেকটা কণ্ঠ আমন্ত্রণ জানালো ওকে।

'বাহ! এইবার জমবে।'

মনিটরে ওর স্বামীকে দেখা যাচ্ছে, হাতে একটা মগ নিয়ে বসে আছে সে। নামরু-৩ এর ডিরেক্টরেটের সাথে দেখা করে এসেছে মঙ্ক, এখন তাই পেইন্টারকে ব্রিফ করছে।

দেঁতো হাসি ঝুলে আছে মঙ্কের মুখে, 'হাই, সুন্দরী!' কিন্তু সেই হাসিতে উত্তেজনা প্রশমিত হলো না ক্যাটের, ব্যাপারটা চোখ এড়াল না মঙ্কের। 'কী হয়েছে? কোন সমস্যা?'

'আমার বিশ্বাস, অ্যাশওয়েলে সেইচানদের ওপর হামলাকারী মেয়েটিকে খুঁজে পেয়েছি আমরা। হয়তো ড. সাফিয়া আল-মায়াজকে অপহরণের পিছনেও তার হাত আছে।'

ওর দিকে ঝটকা দিয়ে ঘুরল পেইন্টার, 'সব খুলে বলো আমাকে।'

পুরো ঘটনা খুলে বলল ক্যাট, চুপচাপ সব শুনল পেইন্টার আর মঙ্ক। মাত্র একটা বা দুটো প্রশ্ন করেছে তারা দু'জন, কথা শেষ হতেই আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনে হলো পেইন্টারকে।

'ভালো কাজ দেখিয়েছ।' প্রশংসা করল পেইন্টার।

কিন্তু প্রশংসাটুকু একা গ্রহণ করল না ক্যাট, 'আসল প্রশংসার দাবিদার জেসন, ও-ই করেছে সব।'

নড করল শুধু পেইন্টার, গভীর মনোযোগ দিয়ে ভাবছে কিছু একটা। কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে, 'উত্তর মেরুর অরোরা স্টেশনটা চিনি আমি, অন্তত পরিচিত বলা যায়।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল ক্যাট।

'স্টেশনটায় ডারপা কিছু টাকা দেয়।'

'মানে? কেন?'

'এর দায় পত্রিকার।' রহস্যময় সুরে বলল পেইন্টার, কম্পিউটারের কী-বোর্ডে উড়ে চলল তার হাত।

'২০১৪ সালের দিকে,' ব্যাখ্যা করল সে, 'যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী আলাস্কার হার্প ফ্যাসিলিটি বন্ধ করে দেয়। হার্প বা এইচ.এ.এ.আর.পি. দিয়ে বোঝানো হতো- হাই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাকটিভ অরোরাল রিসার্চ প্রোগ্রাম। ডারপার অর্থায়নে এই ফ্যাসিলিটি পৃথিবীর আয়নমন্ডল নিয়ে গবেষণা করত, এই স্তর স্যাটেলাইট এবং রেডিয়ো কমিউনিকেশনের জন্য খুবই জরুরি। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হতো, মাটি থেকে উচ্চ কম্পাঙ্কের সিগন্যাল ছুড়ে দেওয়া হতো আকাশে। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সাবমেরিনের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা হতো। একবার এক প্রজেক্ট-দ্য লুনার ইকো এক্সপেরিমেন্ট-থেকে চাঁদে আঘাত করল তরঙ্গ।'

'কেন?' জানতে চাইল মঙ্ক, 'আকাশ থেকে চাঁদ পেরে ফেলতে চাইছিল নাকি ওরা?'

রসিকতায় হাসল ক্যাট, তবে পেইন্টার গম্ভীর।

'সত্যি বলতে, এই ফ্যাসিলিটি সম্পর্কে তোলা অভিযোগের মাঝে এটাই সবচেয়ে কম পাগলাটে। মানুষ জানল-সুমেরুর একটা বেস থেকে আকাশের দিকে তরঙ্গ ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে। সবাই তখন নানা অভিযোগ নিয়ে হাজির হলো। কেউ কেউ বলল এটা মহাকাশের অস্ত্র, কেউ কেউ বলল এটা মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র, আবার

কেউ কেউ তো বলল এইটা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে সক্ষম! কিছু লোক আবার আরও কয়েক কাঠি সরেস, ২০১১-তে জাপানে ঘটা ভূমিকম্পের দায় চাপালো ফ্যাসিলিটির ওপর।'

'অনেকগুলো অভিযোগ।' বলল ক্যাট।

'এই অভিযোগ পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে ব্যর্থ হলো হার্প।'

'কিন্তু অরোরা স্টেশনের সাথে এর কী সম্পর্ক?' জানতে চাইল মঙ্ক।

'অরোরা স্টেশনে হার্পের পুনর্জন্ম হয়েছে, শুধুমাত্র আরেকটু বড় আয়তনে। এর অ্যান্টেনা আগেরটা থেকে প্রায় দশগুণ বড়, আর প্রযুক্তিতেও বেশ উন্নত। ব্যক্তিগত উদ্যোগে সামরিক বাহিনীর সহায়তায় চালু হয়েছে ওই প্রকল্প, দূরে থাকায় সবার নজরে পড়েনি এখনও। এ কারণেই ডারপা পয়সা খরচ করছে ওখানে, যাতে লোকচক্ষুর অন্তরালে হার্পের গবেষণাগুলো চালাতে পারে।'

প্রজেক্ট সম্পর্কে পেইন্টারের আগ্রহের কারণ বুঝতে পারল ক্যাট, ডিরেক্টর হওয়ার আগে হাইটেক নিয়ে গবেষণা করত ডিরেক্টর। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙয়ে পি.এইচ.ডি.র পাশাপাশি বেশ কয়েকটি পেটেন্টও আছে তার নামে।

পেছনের দেয়ালের মনিটরে ভেসে উঠল পরিচিত এক লোগো, অরোরা স্টেশনরেও একই লোগো দেখেছিল ক্যাট। একটা হেলানো ডিমের মাঝে বৈজ্ঞানিক নানা সূত্র আঁকা।

Clyffe
Energy

'এই একটা লোগো থেকেই কোম্পানি এবং এর সি.ই.ও. সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।' বলল পেইন্টার, 'মূলত তার সংশ্লিষ্টতার কারণেই এখনও জনগণের কারও আঙুল উঠেনি ওই ফ্যাসিলিটির ওপর।'

'কেন?' বলল মঙ্ক।

'বিভিন্ন দানশীল কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে লোক-হিতৈষি হিসেবে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত তিনি। এছাড়াও, সবাই তার প্রযুক্তি ব্যবহার করে। একেবারে তারবিহীন চার্জার থেকে উচ্চক্ষমতার ব্যাটারি পর্যন্ত। এইসব সুনাম থাকায় কেউ তাকে মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র তৈরির অভিযোগে অভিযুক্ত করেনি।'

ভ্রূকুটি করল মঙ্ক, 'কিন্তু এই ডিম কীভাবে এই লোকের ব্যাপারে ধারণা দেয়, তা বললেন না।'

লোগোটার দিকে তাকিয়ে বলল পেইন্টার, 'এই ডিম কলম্বাসের ডিমকে প্রতিনিধিত্ব করে।'

'সেটা আবার কী?' জানতে চাইল মঙ্ক।

'একটা গল্প আছে, একবার কলম্বাস দাবি করেন তিনি একটি ডিমকে লম্বাভাবে টেবিলে বসাতে পারবেন এবং সমালোচকদের উদ্দেশে ছুঁড়ে দেন চ্যালেঞ্জ। কিন্তু কেউই সফল হলো না, যতই চেষ্টা করে ডিম সোজা হয়ে বসে না টেবিলে। সবশেষে গেলেন কলম্বাস, একটা ডিমের নিচের অংশ ভেঙে বসিয়ে দিলেন টেবিলে। নিচের অংশ সমান থাকায় ডিম লম্বা হয়ে বসে রইল টেবিলে।'

'সহজ ভাষায় বললে, তিনি প্রতারণা করলেন।' বলল মঙ্ক।

মুখ বিকৃত করল ক্যাট, 'এই গল্পে সৃজনশীলতার একটা শিক্ষা আছে, মাঝে মাঝে প্রথাগত নিয়মের বাইরে গিয়ে অসম্ভবের সমাধা করা যায়।'

'সংক্ষেপে সাইমন হার্টনেলের মনস্তত্ত্বও তাই।' বলল পেইন্টার, 'এই লোগোর আরও একটি বিশেষত্ব আছে। হার্টনেল নিজেকে নিকোলা টেসলার মেধা-সন্তান বলে দাবী করেন, রীতিমতো পুজো করেন তিনি টেসলাকে।'

আবার প্রশ্ন ছুড়ে দিল মঙ্ক, 'কিন্তু এই ডিমের সাথে তার আবার কী সম্পর্ক?'

'১৮৯৩ সালে, কলম্বাসের সাফল্যটারই আবার পুনরাবৃত্তি করেন টেসলা, তবে এবার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে। চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের ভেতর রাখেন একটা কপারের ডিম, জাইরোস্কোপিক ক্ষমতার ফলে উল্লম্বভাবে শূন্যে ঘুরতে থাকে ডিমটা। সেই সহস্র বছর আগের কলম্বাসের বাজী জিতে যান তিনি।'

'এবং কোন দু' নাম্বারি ছাড়া।' যোগ করল মঙ্ক, খুশি হয়েছে।

'কলম্বাস দুই নাম্বারি করেননি।' বলে পেইন্টারের দিকে ফিরল ক্যাট, 'কিন্তু উত্তর মেরুর ওই ফ্যাসিলিটিতে ঠিক কী করছে ক্লাইফ এনার্জি?'

'বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যেমন-উত্তর পোলের চৌম্বকশক্তির স্থান পরিবর্তনের ম্যাপিং। অথবা বায়ুমন্ডলের প্লাজমা মেঘ নিয়ে গবেষণা। কিন্তু মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং প্রভাব নিয়ে গবেষণা করা। সাধারণত ই.এল.এফ. এবং ভি.এল.এফ. সিগন্যাল ব্যবহৃত হয় সাবমেরিনের যোগাযোগে। কিন্তু ফ্যাসিলিটিতে এই সিগন্যাল দিয়ে বরফের চাইয়ের পুরুত্ব মাপা হয়।'

সচেতন হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল ক্যাট, 'বিশাল কারখানা গড়ে উঠেছে উত্তর মেরুতে।'

'রাজনৈতিক ঝামেলা শুরু হতে যাচ্ছে।' বলল পেইন্টার, 'উত্তর মেরুর বরফগুলো গলে গলে পড়ছে, বরফের নিচে জেগে উঠা সম্পদের মালিকানার

দাবিদার সবাই। কানাডা, রাশিয়া, ডেনমার্ক-সবগুলো দেশ এখনই কাড়াকাড়ি লেগে গিয়েছে। কিছুদিন পর বাকিরাও হামলে পড়বে।'

পায়ের আওয়াজ শোনা গেল পিছনে, ঠক ঠক আওয়াজ হলো দরজায়। জেসন কার্টার ঢুকেছে রুমে।

'গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি।'

দুপুর ২:৩৯

সরে বসল পেইন্টার, জেসনের হাতে ছেড়ে দিয়েছে কম্পিউটার। বুঝতে পারছে, ছেলেটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু আবিষ্কার করেছে।

কাজ করতে করতেই বলল জেসন, 'উত্তর মেরুর বেসটা সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলেছিল ক্যাট। ওই অঞ্চল পুরোটা নজরবন্দি করে রেখেছে সামরিক বাহিনীর স্যাটেলাইট আর এন.ও.এ.এ. ওয়েদার স্টেশন। এছাড়াও আছে কানাডার ড্রোন-যেগুলো জল, স্থল এবং আকাশপথ থেকে নজর রাখছে পুরো অঞ্চলের। এত কড়াকড়ি অবস্থা যে, একটা মেরুভাল্লুক পাদ দিলেও ধরা পড়বে কোন না কোন সেন্সরে।'

'জেসন' ' সতর্ক করল ক্যাট।

'দুঃখিত, এক সেকেন্ড।'

দৃষ্টি বিনিময় করল ক্যাট এবং পেইন্টার, রসিকতা করে কথাটা বললেও জেসনের কথাটা পুরোপুরি সত্য। একটু আগে বলা কথাটার সাথেও জেসনের বিশ্লেষণ খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে।

'তাই ভাবলাম, এই সবগুলো থেকে একটু উপযোগিতা নেই না কেন!' বলতে শুরু করল চিফ অ্যানালিস্ট, 'সেজন্যই অরোরা স্টেশনকে ঘিরে একটা সার্চ প্রটোকল তৈরি করলাম। সময় বেঁধে দিলাম গত চব্বিশ ঘন্টা, ড. আল-মায়াজ অপহৃত হবার সময় থেকে।

'নরওয়েজিয়ান পোলার ইন্সটিটিউট স্যাটেলাইট থেকে এই ভিডিয়োচিত্রটা পেয়েছি।' রুমের তৃতীয় মনিটরে একটা ভিডিয়ো ক্লিপ ছেড়ে দিল সে। ঝাপসা ভাবে একটা হেলিকপ্টারের অবয়ব ফুটে উঠেছে পর্দায়। রোটর ঘুরছে হেলিকপ্টারের, ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে কয়েকজন। একটা স্ট্রেচার বের করতে দেখা গেল, দু'জন লোক সরাসরি বিল্ডিংয়ের দিকে চলে গেল স্ট্রেচার নিয়ে।

পেইন্টারের দিকে তাকাল জেসন, 'দূর থেকে চেহারাটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এমন একটা দুর্গম জায়গায় অসুস্থ রোগীকে নিয়ে যাওয়াটা কিছুটা অস্বাভাবিক।'

কল্পনায় ট্রাংকুলাইজার ডার্ট সাফিয়ার গায়ে বিঁধতে দেখল ডিরেক্টর, এক হাত উঁচু করে সাহায্য চাইছিল মেয়েটা তার কাছে।

‘কী মনে হয়?’ জিজ্ঞাসা করল জেসন।

মনের মাঝে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল পেইন্টারের, ছোট ছোট হয়ে গেল চোখ। গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল, দাঁতে দাঁত চেপে বসল। কোন উত্তর দিল না সে। ভিডিয়োচিত্রটা আবার দেখল, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্ট্রেচার অদৃশ্য হওয়া বিল্ডিংয়ের দিকে।

‘স্যার?’ বলল ক্যাট।

‘আমি যাচ্ছি ওখানে।’ দাঁতে দাঁত চেপে বলল ডিরেক্টর, কণ্ঠে ঝরে পড়ছে সীমাহীন ক্রোধ।

‘কাউকে না কাউকে তো যেতেই হবে।’ সম্মতি দিল ক্যাট, ‘কিন্তু আমাদের আরও অনেক দক্ষ এজেন্ট-’

কথা শেষ হওয়ার আগেই বাঁধা দিল পেইন্টার, ‘আমি যাচ্ছি।’ বড় করে দম নিয়ে বলল সে, ‘অরোরা স্টেশনের সাথে ডারপার স্বার্থও জড়িত। স্টেশনটা পরিদর্শনের এখনই উপযুক্ত সময়।’

বসের দিকে তাকাল ক্যাট, পরিকল্পনার সম্ভাব্য সবদিক খতিয়ে দেখছে। ‘জেনারেল মেটকাফকে এই কাভার তৈরি করতে বলতে হবে।’

‘তবুও সাথে একজন দক্ষ টেক ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক লাগবে।’

‘যেমনটা তুমি।’ বলল মঙ্ক, তাকিয়ে আছে ক্যাটের দিকে।

নড করল ক্যাট, দু'জনেই বুঝতে পারছে পেইন্টারকে ফেরানো যাবে না। ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে নিয়ে নিয়েছে সে।

‘আমি যাচ্ছি আপনার সাথে।’

‘ভালো হয় যদি-’

এইবার পেইন্টারকে থামিয়ে দিল ক্যাট। ‘আপনি যদি যান, তবে আমিও যাব।’ জেসনের দিকে ইশারা করল সে, ‘এখানকার সবকিছু সামলানোর জন্য জেসন আছে। আর প্রয়োজন পড়লে মঙ্কও সাহায্য করতে পারবে ওকে।’

‘একটুও সমস্যা হবে না, স্যার।’

উপলব্ধি করল পেইন্টার, সাফিয়াকে উদ্ধার করতে হলে ক্যাটের সাহায্য লাগবে। হতে পারে সে সিগমার ডিরেক্টর, কিন্তু আড়াল থেকে সব কলকাঠি নাড়ে ক্যাট। বাস্তবতা অনুধাবন করে নড করল ও, ‘তোমার পার্কাটা নিয়ে নাও তাহলে।’

তেরো
২রা জুন, রাত ৭:১৮ . ই.এ.টি.
খার্তুম, সুদান

সূর্য ডুবে গিয়েছে, গ্রে দাঁড়িয়ে আছে সভ্যতার উৎকর্ষতার উৎসের পাশে।

দুটি স্রোতধারা এসে মিশেছে এক নদীতে, বাম দিকে বয়ে চলেছে হোয়াইট বা শ্বেত নীল কঠোর তেজস্বী গতিতে। এই অংশের ঘোলাটে কাদার পরিমাণের আধিক্যের কারণে স্রোতধারার এই নাম। আর গ্রে-র ডানে ক্ষীণ ধারায় বয়ে চলেছে নীলাভ নীল নদ।

দুটি উপনদী মিলে গঠন করেছে মহাপরাক্রমশালী এ নদটি, যা অত্র অঞ্চলের জীবনীশক্তির উৎস। উত্তরে জলাধার বয়ে গিয়েছে মিশরের দিকে। সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনার আওয়াজ ভেসে আসছে খার্তুম থেকে।

সময় যেন থমকে আছে এখানে। মনে হচ্ছে, অনন্তকাল ধরে এই স্থান এভাবেই আছে। মাথার উপর কাস্তে আকৃতির চাঁদ উঠেছে, নদীর পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে সেই আলো। প্রতিফলন ষাঁড়ের শিংয়ের মতো আকৃতি ধারণ করেছে।

সেইচান এসে দাঁড়াল পাশে, জড়িয়ে ধরল ওর কোমর। কায়রোর কথা মনে পড়ল ওর, মেয়েটা সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে যেতে বলেছিল। এই অদ্ভুত সময়ে সেই চাওয়াটাই আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গ্রে, পূরণ হবে না জেনেও ব্যর্থ দিবা-স্বপ্ন দেখছে ও। 'কোয়ালস্কি ফিরতি পথে আছে, গাড়ি নিয়ে চলে আসতে বড়জোর দশ মিনিট লাগবে ওর।' বলল সেইচান, ওকে বর্তমানে টেনে আনার চেষ্টা করছে।

গভীর মরুভূমিতে চলার উপযোগী একটা গাড়ির ব্যবস্থা করেছে পেইন্টার এবং ক্যাট। সেই গাড়িটাই আনতে গিয়েছে কোয়ালস্কি, সাথে খাবার, পানি আর অতিরিক্ত তেলের মজুতও নিয়ে আসবে। এখন থেকে, নিজেদের খেয়াল নিজেদেরই রাখতে হবে।

ক্যাটের পাঠানো ছবিটা ওকে দেখিয়েছে সেইচান, সাদা চুলের ফর্সা মেয়েটার চোখে শীতল দৃষ্টি। অ্যাশওয়েলে, সেইচান অল্পই দেখতে পেয়েছিল মেয়েটার চেহারা, তাই নিশ্চিত করে বলতে পারছে না যে এ-ই সে কিনা।

তবুও, সেই ঘটনার পর থেকে অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে গিয়েছে সে। সেইচানকে যে মেয়ে ঘাটাতে পারে, সেই মেয়ে ভয়ঙ্কর না হয়ে যায় না।

উপর থেকে হাসির আওয়াজ কানে এল গ্রে-র।

পেছনে তাকাতেই ফেরিস হুইলে বসা ডেরেক আর জেনকে দেখতে পেল, মুহূর্তটা উপভোগ করছে দু'জন। বর্তমান সময়ে এটাই বুদ্ধিমানের কাজ, কেউই জানে না সামনে ওদের ভাগ্যে কী ঘটতে চলেছে। ছোট ফেরিস হুইলটা মরগার অ্যামিউজম্যান্ট পার্কের ভিতরে, নামটার অর্থ নদীর সঙ্গামস্থল।

দু'ঘন্টা পূর্বে সবাই পৌঁছেছে খার্তুমে, বিকালের আবহাওয়া অসহ্য গরম এখানে। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রওনা হবে সূর্য ডোবার পর। সত্তর মাইল দক্ষিণে রুফা গ্রাম হচ্ছে ওদের গন্তব্য। প্রফেসর ম্যাককেবকে খুঁজে পাওয়া লোকটার পরিবারের ওখানেই বসবাস। পুরো পরিবারকে পৃথক করে রাখা হয়েছে সংক্রমণের আশঙ্কায়, কিন্তু এদেরই এক আত্মীয় মরুভূমিতে পথ দেখাতে রাজী হয়েছে।

থেমে গিয়েছে ফেরিস হুইল, নামিয়ে দিচ্ছে যাত্রীদের। পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেইচান, সতর্ক দৃষ্টি রাখছে চারপাশে। হাসতে হাসতে নেমে এল ডেরেক আর জেন। হাত ধরে আছে একজন অন্যজনের, তবে একটু বেশি শক্ত করেই হয়তো। দু'জনকেই বেশ লাগছে একসাথে দেখতে, বয়সটাও কম কম লাগছে এখন।

'মজা পেয়েছি।' বলল জেন, 'মাইলের পর মাইল নজরে পড়ে চারপাশে।'

নড করল ডেরেক, 'নতুন বাঁধটা চোখে পড়বে ভেবেছিলাম, ওখান থেকেই তো সব ঝামেলার শুরু হলো। কিন্তু অনেক দূরে ওটা, উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় একশো মাইল তফাতে।'

প্রকল্পটা নীল নদের ষষ্ঠ জলপ্রপাতের কাছে, জানা আছে গ্রে-র। ওখান থেকেই দু'বছর আগে প্রফেসর ম্যাককেবের দল যাত্রা শুরু করেছিল। হাজার মাইলব্যাপী নিঃসঙ্গ মরুতে হারিয়ে গিয়েছে পুরো দলটা।

এখন সেখানেই যাচ্ছি আমরা।

সবাইকে নিয়ে এগোল গ্রে, 'কোয়ালস্কি চলে আসবে শীঘ্রই, রাস্তার ধারে চলো।'

অ্যামিউজম্যান্ট পার্ক পার হয়ে রূপালি নদীর দিকে তাকাল জেন, বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওর। 'অনেক পড়েছি এই অঞ্চল নিয়ে, কিন্তু বাস্তবে

মেয়েটার বয়স মনে করার চেষ্টা করল গ্রে, একুশ। এই বয়সে কতটুকুই বা দেখেছে দুনিয়ার রূপ, বেশিরভাগ তথ্যই পড়েছে কোন না কোন বই-পুস্তকে। কিন্তু সৌন্দর্যের বর্ণনা কি কাগজে দেওয়া যায়!

মেয়েটার পাশাপাশি হাটতে লাগল সে।

'জেন, আমরা তোমার বাবার দেখানো পথ অনুসরণ করে মরুভূমিতে যাব। আমরা প্রফেসরের থিওরিটা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি, যেটা প্রমাণিত করার জন্য তিনি এসেছিলেন এখানে। তুমি বলেছিলে, প্রত্নতাত্ত্বিকরা তার থিওরিকে বুক অফ এক্সুডাস অনুযায়ী ভুল ভাবেন।'

'শুধু প্রত্নতাত্ত্বিকরাই না, ইহুদি পন্ডিতরাও।' আলোচনায় স্বচ্ছন্দবোধ না করলেও থামল না সে, 'অনেকেই বিশ্বাস করেন, মোজেসের গল্পগুলো রূপক, প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য নয়। বইয়ে রামেসিসের কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু তার রাজত্বকালে এমন কোন মহামারীর কথা শোনা যায়নি। তাই মোজেসের ঘটনাকে রূপকথার গল্প বলে উড়িয়ে দেয় সবাই।'

'এখানে তোমার বাবার কী ভূমিকা?'

'তিনি এবং তার কয়েকজন সহকর্মী, রামেসিসের সাথে দশটি মহামারীর ঘটনার অসঙ্গতি খুঁজে পান। যদি সত্যিই ফারাও বলতে রামেসিসকে বোঝানো হয়, এবং মোসেস তাকে দশটি মহামারীর অভিশাপ দিয়ে থাকেন, পুরো ইতিহাস পালটে যাবে।'

'কিন্তু এর কি সত্যি কোন প্রয়োজন আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এক্সুডাসের নিদর্শন খুঁজে বেড়ায় রামেসিসের শাসনামলে। যদি তা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তবে ইতিহাসের অন্য কোন কালেও এই নিদর্শন খোঁজা হবে।'

'তোমার বাবা আর তার সহকর্মীরা কি এই মতবাদের পক্ষে কোন প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন?'

'অনেককিছুই খুঁজে পেয়েছেন।' দূরের পর্বতগুলোর দিকে তাকাল মেয়েটা। 'ফারাও রামেসিসের শাসনকালের চারশ' বছর পেছনে ফিরে তাকালেই এক্সুডাসের প্রমাণ পাওয়া যায়।' আঙুল দিয়ে গুনতে লাগল জেন। 'শেমিট ক্রীতদাসদের শহর। পাওয়া যায় বৃহৎ আকারে মহামারী হওয়ার প্রমাণ। পাগলের মতো পালিয়েছে শহরবাসী। এমনকী মাটির নিচে অর্ধ-গোলাকার ঘর পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, যার উল্লেখ আছে বাইবেলে। সব একদম খাপে খাপে মিলে যায়।'

'তোমার বাবা এটাই প্রমাণ করতে চাইছিলেন?'

'এটাকে নতুন কাল-গণনা পদ্ধতি বলা হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, সেই সময়ের সাথে মহামারীগুলোর কোন যোগসূত্র আছে। আর সেই যোগসূত্র খুঁজে বের করতে পারলে নিজের থিওরির সত্যতা যাচাই করতে পারতেন তিনি।'

এই লোকের দেখি বাইবেলের মহামারী নিয়ে মারাত্মক পাগলামী ছিল!

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেন, আর এই বিষয়ে কথা বলতে চাইছে না সে।

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে কোয়ালস্কি, পিছনে বিশাল বড় একটা ট্রাক। গাড়িটা রিকন্ডিশন করা সবুজ মার্সিডিজ ইউনিমগ। চার চাকার একটা দানব এই গাড়ি। উঁচু উঁচু চাকা যেকোন দুর্গম পথে চলার সক্ষমতা দিয়েছে, সামনে আছে বিশাল উইঞ্চ যাতে সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে ট্রাকটাকে।

ট্রাকটা যেন একেবারে কোয়ালস্কির যান্ত্রিক সংস্করণ। দু'জনেই মন্থরগতির অধিকারী, আওয়াজটাও বেশি, তবে পুরোপুরি বন্য।

সবাইকে গাড়িতে উঠতে ইশারা করল সেইচান, কিন্তু নিজে নজর রাখল রাস্তায়।

'সবকিছু ঠিক?' জানতে চাইল গ্রে।

'এখন পর্যন্ত।'

সামনে সব ঠিক করে নিতে হবে।

রাত ৮:০৮

ট্রাকের পিছনের সিটে আইপ্যাড নিয়ে বসে আছে ডেরেক। দুই লেনের রাস্তা ধরে দক্ষিণে যাচ্ছে ওরা, নীল নদের সাথে দেখা হচ্ছে বাঁকে বাঁকে। খার্তুমের উজ্জ্বল আলো নজরে পড়ছে না আর, সামনে যেন সুদূর অতীত। আশেপাশের ভূপ্রকৃতি শত শত বছর ধরে অপরিবর্তিতই আছে, বিস্তীর্ণ ভূখন্ডে অল্প কয়েকটা পামগাছ জেগে আছে শুধু। দূরে দেখা যাচ্ছে নদের রূপালি ধারা, পাশে অলস সময় কাটাচ্ছে কয়েকটা মাটির কুঁড়েঘর।

নীলাভ নীল বয়ে চলছে উত্তরে, মিশরের মাঝ দিয়ে। শহরটার উর্বর জমির দানকর্তা এই হ্রদ, তবে এই অঞ্চলে দানশীলতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। নদের দুই তীর ধরে খুব বেশি দূর বিস্তৃতি পায়নি সবুজ চাষভূমি।

চাদের রূপালি আলোয় নজরে পড়ছে সামনের ছোট টিলাগুলো। রুক্ষ টিলার চূড়া দেখে মনে হয় পুরনো কুঁজো হওয়া ভিখিরি, মরে গিয়েছে তৃষ্ণায়। ওগুলোর পিছনে উষর মরুভূমি, ছড়িয়ে রয়েছে হাজার হাজার মাইল।

সেই বিস্তীর্ণ মরু পার হতে হলে প্রয়োজন নির্দিষ্ট পরিকল্পনার।

সেজন্যই সতর্ক হয়ে আছে সে, অতীতের আলোচনাগুলো আরেকটু খতিয়ে দেখছে। রুফাতে পৌঁছে মরুভূমির দিকে রওনা দিবে সবাই, সেই জায়গায়-যেখানে শেষ দেখা গিয়েছিল প্রফেসরকে। এরপর কী করবে তা ঠিক করেনি এখনও, তবে ডেরেকের মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

পাশে নড়ে উঠল জেন, কাঁপছে গাড়ির শক্তিশালী ইঞ্জিন। গত কয়েকদিনের ছোটাছুটিতে ক্লান্ত মেয়েটা। 'কী করছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল জেন, হাই তুলল সেই সাথে।

আইপ্যাডের পর্দার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে মেয়েটার চেহারা। হরিণের মতো টানা টানা চোখজোড়াতে থমকে গেল ওর নজর। কেশে গলা পরিষ্কার করল ও। 'আমাদের সম্ভাব্য যাত্রা পথের ম্যাপ তৈরি করার চেষ্টা করছি। মানে, তেমন কিছুই করার চেষ্টা করে নিজেকে বুঝ দিচ্ছি আরকি।'

কাঁধে হেলান দিল সে, 'দেখি।'

মেয়েটাকে নিজের কাজ দেখাবার প্রচন্ড তাড়না অনুভব করছে ও!

'আমরা জানি, নীল নদের ষষ্ঠ জলপ্রপাতের কাছেই হারিয়ে গিয়েছিল তোমার বাবা ও তার দলসহ। দুই বছর পর তিনি ফিরে এসেছেন একশ মাইল দক্ষিণে, রুফার খুব কাছে। দুর্ভাগ্যবশত, কেউই জানে না এই সময় তিনি কোথায় ছিলেন, আর এসেছেন-ই বা কোথা থেকে। কিন্তু সেই সূত্র লুকিয়ে আছে লিভিংস্টোনের পুরনো স্কেচের সেই মিশরীয় গুবরে পোকার ছবিতে।'

ওর দেখার সুবিধার্থে আইপ্যাড ঘোরাল সে, 'এই অঞ্চলের স্যাটেলাইট ম্যাপ বের করেছি আমি, সেখানে লিভিংস্টোনের সূত্রটা বসিয়ে রেখা টেনেছি শুধু। গুবরে পোকার ডানায় দুই ভাগ করা হয়েছিল নীল নদ।'

ছবিটা দেখাল সে।

'এরপর ষষ্ঠ জলপ্রপাতের কাছ থেকে রুফা পর্যন্ত আরেকটি রেখা টেনেছি। এই রেখাটা তোমার বাবার যাত্রাপথের প্রথম এবং শেষ বিন্দুর যোগফল।' ম্যাপে ইংরেজি এক্স অক্ষরের মতো একটা আকার তৈরি হলো, দুইটি রেখার সংযোগস্থলে আঙুল রাখল ডেরেক। 'আমার মনে হয়, প্রথমে এখানে যাওয়া উচিত আমাদের।'

'চমৎকার!' বলল জেন, একহাত রাখল ওর হাঁটুতে।

তৃতীয় এক ব্যক্তি সহমত পোষণ করল, 'ঠিক বলেছে ডেরেক।'

গ্রে যে এতক্ষণ ধরে চোরাচাহনিতে পাশ থেকে দেখছে সব, তা ওদের দু'জনের কেউই লক্ষ করেনি। লজ্জা পেয়ে বলল ডেরেক, 'ধন্যবাদ।'

'আমি কি দেখতে পারি?' হাত বাড়িয়ে দিল গ্রে।

গ্রে-র হাতে আইপ্যাড তুলে দিল ডেরেক, ঝুঁকে সেইচান আর কোয়ালস্কিকেও ম্যাপটা দেখাল গ্রে। তারা দু'জন একসাথে বসেছে সামনের সিটে।

সেইচানকে কম কৌতূহলী মনে হলো, 'উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরার থেকে অনুমানে চলা ভালো।'

চালকের আসন থেকে বলে উঠল কোয়ালস্কি, 'সামনে আলো দেখা যাচ্ছে।'

স্যাটেলাইট ফোনে ম্যাপ দেখে নিল গ্রে, 'খুব সম্ভবত রুফা।'

ডেরেকের হাঁটু থেকে হাত সরিয়ে নিল জেন, কিছুটা নার্ভাস দেখাচ্ছে ওকে। মেয়েটার চিন্তার কারণ ধরতে পারল সে, ওখানে পৌছুতে গিয়েই মৃত্যু হয়েছে ওর বাবার।

'সব ঠিক হয়ে যাবে।' আশ্বাস দিল সে।

কিন্তু সত্যিই কী তাই?

রাত ৮:২৮

সেইচান ভেবেছিল গ্রামটা আরও ছোট, পুরোটা জুড়ে থাকবে ছোট ছোট কুঁড়েঘর। কিন্তু রুফা বেশ বড় গ্রাম, নীল নদের একেবারে তীরে অবস্থিত।

'এখানে নামলেই হারিয়ে যাব।' বলল ডেরেক, সে-ও একমত।

রাস্তা ভাগ হয়ে পরিণত হয়েছে গোলকধাঁধার অলিগলিতে, সেই গলির দু'পাশ দিয়ে সারি সারি ছাদঅলা বিল্ডিং। সবগুলো বিল্ডিং একই ধরনের ইট দিয়ে একই নকশায় তৈরি, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখে ধাঁধা লেগে যায়। শুধুমাত্র স্থানীয় মসজিদটা আলাদা, এর সাদা মিনারটা যেন আলোকবর্তিকার দায়িত্ব পালন করছে।

জানে জেন-রুফার নামকরণ এখানে বসবাসরত মানুষজন করেছে। এখানকার সবাই আরবি ভাষা ব্যবহার করে, পালন করে সুন্নি ইসলাম ধর্ম। অনেক পরিবারেরই নাড়ি এখানে, তবুও যাযাবরের মতো জীবন-ধারণ করে। এই তথ্যটা ওর বাবার উদ্ধারকারী পরিবারের জন্যও সত্য। পরিবারটা জালিয়ন গোত্রের, হাজার হাজার বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মরুভূমিতে। নিজেদেরকে আব্বাসের বংশধর বলে দাবি করে এরা, আব্বাস হলেন নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আপন চাচা।

গ্রামের কাছে ট্রাকের গতি কমিয়ে দিতেই ছোট ছোট বাচ্চারা উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো। রাস্তা থেকে সরে জায়গা করে দিল ছাগলের পাল। অবশেষে এক শুকনো ছেলে এগিয়ে এল গাড়ির জানালায়।

'এই লোকের সাথে-ই কি আমাদের দেখা করার কথা?' জানতে চাইল কোয়ালস্কি।

'তাই তো মনে হচ্ছে।' উত্তর দিল গ্রে। 'আমাদের জন্য নজর রাখতে বলা হয়েছে ওদের।'

ট্রাক থামতেই এগিয়ে এল সেই অবয়ব, ষোলো বা সতেরো বছরের বাচ্চা একটা ছেলে। গায়ের রং মিশমিশে কালো, পরনে বেগুনি ফুটবল জার্সি এবং হলদেটে বাদামি রংয়ের শর্টস আর পায়ে স্যান্ডেল।

'আমি আহমাদ। স্বাগতম।'

গ্রে-র দিকে ফিরল কোয়ালস্কি, নামটা চিনতে পেরে নড করল সে।

'আমার পরিবারের কাছে নিয়ে যাব তোমাদের। আমরা সবাই খাব ওখানে।' হাত দিয়ে মুখে খাবার তুলে দেওয়ার ভঙ্গি করল ছেলেটা। 'তারপর রওনা দেব, ঠিক আছে?'

শ্রাগ করল কোয়ালস্কি, 'খাওয়ার ব্যাপারে কেউ আবার না করে নাকি!'

খোলা একটুকরো জায়গা দেখাল আহমাদ, 'গাড়ি ওখানে রেখে দাও। খুব বেশি দূরে যেতে হবে না।' সবার চিন্তিত নজর দেখে যোগ করল, 'একদম নিরাপদ, চিন্তা নেই।'

ভ্রূকুটি করল সেইচান, 'আমি থাকছি ট্রাকের সাথে।'

নড করে ট্রাক পার্ক করার নির্দেশ দিল গ্রে। গাড়ির ইঞ্জিন থামতেই নেমে পড়ল ও, কানে গুঁজল ইয়ারফোন।

'যেকোন সমস্যা রেডিয়োতে জানিয়ো, সেইচান।'

জেন আর ডেরেক নেমে দাঁড়াল এক পাশে, ছেলেটার দিকে চোখ মেয়েটার। 'আমরা ওকে বিশ্বাস করতে পারি তো?'

'এই ঊষর সুদানিজ মরুর পথ দেখাবে সে, আমাদের এখন রওনা দিলেই তো বেশি ভালো হতো।'

সবাই তৈরি হতেই রওনা দিল আহমাদ, ছেলেটাকে অনুসরণ করে গ্রামের মূল অংশে প্রবেশ করল ওরা। কিন্তু ওখানে প্রবেশ করার আগেই তীক্ষ্ণ শিষ দিল ছেলেটা, আওয়াজের সাথে সাথেই ছোটখাটো অস্থিসার এক কুকুর বেরিয়ে এল। লেজ নাড়াচ্ছে ওটা, বয়স একেবারেই কম। গায়ের রং কালো সোনালি আর তীক্ষ্ণ কালো চোখ জন্তুটার।

'খুব শান্ত মেয়ে।' গর্বিত স্বরে বলল আহমাদ।

কুকুরটার দিকে একহাত বাড়িয়ে দিল জেন, 'কী নাম ওর?'

ওর আগ্রহ দেখে দেঁতো হাসি মুখে বলল ছেলেটা, 'আনজিং।'

দ্বিধায় ভ্রূকুটি করল জেন।

'এর মানে কী?' জানতে চাইল কোয়ালস্কি।

সুদানিজ ভাষা জানা আছে ওর, 'এর অর্থ কুকুর।'

শ্রাগ করল কোয়ালস্কি, 'আর কোন নাম খুঁজে পেল না!'

হাঁটার ফাঁকে জেনের দিকে ঝুঁকল ডেরেক, 'কুকুরটা খুব সম্ভবত আফ্রিকান জংলি কুকুর অথবা সঙ্কর।'

ভক্তির দৃষ্টিতে জন্তুটার দিকে তাকাল জেন, এই জাতের শিকারি কুকুরের নানা গল্প শুনেছে ও। একটু আগে হাত বাড়িয়েছিল কুকুরটার দিকে।

সৌভাগ্যক্রমে হাতটা এখনও আস্ত আছে!

সবার সামনে জোরকদমে হাঁটছে আহমাদ, উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে যেন। বকবক করেই যাচ্ছে ছেলেটা, গর্বিত ট্যুর গাইডের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

'ওখানে।' সবুজ একটা আকৃতি দেখাল গাইড। 'শেইকে টানার কুঁড়েঘর ওটা। খুব গুরুত্বপূর্ণ লোক। ওই কোনায় যে ঘর দেখছ, ওই লোকটা একাই একটা ছাগল খেয়ে ফেলতে পারে।' ওদের দিকে তাকাল ছেলেটা। 'তিন সত্যি।'

ছেলেটার এই দাবি শুনে একমাত্র কোয়ালস্কি-ই আমোদ পেল। অবশেষে গন্তব্যে পৌঁছে গেল ওরা। রুটি সেঁকার গন্ধ বাতাসে, খিদে চাগিয়ে উঠল জেনের। এত যে ক্ষুধা লেগেছে তা বুঝতেই পারেনি এতক্ষণ।

জোব্বা পরা নারী-পুরুষ এগিয়ে এল ওদের অভ্যর্থনা জানাতে, যেন ওরা অনেকদিনের পুরনো বন্ধু। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন বাচ্চা, সবার পা খালি।

দড়িতে বাঁধা এক গাধার দিকে এগিয়ে গেল আহমাদ, জন্তুটার মোটা গলা জড়িয়ে ধরল। নতুন বন্ধুকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল, 'কালদ।'

আবারও জেনের দিকে তাকাল কোয়ালস্কি।

ভাষান্তর করল ও, 'মানে গাধা।'

মাথা নাড়ল বিশালদেহী লোকটা, 'বুঝলাম না। ছেলেটা কি আমাদেরকে আরবি পড়াচ্ছে নাকি?'

পরিচয় পর্ব শুরু হলো, জেনের নাম শুনে চুপ হয়ে গেল সবাই। চিনতে পেরেছে, হতভাগ্য লোকটার সন্তান সে। পরিবারের সবাই একের পর এক এগিয়ে এসে দুঃখ প্রকাশ করল। ওদের আন্তরিকতা মন ছুঁয়ে গেল মেয়েটার।

ডেরেক ঠিক ওর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দিকে ঝুঁকল মেয়েটা, 'দুঃখিত, জানি না কেন হঠাৎ করেই মনটা খারাপ হয়ে গেল।'

তার কাঁধে হাত রাখল ছেলেটা, 'শোক আমাদের সবাইকেই কাবু করার ক্ষমতা রাখে।'

কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল জেনের ধাতস্থ হতে, 'আমি ঠিকই আছি।'

পাশেই খোলা আকাশের নিচে রাখা টেবিল ভরে উঠল নানা খাবারে। ফল, ঝাল আর মশলা দেওয়া মাংস, মোটা পরতের পরিজ, বড় বড় থালা ভর্তি খেজুর, দই এবং গাজরের তৈরি সালাদ, রুটির উঁচু স্তর-সব সাজানো আছে টেবিলের উপর।

সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের টেবিলে। গ্রে সময়টুকু বয়স্ক এক লোকের সাথে কথা বলে কাটালো, গন্তব্য সম্পর্কে জেনে নিল কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

বাড়ির কর্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালো জেন, আপ্যায়ন বেশ ভালো করেছে এরা। আনজিংকে একটা ভেড়ার কলিজার টুকরো খেতে দিল সে। পেট ভরে যেতেই হেলান দিয়ে বসল চেয়ারে। আশেপাশের বাড়িগুলো থেকে হলদেটে আভা নজরে পড়ছে, কিন্তু রাতের আকাশের তারার কাছে নিষ্প্রভ ঠেকছে ওসব।

মনে শান্তি অনুভব করছে জেন। তবে এটাও জানে, এই শান্তি খুব বেশিক্ষণ আর কপালে নেই।

রাত ৯:২২

এখনই সময়

পরিত্যক্ত এক বাড়ির ছাদে আছে সেইচান, অদূরে দেখা যাচ্ছে পার্ক করা ট্রাকটা। দশ মিনিট আগেই চলে গিয়েছে সবাই, ও নিজেও নেমে পড়েছে তাদের সাথেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন ভাব করেছে যেন কারও সাথে কথা বলছে রেডিয়োতে। কথা শেষে, সবাই যেদিকে গিয়েছে সেদিক অনুসরণ করল ও। কেউ অনুসরণ করছে কিনা তা-ও লক্ষ্য রাখছে। কেউ করছে না নিশ্চিত হয়ে সরে গেল কয়েক ব্লক সামনে। ঘুরপথে এসে উঠল পাশের এক বাড়ির ছাদে। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় ট্রাকটা। অপেক্ষা করছে কেউ টোপটা গিলল কিনা দেখার জন্য।

গ্রামের সবার আগ্রহের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে ইউনিমগ। সাধারণ চোর-ছ্যাঁচড়দের নিয়ে ভাবছে না সে, জানে এরা কেউ ধরবেও না ওটা। অপরিচিত লোকদের কাছ থেকে চুরি করা যায়, কিন্তু অতিথিদের কোন কিছু ছুঁয়েও দেখা পাপ। এটাই এই ধরনের গ্রামগুলোর অলিখিত নিয়ম।

চল্লিশ মিনিট ধরে অপেক্ষা করছে সে, এখনও কাউকে নজরে পড়েনি।

চোখের কোনা দিয়ে বাম দিকে কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখল সেইচান। সাদা জোব্বা পরা এক লোক এগিয়ে আসছে গাড়ির দিকে। এই ধরনের পোশাক এই এলাকার সবাই পরে, সাদা রংয়ের ঢোলা পোশাকে গরম লাগে কম। স্বাভাবিকভাবেই লোকটা হেঁটে যাচ্ছে ট্রাকটার দিকে, দেখে মনে হচ্ছে স্বাভাবিক কৌতূহলে।

তবুও কেন যেন একটা সতর্কঘন্টা বেজে উঠল সেইচানের মনে।

চারপাশে আরও একবার নজর বোলাল লোকটা, তারপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল পার্ক করা গাড়িটার ওপর। আগন্তুকের হাতে কিছু একটা আছে, তবে লম্বা হাতার কারণে দেখা যাচ্ছে না।

লোকটা পুরোপুরি খোলা জায়গায় আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করল সেইচান, এখন চাইলেও সহজে গ্রামের দিকে পালাতে পারবে না আগন্তুক। সন্তুষ্ট হয়ে ছাদের একপাশ থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নামল সে, রাস্তা ঘুরে পেছনে চলে এল লোকটার। নিচু হয়ে হাতে তুলে নিল সিগ সয়্যার, যেকোন মুহূর্তে ব্যবহার করতে প্রস্তুত। কাছে এসে দেখল, লোকটার হাতে অস্ত্র নেই। তবুও হাতের অস্ত্র সরাসরি তাক করল লোকটার পিঠ বরাবর।

মন চাইছে এখনই গুলি করে দিতে, কিন্তু যদি ভুল করে ফেলি!

হয়তো দেখা গেল লোকটা পুরোপুরি নিরাপদ! এজন্যই ঝুঁকি নিল না সেইচান, অনুসরণ করতে লাগল নিঃশব্দে। পায়ের নিচে নরম বালি থাকায় কোন আওয়াজ হচ্ছে না ওর পদশব্দের, তবুও টের পেয়ে গেল আগন্তুক। পিছনে ফিরে তাকাল সে, কঠোর চোখগুলো জ্বলছে।

চাহনি দেখেই যা বুঝে নেওয়ার তা বুঝে নিল সেইচান, এই লোক সাধারণ চোর নয়। গুলি করল সে, কিন্তু ঝাপ দিয়ে সরে গেল লোকটা। সাথে সাথেই উঠে দাঁড়াল আগন্তুক, ছুট দিল গাঁয়ের পথ ধরে।

পিছনে ছুটল সেইচান, আশেপাশের বাড়িগুলোতে আলো জ্বলছে। গুলি করা থেকে নিজেকে বিরত রাখল ও। একটা গুলিও যদি গ্রামের কারও গায়ে লাগে তবে

আর দেখতে হবে না। এই সুযোগে একটা গলির মধ্যে হারিয়ে গেল রহস্যময় আগন্তুক। ধাওয়া করে গলিমুখে চলে এল সে, কিন্তু সামনের রাস্তা গোলকধাঁধার মতো। এই রাস্তায় অন্ধের মতো এগিয়ে সহজ শিকারে পরিণত হতে সে আগ্রহী নয়।

তার বদলে গ্রেকে রেডিয়োতে বলল সেইচান, 'রওনা দেওয়ার সময় হয়েছে।'

বেশি কিছু জানতে চাইল না গ্রে, কণ্ঠে প্রয়োজনীয়তার তাগিদ কান এড়ায়নি ওর।

তিন মিনিট পর, হাজির হলো গ্রে; সাথে অন্যরা। সতর্ক নজর ওর চারপাশে, হাতে ধরা সিগ সয়্যার। ডেরেক আর জেনকে পাহাড়া দিচ্ছে পিছনে থেকে। সবার আগে আগে চলছে কোয়ালস্কি, হাতে শটগান।

সেইচানের দিকে তাকাল গ্রে, নড করে ট্রাকের দিকে আসতে ইশারা করল মেয়েটা।

কাছে এসে একটা প্রশ্নই করল কমান্ডার, 'কী হয়েছে?'

বিস্তারিত ব্যাখ্যা করল সেইচান।

'সাধারণ চোরও তো হতে পারে।' সব শুনে মন্তব্য করল সে।

চোখজোড়া ভুলেনি ও, আর আগন্তুকের রিফ্লেক্সও সাধারণ চোরের থেকে অনেক বেশি। 'না, সে সাধারণ চোর না।'

কথাটা মেনে নিল গ্রে।

হঠাৎ এক অবয়ব দৌড়ে এল গ্রাম থেকে, হাতের অস্ত্র তাক করল সেইচান ওদিকে।

কাছে আসতেই চেনা গেল অবয়বটাকে, আহমাদ।

'দাঁড়াও! আমিও যাব সাথে।' চেঁচিয়ে বলছে ছেলেটা।

ছেলেটাকে বিপদে ফেলতে চায় না গ্রে, তাই সাথে নিতে অনাগ্রহী।

সেইচান ওকে মনে করিয়ে দিলো, 'এমন কাউকে সাথে নেওয়া দরকার, যে মরুভূমিতে আমাদের পথ দেখাতে পারে।'

নড করল ছেলেটা, 'আমি চিনি, খুব ভালো চিনি।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল গ্রে, আরও একটি জীবনের দায়িত্ব বোঝা হিসেবে কাঁধে চাপল।

'ঠিক আছে, ওঠ সবাই। আমরা রওনা দিচ্ছি।'

হাসল আহমাদ, ঘুরে শিষ বাজাল।

সাথে সাথেই ছুটে এল ওর পোষা কুকুরটা।

নতুন আরও একজন সহযাত্রীকে মেনে নিল গ্রে, রওনা দিল ট্রাকের দিকে।

কোয়ালস্কি অবশ্য মন্তব্য করতে ছাড়ল না, 'যাক, তা-ও ভালো যে গাধাটাকেও সাথে আনেনি।'

রাত ৯:৪১

ট্রাকের ইঞ্জিনের জোরালো আওয়াজ কানে এল ভালিয়ার। একটা বাড়িতে লুকিয়ে আছে ও। রওনা দিয়েছে টার্গেট।

আবারও সেই নারী!

গায়ের জোব্বাটা খুলে ফেলল একপাশে, পুরোপুরি নগ্ন এখন সে। ছদ্মবেশের খয়েরি মেকআপ এখনও লেগে আছে গায়ে আর মুখের উল্কিতে। প্রয়োজনীয়তা এখনও ফুরায়নি এর, বুড়ি মহিলার ছদ্মবেশ নিতে লাগবে আবার। প্রশিক্ষণের সময় শিখেছে কীভাবে ছদ্মবেশ নিয়ে উধাও হয়ে যেতে হয়, অর্জন করেছে আশ্চর্য দক্ষতা। নিজের পাণ্ডুর গাত্রবর্ণকে খালি ক্যানভাসের সাথে তুলনা করে ভালিয়া, যেখানে ইচ্ছামতো যেকোন চরিত্র ধারণ করতে পারে সে। খার্তুম থেকে সরাসরি এই গ্রামে এসেছে। দু'ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছে প্রতিপক্ষের জন্য।

অ্যান্টনের দল সরাসরি মরুভূমিতে চলে গিয়েছে, ফাঁদ তৈরি করছে অভিযাত্রী দলের জন্য। ওদের সাফল্য কামনা করছে ভালিয়া। শত্রুদের ট্রাকটা পুরনো, জি.পি.এস. থাকলে সহজেই অনুসরণ করা যেত। তার ওপর আবার দলটা ছুটছে মরুভূমির মাঝ দিয়ে। হাতে ট্র্যাকিং ডিভাইস নিয়ে গাড়িটার চাকায় লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল সে। কিন্তু ঠিক তখনই কোথা থেকে ছুটে এল সেই মেয়েটা।

অবশ্য ছোট একটা লাভ অবশ্য হয়েছে। মেয়েটার নামটা জানে সে এখন।

সেইচান।

সন্তুষ্ট হয়েছে; রহস্যময়তার পর্দা সরিয়ে ফেলেছে নাম। ওকে খুন করার ক্ষমতা রাখে এখন ভালিয়া।

তবুও, মেয়েটাকে ছোট করে দেখতে একদমই রাজী নয় সে।

ঘুরে দাঁড়াল ভালিয়া, ঘরের কোণে দুটো গলাকাটা লাশ পড়ে আছে। রক্তে ভেসে গিয়েছে মেঝে। দু'জনই এই বাড়িটার বাসিন্দা। ভিখারির বেশে ঘরে ঢুকেছিল সে, পরনে ছিল আগাগোড়া ঢাকা বোরকা। ভেতরে ঢুকেই নিজের রূপে ফিরে গেল সে। পাণ্ডুবর্ণের চামড়া দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল বাড়ির বাসিন্দারা, সেই সময়টুকু কাজে লাগিয়ে গলা দু'ফাঁক করে দিতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি।

আফ্রিকার অনেক দেশেই অ্যালবিনোদেরকে জাদুকরী মানুষ হিসেবে মানা হয়। সবার বিশ্বাস, এদের হাড়ে সৌভাগ্য লুকিয়ে থাকে। এই কুসংস্কারের ফলে গোটা মহাদেশ থেকেই অপহৃত হয় শিশুরা। কালোবাজারে বিক্রি হয় এদের দেহের নানা অঙ্গ।

মৃত মানুষ দু'জনের দিকে তাকাল সে।

এদের কপালে অবশ্য সৌভাগ্য জোটেনি!

হাতে নষ্ট করার মতো সময় নেই, তাই দ্রুততার সাথে নানীর ড্যাগারটা তুলে নিল সে। কালো হাতলের অ্যাথেমি দিয়ে মৃতদেহের কপালে এঁকে দিল সে নিজের নিশানা। টকটকে লাল হোরেসের চোখ জ্বলে উঠল মৃত মহিলার কপালে।

শান্তি অনুভূত হচ্ছে ওর মনে, ঠোঁটে খেলে গেল নরম হাসি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও একজনের কপালে এই চিহ্ন আঁকার সুযোগ পাবে ভালিয়া। নামটা জোরে আরেকবার উচ্চারণ করল সে।

'সেইচান

চৌদ্দ
২রা জুন, ৯:২২ পি.এম. ই.ডি.টি.
বাফিন উপসাগরের আকাশে

খোলা বাফিন উপসাগরের পাশেই গালফস্ট্রিম, ওদের গন্তব্যস্থল নিয়ে পড়ছে পেইন্টার। সামনে শুভ্র বরফে ঢাকা এলেসমেয়ার দ্বীপ। খাড়িটা বেশ আঁকাবাঁকা, পাথর আর শেলে পরিপূর্ণ। ছোট ছোট বরফখন্ড ভাসছে ওখানে।

'বাস করার মতো জায়গা বলে মনে হচ্ছে না।' বলল ক্যাট, কেবিনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে।

'কিন্তু মানুষ উপায় খুঁজে নেয়।' বলল পেইন্টার, বই পড়ে সাধারণ ধারণা পেয়েছে দ্বীপটা সম্পর্কে। 'চার হাজার বছর পূর্বে, শিকারি জাতি বাস করত এখানে। পরবর্তীতে ভাইকিং আর ইংরেজদের আগমনও হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীতে।'

'আর এখন, আমরা এসেছি।' বলল ক্যাট।

নড করল পেইন্টার, তার পাকস্থলীতে খামচে ধরেছে উৎকণ্ঠা। মেটকাফের সাথে কথা হয়েছে ডি.সি.তে, একটু সময়ও নষ্ট করেনি ওখানে। শুধু বসকে বুঝিয়েছে এই মিশনের প্রয়োজনীয়তা। প্রথমে মানা করলেও তিনি হার মেনেছেন পেইন্টারের জেদের কাছে।

আকাশপথে এসেছে ক্যাট আর পেইন্টার। পথে শুধু তেল নেবার জন্য থেমেছে গ্রিনল্যান্ডের মিলিটারি বেসে। থুলের কাছ থেকে ওই অঞ্চল সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জেনে নিয়েছে পেইন্টার। দুইটি আলাদা এয়ারফোর্স স্কোয়াড্রন দ্বারা পরিচালিত এই বেস। আছে ব্যালেস্টিক মিসাইলের আর্লি-ওয়ার্নিং সিস্টেম এবং বৈশ্বিক স্যাটেলাইট কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক। সেই সাথে মিলিটারি বেস আর রিসার্চ ইন্সটলেশন ফ্যাসিলিটি, পুরো গ্রিনল্যান্ডে চলে এদের কার্যক্রম। এলেসমেয়ারের অরোরা ষ্টেশনও এরাই তদারকি করে। এই হলো শুধু আমেরিকার কর্মকান্ডের বিবরণ।

কানাডারও আছে আলাদা ঘাঁটি, নর্থ পোল থেকে পাঁচশ মাইল দূরে সেটা। সেখানেও আছে মিলিটারি বাহিনী আর বৈজ্ঞানিকদের লোকবল।

বিমান থেকে দেখতে চেয়েছিল পেইন্টার ওই স্থান। দূরে বলে দেখতে পারেনি। কুইটিনিরপাক ন্যাশনাল পার্কের পাশ দিয়ে উড়ে চলছে আকাশযান, ঠিক নিচে চ্যালেঞ্জার পর্বতের সাদা বরফাচ্ছাদিত চূড়া।

'কাছাকাছি চলে এসেছি।' বলল ক্যাট।

আর্কটিক সাগরের উত্তর-পশ্চিম তীরে অরোরা স্টেশনের অবস্থান। বিভিন্ন কারণে এই স্থানটা ঠিক করা হয়েছে এর জন্য। তার মধ্যে একটি হলো-চৌম্বকীয় উত্তর মেরুর খুব কাছে এই ঘাঁটি। সহজেই এই সংক্রান্ত গবেষণার নানা উপাত্ত সংগ্রহ করা যায় এখান থেকে। ভৌগলিক উত্তর মেরু যেখানে স্থির, সেখানে তার চৌম্বকক্ষেত্র নিয়ত পরিবর্তনশীল।

পাইলটের কণ্ঠ শোনা গেল রেডিয়োতে, 'বিশ মাইল দূরে গন্তব্য। দশ মিনিটের মাথায় মাটিতে নামবো আমরা। সামনে আবহাওয়া পরিষ্কার।'

মাটি থেকে আকাশে গেল পেইন্টারের নজর, শুভ্র সাদা মেঘ আছে কিছু ওখানে। তবে, উত্তর-পশ্চিমকোণে ঘোর অন্ধকার, ওদিক থেকে ধেয়ে আসছে ঝড়। আবহাওয়া খারাপ হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র, দিন এমনকী সপ্তাহ পর্যন্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে সবার সাথে। এজন্যই সে জোর করেছে জেনারেল মেটকাফকে। কারণ এই সময়ে না পৌঁছুতে পারলে, কমে যাবে সাফিয়াকে উদ্ধারের সম্ভাবনা।

তা হতে দিতে পারে না পেইন্টার।

জোরে বলল ক্যাট, 'ঝড় শুরু হলে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে সবার সাথে।'

ওদেরকে নামিয়ে দিয়েই চলে যাবে জেটবিমান। এয়ার বেসের কমান্ডার কর্নেল ওয়াইক্রাফট প্রস্তুত হয়ে আছে যেকোন পরিস্থিতির জন্য। তবে, আবহাওয়ার ব্যাপারে ওদেরও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

তবুও দমেনি পেইন্টার।

'সামনে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমাদের।' বলল সে।

মেয়েটা তাকাল ওর দিকে, তর্ক করতেই হয়তো। কিন্তু কিছু একটা ভেবে পিছিয়ে গেল সে। পেইন্টার জানে, এই মিশনটাকে ক্রমশ কঠিন করে তুলছে সে। আর অন্যদিকে, দক্ষ হাতে ওই ঝামেলাগুলো সামলে নিচ্ছে ক্যাট। এখন পর্যন্ত কোন নির্বোধ লোকের খপ্পরে পড়েনি তারা। মেয়েটা যথাসম্ভব চেষ্টা করছে নিজেদের এবং সাফিয়ার ভালো দেখতে।

ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ক্যাট।

'কী?' জিজ্ঞাসা করল ডিরেক্টর।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, 'ছবিগুলোতে আসল রূপ ধরা পড়েনি।'

তাকাল পেইন্টার, আসলেই তাই। হাতে গোণা কয়েকটা সেসনা পার্ক করা স্টেশনটার এয়ারস্ট্রিপে। আরেকটা জেট রাখা হ্যাঙারের ভেতর। তবে, এই দৃশ্য দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেনি ক্যাট।

অরোরা স্টেশন একটা সত্যিকারের এক ইঞ্জিনিয়ারিং-মাইলফলক। পুরো তিনশো একর জুড়ে ছড়িয়ে আছে যন্ত্রপাতি। আর মাটির নিচে অবস্থিত এর পাওয়ারহাউস। কম করে হলেও দুই হাজার অ্যান্টেনায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে ওটা। প্রতিটা কম করে হলেও দশ তলা সমান লম্বা, পরস্পরের সাথে সংযুক্ত।

'মহাকাশের ছায়াপথের মতো লাগছে।' মন্তব্য করল মেয়েটা।

বুঝল পেইন্টার, এই ফ্যাসিলিটিটা তৈরিই হয়েছে এভাবে। সৌন্দর্য আর বাস্তবতার মিলন ঘটেছে ভালোভাবেই। অতীতে খনি ছিল এখানে, সুমেরুর নানা গবেষণা চলেছে। বরফের নিচ থেকে তামা, সোনা, সীসা, দস্তা, এমনকী হীরা পর্যন্ত পাওয়া যায়। সমৃদ্ধ এই অঞ্চলে, এখনও ওইভাবে মানুষের হাত পড়েনি।

'মাঝখানের ওটা কী?' জানতে চাইল ক্যাট।

উঁচু ধাতব চূড়ার দিকে তাকাল পেইন্টার, আকাশের দিকে মুখ করে আছে ওটা। চকচক করছে শুভ্র বরফের মাঝে, নানা তারে প্যাঁচানো অবয়ব দূর থেকেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

'সাইমনের মনের একাগ্রতার সাক্ষর বলতে পারো।' বলল সে। 'নিকোলা টেসলার কাজগুলোকে আরও পরিণত করে গবেষণার কাজে লাগাচ্ছে লোকটা।'

'কিন্তু এই অবয়বটা কিসের?'

'ওয়ার্ডেনক্লাইফ টাওয়ার, টেসলার বহুল আকাঙ্ক্ষিত প্রকল্প।'

পকেটের আইপ্যাড বের করল পেইন্টার, আগেই খুঁজে রেখেছে সেই চিত্র। পরিষ্কার ধারণার জন্য ক্যাটকে দিল আইপ্যাডটা। দুটো অবয়বই দেখল মেয়েটা।
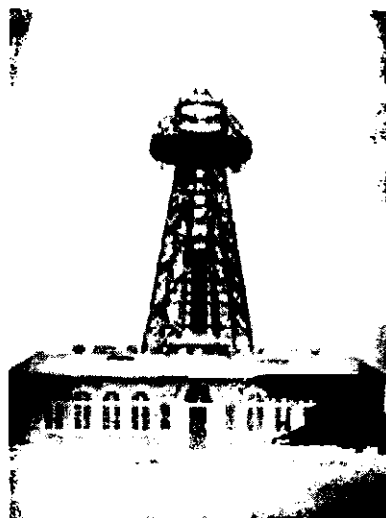
'এক দ্বীপের দুইশো একর জায়গা জুড়ে একটা বিশাল পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করেছিলেন টেসলা। সেই সাথে আঠারো তলা কাঠের টাওয়ার। উদ্দেশ্য ছিল বৈশ্বিক তারবিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা।'

'উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল বেশ।'

'পরবর্তীতে অর্থের অভাবে থেমে যায় এই প্রকল্প। জায়গাটা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় একটা সময়।' নিচে তাকাল পেইন্টার, 'এখনও অনেকেই ছোটে এই স্বপ্নের পিছনে। ওয়ার্ডেনক্লাইফ থেকেই এসেছে ক্লাইফ এনার্জি। সেই একই স্বপ্ন আর অনুপ্রেরণা থেকে।'

'কিন্তু এই টাওয়ার দিয়ে হার্টনেলের কী পরিকল্পনা?' জিজ্ঞেস করল ক্যাট।

'ভালো প্রশ্ন করেছ।' ভ্রূকুটি করল ডিরেক্টর।

এইখানে আসার সময় অল্পই সময় পেয়েছে সবগুলো লেখা পড়ার। সেখান থেকেই জেনেছে, এই টাওয়ার অ্যান্টেনা এমপ্লিফায়ার। নকশাটা তৈরি করা হয়েছে টেসলার প্রতি সম্মান দেখিয়ে। হার্পের সেই আয়নোস্ফিয়ার স্টিমুলেটিং বিম তৈ করতে পারে এই অবয়ব। এর মাধ্যমে আরও নিখুঁত ফলাফল পাওয়া সম্ভব, কাজ করে আগের যন্ত্রটার মতোই।

কিন্তু এখন সরাসরি দেখছি আমি!

পেটের মধ্যে খামচে ধরার মতো অনুভূতি হলো পেইন্টারের, সাফিয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ থাকায় বাকি বিষয়গুলো নিয়ে ঘাঁটায়নি তেমন। এজন্যই নতুন অবয়বগুলো অপরিচিত ঠেকছে।

রেডিয়ো করল পাইলট, 'অবতরণ করার সময় হয়েছে। তৈরি হোন।'

নিজের সিটে হেলান দিয়ে বসল পেইন্টার, পেছন ফিরে তাকানোর সময় শেষ।

রাত ১০:২২

আকাশযান থেকে নামল ক্যাট, শীতে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর গায়ে। পার্কা পরা সত্ত্বেও হাড়ে গিয়ে ঠেকছে শীত। গায়ের জামাটা আরেকটু চেপে ধরল সে, দমকা হাওয়া থেকে বাঁচার ব্যর্থ প্রয়াস। তাপমাত্রা কমে গিয়ে ঠেকেছে শূন্যের কাছাকাছি, ঝড় শুরু হলে নেমে যাবে আরও।

দূরে সমুদ্রের দিকে তাকাল ও, দিগন্তে কালো মেঘের ছোঁয়া। সূর্য অস্ত যাচ্ছে ঠিক ওদিকেই, মনে হচ্ছে যেন আসন্ন ঝড় থেকে পালাতে চাইছে ওটা, রক্ষা নেই তবুও। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের আগে অস্ত যাবে না সূর্য।

বাঁ দিকে সাদার মাঝে একটুকরো কালো নুড়ি মেশানো রাস্তা, এয়ারস্ট্রিপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তারপরই বিস্তর শুভ্র বরফের রাজত্ব। ওখানে বাস করে মেরু ভাল্লুক, সিল মাছ, নারওয়েল এবং বেলুগা তিমি। ক্যারিবুর পাল ঘুরে বেড়ায় ওখানে। সেই সাথে লোমশ কস্তুরী বলদেরও অভাব নেই। এই অঞ্চলের আদি নামইই, ইউমিনম্যাক নুনা। যার অর্থ "কস্তূরী বলদের ভূমি"।

নীল ঘাস জেগে আছে বরফের রাজ্যের মাঝে, পলিমাটির অভাব নেই বরফের নচে। এই প্রতিকূল পরিবেশেও বেঁচে আছে ওসব।

পাশের কংক্রিটের অবয়বের দিকে নজর গেল ওর, কমলা রং সবগুলোর। এগিয়ে গেল ওরা সেদিকে। পিছনে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে বিমান। তাকিয়ে তাকিয়ে ওটার চলে যাওয়া দেখল ক্যাট। তবে পেইন্টার ভ্রূক্ষেপই করল না।

আশা করা যায়, আমরা বেঁচে থাকব এই শুভ্র বরফের রাজ্যে।

সামনে মূল ফটকের দরজায় অপেক্ষা করছে অভ্যর্থনা দল। সোজাসুজি ওদিকে এগিয়ে গেল পেইন্টার, মনে হচ্ছে যেন শীত থেকে বাঁচতে। কিন্তু না, আসলে সাফিয়ার প্রতি দুশ্চিন্তাই তার দ্রুত পদক্ষেপের কারণ।

অনুসরণ করছে ক্যাট, আসন্ন ঝড়ের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে ফ্যাসিলিটির লোকজন। একটা গ্যারেজ থেকে উঁকি দিচ্ছে একজোড়া স্নো-ক্যাট। এয়ারস্ট্রিপে বেঁধে রাখা হয়েছে কয়েকটা সেসনা, এই ধরনের আকাশযানের জন্য হ্যাঙার বরাদ্দ নেই। হ্যাঙারে আছে একটা চকচকে লিয়ারজেট, বোঝাই যাচ্ছে এটা পুরোপুরি সচল এয়ারপোর্ট।

এই বিচ্ছিন্ন স্টেশনে ব্যাপারটা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়।

স্টেশনের ভেতরে প্রবেশ করল ওরা, উষ্ণতা অভ্যর্থনা জানাল ওদের। অল্প কয়েক মিনিটেই জমে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল ক্যাটের।

পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, সাইমন হার্টনেল স্বয়ং উপস্থিত হয়েছে। লোকটার পরনে মোটা উলের গলাবন্ধ, জিনস আর বুট। স্বয়ং সি.ই.ও.কে এখানে দেখে অবাক হলো ক্যাট, এমন ছোট-খাটো কাজে মানাচ্ছে না ঠিক তাকে।

'দুনিয়ার শেষ প্রান্তে স্বাগতম।' বলল সাইমন, উত্তরদিকে ইশারা করল এইবার। 'পুরোপুরি নয়, তবে উঁকি দিলে ঠিকই শেষ প্রান্ত দেখা যায়।'

হাসল ক্যাট, সন্দেহ করল ওটা কোন পুরনো রসিকতা। যারা এখানে আসে সবাইকে একই কথা বলেই অভ্যর্থনা জানায়।

'ধন্যবাদ,' পার্কার হুড নামিয়ে বলল ক্যাট, 'ঝড়ের আগেই পৌঁছুতে পারব ভাবিনি।'

নড করল পেইন্টার, 'স্বল্প সময়ের নোটিশে থাকার ব্যবস্থা করার জন্য ধন্যবাদ।'

হাত নেড়ে বলল সাইমন, 'প্রতিষ্ঠানের জন্য তৎক্ষণাৎ পরিদর্শন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এবং ডারপা সবসময়ই সমাদৃত। হার্পে আপনাদের অবস্থান ছাড়া কখনওই অরোরা স্টেশন তৈরি সম্ভব ছিল না।' হাসি প্রসারিত হলো, 'তাছাড়া, নিজের কাজগুলো দেখানোর সুযোগ পাওয়া গেল। নিজেদের কাজ নিয়ে রীতিমতো গর্বিত আমরা, আর কাজের ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখতেও অঙ্গীকারবদ্ধ।'

'আবহাওয়ার পরিবর্তন রুখতে?' বলল ক্যাট।

'একদম ঠিক। বর্তমানে চৌত্রিশটা আলাদা আলাদা প্রকল্পের কাজ চলছে। প্রধান লক্ষ্য একটাই, বৈশ্বিক উষ্ণতার সাথে লড়াই।'

'মহত উদ্যোগ।' বলল পেইন্টার।

শ্রাগ করল সি.ই.ও., 'সেই সাথে লাভজনকও। প্রতি সহায়-সম্পত্তির মালিক হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানির মালিকানা পরিষদের সদস্যদের সন্তুষ্ট করতে হয় আমাকে।' ঘুরে দাঁড়াল সে, 'কাল সকালে না হয় বিস্তারিত কথা হবে। যদিও বাইরে সূর্যের আলো আছে, তবুও সময় হয়েছে অনেক। চলুন, আপনাদের থাকার জায়গা দেখিয়ে দেই।'

নীল করিডর ধরে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেল ওরা।

'স্টেশনের অধিকাংশ অংশ মাটির নিচে অবস্থিত, প্রাকৃতিকভাবে গরম রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা।' বলল সাইমন।

বি-৪ লেখা বাটনে চাপ দিল।

বেসটার নির্দিষ্ট বিন্যাস দেখে নিল ক্যাট। ভূস্তরের উপরের চারতলায় ল্যাব, অফিস, স্টোরেজ স্পেস, ওয়ার্করুম, এমনকী বিনোদনকেন্দ্র পর্যন্ত আছে। ওখানে আছে ইনডোর টেনিস কোর্ট, পুল এবং মুভি থিয়েটার।

প্রকৃত অর্থেই একটি শহর বলা যায় এই অবকাঠামোটাকে।

এই গোলকধাঁধায় সাফিয়াকে খুঁজে বের করা কঠিন হবে।

হলওয়ের সিকিউরিটি ক্যামেরাটা নজর এড়ায়নি ক্যাটের। পরিষ্কার বুঝতে পারল নজর রাখা হয় পুরো ফ্যাসিলিটিতেই। পাণ্ডুর বর্ণের লোকটার কথা ভাবল সে,

অ্যান্থনি ভ্যাসিলিভ ওরফে অ্যান্টন মিখাইলোভ, এই পুরো কমপ্লেক্সের সিকিউরিটি প্রধান।

হার্টনেল সত্যিই যদি মিখাইলোভ ভাই-বোনকে চাকরি দেয় এখানে, তবে না জানি এমন আরও কতজনকে চাকরিতে রেখেছে এই লোক!

বরফ শীতল চোখগুলোকে এখনও অনুভব করছে ও।

ওদের দু'জনের ব্যাপারে রীতিমতো গবেষণা করেছে এই লোক, সন্দেহ নেই। এলিভেটরের দরজা খুলতেই প্রমাণ মিলল এই ধারণার।

ভেতরে সবাই ঢোকার পর, হার্টনেল তাকাল পেইন্টারের দিকে। 'পেইন্টার ক্রো, আমি আপনাকে চিনি।'

'সত্যি?' অবাক হলো পেইন্টার।

নকল পরিচয় ব্যবহার করেনি ওরা, দু'জনের অতীতই ডারপার সাথে যুক্ত। তাছাড়া সিগমার সাথে ওদের সংশ্লিষ্টতা, এমনকী সিগমা ফোর্সের নামটা পর্যন্ত বরাবরের মতোই গোপন সবার কাছে। ঘন্টাখানেকের বেশি সময় পায়নি এরা তাদের অতীত ঘাঁটার জন্য।

'হ্যাঁ,' বলল হার্টনেল, 'আপনিই সেই লোক, তাপ নিয়ন্ত্রক মাইক্রোরিলে সার্কিট বানিয়েছিলেন যিনি।'

'একদম ঠিক।' ভ্রু কুঁচকে বলল পেইন্টার।

হাসল সি.ই.ও., 'এখানে সত্তুর হাজার সার্কিট ব্যবহৃত হচ্ছে। মাইক্রো ইঞ্জিনিয়ারিং এর এক অদ্ভুত নমুনা। আর যেভাবে উত্তাপের ব্যাপারটা সামলেছেন!' কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল সে। 'ডারপার কাছ থেকে আপনাকে কেড়ে নেয়া উচিত।'

বিশাল কমন রুমের মাঝ দিয়ে চলল সবাই, মিল ট্রে হাতে অল্প কয়েকজন পড়ল রাস্তায়। রান্নাঘরটা কিছুটা দূরে, মসলার সুবাস ভেসে আসছে ওখান থেকে।

'ক্ষুধা লাগলে চলে আসবেন এখানে। আপাতত খাদ্যের মেনু সীমিত। কিন্তু এখানকার কফি সারা পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো কফি।'

নড করল ক্যাট, শেষের কথাটা শুনে প্রলুব্ধ হয়েছে।

বাম দিকের করিডোরে নিয়ে এল হার্টনেল, 'আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। থাকার জায়গাটা খুব একটা আরামদায়ক নয়, তবে পাশাপাশি থাকতে পারবেন আপনারা।'

'সমস্যা নেই।' বলল পেইন্টার, 'আমাদের কাজ দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে।'

তাই যেন হয়!

কী-কার্ড দিলেন লোকটা, 'পুরো স্টেশন নিয়ন্ত্রণ করা হয় বিদ্যুতের মাধ্যমে। এমনকী এই কার্ডগুলো শিডিউল শিখে নিতে পারে। সেই অনুপাতে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে রুমের। সব তথ্য জমা থাকে এতে।'

হার্টনেল ওদেরকে কিছুটা ঘাবড়ে দিতে চাইছে বলে মনে হলো ক্যাটের।

'যেমনটা বলেছিলাম, কাল বিস্তারিত কথা হবে। আপনারাও নিশ্চিত হবেন, যে ডারপা অযথা টাকা ঢালছে না।' করমর্দনের জন্য হাত বাড়াল লোকটা।

'ধন্যবাদ,' বলল ক্যাট, হাই তুলল।

'বিশ্রাম নিন নাহয়।' নড করে চলে গেল সাইমন।

দরজা খুলল পেইন্টার, হলের সিলিং-এ লাগানো ক্যামেরার দিকে চোখ। 'নজরে রাখা হবে আমাদের।'

নিজেদের রুমে প্রবেশ করল ওরা। ক্যাট ভেতরে ঢুকেই দেখল 'আরামদায়ক না' হবার নমুনা! রুমের মেঝে শক্ত কাঠের, উষ্ণ পরিবেশ ভেতরে। বিশাল বড় খাটে বুটিদার রেশমি চাদর বিছান। একপাশের দেয়ালে পর্দা টানানো, পেছনে বিশাল বড় প্লাজমা টিভি সেট। স্ক্রিনে রৌদ্রালোকিত সমুদ্রতীর। মিষ্টি গানের সুর ছড়িয়ে আছে রুম জুড়ে। বড় একটা টাব এবং স্টিম শাওয়ার দেখা যাচ্ছে একপাশের মার্বেল বাথরুমে।

মাথা নাড়ল ক্যাট, লোকটা চমক দিতে ভালোবাসে।

চমক আমরাও দিব .!

ব্যাগ রাখল বিছানায়, ভেতরে গোপন কম্পার্টমেন্টে লুকান আছে সিগ সয়্যার। তবে, ওটা ধরল না ও। বদলে, পর্যবেক্ষণ করল রুমের ভেতরটা।

পেইন্টারের রুম থেকে টোকার আওয়াজ ভেসে এল। কার্ড ঢুকিয়ে পথ করে নিল সে। চুপচাপ পেইন্টার ঢুকল ওই রুমে, হাতে একটা যন্ত্র দিয়ে পুরো রুম পরীক্ষা করল ।

কাজ শেষ করে সন্তুষ্টচিত্তে নড করল ও, 'পরিষ্কার, কোন মাইক নেই। কথা বলা নিরাপদ।'

'কী করবেন এখন?' জানতে চাইল ক্যাট, ব্যাগ হতে অস্ত্রটা বের করতে উদ্যত হলো।

'সাফিয়াকে খুঁজব।'

'বেঁচে আছে ও।' বলল ক্যাট, সতর্ক পদক্ষেপ ফেলতে হবে এখন থেকে। 'খুন করার জন্য এতদূর বয়ে আনেনি ওকে। অন্য কোন প্রয়োজন আছে।'

'কী সেই প্রয়োজন?'

'ভালো প্রশ্ন, উত্তরটা সাফিয়াই দিতে পারবে।' দরজার দিকে তাকাল সে, 'কোত্থেকে শুরু করবেন?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ভাবল কিছুক্ষণ পেইন্টার, তারপর আঙুল তাক করল হলওয়ের দিকে।

'প্রথমে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো কফিটা চেখে নেই, তারপর প্রতিবেশীদের চেনায় মন দিতে হবে।'

রাত ১১:২৬

নাহ! কোন মানে হয় না এর!

স্টেশন লাইব্রেরিতে বসে ক্লান্ত চোখ রগড়ে নিল সাফিয়া। সারাদিনই মিশরীয় মেয়েটার দেহের উল্কির নকশা করেছে রোরিকে নিয়ে। মিশরীয় রাণীর বয়স এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ওপর বায়োসেফটি স্যুট পরে কাজ করতে হচ্ছে।

কিছু কিছু অংশ সহজে পড়া যাচ্ছে, আর আলট্রাভায়োলেট রে দিয়ে বাকিগুলোর ছবি তোলা হচ্ছে। তাছাড়া পায়ের আঙুলে ছাপ দেয়া ছোট ছোট লেখাগুলো উদ্ধার করতে হতে হচ্ছে গলদঘর্ম।

নয় ঘন্টা পর, মোটামুটি পড়ার মতো একটা লেখা পাওয়া গেল। ল্যাপটপে একটা অংশ নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিয়েছে ও। প্রচুর লেখা ঝাপসা, কিছু কিছু অক্ষর উধাও।

খুব যত্নের সাথে কাজ করা সত্ত্বেও, কয়েকটা অংশ পুনরুদ্ধারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তাই, থ্রিডি টপোগ্রাফিক স্ক্যানার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে মমিটার চারপাশ ঘিরে। যন্ত্রটার চার চারটা লেজার পুরোটার পুঙ্খানুপুঙ্খ ম্যাপ তৈরি করবে।

কিন্তু সময় লাগবে প্রচুর। তাই ওটাকে রেখে লাইব্রেরিতে চলে এসেছে দু'জন। কিছু অংশের পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করছে। কোন কূল-কিনার খুঁজে পাচ্ছে না।

'সব অস্পষ্ট।' বলল সে।

'হুম, কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া তো আর এইসব উল্কি আঁকা হয়নি মেয়েটার গায়ে।' রোরি উত্তর দিল।

'অলঙ্কারও হতে পারে। অনেকেই লেখার অর্থ না দেখে নানা চিহ্ন উল্কি করে গায়ে।'

'বিশ্বাস হলো না।'

'আমারও না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা সংরক্ষণ করতে চেয়েছে মেয়েটি।'

কিন্তু কী সেই কথা?

'কাল আবার শুরু করা যাবে নাহয়।' বলল রোরি। 'আজ রাত হয়েছে অনেক, দু'জনেই ক্লান্ত।'

নড করল সাফিয়া, হতাশ হয়েছে। 'মনে হচ্ছে, এমন একটা বই পড়ছি, যার অর্ধেক অক্ষর নেই, যেগুলো আছে ওগুলোও ঝাপসা প্রায়।'

'মমির দেহের সামনের অংশ পুড়ে গিয়েছে, পিঠের অংশটাও পাইনি আমরা।' মনে করিয়ে দিল সে।

'ঠিক।'

রোরি নিজের হাই ঢাকার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করল।

হাসল সাফিয়া। 'যখন চোখ খোলা রাখতে পারবে, তখন নাহয় আবার চেষ্টা করা যাবে।'

'এটা তো এমনিতেই আর খুলছে না।' আঘাত পাওয়া চোখটা দেখাল সে। ব্যর্থতার স্মারক চিহ্ন ওটা।

স্মারকদাতা বসে আছে দরজার পাশে, তাকিয়ে আছে অন্যদিকে।

'এর একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করব।' আশ্বস্ত করল সাফিয়া।

দু'জনেই ল্যাপটপ তুলে নিল। কম্পিউটারে সবকিছু লক করা থাকলেও, নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারে ওরা। রাতের বেলা কোনকিছু মাথায় আসলে তা ত্বরিত জানানোর জন্য এই ব্যবস্থা।

'শেষ একটা প্রশ্ন।' বলল সাফিয়া, 'ওই চারকোনা চামড়াটা, যেটা পরীক্ষার জন্য তোমার বাবা কেটে নিয়েছিলেন '

'এই মমিকরণের প্রাকৃতিক কারণ অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন তিনি। তার মতে, এখানে অসঙ্গতি আছে।'

'অসঙ্গতি বলতে?'

'তিনি বিশ্বাস করতেন, অদ্ভুত কোন ধর্মীয় আচার পালন করা হয়েছে মেয়েটাকে নিয়ে। কিন্তু বিস্তারিত কিছু বলেননি। প্রতি সপ্তাহে এক ঘন্টা মাত্র কথা বলার সুযোগ পেতাম আমরা।' অ্যান্টনের দিকে ফিরে তাকাল ও। 'আমাদের যা আদেশ দেয়া হতো, আমরা তাই করতাম।'

খালি জায়গাটা আবার দেখল সাফিয়া, 'ওই অংশের লেখাটুকুর কোন অনুলিপি নেই?'

'জানা নেই। যদি থেকেও থাকে, পুড়িয়ে ফেলেছেন বাকি জিনিসের সাথে।'

'কী গোপন করতে চাচ্ছিলেন তোমার বাবা?' জানতে চাইল সে।

বলল রোরি, 'এমন কিছু, যার গোপনীয়তা রক্ষায় জীবন দিয়ে দেয়া যায়।'

সংকুচিত হয়ে গেল মেয়েটা, ওর হাত ধরে বলল, 'দুঃখিত।'

পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'আর আমাকে ফেলে গিয়েছেন বাকিটুকু যোগাড় করতে।' কণ্ঠের তিক্ততা চাপা রইল না।

দরজার দিকে গেল রোরি, পিছনে ছুটল সাফিয়া। ছেলেটার অশান্ত মনকে শান্ত করতে চাইছে, তবে জানে না ঠিক কী বলবে। বাবার তিরোধান কষ্ট দিয়েছে ওকে। জোর করে এখন বাবার পথেই হাঁটানো হচ্ছে ছেলেটাকে। হ্যারল্ডের শেষ পদক্ষেপের জন্য অবাক হলো সাফিয়া।

স্বার্থপরতা? নাকি হতাশা?

রোরির কাছে ও পৌঁছুতেই দরজায় টোকার আওয়াজ শুনতে পেল। ওদের পিছিয়ে যেতে ইশারা করল অ্যান্টন। দেহ দিয়ে আড়াল করে খুলল দরজা, হাতে নিল একটা ফাইল। দরজা বন্ধ করে বলল সে, 'টেস্ট রেজাল্ট।'

বিভ্রান্ত হলো সাফিয়া, কিন্তু হাতে তুলে নিল কাগজটা। ভেতরে সাবজেক্টের ডি.এন.এ. অ্যানালাইসিস। ওটার কার্বন ডেটিং করা হয়েছে ওখানে। এত দ্রুত

ফলাফল পেয়ে যাবে আশা করেনি সে। কিন্তু যদি জানত, এসবের পিছনে টাকা ঢালছে কে, তবে অবাক হতো না এতটা।

রোরিকে অতোটা অবাক মনে হলো না। মমিটার বয়স জানার জন্য অটোজোমাল এবং মাইটকন্ড্রিয়াল ডি.এন.এ. টেস্ট দিয়েছিল সাফিয়া। যাতে জানতে পারে অতীত মিশরের ঠিক কোন সময়টাতে বাস করত মেয়েটা।

বিস্তারিত ত্রিশ পাতার একটা রিপোর্ট, চার্ট আর গ্রাফও আছে সাথে। সংক্ষিপ্ত ফলাফল লেখা আছে ওপরে। শেষ লাইনটা পড়ল ও, 'সাবজেক্টের গায়ে কয়েক ধরনের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাওয়া গিয়েছে যেটা, হ্যাপলোগ্রুপ কে১এ১বি১এ। মিশরীয় বংশের গুণধারী এল২ অনুপস্থিত।'

ভ্রূকুটি করে রোরি বলল, 'আর্কিওজেনেটিকস আমার সাধ্যে কুলায় না। কী মানে এর?'

ঢোক গিলল সে, মমিটাকে কল্পনা করল আরও একবার। 'এটা বলছে, ও মিশরীয় না।'

'কী?'

'আমার ধারণা .সে ইহুদি।'

রাত ১১:৫৫

বরফ শীতল পুল থেকে উঠল সাইমন, গায়ে একপ্রস্ত সুতো পর্যন্ত নেই। কাঁপতে কাঁপতে তোয়ালেতে জড়িয়ে নিল গা। প্রতি রাতের পালনীয় আচার এটা। ব্যক্তিগত পুলটা এক গজ চওড়া এবং বারো ফিট গভীর, পানির উষ্ণতা ঠিক পঞ্চান্ন ডিগ্রি। প্রতিরাতে ঝাঁপ দেয় এখানে। পুলের গভীরে গাঁথা স্টেইনলেস স্টিলের রিংটা ধরে রাখে দম শেষ হওয়া পর্যন্ত এবং উঠে আসে।

ঠান্ডা পানির বদৌলতে নিজের কর্মস্পৃহা বেড়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। এছাড়াও এতে লসিকাগ্রন্থির সঞ্চালন বাড়ে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয়...এমনকী দেহের মেদ পর্যন্ত ঝরে পড়ে। আর কিছু না হলেও হৃদপিণ্ডের ব্যায়াম হয়, এই যেমন এখন বুকের খাঁচায় লাফাচ্ছে হৃদপিন্ডটা।

কেঁপে উঠল পুরো শরীর, মোটা রোবটা পরে নিল সে। এই আচারের মাধ্যমে ভালো ঘুম হয় তার। বিশেষ করে এই অঞ্চলে, যেখানে দিন আর রাতের ফারাক

নেই। চিন্তা-ভাবনাও পরিষ্কার হয়ে যায় অনেকটুকু। সারাদিনের কথা ভাবল, ডারপার আকস্মিক আগমনে সন্দেহ জাগছে মনে।

ঠিক এখনই কেন এল ওরা?

নতুন এক পরীক্ষা করতে যাচ্ছে সে। সময় নির্ধারণ করা হয়েছে আটচল্লিশ ঘন্টা পর। সবকিছুই উপকরণই প্রস্তুত; দুর্লভ ঝড়টাও আসছে, শক্তিশালী জিওম্যাগনেটিক ঝড়। সবকিছু ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও দেরি করতে হবে এখন।

মাথায় জোর গতিতে চলছে চিন্তা, খালি পায়ে নিজের লাইব্রেরির দিকে রওনা দিল সাইমন। পুরো পাঁচতলা নিয়ে তার থাকার জায়গা। অল্প কয়েকজন নির্দিষ্ট মানুষের অনুমতি আছে এখানে ঢোকার।

লাইব্রেরি রুমটা নতুন এবং পুরনোর মিশেল। তিনদিকের দেয়ালে মেহগনি কাঠের শেলফ ভর্তি বই, কিছু কিছু বই হাজার বছর আগের। সেই সাথে কাঁচের পিছনে আছে তালিসমান আর বহুমূল্য ঐশ্বর্য।

একটা দেয়ালের পুরোটা জুড়ে শুধু নিকোলা টেসলার জাদুঘর বলা যায়। এমনকী প্লাজমা স্ক্রিনেও ভাসছে নিউ ইয়র্কের টেসলার আদি বাসভবন। যেখানে এখনও রয়েছে জ্ঞানী লোকটার স্মৃতিচিহ্ন।

এই ঘরেই শেষ হয়েছে টেসলার জীবন আর শুরু হয়েছে আমার নেশার।

কালো মোটা বইটার দিকে নজর সাইমনের, ওর কালেকশনের সবচাইতে মহামূল্যবান বস্তু।

১৯৪১ সালের সকালে মৃত্যু হয় নিকোলা টেসলার, তার ভাতিজা সাবা কোসানবিক ছুটে আসে হোটেলে। এসে দেখে রুম খালি, চাচার দেহটাও নেই। বৈজ্ঞানিকের সারাজীবনের সব গবেষণাপত্র উধাও! এর মাঝে একটা বিশেষ নোটবুকও আছে, যেটা ওর চাচা ওকে নিরাপদে রাখতে বলেছিলেন। এফ.বি.আই. এবং সরকার সব গবেষণাপত্র জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে বাজেয়াপ্ত করল।

ফ্রেমে রাখা ওইদিনের পত্রিকায় চোখ বোলালেন তিনি। ১৯৩৪ সালের কথা, ১১ই জুলাই ছিল ওইদিনের তারিখ। হেডলাইনঃ টেসলা, আটাত্তরে, আবিষ্কার করেছেন নতুন ডেথ বিম। প্রবন্ধে লেখা, এই বিশেষ আলোকরশ্মি দিয়ে দশ হাজার বিমান শত মাইল দূর থেকে ফেলে দেওয়া সম্ভব। টেসলা যুদ্ধে নয়, শান্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এই আলোকরশ্মি ব্যবহার করে সব যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়া যাবে। এই একই প্রযুক্তি ব্যবহার করে শক্তি স্থানান্তরের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তারবিহীন এই প্রযুক্তি উত্তপ্ত করত বায়ুমন্ডল, তৈরি হতো মানবসৃষ্ট ঊষা।

হাসল সাইমন।

লোকটা সময়ের চেয়ে ঢের এগিয়ে ছিলেন।

কিন্তু এখন সময় হয়েছে।

কালো নোটবুকটার দিকে নজর তার, সার্বিয়ার ভাষায় লেখা ওটা। বেলগ্রেডের টেসলা মিউজিয়ামের জন্য ফান্ড সংগ্রহ এবং প্রসারের কাজে সাহায্য করার সময় পেয়েছে এই বই।

১৯৫২ সালে, সরকার সব কাগজপত্র ফিরিয়ে দেয় টেসলার ভাতিজার কাছে। সবগুলো এই মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। কিন্তু সাবা নিজেও জানতেন, খুব অল্প জিনিসই ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে। বাকি কাগজগুলো গচ্ছিত ছিল ন্যাশনাল ডিফেন্স রিসার্চ কমিটির কাছে। কমিটি চালাতেন জন জি. ট্রাম্প, এক নিউ ইয়র্ক রিয়েল এস্টেটের কর্তাব্যক্তির চাচা।

শেষ পর্যন্ত সাবার ধারণাই সত্য প্রমাণিত হলো।

হারিয়া যাওয়া ডকুমেন্টগুলো খুঁজতে লাখ লাখ টাকা খরচ করেছে সাইমন। জানতে পারল, ট্রাম্প মারা গিয়েছেন ১৯৮৫ সালে। লোকটার কাছে গচ্ছিত সব তথ্য ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতে দান করেছেন। ওই তথ্য উদ্ধারে এম.আই.টি.তে একদল রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর পাঠাল সে।

ব্যাপারটা বুঝতে খুব একটা কষ্ট হয়নি তার। কারণ, ট্রাম্প প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হাই ভোল্টেজ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন, টেসলা কয়েলের মতো একই পদ্ধতিতে ভ্যান ডি গ্রাফ জেনারেটর তৈরি করতো এই প্রতিষ্ঠান। এমনকী লোকটাকে ন্যাশনাল একাডেমী অফ ইঞ্জিনিয়ারিং উপাধি দিল-'বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেলের হাই ভোল্টেজ যন্ত্রপাতির পথপ্রদর্শক'।

টেসলারই আবিষ্কারের বদৌলতে।

সন্দেহ বেড়ে গেল, যখন লোকটা এন.ডি.আর.সি. বন্ধ করে দিল। ওখানেই একটা অচিহ্নিত সার্বিয়ার ভাষায় লেখা নোটবই খুঁজে পেল ইনভেস্টিগেটর দল।

কাঁচের পিছনের নোটবইটার দিকে তাকাল সে।

টেসলার হারানো নোটবই!

এন.ডি.আর.সি. একে খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। কারণও আছে, এতে কোন তত্ত্ব লিখিত নেই। আছে একটা অবিশ্বাস্য ঘটনার বর্ণনা। কাহিনির সূত্রপাত ১৮৯৫ সালে, তখনকার এক গোপন রহস্য লুকিয়ে রেখেছেন টেসলা। এই আবিষ্কারকে

প্রকৃতির আসল ক্ষমতা বলেছেন তিনি। এক সাক্ষাতকারে বলেছেন এই শক্তির কথা: নতুন এবং অপ্রত্যাশিত এক উৎসের শক্তি।

ট্রাম্প এবং এন.ডি.আর.সি. এই বইকে মিথ্যা উদ্ভাবন বা কল্পনা বলে উড়িয়ে দিয়েছে, অথচ সত্য বলে একে মেনে নিয়েছে সাইমন। এই বইয়ের কথাগুলো সত্য প্রমাণিত করতে, লাখ লাখ টাকা খরচ করেছে আফ্রিকায়। এর মাঝে নীল নদের তীরে তৈরি আবাসন প্রকল্পও আছে। সেই সাথে নানা প্রত্নতাত্ত্বিক সার্ভে তো আছেই। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের খরুচে ক্ষেত্র-সমীক্ষায় অর্থও দিয়েছে।

অবশেষে, বারো বছরের সাধনার পর, মাত্র দুই বছর আগে টেসলার সেই গোপন রহস্য উন্মুক্ত হয় তার সামনে।

সত্যিকারের এক আশ্চর্য এই বই, সেই সাথে সীমাহীন ঝুঁকির আধার। বর্তমান মহামারী এরই সাক্ষ্য।

বইটার দিকে ভ্রূকুটি করল সাইমন, বুঝে গিয়েছে কেন টেসলা আর দুই সঙ্গী চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই আবিষ্কার মানুষের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার বাইরে। ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকিটাই বেশি ছিল।

তাই, রহস্যকে মরুভূমিতেই কবর দিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা, যতদিন না তা জানার জন্য প্রস্তুত হয় এই পৃথিবী।

নিজের কাছেই প্রতিজ্ঞা করল সাইমন।

টেসলা যা পারেননি, আমি তা করে দেখাব।

এই দুনিয়ার জন্য।

যেকোন মূল্যেই হোক।

আচমকা পিছনে একটা আওয়াজ শুনতে পেল ও। দেয়ালের খালি পাশে সারি সারি মনিটর। পুরো স্টেশনের ছবি দেখা যায় এখানে। ভিডিয়ো কলটা ধরল, এই একই সময়ে প্রতিদিন কথা বলে সে।

একটা মনিটরে অ্যান্টনের চেহারা ভেসে উঠল, সারাদিনের ব্রিফিং দিবে সে এখন। এটা ওর প্রতিদিনের রুটিন।

'ঘুমিয়েছে?'

'ড. আল-মায়াজ নিজের রুমে চলে গিয়েছে।' বলল অ্যান্টন। 'আজ ভালো কাজ দেখিয়েছে সে। এমন এক আবিষ্কার করেছে যা প্রফেসরেরও চোখ এড়িয়ে গিয়েছে।'

'যেমন?'

'সাবজেক্ট মিশরীয় নয়, ইহুদি নারী।'

'ইহুদি!'

শ্রাগ করল অ্যান্টন, 'কাল আরও বিস্তারিত জানা যাবে।'

মনিটরের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল সাইমন, হজম করছে খবরটা। টেসলার নোটবুকে সেই অদ্ভুত তড়িৎ শোষণক্ষম জীবাণুর উল্লেখ ছিল। অত্যন্ত ক্ষতিকর এই অণুজীব একই সাথে বৈজ্ঞানিক আর ঐতিহাসিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে টেসলা এর একটা সমাধানও দিয়েছেন, কিন্তু ভীতিজনক সেই সমাধান কাজে লাগাবার চেষ্টা করেননি।

এই একটা সমাধানের জন্যই আটকে আছে তার কাজ। তত্ত্বীয়ভাবে সবকিছুই ব্যাখ্যা-যোগ্য। কিন্তু ব্যর্থ হলে-ধ্বংস হয়ে যাবে পুরো বিশ্ব।

অবশ্য বিশ্ব এখন বিপর্যয়ের মুখেই আছে।

এলেসমেয়ারে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে আশেপাশের জলাশয়ে। মারা গিয়েছে জলজ নানা প্রাণী এবং উদ্ভিদ। আর এটা তো সবেমাত্র শুরু! একশো বছর পর অবস্থা হবে ভয়াবহ।

.যদি না কোন সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

বিষয়টাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে সাইমন। এটারই পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল দুদিন পর। আপাতত ছোট আঙ্গিকে হবে পরীক্ষা, পরে ছড়িয়ে দেয়া হবে পৃথিবীময়। কিন্তু ঝুঁকিটা কি সে নেবে? বিশেষ করে দু'জন তদন্তকারী আসার পরও?

'ডারপা থেকে আসা অতিথিদের কী খবর?' জানতে চাইল সে।

'শেষ ক্যাফেটেরিয়াতে গল্প করতে দেখেছিলাম।'

'ওদের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে নিশ্চিত তুমি?'

নড করল অ্যান্টন, 'বারো বছর ধরে ডারপায় চাকরি করছে ওরা।'

বেশ!

নতুন করে কোন ঝামেলা চায় না সাইমন। 'কাল অফিসিয়াল ট্যুর দেওয়া হবে ওদের। এরপর যত দ্রুত সম্ভব পাঠিয়ে দিতে হবে।'

তবুও, কিছু একটা খটকা লাগছে তার। নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রতি বিশ্বাস আছে, বুঝতে পারছ-কিছু গড়বড় না থেকেই যায় না।

'নজর রেখো ওদের উপর, অ্যান্টন।'

'অবশ্যই।'

'সুদান থেকে কোন খোঁজ এসেছে? তোমার বোন ঝামেলা মেটাতে পেরেছে কি?'

'সবকিছু ঠিক আছে। দ্রুতই ঝামেলার সমাধান হয়ে যাবে।'

'বাহ! বেশ ভালো।'

আরও কয়েকটা কথার পর আলোচনা শেষ হয়ে গেল দু'জনের। চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ সাইমন, মনিটরে নজর রাখছে।. একটা গুহা দেখা দিল মনিটরের পর্দায়, উজ্জ্বল হ্যালোজেন বাতি জ্বলছে। পুরনো ফিটজিরাল্ড খনি ওটা, নিকেল আর সীসার জন্য খনন করা হয়েছিল। অর্ধশত বছর আগে ডুবে গিয়েছিল এই গুহা, কিন্তু জমে যায়নি। অরোরা স্টেশন নির্মাণের সময় প্রথম নজরে আসে এটা। ভেতরের পানি গাঢ় নীল।

শেষে, পুরাতন এই অবয়ব নিখুঁত একটা পাতাল হ্রদে পরিণত হয়েছে। সমতল পৃষ্ঠে ফুটে উঠেছে ধাতব সব কাঠামোর প্রতিবিম্ব। তবে, পানির রং আর আগের মতো নীল নেই, গাঢ় লাল বর্ণ ধারণ করেছে।

টেসলার আরেকটি কথা মনে পড়ল সাইমনের, এই আবিষ্কার সামনে এলে কী হবে!

তুমি হয়তো বেঁচে থাকবে মানব সৃষ্ট এই আতঙ্ক দেখতে, তবে এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করার জন্য বেঁচে থাকতে পারবে না।

আরও একবার প্রার্থনা করল সে, যেন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ভুল করে থাকেন।

পর্ব তিন

ঘুমন্ত দেবতা

পনেরো
৩রা জুন, সকাল ৬:১৮, ই.এ.টি.
সুদান মরুভূমি

সূর্যের আলো হাতুড়ির আঘাতের মতো পড়ল গায়ে।

গ্রে-র মুখ ঢাকা, শ্বাস নিচ্ছে মেপে। মাথার উপর অগ্নিবর্ষণ করছে সকালের সূর্য। গাড়ি চালাচ্ছে ও, বাকিরা ঘুমাচ্ছে বা ঝিমুচ্ছে। পিছনের সিটে বসে আছে জেন, ডেরেকের কাঁধে মাথা রেখেছে ও। হা করে ঘুমাচ্ছে ছেলেটা। কোয়ালস্কির মাথা বুকে ঠেকে আছে, নাক ডাকছে। সেইচান বসেছে সামনে, জানালায় হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আছে।

দলের আরেকজন সদস্য সজাগ আছে। পুরনো একটা সুজুকি ট্র্যাকার সেন্ড বাইকে করে ছুটে চলেছে সামনে। আহমাদ, রুফা থেকেই বাইকটা চালাচ্ছে ও। ছেলেটার কুকুর আনজিং শুয়ে আছে পেছনে, তাদের ব্যাগগুলোকে বিছানা বানিয়ে নিয়েছে প্রাণীটা।

তিন ঘন্টা আগে, প্রফেসর ম্যাককেবকে যেখানে পাওয়া গিয়েছিল ওখানে নিয়ে গিয়েছিল ছেলেটা। কিন্তু কোন সূত্র খুঁজে পায়নি ওরা। স্থানীয় অনুসন্ধান দল, মরুর বাতাস, ধুলো এসবের আর কোনকিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। এমনকী প্রফেসরের পদচিহ্ন পর্যন্ত মুছে গিয়েছে।

তাই ডেরেকের ম্যাপের ক্রসচিহ্ন বরাবর রওনা দিল ওরা। আহমাদ সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে, প্রফেসরের চিহ্ন খুঁজছে পুরো রাস্তায়। বাইকের হেডলাইট বন্ধ করে অন্ধকারে খুঁজেছে, অন্ধকারে চাঁদ-তারার আলোয় নাকি ভালো দেখতে পায় ও।

সারারাত ছেলেটার পেছন পেছন ছুটেছে গ্রে, তবে হেডলাইট জ্বেলে রেখেছিল। কয়েক ঘন্টা আগে পাহাড়ের সারির মাঝে প্রবেশ করেছে ওরা। সূর্যের আলোয় ঘুম ভেঙে গেল সেইচানের, আড়মোড়া ভাঙল। জানতে চাইল মেয়েটা, ‘কয়টা বাজে?’

‘বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা খুঁজে বের করতে হবে, কয়েক ঘন্টা পর আর রোদ সহ্য করা সম্ভব হবে না।’

‘ডেরেকের স্থানাঙ্ক থেকে কত দূরে আমরা?’

জি.পি.এস. দেখে নিল গ্রে, ‘বিশ মাইল মাত্র... রাস্তা যদিও সুবিধার না।’

সামনের পাহাড়ি অঞ্চলের দিকে তাকাল সে, বুঝল এই গাড়ির উপযোগিতা। ইউনিমগের গতি ষাটের ঘরে, কিন্তু তৈরি হয়েছে এই রুক্ষ পথের উপর চলার

জন্য। যাই হোক, রুক্ষ পথে প্রবেশের আগে হাত পা নাড়াচাড়া এবং উদরপূর্তির জন্য বেশ সময় পাওয়া যাবে।

একই কথা ভাবছে আহমাদ, দূরে একটা ছায়াময় পাথুরে চাতালের দিকে আঙুল তাক করল সে। ওদিকেই রওনা দিল গ্রে। বাকি সবাই ঘুম থেকে উঠে গিয়েছে।

'আমরা বিশ্রাম নিব কিছুক্ষণ।' ঘোষণা করল সে। 'আর সেই সুযোগে ইঞ্জিনটাও ঠান্ডা হয়ে যাবে।'

বড় করে দম নিল কোয়ালস্কি, 'আচ্ছা, উট ব্যাটা একসাথে এত পানি পান করে কী করে? জানা থাকলে আজ...'

বাইক পার্ক করে ওদের জন্য অপেক্ষা করল আহমাদ। হঠাৎ করেই নিচে কিছু একটা দেখল ও, উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নাড়তে লাগল ওদের উদ্দেশে।

এই ছেলেটা এত উদ্যম পায় কোথা থেকে!

গাড়ি থামাল গ্রে, নামল ছায়ার মধ্যে। পেছন থেকে লাফিয়ে নামল আনজিং, ছুটে গেল মনিবের কাছে।

'দেখে যাও। দেখে যাও।' চেঁচাতে লাগল আহমাদ।

এগিয়ে গেল গ্রে ওদিকে, কোয়ালস্কি হালকা হওয়ার জন্য সরে পড়ল আড়ালে।

'দেখ, পায়ের ছাপ!' বলল ছেলেটা।

ভালো করে নজর বোলাল গ্রে, 'বুটের ছাপ। কেউ একজন রাত কাটিয়েছিল এখানে।'

'অথবা দিন।' বলল জেন, 'বাবা মরুভূমি চিনতেন। সূর্যের তাপে পথচলার কথা নয় তার।'

একমত হলো ডেরেক, 'হ্যারল্ডের কই মাছের প্রাণ!'

'কিন্তু তিনি অসুস্থ ছিলেন।' মনে করিয়ে দিল সেইচান, 'অন্য কেউও এখানে ক্যাম্প করতে পারে।'

'না, আমার বাবাই। আমি জানি।'

হাঁটু গেড়ে বসে বালি হাতড়াতে লাগল জেন, ওর বাবার থাকার প্রমাণ খুঁজছে। বাঁধা দিল ডেরেক, 'জেন, হয়তো. .হয়তো অন্য কেউ.

শ্রাগ করল জেন, 'বাবা আমার জন্য কিছু না কিছু রেখে যাবেনই-'

কথাটি শেষ হওয়ার আগেই হাতে লাগল কিছু। একটা সিল করা কাঁচের জার।

নিচু হয়ে জারটা তুলে নিল গ্রে, টেস্ট টিউবের মতো জারটায় কাগজের মতো কিছু পাকিয়ে রাখা।

চোখ বড় বড় করে তাকাল জেন, 'বাবা নিশ্চয় চাননি এটা ভুল লোকদের হাতে পড়ুক, তাই লুকিয়ে রেখেছিলেন এখানে।

'কিন্তু কী এটা?' প্রশ্ন করল সেইচান।

ঝুঁকিটুকু নিল গ্রে, খুলে ফেলল সিল। জানে, প্রফেসর ম্যাককেবের অজানা রোগে নিজেও আক্রান্ত হতে পারে। হাতের তালুতে ভেতরের জিনিস উপুড় করে ফেলল। ছোট একটা পার্চমেন্ট, অনেক পুরনো। পার্চমেন্টে হায়ারোগ্লিফে লেখা কয়েকটি শব্দ।

ঝুঁকল জেন, হাতে নিল ওটা। 'আমাকে দেখতে দাও।'

কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিল ডেরেক। 'গ্লিফের নকশাটা দেখ, মুরগি আর নলখাগড়ার আকারটা বিশেষ করে। বেশ পুরাতন।'

'সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর।' বলল জেন।

'কী লেখা এখানে?' জানতে চাইল গ্রে।

'ব্যাকরণ আর পদবিন্যাস কিছুটা আলাদা। নদীতে নৌকা ভাসানো সম্পর্কে কিছু লেখা। পরে লেখা হাতির হাড় সংক্রান্ত কিছু।'

মেয়েটা তাকাল ডেরেকের দিকে, শ্রাগ করল শুধু।

ভ্রূকুটি করল গ্রে, 'এই পুরনো পার্চমেন্ট লুকানোর জন্য তোমার বাবা এত পরিশ্রম করেছেন?'

'প্রথমত, এটা পার্চমেন্ট না। চামড়া. .হয়তো উল্কি আঁকা মানুষের দেহ থেকে কেটে নেয়া।' বলল জেন।

'আর চারপাশের কোনাগুলো দেখ। মনে হচ্ছে ধারাল কোন স্কালপেল দিয়ে কাটা হয়েছে।' যোগ করল ডেরেক।

'শুষ্কতা দেখে মনে হচ্ছে কোন মমির শরীরের অংশ এটা।' আড়চোখে তাকিয়ে বলল জেন।

'কিন্তু কেন?' জোর দিল গ্রে।

টুকরোটা হাতে নিল মেয়েটা, কিছু একটা দেখে ভ্রূ কুঁচকে উঠল। দেখাল গ্রেকে, নিচের দিকে ঝাপসা প্রায় একটা লেখা।

15 42'09.1"N 33"14'35.4"E

'স্থানাঙ্ক।' বলল গ্রে।

সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। হাতের ফোনটায় সংখ্যাগুলো প্রবেশ করালো ও। একটু পর, একটা লাল ডট ভেসে উঠল ফোনের ম্যাপে।

'কোথায় নির্দেশ করছে ওটা?' জানতে চাইল সেইচান।

'এখান থেকে মাত্র দু' মাইল দূর, ডেরেকের ক্রসচিহ্নের কাছাকাছি।'

উঠে দাঁড়াল জেন, 'চলো, যাওয়া যাক।'

নড করল গ্রে, চামড়ার টুকরো আবার চালান করে দিল টিউবের ভেতর। ট্রাকের দিকে আঙুল তাক করে বলল সে, 'সবাই উঠে পড়ো।'

ফিরে এসেছে কোয়ালস্কি, কাঁধ উঁচু করে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। উত্তেজনায় প্যান্টের জিপার লাগাতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে।

'কোন সমস্যা?' জানতে চাইল গ্রে।

'আমাদের অনুসরণ করা হচ্ছে।'

'কী?'

'আকাশে কিছু একটা নড়তে দেখেছি। সূর্যের আলোয় হারিয়ে গেল ওটা।'

'পাখিও তো হতে পারে।' বাঁধা দিল ডেরেক।

কোয়ালস্কিকে জিজ্ঞেস করল গ্রে, 'কী মনে হয়?'

ঘাড়ে হাত ঘষল কোয়ালস্কি, 'হয়তো। কিন্তু ওটা দেখার আগেও আমার মনে হচ্ছিল কেউ একজন দেখছে আমাকে।'

গ্রে-র দিকে ঘুরল জেন, 'কী করবে এখন?'

আর যাই হোক, কোয়ালস্কির ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ওপর বিশ্বাস আছে গ্রে-র, বিশেষ করে প্রশ্ন যখন বেঁচে থাকার। এই সময়ে নীল নদেও ফিরে যেতে পারবে না ওরা। অনেক বড় ঝুঁকি নেওয়া হয়।

'এগিয়ে যাব আমরা।' সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সে। 'কিন্তু পিছনে নজরও রাখবো।'

'এবং আকাশেও।' যোগ করল কোয়ালস্কি, অবশেষে প্যান্টের জিপার লাগিয়ে নিল।

গ্রে-র দিকে ফিরে তাকাল সেইচান, উদ্বিগ্ন হয়ে আছে ও। রুফার আগন্তুক সাধারণ কোন চোর ছিল না। আর এখন, ওই ধারণার স্বপক্ষে প্রমাণ পাচ্ছে। তবে একটাই উপসংহার টানা যায় এখন।

আমরা ফাঁদে পড়তে যাচ্ছি!

সকাল ৭:০২

ভালিয়া অভিসম্পাত করল। ড্রোনটা ঠিক সামনে বালিতে অবতরণ করল, মডেল আর.কিউ. ১১বি র‍্যাভোন। ওজন পাঁচ পাউন্ডেরও কম, পাখা চার ফুট প্রশস্ত। এরিয়াল সার্ভেইল্যান্সের জন্য এমন দুটো যন্ত্র ব্যবহার করছে ও। প্রতিটাতে চার্জ থাকে মাত্র নব্বই মিনিট। তাই দুটো ড্রোন একটার পর আরেকটা ব্যবহার করতে হচ্ছে। সবসময় একটা না একটা আকাশেই থাকছে।

মধ্যরাতে রওনা দিয়েছিল রুফা থেকে, অনুসরণ করেছে শত্রুদের। ক্যামোফ্লাজ তাঁবু খাটিয়ে লুকিয়ে রেখেছে নিজেদেরকে। ওদের গন্তব্য সম্বন্ধে আঁচ করতে

পেরেছে নির্ভুলভাবে, প্রফেসর ম্যাককেবকে যেখানে পাওয়া গিয়েছিল ওখানেই গিয়েছে প্রথমে শত্রুদল।

ট্র্যাকিং ডিভাইসটা লাগাতে পারলে এখন আর এত কষ্ট হতো না। কারণ সূর্য উঠে গেলে এই ড্রোন দুটো আর ব্যবহার করা যাবে না। শেষবার ড্রোন উড়তেই দেখতে পেয়েছে, দলের মোটা লোকটা তাকিয়ে আছে সরাসরি ওটার দিকে। অবশ্য দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে না ওটা ভেবে নামিয়ে নেয়নি। ঝুঁকি নিয়ে লোকগুলোর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে সে। সবাই জড়ো হয়ে কী যেন দেখছে। দূর থেকে বুঝতে পারেনি কিছুই।

কী খুঁজে পেয়েছে ওরা?

রাতের বেলা ট্রাকটার গতিপথ দেখে সন্দেহ হয়েছিল ওর। ওদের অবস্থানের দিকে সরাসরি আসছিল গাড়ি। মনে হচ্ছিল যেন জানে কোথায় যেতে হবে। ভালিয়ার ধারণা ছিল-আরও বিস্তৃত পরিসরে খোঁজ করবে এরা।

বদলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগোনোটা কিছুটা রহস্যময়।

ওদের উপস্থিতি টের পাবার কথা নয় দলটার।

'নড়তে শুরু করেছে ওরা।' একটা কণ্ঠ শুনতে পেল কানে।

এক স্কাউটকে পাঠানো হয়েছিল গাড়িটার ওপর নজর রাখতে, সে-ই বলেছে কথাটি।

দুই মাইল পশ্চিমে ধুলো উড়ছে, ট্রেইল রেখে যাচ্ছে ট্রাকের। নিজের আরও ছয়জন লোক ওই পাহাড়ে অবস্থান নিয়েছে।

'আপনার আদেশ কী?' জানতে চাইল ক্রুগার, দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। লোকটা ওর বাছাইকৃত সেরা যোদ্ধা। অতীতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষ বাহিনীর রিকনেইসেন্স কমান্ডো। ওই দেশের আদম ব্যবসায়ীদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করায় পুরো দলটাই বহিষ্কৃত হয় বিগ্রেড থেকে। সে জানে না এসব কথা সত্য কিনা, শুধু জানে এদের খ্যাতি। কতটুকু হিংস্র, দক্ষ, এবং আপোষহীন এরা তা সকলেরই জানা।

দূরের ধুলোর ট্রেইলের দিকে তাকিয়ে আছে যোদ্ধা, 'এখন কী কাছে যাওয়া যায়?'

প্রশ্নটা শুনল সে, তাকিয়ে আছে লোকটার খাকি রংয়ের জামায় লাগানো প্রতীকটার দিকে। গোল লতানো গুল্মের মাঝে একটা কালো ড্যাগার, লোকটার পুরনো দলের প্রতীক ওটা। কালো ছুরিটা ওর নিজের অস্ত্র, অ্যাথেমিটার কথা মনে করিয়ে দিল।

গতরাতে করা ওয়াদাটা মনে আছে ওর, হাতায় লুকানো কালো হাতলে স্পর্শ করল ভালিয়া। শুধু জেন ম্যাককেবকে জীবন্ত নিয়ে যেতে হবে, বাকিদের কী হলো তা দেখবে না কেউ।

'না, এখনও না।' সিদ্ধান্ত নিল ও।

অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকাল ক্রুগার।

'আমি জানি ওরা কোথায় যাচ্ছে।' বলল সে, হঠাৎ করেই বুঝতে পেরেছে। 'ওটা একটা কানা গলি।'

সত্যিই তাই, ওখানে যা-ই আবিষ্কার করুক না কেন এরা!

সকাল ৮:০৮

গাড়ির দরজার হাতলে শক্ত করে ধরল জেন, একটা পাথরের টুকরোর ওপর উঠে গিয়েছিল ট্রাক। এক ঘন্টা ধরে বিস্তৃত ভূমিখন্ডের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা।

'হেঁটে গেলেও এর থেকে দ্রুত যেতে পারতাম।' সিটের সাথে শক্ত হয়ে বসে আছে ডেরেক।

দু'জনের মাঝে বসেছে সেইচান, গাড়ি চালাচ্ছে কোয়ালস্কি। গ্রে-র সাথে কথা বলতে ঝুঁকল মেয়েটা, 'আর কত দূর?'

ভালো প্রশ্ন!

সামনে তাকাল গ্রে, 'দুই পাহাড়ের মাঝের ফাটলটা দেখছো? ওটা পার হয়ে পৌঁছুতে হবে গন্তব্যে।'

আহমাদকে দেখল জেন, এখনও বাইক নিয়ে ছুটছে সামনে। ছেলেটার পেছন পেছন ছুটছে ওর কুকুরটা। ওদের গতি কম থাকায় সহজেই পাশাপাশি দৌড়াচ্ছে আনজিং।

সামনে পথ আরও কঠিন, গাড়ির গতি কমে গেল অনেকখানি। কিছুক্ষণ পর গতি এতই কমে গেল যে, শামুকের গতিকেও হার মানায়।

সংকীর্ণ এক রাস্তার মধ্যে দিয়ে ঢুলল ইউনিমগ, কোনমতে এঁটে গেল ওটা। মেয়েটা কল্পনায় ছিপির মতো গাড়িটাকে আটকে যেতে দেখল সরু পাহাড়ি ক্লিফে। একবার আটকে গেলে, সূর্যের প্রখর তাপে সিদ্ধ হয়ে মরা ছাড়া আর কোন গতি নেই।

পাথরে ধাতুর ঘষা খাওয়ার তীক্ষ্ণ আওয়াজ কানে এল, ভয় পাচ্ছে সে। মনের ভয়টা না যেন সত্যিই হয়ে যায়!

এমনকী গ্রে পর্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে গেল।

'কোয়ালস্কি. . .!'

'বহুত জায়গা।' আশ্বস্ত করল চালক।

'তাহলে গাড়ির গায়ের অর্ধেক রং রেখে যাওয়ার কী দরকার?'

শ্রাগ করল কোয়ালস্কি, 'যোদ্ধার গায়ে দু-তিনটা আঘাতের চিহ্ন না থাকলে কি চলে?'

অবশেষে সংকীর্ণ পথ থেকে বের হয়ে এল গাড়ি, গতি বাড়াচ্ছে।

'আগেই বলেছিলাম।' বলল কোয়ালস্কি।

সামনে বিশাল বড় এক টুকরো খোলা জায়গা, প্রায় ফুটবল স্টেডিয়ামের সমান। পুরোটা পাথুরে ক্লিফ দিয়ে ঘেরাও করা। পাথরের চাতালের নিচে বাইক থামাল আহমাদ। ওর কুকুরকে পানি খাওয়াতে লাগল সে।

'বাহ! চলে এসেছি এখানে।' ছায়াতে ইউনিমগ রাখল বিশালদেহী লোকটা। 'এখন কী করবে?'

ভ্রূকুটি করল সেইচান, 'কিছু নেই দেখি!'

গাড়ি থেকে নামল জেন, বাবার হয়ে বলল, 'কিছু একটা তো অবশ্যই আছে।'

'ঠিক বলছে জেন।' বলল ডেরেক, 'কিছু না থাকলে নিজের সর্বস্ব নিয়ে ঝুঁকিতে লাফিয়ে পড়তেন না।'

'সামনে এগিয়ে দেখি।' বলল গ্রে, 'দুইভাগে ভাগ হয়ে ক্লিফে অনুসন্ধান করব আমরা।'

'অথবা, ওই পিচ্চির পিছনে গেলেও হয়।' বলল কোয়ালস্কি।

দূর থেকে হাত নাড়ছে আহমদ, কুকুরটার দিকে আঙুল তাক করছে। দেয়ালের দিকে গর্ত খুঁড়ছে আনজিং, কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে হয়তো। গাড়ি থেকে নেমে ছেলেটার কাছে গেল ওরা, সূর্য ইতিমধ্যেই তেতে উঠেছে।

'আনজিং কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে। চলো, দেখি।'

চোখের সামনে ধাতব দরজা ভেসে উঠল জেনের, বুঝতে পারল কেন ছেলেটা এত উত্তেজিত। মানুষের চোখকে ধোঁকা দিতে পাহাড়ের লালচে গায়ের মতো করে রং করা হয়েছে ওটা।

ডেরেকের নজর অন্যদিকে, পুরনো একটা শীলাখন্ডে ওর হাত। 'এগুলো পাথর নয়, প্রাচীন ইট। বাটালির আঁচড় টের পাচ্ছি পরিষ্কার।'

দরজার দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা, 'পাথর দিয়ে সিল করে দেওয়া হয়েছে জায়গাটা।'

মনে মনে কল্পনা করছে জেন, দুই বছর আগে এখানে এসেছিল ওর বাবা। দেখে গিয়েছে রহস্যঘেরা এই জায়গা, কিন্তু এই কাজ তার নয়। অন্য কেউ একজন চাইছে না উন্মুক্ত হোক এই রহস্য সাধারণ মানুষের কাছে।

বালি খুঁড়ে দরজাটা উন্মুক্ত করার চেষ্টা করছে আনজিং, কোনকিছুর গন্ধ উন্মাদ করে দিয়েছে ওটাকে। মনে পড়ল ওর, তার বাবা রোগটা বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

'আহমদ, সরিয়ে নাও তোমার কুকুরটাকে। আমরা জানি না এখনও ঠিক কীসের সাথে বোঝাপড়া হতে যাচ্ছে আমাদের।' গ্রে-র দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল মেয়েটা। 'আমাদের বেলচা লাগবে, সাথে মাস্ক আর হেলমেট।'

ঝুঁকির কথা ভেবে সাথে করে ওরা নিয়ে এসেছে বিশেষ মুখোশ, অনেকটা দমকলকর্মীদের মতো। এটার বিশেষত্ব হচ্ছে, জীবাণুনাশক প্রযুক্তি যুক্ত এতে।

মাটি খুঁড়ে দরজা উন্মুক্ত করা হলো। সবার পরনে বিশেষ মাস্ক, ঠিকমতো সিল হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে নিল সবাই। কিন্তু সেইচান পড়েনি ওটা। বদলে আকাশের দিকে তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে আছে।

পাহারা দেয়ার জন্য আহমাদ আর কুকুরটার সাথে বাইরে থেকে যাবে সে।

কেউ ওদের অনুসরণ করছে, কথাটা ভুলেই গিয়েছিল জেন। এখানে আসার পথে আকাশে আর কোন অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়েনি ওদের। এমনকী এখনও, নির্জন পুরো মরুভূমি। শুধু বাতাসের হিস হিস শব্দ।

তবে হ্যাঁ, আরও একটা আওয়াজ আসছে কানে।

হৃদপিন্ডের ধুকপুক আওয়াজ।

কিছুটা ভয় হয়তো আছে, তবে এই নতুন আবিষ্কারই হৃদপিন্ডের দ্রুতগতির কারণ। বাবার কী হয়েছিল তা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবে সে। এজন্যই এত উত্তেজনা অনুভব করছে।

তবুও, হতাশার সুর জেঁকে বসেছে মনে। যা হারিয়েছে, তা তো চিরতরেই হারিয়ে গিয়েছে। চেষ্টা করেও চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না জেন।

মুখে মাস্ক থাকায় চোখের পানি মুছতেও পারল না জেন। মুখ ঘুরিয়ে অবশেষে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল সে। এক টুকরো বালিময় ধাতব অবয়ব নজরে পড়ল ওর।

গ্রে আর কোয়ালস্কি মিলে খুলল সেই দরজা।

ভেতরে হেলমেটে লাগানো আলো জ্বেলে দিল জেন, অন্ধকার গুহা চিরে গেল সেই আলো।

'সবাই প্রস্তুত?' জানতে চাইল গ্রে।

'বহু আগে থেকেই।' ভেতরে পা বাড়াল মেয়েটা। 'দু'বছর অপেক্ষা করে আছি এই দিনটার জন্য।'

সকাল ৮:৪০

সবার সামনে রইল গ্রে, পিছনে জেন, তারও পিছনে ডেরেক। মেয়েটার পায়ে পড়ছে ওর হেডলাইটের আলো। মাথা নুইয়ে হাঁটছে ওরা, উপরে মাথা ছুঁই ছুঁই ছাদ। পিছনে কোয়ালস্কি প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে, বড়সড় গরিলার মতো লাগছে ওকে দেখতে।

কিছুটা বাঁকা হয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে সুড়ঙ্গ, পর্বতের আরও গভীরে।

হাত দিয়ে সুড়ঙ্গের দেয়াল পরীক্ষা করল জেন, 'মানুষের তৈরি।' ডেরেককে বলল সে, 'কেউ একজন বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরি করিয়েছে এই সুড়ঙ্গ। না জানি কত দূর গিয়েছে এটা। হয়তো, দারিনকুয়োর মতো কিছু একটা খুঁজে পেতে যাচ্ছি আমরা।'

ভূগর্ভস্থ শহর দারিনকুয়ো আবিষ্কারের কথা পড়েছে ডেরেক, তুরস্কের আনাতোলিয়াতে ওটা। বয়স হবে কম করে হলেও পাঁচ হাজার বছর। পুরো শহরটায় সুড়ঙ্গ আছে চার মাইলব্যাপী, স্তরে-স্তরে থাকার জায়গা পর্যন্ত আছে। এমনকী পালানোর জন্য আছে বেশ কয়েকটি গোপন পথ। এটাই প্রমাণ, অতীত সভ্যতাগুলো নিজেদের সীমিত যন্ত্র দিয়েও বিস্ময়কর সাফল্য দেখাতে পারে। গিজার পিরামিড ওই অঞ্চলের সভ্যতার উৎকর্ষের একটা নমুনা মাত্র।

কিন্তু কে খুঁড়েছে এই সুড়ঙ্গ?

আর কেন-ই বা খুঁড়েছে?

'সামনে খোলা জায়গা।' জানান দিল গ্রে।

কয়েক গজ যেতেই খোলা উদ্যানে এসে পৌঁছল ওরা সবাই। বিশাল এক পাথরের ভাস্কর্য সামনে। গম্বুজের মতো উপরে উঠে গিয়েছে ছাদ। চারপাশ ঘুরিয়ে দেখল ও। একটা পাথুরে ঠোঁট নজরে পড়ল ওদের।

'হায় ঈশ্বর. .!' বলল জেন।

'অসাধারণ!' বলল সে।

ঠোঁটের ভেতর একসারি পাথরের দাঁতও দেখা যাচ্ছে। দাঁতগুলো একদম নিখুঁতভাবে খোদাই করা। তবে, কয়েকটা ভেঙে গিয়েছে প্রায়। ইদানীং ভাঙা হয়েছে এই পাথরগুলো।

ভেতরে প্রবেশ করল সে, ছোট একটা প্রকোষ্ঠ। পায়ের নিচে জিহ্বার আকৃতি ফুটে উঠেছে। উপরে ছাদটা মুখের ভেতরের তালুর মতো লাগছে। সোজা হয়ে দাঁড়াল কোয়ালস্কি, বলল, 'না জানি আমাদের চিবিয়ে খেয়ে ফেলে!'

ধীরে ধীরে সব দেখছে জেন, 'দেহের নিখুঁত গঠন।' বের হয়ে থাকা একটুখানি পাথরখন্ডের দিকে ফেলল আলো, 'ওটা হয়তো আলজিহবা। আর ওখানে যে ঝুলছে একটা অংশ, ওটা টনসিল।'

'ওর টনসিলের অপারেশন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।' বলল কোয়ালস্কি, লক্ষ করেছে ওই পাথরখন্ডটা একপাশে ভাঙা।

এক পা সামনে এগোল ডেরেক, প্রকোষ্ঠের আরও গভীরে নজর ওর। দুটো সুড়ঙ্গ চলে গিয়েছে ভেতরে, জানে ও দুটো কিসের প্রতীক। 'খাদ্যনালী আর শ্বাসনালী।' বিড়বিড় করে বলল সে।

একটা সুড়ঙ্গ মসৃণ আর মাংসল এবং আরেকটি তরুণাস্থির মতো গোল গোল রিংযুক্ত। এমনকী বাগযন্ত্র পর্যন্ত নিখুঁতভাবে পাথর দিয়ে তৈরি।

'কী এসব?' জানতে চাইল কোয়ালস্কি।

গ্রে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক ফিট সামনে, আলো তাক করে রেখেছে ছাদ বরাবর। 'হায়রোগ্লিফ খোদাই করা এখানে।'

পাশে এসে দাঁড়াল ডেরেক, মানবদেহের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য দেখতে বিভোর ছিল বলে নজর পড়েনি ওটা। তিন সারিতে কয়েকটা চিহ্ন খোদাই করা। প্রথম সারির উপর আলো ফেলল জেন।

পাঠোদ্ধার করল ডেরেক- যারা আসছে একজনের ডাকে

'আমাদের কথা বলেনি তো?' জিজ্ঞাসা করল বিশালদেহী লোকটা, 'কিন্তু কে সে? কার মুখের ভেতর আছি আমরা?'

'বাকি দুই সারিতে এই উত্তর আছে।' বলল জেন, 'দুইভাবে এক মিশরীয় দেবতার নাম লেখা এখানে।'

'কোন দেবতা?' প্রশ্ন করল গ্রে।

'আদি সর্ব দেবতার মন্দিরের দেবতা, নাম তুতু।' ব্যাখ্যা করল জেন, 'সমাধিক্ষেত্রের রক্ষক।'

'বেশ ভালো তো।' অভিযোগের সুরে বলল কোয়ালস্কি।

ওর কথা উপেক্ষা করে গেল জেন, 'পরবর্তীতে ঘুমের প্রহরী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি, স্বপ্নরক্ষক।'

'সেই সাথে অশুভ শক্তির প্রভু।' মনে করিয়ে দিল ডেরেক।

কোয়ালস্কি বলল, 'কতই না গুণগ্রাহী তিনি!'

'এই স্থান যদি রোগটার উৎস হয়, তবে ওটাই সেই অশুভ শক্তি যাকে পাহারা দিয়ে রাখছে তুতু।'

আরও গভীরে নজর গেল ডেরেকের, কল্পনা করছে পুরো দৈহিক অবয়বটার কথা। এই দেবতা কত সময় ধরে না জানি পাহারা দিয়ে রাখছে এই ভয়াবহ মহামারীকে।

কিন্তু জেনের ব্যাখ্যা চিন্তিত করে তুলল ওকে। অনুভব করছে, রহস্য আরও গুরুতর। কারণ, ওর নজরে পড়েছে একটা ভুল।

আঙুল তাক করল ডেরেক ওদিকে, 'জেন, শেষ চিহ্নটার দিকে তাকাও। বসে থাকা অবয়বটা নারীর। তুতুর নামের শেষে হয় সিংহ নয় মানুষ থাকার কথা।'

নড করল সে, 'কারণ, প্রচলিত বিশ্বাসে তিনি অর্ধ মানব এবং অর্ধ সিংহ।'

'ঠিক তাই।' বলল ডেরেক। 'কিন্তু এখানে মেয়ের ছবি এল কীভাবে?'

'কী নিয়ে কথা বলছো তোমরা?' জানতে চাইল গ্রে।

পকেট থেকে আইপ্যাড বের করে নিল ডেরেক, হায়ারোগ্লিফের ক্যাটালগ বের করে দেখাল ওকে।

পুরুষ

নারী

'দেখ, মেয়ে কীভাবে পা গুটিয়ে বসেছে, এবং অন্যদিকে পুরুষ এক হাত উঁচু করে এক পা উঁচু আর অন্য পা নিচু করে আছে। নিশ্চিতভাবেই-ওটা নারীর প্রতীক।'

ভ্রূকুটি করল গ্রে, 'কিন্তু এর গুরুত্ব কী?'

শ্রাগ করল ডেরেক, মাথা ঝাঁকাল, 'জানি না।'

'দাঁড়াও,' ডেরেকের কাঁধে হাত রাখল জেন। 'বাবার জার্নালে আঁকা মিশরীয় তেলের পাত্রের কথা মনে আছে?'

'আরিয়াবোলস, দুই মাথাওয়ালা পাত্র।' সে নিজেও লক্ষ করল ব্যাপারটা, 'আরে! ঠিক বলেছ তো!'

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল গ্রে।

পাত্রের ছবিটা দেখাল ডেরেক, হ্যারল্ডের পুরো জার্নালটার ছবি তুলে নিয়েছে ও। 'উপজাতির ছেলের জীবন বাঁচানোর জন্য লিভিংস্টোনকে উপহার দেয়া হয়েছিল এটা।'

'বলা হয়ে থাকে, নীল নদের রক্ত-লাল পানি সংরক্ষিত ছিল ওখানে।' বলল ও। 'ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এটা খোলার পর, জীবাণুর আক্রমণে মারা যায় জনা বিশেক।'

নড করল গ্রে, 'কিন্তু মহামারী হয়ে ছড়িয়ে পড়েনি রোগটা ইংল্যান্ডে।'

'মোজেসের সময়ও হয়তো তাই ঘটেছিল,' বলল জেন। 'কোনভাবে এই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছিল ওরা। সেই একই পদ্ধতি হয়তো ব্রিটিশরাও অবলম্বন করেছে। উত্তরটা এখানেই আছে।'

'কীভাবে নিশ্চিত হলে?' জানতে চাইল গ্রে।

'দুই মাথাওয়ালা পাত্রটা দেখ, একদিকে সিংহ আরেকদিকে একটা মেয়ের প্রতিকৃতি।' জবাব দিল ডেরেক। 'আর এই যে এইখানে তাকাও, তুতুর নামের শেষেও তাই। একটা শেষ হয়েছে সিংহ দিয়ে আর অন্যটা নারী।'

'ঠিক ওই পাত্রটার মতো।' বলল জেন। 'এটা কাকতালীয় হতে পারে না, আরিয়াবোলসটা এখান থেকেই পাওয়া। আর রোগটার উৎস যদি এটা হয়, তবে প্রতিষেধকও থাকবে এখানে।'

গ্রে-র দিকে তাকাল ডেরেক, মুখোশের পিছনের চেহারাটা গভীরভাবে ভাবছে কিছু।

'যদি ' বিড়বিড় করে বলল গ্রে।

'কী?' প্রশ্ন করল ডেরেক।

মাথা ঝাঁকিয়ে আলো ফেলল সে সামনে, 'আমাদের সামনে এগোন উচিত।'

ফিরে তাকাল সবাই অজানা সেই রহস্যের উদ্দেশে।

'কিন্তু কোন রাস্তায়?' জানতে চাইল জেন। 'খাদ্যনালী না শ্বাসনালী?'

অবয়বটার শ্বাসনালীর দিকে এগিয়ে গেল জেন, উঁকি দিয়ে দেখল ভিতরে। 'সামনে খোলা রাস্তা আছে।' বলল সে। 'হায় ঈশ্বর! দেখে যাও।'

ডেরেক আর গ্রেকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল ও। আলো পড়ছে ছোট একটা গুহার ভেতর, পাতলা একটা পর্দা ঝুলছে ওখানে।

'মস্তিষ্ক গহ্বর,' বলল জেন।

'ঠিক বলেছে ও।' মস্তিষ্কের অনুকৃতির দিকে তাকাল ডেরেক, একেবারে নিখুঁত ওটা। দুটো হেমিস্ফিয়ার পর্যন্ত আলাদা বোঝা যায়।

'ডানে আর বামে তাকাও।' হাতের লাইট নিচু করল গ্রে।

নিচে সারি সারি ছোট অবয়ব পাথর কুঁদে বানান। বয়সের ভারে ভেঙে গিয়েছে অনেকগুলো, বাকি কুলঙ্গিতে মিশরীয় মৃৎশিল্পের নমুনায় ভর্তি। নমুনাগুলো অচেনা নয়, দু'মুখো সেই আরিয়াবোলস।

'লিভিংস্টোনেরটার মতো।' বলল জেন, আলো ধরে আছে ওদিকে। 'এখান থেকেই নেওয়া হয়েছিল ওটা।'

'এজন্যই কেউ জায়গাটা সিল করে দিয়েছিল।' ভাঙা মাটির পাত্রে দিকে নজর ওর।

কয়েকটা ইদানীং ভেঙেছে।

কোন দুর্ঘটনা হয়নি তো?

ডেরেকের দিকে ফিরল গ্রে, 'এখানে সিল করা সব পাত্রের একটাই মানে, প্রাচীন লোকেরা জানত যে এই রোগ মস্তিষ্কে বাসা বাঁধে। নয়তো এখানে জমা রাখত না এসব।'

'ভুল বলনি তুমি।'

পিছিয়ে গেল জেন, 'এটুকু যদি জানে এরা, তবে আরও অনেককিছুই জানা অসম্ভব না।'

কথা শেষ করল ডেরেক, 'সম্ভাব্য প্রতিষেধকও।'

নড করে গ্রে-র পাশে দাঁড়াল মেয়েটা। 'কিন্তু কোথায় আছে এই প্রতিষেধক?' আগের প্রশ্নটারই পুনরাবৃত্তি করল সে, 'কোন রাস্তায় খুঁজে পাবো এর উত্তর? অন্ননালী নাকি শ্বাসনালী?'

ভগ্নপ্রায় বাম টনসিলে আলো ফেলল ডেরেক, 'ফুসফুসের পথেই অধিকাংশ অভিযাত্রী গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।' পায়ে চলা পথটার দিকে আলো ফেলল ও। 'বহুল ব্যবহৃত রাস্তা ধরেই এগোন উচিত।'

তাকিয়ে দেখল সবাই, অন্ননালী থেকে শ্বাসনালীর পথটা বেশি ব্যবহৃত হয়েছে অতীতে।

নড করল গ্রে, 'চলো, সামনে যাই।'

শুধু কোয়ালস্কিকে এই সিদ্ধান্তে নাখোশ মনে হলো। 'ঠিক, চলো এই দৈত্যের পাহারাদারের পেটে ঢুকে যাই?' বিদ্রুপ করল ও। 'শুনেই তো আর তর সইছে না!'

ষোলো
৩ জুন, রাত ২:৪১ ই.ডি.টি.
এলেসমেয়ার দ্বীপ, কানাডা

'প্রস্তুত?' জানতে চাইল পেইন্টার।

নড করল ক্যাট, টেবিল থেকে সরিয়ে নিল চেয়ার। মনে মনে প্রার্থনা করছে, ডিরেক্টরের প্ল্যান যাতে কাজে লাগে। 'তবে, শুরু করা যাক।'

অরোরা স্টেশনে পৌঁছানোর পর, পেইন্টার এবং সে চারপাশের পরিস্থিতি যাচাই করল বেশ কিছুক্ষণ। শুরু করেছে ডাইনিং রুম থেকে, হাতে কফি নিয়ে। কফিটার প্রয়োজন ছিল খুব। ডি.সি. থেকে পুরো রাস্তা বিমানে ঘুমিয়ে কাটালেও, শরীর এখনও মানিয়ে নিতে পারেনি নতুন সময়ের সাথে। মনোযোগ ধরে রাখতে ক্যাফেইন বেশ সহায়ক।

প্রস্তুত হওয়ার জন্য আরেকটু সময় চেয়েছিল ও। কিন্তু ঝড়টা চলে এসেছে একদম নাকের ডগায়। বড়জোর আর এক ঘন্টা, এরপরেই এলেসমেয়ার দ্বীপে আছড়ে পড়বে ওটা। সাফিয়াকে উদ্ধারের পর, থুলে এয়ার বেসের সাহায্য নিয়ে পালাবে ওরা। আর তা করতে হলে, আগে সময়ের যুদ্ধে হারাতে হবে ঝড়কে।

এককথায়-হয় এখন, নয়তো কখনওই না।

টার্গেটের উপর চোখ রাখছে ক্যাট, অপেক্ষা করছে সঠিক মুহূর্তের।

কফি খেয়ে চাঙ্গা হবার পর, পেইন্টারকে নিয়ে স্টেশনের বিনোদন অংশে গেল মেয়েটা। পুল টেবিলের পাশে জায়গা খুঁজে নিয়েছে দু'জন। ডানদিকে একটা দুই পাল্লার দরজা, চলে গিয়েছে অন্ধকার মুভি থিয়েটারের দিকে। অন্য পাশে ছিমছাম একটা ব্যায়ামাগার। একটা সুইমিং পুলও দেখা যাচ্ছে দূরতম কোনায়। বিশ মিনিট ধরে এক সাঁতারু চক্কর কাটছে ওখানে। দেখে মনে হচ্ছে যেন, খাঁচায় বন্দী অস্থির বাঘ! অন্তত ক্যাটের তাই মনে হলো।

ইন্টেলিজেন্স অপারেশনের ট্রেনিং থাকায়, সহজেই সবার মানসিক অবসাদের লক্ষণ বুঝতে পারছে সে। এখানকার বেশ কয়েকজন কর্মচারীদের মাঝেও তাই লক্ষ্য করেছে সে। সকাল সকালই এখানে এসে ঘোরাঘুরি করে এরা উদ্দেশ্যহীনভাবে। অবশ্য কারণটাও অনুমেয়। পরিবার-পরিজন থেকে দূরে থাকে সবাই, অন্যদিকে নিষ্ঠুর প্রকৃতির প্রকোপ তো আছেই। এই অঞ্চলে টানা কয়েক মাস রাত অথবা দিন থাকে, মানুষের স্বাভাবিক সহজাত প্রবৃত্তিগুলো বিগড়ে যেতে বাধ্য .তা যতই বিশ্বের সেরা কফিটা দেওয়া হোক না কেন! তাছাড়াও, পুরো স্টেশন চলে ঘড়ির কাঁটা ধরে, দৈনন্দিনের রুটিন থেকে নিস্তার নেই কারও।

বিষণ্ন মনে মাথা ঝাঁকাল ক্যাট।

প্লাজমা পর্দার তৈরি নকল জানালায় ভেসে উঠছে রৌদ্রোজ্জ্বল সমুদ্রতটের ছবি, সেই সাথে দেয়ালের উজ্জ্বল রঙ। এসবও পারছে না মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করতে। সবচেয়ে বেশি পীড়িত হচ্ছে এই লোকগুলো। বেছে বেছে এমন সবাইকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যারা পারতপক্ষে বন্ধু-সঙ্গ এড়িয়ে চলে। পুরোপুরি অসামাজিক বলা যায়।

এবং এরাই আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো টার্গেট।

চওড়া কাঁধের এক বিশালদেহীকে নির্বাচন করেছে ক্যাট। লোকটার হাতের পাকানো পেশি দেখে মনে হচ্ছে যান্ত্রিক অংশের কর্মী। সবুজ কভারঅল পরা কয়েকজনের সাথে পুল খেলছে সে, সবার পরনে একই পোশাক। একের পর এক বিয়ার সাবড়ে দিচ্ছে এরা, বেশ হৈচৈ-এর মধ্যে চলছে খেলা। লোকটা সহকর্মীদের সাথে কানাকানি করছে, হাসছে একটু পর পর।

বুঝতে পারল ক্যাট, এখানে খুব বেশি নারী কর্মী নেই।

অপেক্ষা করল সে, লোকটা না নড়া পর্যন্ত। লোকটার নজর বাথরুমের দিকে, তবে ওদের টেবিল অতিক্রম না করে ওখানে যাওয়ার উপায় নেই। কর্মচারীটা এগিয়ে আসতেই, রেস্টরুমে যাওয়ার কথা বলে ঘুরে দাঁড়াল ক্যাট। বিশালদেহী লোকটার গায়ে ইচ্ছে করেই ধাক্কা খেল সে, তবে চেহারায় ভয় নিয়ে সাথে সাথে লাফিয়ে পড়ল পিছনে। নিখুঁত অপমানের ছাপ ফুটে উঠল ক্যাটের চোখে-মুখে।

রাগী চোখে তাকাল সে লোকটার দিকে, হাত দিয়ে আড়াল করল বুক। পেইন্টারের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমার আমার বুকে হাত দিয়েছে!’

এক পা এগিয়ে এল পেইন্টার। লোকটা হাত তুলে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করছে ওকে। এখনও বুঝতেই পারেনি বিশালদেহী লোকটা, কী থেকে কী হয়ে গেল। ‘এ কী করলে তুমি?’ হুঙ্কার ছাড়ল পেইন্টার।

অপরাধ অস্বীকার করতে চাইল লোকটা। কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছে না, চমকটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও। আর সেই সময়টুকুও দিল না পেইন্টার, জোরে ধাক্কা মারল লোকটাকে। পাশের টেবিলে পড়ে গেল বিশালদেহী, বন্ধু-বান্ধবদের মুখ থেকে চাপা হাসি ভেসে এল।

যেমনটা আশা করেছিল ক্যাট, অপমানের শোধ নিতে পাল্টা আক্রমণ করল বিশালদেহী। ঝুঁকে ঘুষিটা এড়িয়ে গেল সিগমা ডিরেক্টর, শুরু হলো লড়াই। বিক্ষিপ্ত হলো চেয়ার, একজন আরেকজনের দিকে ছুঁড়ে দিল ঘুষি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল দু'জন। বিশালদেহী লোকটার বন্ধুরা উল্লাস করে উঠল, বুঝতে পেরেছে, আগন্তুক হারাতে পারবে না ওদের বন্ধুকে।

এমনকি ক্যাটেরও এমনই মনে হতে লাগল।

কোথায় ওরা ?

হঠাৎ খুলে গেল পিছনের দরজা, কালো ইউনিফর্ম পরা তিন লোক এগিয়ে এল। তিনজনের মধ্যে এগিয়ে থাকা লোকটাই ওদের মূল টার্গেট। অ্যান্টন মিখাইলোভের পাণ্ডুর চেহারায় জ্বলজ্বল করছে ট্যাটুটা। এখানে নিজেকে গোপন করে রাখার কোন কারণ নেই ওর।

'থামো।' গর্জে উঠল অ্যান্টন, কণ্ঠে কড়া রাশিয়ান টান।

স্বাভাবিকভাবেই ওরা ধারণা করেছিল, সাইমন হার্টনেল নিজের নিরাপত্তা প্রধানকে ডারপার তদন্তকারীদের উপর নজর রাখতে অবশ্যই বলবে; বিশেষ করে যখন রুমের বাইরে থাকে ক্যাটরা। তাই, চাল চেলে লোকটাকে বাইরে আনতে এই নাটকের অবতারণা।

অ্যান্টনের সাথের দু'জন লড়াইরত মানুষ দুটোকে আলাদা করার চেষ্টা করছে।

শক্তির লাগাম টেনে ধরে রেখেছিল পেইন্টার, তবে এক ঝলক দেখিয়ে দেয়ার সুযোগ ছাড়ল না। দুটো ঘুষি ছুড়ল প্রতিপক্ষের মুখ লক্ষ্য করে। শেষেরটা আপারকাট, সরাসরি চিবুকে আঘাত হানল শক্তিশালী মুষ্টি। সাথে সাথে কুপোকাত হলো বিশালদেহী লোকটা, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

দাঁড়িয়ে আছে সিগমা ডিরেক্টর, হাত থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীর রক্ত ঝারছে।

দেঁতো হাসি খেলে গেল ক্যাটের মুখে।

সন্দেহ করা একদম উচিত হয়নি।

'কী হয়েছে এখানে?' জানতে চাইল নিরাপত্তা প্রধান।

ঘুরে দাঁড়াল পেইন্টার, রাগে জ্বলছে চোখ দুটো। 'কেমন মানুষ তোমরা? এই লোক আমার সঙ্গিনীকে অপমান করেছে।' পুল টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল। 'আর এরা তখন হাতে চুড়ি পরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।'

অন্যান্য সহকর্মীদের চুপ করানোর জন্য অপমানটুকু যথেষ্ট।

অ্যান্টনের দিকে ফিরল ক্যাট, চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমাকে রুম পর্যন্ত একটু এগিয়ে দিতে পারবে?'

'অবশ্যই।' নিজের লোকদের উদ্দেশ্য হাত নাড়ল সে, 'অজ্ঞান লোকটাকে নিয়ে যাও। পরে ব্যাপারটা দেখছি।'

'ধন্যবাদ।' বলল ক্যাট, কাঁপছে এখনও .যেন একটু আগের ঘটনা স্মরণ করে।

বিনোদন কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এল ওরা, ওদের রুমের দিকে নিয়ে চলছে নিরাপত্তা প্রধান। 'দুঃখিত,' বলল অ্যান্টন, 'যা ঘটেছে তার জন্য ক্ষমা চাইছি

আমি।' কঠিন কণ্ঠে বলল লোকটা। 'অবশ্যই এর বিচার হবে, আপনাদের কথা দিচ্ছি।'

রুমের কাছে পৌঁছতেই, নিজের কী-কার্ড ব্যবহার করে দরজা খুলল অ্যান্টন। লোকটার কাছে পুরো স্টেশনের এক্সেস আছে।

বাহ! বেশ।

হল ক্যামেরার সামনে আড়াল হয়ে দাঁড়াল ক্যাট, জানে না ওখানে এখন কেউ নজর রাখছে কিনা। কিন্তু ঝুঁকি নিতে রাজী নয় সে।

দরজা খুলে যেতেই, অ্যান্টনকে ভেতরে ধাক্কা দিয়ে ফেলল পেইন্টার, সেই সাথে নিজেও ঢুকে গেল ভেতরে। পেছন পেছন এল ক্যাট, দরজা আটকে দিল সাথে সাথে।

ঘুরে দাঁড়াল অ্যান্টন, হাতের অস্ত্র লোকটার নাক বরাবর তাক করে রেখেছে সিগমা ডিরেক্টর। 'হ্যালো! অ্যান্টন মিখাইলোভ।'

লোকটাকে সিগ সয়্যারের লোলুপ দৃষ্টির চেয়েও বেশি চমকে দিল পেইন্টারের কথাগুলো। কিন্তু চটজলদি নিজেকে সামলে নিল অ্যান্টন।

'কী চাও?' পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ল সে।

হ্যামার কক করলেন পেইন্টার, 'সাফিয়া আল-মায়াজের কাছে আমাদের নিয়ে যাচ্ছ তুমি।'

সকাল ৩:০৪

'কী ভাবছ?' রোরিকে জিজ্ঞাসা করল সাফিয়া।

ল্যাপটপের পর্দায় ভেসে উঠেছে ছেলেটার ছবি, ওয়েবক্যামের দিকে ঝুঁকল সে। 'কিছু একটা খুঁজে পেয়েছ তুমি।'

নড করল মেয়েটা, 'তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্য দুঃখিত। কিন্তু মেয়েটা ইহুদি-এই তথ্য জানার পর থেকে আর ঘুম ধরছে না আমার। বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবছি বিষয়টা নিয়ে। হঠাৎ মনে হলো, ভুল পথে ধরে এগোচ্ছি আমরা শুরু থেকেই।'

মনিটরে উল্কির হায়ারোগ্লিফগুলো পুনরায় সাজিয়েছে সে। 'কয়েকটা অংশের লেখায় গ্লিফ বাদ পড়ায় মূল অংশের পাঠোদ্ধার একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও, অল্প যেটুকু লেখা পড়া যায়, সেটুকুকে আমরা মিশরীয় গ্লিফ বলে ভাবছি।'

সোজা হয়ে বসল রোরি, 'কিন্তু এখন আমরা জানি, মেয়েটা মিশরীয় নয়।'

সারারাতের কাজের অংশটুকু দেখাল মেয়েটা, চাইছে রোরি শ্রোতার ভূমিকায় থাকুক।

'আমরা জানি, মিশরীয়রা দুইভাবে হায়ারোগ্লিফ লিখত।' বলল সাফিয়া। 'কিছু ছবি সরাসরি শব্দটার প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন, বিড়ালের চিহ্ন একটা 'বিড়াল'-কেই বোঝায়। কিন্তু মাঝে-মধ্যে লেখক শব্দের প্রতিটি বর্ণ আলাদা আলাদা লেখে। প্রাচীন মিশরীয় ভাষায়, বিড়ালকে বলা হতো 'মিউ'।'

নড করল রোরি, 'বিড়ালের ডাকের মতো।'

হাসল ও, 'একদম ঠিক। তিনটি বর্ণ দিয়ে এই শব্দের বানান লিখতো ওরা। এইভাবে-'

উদাহরণ দুটো দেখাল সে।
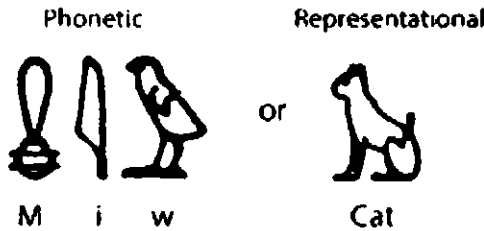
'কিন্তু মেয়েটা ইহুদি, সে কথা বলত প্রাচীন হিব্রু ভাষায়। তাই, এই হায়ারোগ্লিফগুলো পড়তে হবে ওদের মতো করেই। মিশরীয় শব্দের বদলে, সে হয়তো হিব্রু শব্দের উচ্চারণ লিখেছে। ওর জানা একমাত্র লেখ্য রূপ হয়তো ওটাই ছিল।'

'প্রাচীন হিব্রু।' ভ্রূকুটি করল রোরি। 'কিন্তু হিব্রু ভাষায় কেন লেখল না? আট হাজার বছর আগেই ওখানে লিখিত ভাষার উৎপত্তি ঘটেছিল। রেডিয়োকার্বন থেকে জানা গিয়েছে, মমিটা মাত্র ১৩০০ খ্রিস্টপূর্বের।'

'হয়তো মিশরেই বড় হয়েছে সে, শিখেছে শুধুমাত্র মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ। এই একটাই লিখিত ভাষা জানা ছিল ওর। আরেকটা কথা ভাবছি।'

'কী?'

'যদি ওরা মোজেসের আমলে হারিয়ে যাওয়া সেই গোত্র হয়? যারা মহামারীর আক্রমণে দক্ষিণে সরে গিয়েছিল? ওদের অন্যান্য গোত্রগুলো হয়তো গিয়েছিল পূর্বদিকে। এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে, কেন ওরা হায়ারোগ্লিফ লেখে; কিন্তু কথা বলে প্রাচীন হিব্রু ভাষায়।'

উত্তেজনা সংক্রমিত হয়েছে রোরির মাঝেও, 'এই জাতি যদি লিখতে জেনে থাকে, তার মানে একটাই। এরা লিপিকার, কেননা এমন জাতি পাওয়া খুবই দুর্লভ।'

নড করল মেয়েটা, 'হুম, নথি সংরক্ষণ করে রাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্প্রদায়। মহামারী সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞান সংরক্ষণের দায়িত্ব পেয়েছিল এরা।'

'হয়তো কীভাবে এই মহামারীকে থামানো যায় তা-ও জানত তারা!' ফিসফিস করে বলল রোরি। 'জবাবের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি মনে হচ্ছে।'

সাফিয়া জানে, ওর মূল কাজ হচ্ছে ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত থেকে এই রোগটার সম্ভাব্য প্রতিকার বের করা। নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করছে সে, ঠিকই একই সময়ে আরও গবেষক বৈজ্ঞানিক নথিপত্র থেকে একই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। কিন্তু সাইমনের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে কিছুই জানা নেই ওর। প্রথম সাক্ষাতে দাবি করেছিল লোকটা, তার উদ্যম রক্ষা করবে পৃথিবীকে।

যদি তাই হয়–তবে কেন এত রক্তক্ষয়? কেন এত গোপনীয়তা?

আলোচনায় ফিরিয়ে আনল ওকে রোরি, 'কিন্তু কীভাবে বুঝবে সঠিক রাস্তায় এগোচ্ছি আমরা?'

নিজের ধারণার সহায়ক হিসেবে, সাফিয়া আরেকটি কাজ তুলে ধরল পর্দায়।

'এই তিন গ্লিফ আঁকা হয়েছিল মমিটার কপালে, যেখান থেকে শুরু হয়েছে চুলের রেখা। অক্ষর তিনটি রাখা হয়েছে পাত্রের মধ্যে, মানে এটি গুরুত্বপূর্ণ। মিশরীয় ভাষায় এই তিনটি অক্ষর দিয়ে ইংরেজি এস, বি এবং এইচ নির্দেশ করে। যার অর্থ দ্রুত উচ্চারিত বা অস্পষ্ট কথা। কিন্তু যদি এই অক্ষরকে নাম হিসেবে উচ্চারণ করি?' উচ্চারণ করল সে, 'সাহ-বাহ।'

'এখানে এর গুরুত্ব কী?'

'সেবা বা বেতসেবা নাম থেকে প্রাপ্ত হিব্রু নাম হচ্ছে সাবাহ।'

'বাইবেলের মতো।'

নড করল সে, উত্তরাধিকার সূত্রে ধর্মটার সাথে সম্পর্ক রয়েছে ওর। কিন্তু সে এক বিরাট কাহিনি। তাই ওসব বাদ দিয়ে আলোচনায় ফিরে এল সাফিয়া। 'প্রচলিত অর্থ, শপথকন্যা। মানে, এমন কেউ যে গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারে ভালোভাবে।'

'তা সে অবশ্যই পেরেছে।' হাই তুলতে তুলতে বলল রোরি। 'সকালে বাকিটুকু শোনা যাবে খন।'

দেঁতো হাসি দেখা দিল সাফিয়ার মুখে, 'ঘুমিয়ে পড়ো। আমিও চেষ্টা করব ঘুমাতে।'

দু'জন দু'জনকে শুভরাত্রি জানিয়ে ল্যাপটপ বন্ধ করে রাখল। কিন্তু সাফিয়া জানে, রাতে আর ঘুম আসবে না ওর। তবুও চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল, বিছানার দিকে এক পা বাড়িয়েছে কেবল। শুনতে পেল, পিছনে খুলে যাচ্ছে দরজা!

ঘুরে দাঁড়াল সে, পিছিয়ে গেল এক পা, আশংকা করছে খারাপ কিছুর।

খুলে গেল দরজা, ভেতরে প্রবেশ করল অ্যান্টন। চেহারাটা রাগে বেগুনি হয়ে গিয়েছে ওর। হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল, আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সাফিয়া।

কোন ভুল করিনি তো আমি?

হঠাৎ, পেছন থেকে এগিয়ে এল আরও দুটো অবয়ব। একজন অচেনা, কিন্তু অন্যজন অনেকদিনের পরিচিত মুখ।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সাফিয়া, হারানো শক্তি ফিরে পেয়েছে যেন।

'পেইন্টার

সকাল ৩:২৩

ক্যাটকে অ্যান্টনের পাহারায় রেখে সামনে এগিয়ে গেল পেইন্টার। জড়িয়ে ধরল সে সাফিয়াকে, আলিঙ্গনের ভেতর থরথর করে কাঁপছে মেয়েটা। 'ঠিক আছ তুমি?'

'এখন বেশ ভালো আছি।' অস্পষ্ট সুরে বলল সাফিয়া।

'চলো, এখান থেকে বের হওয়া যাক তাহলে।'

'সানন্দে।'

মেয়েটাকে নিয়ে বেরিয়ে এল পেইন্টার।

'দাঁড়াও,' সাথে করে ল্যাপটপটা নিয়ে এসেছে সাফিয়া। 'রোরির কী হবে?'

ওর দিকে ফিরে তাকাল ক্যাট, কিন্তু অ্যান্টনের দিকে তাক করা সিগ সয়্যার নড়েনি একচুলও। 'রোরি ম্যাককেব? সে এখানে?'

নড করল সাফিয়া, 'আমার মতোই একজন বন্দি।'

মুখ বিকৃত করল পেইন্টার: অস্ত্রের মুখে অ্যান্টন ওদের ঠিকই নিয়ে এসেছে এখানে, কিন্তু হাতে কোন না কোন তাশ লুকিয়ে রেখেছে।

'ছেলেটা কোথায় আছে জানো?' জিজ্ঞাসা করল ক্যাট।

'আমি   আমি জানি না। প্রথমে ওরা আমাকেই রুমে নিয়ে আসে।'

অ্যান্টনের দিকে ফিরল পেইন্টার, 'মনে হচ্ছে, বের হওয়ার আগে আরও একটি রুমে যেতে হবে আমাদের।'

সিলিংয়ে লাগানো ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসল নিরাপত্তা প্রধান, ঠান্ডা সুরে বলল, 'না।'

লোকটার অভিব্যক্তিই পেইন্টারকে বলে দিল সবকিছু, প্রথম থেকেই অ্যান্টন হাতের তাশ লুকিয়ে রেখেছে; দেরি করিয়ে দিয়েছে ওদের। এতক্ষণ অস্ত্র ধরে রেখেছিল অ্যান্টনের পিঠে, যতদূর সম্ভব ক্যামেরা এড়িয়ে এসেছে।

কিন্তু এখন?

অ্যান্টনের দিকে ঝুঁকল সে, মার খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে লোকটা। কিন্তু পেইন্টার ভাবছে অন্য কথা।

হাতে ভালো তাশ না থাকলে, ধাপ্পাবাজির আশ্রয় নিতেই হয়!

'বোনকে কতোটা ভালোবাসো?' জানতে চাইল সে। 'আমরা জানি, ওর আসল নাম ভ্যালমা নয়।'

চোখ ছোট ছোট করে ফেলল অ্যান্টন, ইতিমধ্যেই ওর ব্যাপারে বেশ কয়েকটি তথ্য দিয়েছে পেইন্টার। তাই, পেইন্টারের বলা কথাটা বিশ্বাস করতে দেরি হলো না ওর।

জোর খাটাল সিগমা ডিরেক্টর, 'তোমাদের দু'জনের মধ্যে বেশ মিল অন্তত উল্কিটার ক্ষেত্রে তা বলাই যায়।' নিচের চিবুকে স্পর্শ করল পেইন্টার। 'গিল্ডে যোগ দেওয়ার আগে করিয়েছিলে নাকি পরে?'

শক্ত হয়ে গেল অ্যান্টনের দেহ, অতীতের এই তথ্যগুলো কারও জানার কথা নয়। যদি না

এবার .আসল ঝটকা।

'তোমার বোন আমাদের কাছে।' মিথ্যা বলল পেইন্টার। 'এক ঘন্টা আগে ইন্টারপোলের হাতে ধরা পড়েছে সে। এজন্যই, আমরা এত দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পেরেছি। যদি ওকে জীবিত দেখতে চাও, তবে জলদি রোরির কাছে নিয়ে চলো, সেই সাথে এখান থেকে আমাদের বের হতেও সাহায্য করবে তুমি।'

সাফিয়ার সেলের পাশের জানালার দিকে গেল ওর নজর, গাঢ় মেঘ ঢেকে দিয়েছে আকাশ। আবহাওয়া খারাপ হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে। বাইরে গিয়ে স্যাটেলাইট ফোনে থুলে অপেক্ষারত দলটার কাছে সাহায্য চাইবে পেইন্টার। যদি কোন সমস্যা হয়, এখানকার কোন বাহন চুরি করে পৌঁছে যাবে কাছের পাহাড়টার চূড়ায়। ওখানে ঝড়ের আড়ালে অপেক্ষা করবে উদ্ধারের।

কিন্তু সবকিছুই এখন নির্ভর করছে অ্যান্টন ওর বোনকে কতোটা ভালোবাসে, তার উপর।

অগ্নিদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল অ্যান্টন, শেষে চাপা হিস হিস করে বলল, 'খুব একটা দূরে নেই সে।'

পিস্তল দিয়ে অ্যান্টনকে খোঁচা দিল ক্যাট, 'পথ দেখাও।'

দরজা খুলে হলওয়েতে উঁকি দিল পেইন্টার, সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। পিস্তল উরুর কাছে ধরে রেখেছে সে। 'কাছাকাছি থেকো।'

নিরাপত্তা প্রধানের পেছন পেছন রওনা দিল ক্যাট, শিরদাঁড়ায় ঠেস দিয়ে রেখেছে পিস্তল। দুটো প্যাসেজওয়ে পর এককোনায় রোরির রুম। সত্যিই খুব কাছে।

অ্যান্টনের কার্ড ব্যবহার করে দরজা খুলল পেইন্টার, অন্ধকার রুমের বিছানায় শুয়ে আছে একজন।

'কে? কে ওখানে?'

এগিয়ে গেল সাফিয়া, 'রোরি, আমি।'

'সাফিয়া?'

সংক্ষেপে পুরো ঘটনা ব্যাখ্যা করল সে। 'চলো,' বলল ও, 'জলদি।'

ততক্ষণে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রোরি, জামাকাপড় পরে নিচ্ছে দ্রুত। সাফিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু

'কী?'

'মমিটা ওটাই প্রতিবেধক খুঁজে পাওয়ার একমাত্র আশা। তোমার কথামতো ওসব যদি লেখা থাকে ওখানে, তাহলে আমরা সম্ভাব্য মহামারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারব।'

পেইন্টারের দিকে তাকাল সাফিয়া, 'পরিস্থিতি?'

উত্তর দিল ক্যাট, 'খুবই খারাপ।'

'সময়ের সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়ছে মহামারী।' যোগ করল পেইন্টার, ড. কানোর ভবিষ্যৎবাণী মনে আছে। জেনেটিক ক্ষতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম থেকে যাবে।'

রোরির দিকে ঘুরল সাফিয়া, ল্যাপটপটা বুকে জড়িয়ে ধরে আছে। 'সংগ্রহীত সব তথ্য আছে এখানে।'

কাঁচুমাচু দেখাচ্ছে ছেলেটাকে, মনে হচ্ছে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। পালিয়ে যাবে নাকি সংগ্রহ করবে তথ্যগুলো। 'কিন্তু তথ্যগুলো পূর্ণাঙ্গ নয়। তুমি নিজেও তা জানো।'

পেইন্টারের দিকে তাকাল সাফিয়া, 'ঠিক বলছে ও। মমিটা ধ্বংস হয়ে গেলে, হারিয়ে যাবে এই রোগের প্রতিষেধক খুঁজে পাওয়ার আশা।'

সাফিয়ার বলা সব কথা বুঝল না পেইন্টার, কিন্তু ওকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই সিগমা ডিরেক্টরের। 'কী করতে পারি এখন আমরা? সাথে করে মমি নিয়ে যাওয়া তো সম্ভব নয়।'

হতাশ দেখাচ্ছে সাফিয়াকে, 'ওটা আক্রান্ত, প্রফেসর ম্যাককেবের দেহের মতো। বায়োল্যাবের আবদ্ধ ঘরে রাখা হয়েছে মমিটা।'

'তাহলে ফেলে যাওয়াটাই ভালো হবে।' বলল ক্যাট। 'কর্নেল ওয়াইক্রাফটের দল এসে গেলে উদ্ধার করা যাবে ওটাকে।'

পায়ে জুতো গলাল রোরি, 'প্রোটোকল পড়েছি আমি।' বলল সে। 'নিরাপত্তা জনিত যেকোন ঝামেলায়, প্রথমেই ল্যাবটা পুড়িয়ে ছাই করে দেবে ওরা।'

সন্দেহের অবকাশ পেল না পেইন্টার, নিজেদের অপরাধের প্রমাণ ঢাকতে বেশ কার্যকর পদ্ধতি। প্রফেসরের দেহটাও পুড়িয়ে দিয়েছিল শত্রুরা, পুরো রিসার্চ ল্যাবটার সাথে। অ্যান্টনের মুখের অভিব্যক্তিও ছেলেটার কথার সপক্ষে সম্মতি যোগাচ্ছে।

'আর কোন উপায় নেই আমাদের হাতে।' বলল সাফিয়া।

বুদ্ধি দিল রোরি, 'থ্রিডি স্ক্যানার।' নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ছেলেটা।

সোজা হলো সাফিয়া, 'হায় ঈশ্বর! টপোগ্রাফিক্যাল স্ক্যানারে মমিটা রেখে এসেছিলাম আমরা। এতক্ষণে স্ক্যান শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। দেহটার বিস্তারিত নিখুঁত বর্ণনা ফুটে উঠবে ওটায়।'

নড করল রোরি, 'তথ্যগুলো সাথে করে নিয়ে যেতে পারলে

চোখ টিপল সাফিয়া, 'এর মানে আবারও ফিরে যেতে হবে বায়োল্যাবে।'

পেইন্টারের দিকে ফিরল ক্যাট। ভ্রু উঁচু করল, 'আবারও থামতে হবে?'

'যা করার, দ্রুত করতে হবে।'

সাফিয়ার দিকে ফিরল ক্যাট, 'কত দূর?'

'কাছেই, তবে তিন তলা নিচে।'

স্টেশনের ভেতরে আবার ঢুকতে হবে ওদের।

পেইন্টারের দিকে চিন্তিত নজরে তাকাল ক্যাট, 'সবাই মিলে না গিয়ে অল্প কয়েকজন গেলে কাজ দ্রুত হবে।' অ্যান্টনের দিকে ফিরল সে, খুব বেশিক্ষণ ওর সহযোগিতা আশা করা বোকামি হবে।

'আমি রোরিকে নিয়ে যাচ্ছি।' বলল পেইন্টার। 'তোমরা থাকো এখানে।'

মাথা নাড়ল ক্যাট, 'দু'জন নারী গেলেই সহজ হবে বরং। কেউ হুমকি মনে করবে না। বিশেষ করে যদি একজনের গায়ে সিকিউরিটির ইউনিফর্ম থাকে, আর সাথে থাকে একজন নারী বন্দি।'

তর্ক করতে চাইল পেইন্টার, কিন্তু ক্যাটের পরিকল্পনার উপযোগিতা বুঝতে পেরে চুপ রইল সে। এগিয়ে এল সাফিয়া, 'কাজটা করতে পারব আমি।'

সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর, হাতের অস্ত্র নিরাপত্তা প্রধানের দিকে তাক করল পেইন্টার। 'জামাকাপড় খোলো।'

কিছুক্ষণ পর, লোকটার কালো ওভারঅল গায়ে চড়াল ক্যাট। মাথার চুল বেঁধে নিল ও, সিকিউরিটি ক্যাপের নিচে গুঁজে দিল চুল। সাফিয়ার দিকে ফিরে তাকাল সে, 'তৈরি?'

মেয়েটার চোখে ভয়, তবুও নড করল ও।

দরজার দিকে এগিয়ে গেল ক্যাট, চারপাশ দেখে নিল ভালো করে। সামনে এগিয়ে দিল সাফিয়াকে, বের হওয়ার আগে একবার ফিরে তাকাল সে। 'ওকে নিরাপদে রাখব আমি।'

নড করল পেইন্টার।

দরজা বন্ধ করে দিল ক্যাট।

হাতের অস্ত্র নিরাপত্তা প্রধানের দিকে তাক করে রেখেছে পেইন্টার। লোকটার পরনে শুধু জাঙ্গিয়া, ওর তরফ থেকে ভয়ের কিছু নেই। তবুও সাবধানতায় ঢিল দিল না সিগমা ডিরেক্টর। লোকটাকে দেয়ালের পাশে হাত উঁচু করে দাঁড় করিয়ে রেখেছে সে। অ্যান্টনের নজর রোরির দিকে, পেইন্টারের পিছনেই পায়চারি করছে ছেলেটা।

অবশেষে ওর দিকে ফিরে তাকাল অ্যান্টন, 'এখান থেকে বের হতে পারবে না তুমি।' বলল লোকটা, কণ্ঠে সীমাহীন ক্রোধ। 'মেয়ে দুটোকেও ভুগতে হবে।'

'দেখা যাবে-'

বিপদটা কয়েক মুহূর্ত পর টের পেল পেইন্টার। ছায়ার নড়াচড়া, সেই সাথে ধাতব ঝনঝনানি। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেল রোরিকে, ছেলেটার হাতে ভারী ডেস্ক ল্যাম্প। সরাসরি কপালে আঘাত হানল ল্যাম্প, হাজার তারা জ্বলে উঠল পেইন্টারের চোখের সামনে। ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল সে, হাঁটু গেঁড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

নড়ে উঠল অ্যান্টন, ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল পিস্তল। উঠে দাঁড়াতে ব্যর্থ হলো পেইন্টার, মাথাটা ঝিম ঝিম করছে এখনও।

অস্ত্র তাক করল অ্যান্টন নতুন বন্দীর দিকে, সেই সাথে আলতো করে হাত রাখল রোরির বাহুতে। আদুরে গলায় বলল সে, 'শাবাশ, আমার সিংহ।'

পিস্তলটা রোরির হাতে দিল সে, তল্লাশি চালাল পেইন্টারের দেহ। স্যাটেলাইট ফোন বের করে নিল, অন্য কোন অস্ত্র না থাকায় সন্তুষ্ট হয়েছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল অ্যান্টন।

ক্ষমা-প্রার্থনার সুরে বলল রোরি, 'বুঝবে না, কতটা গুরত্বপূর্ণ আর ভয়ঙ্কর বিষয়ে হাত দিয়েছ তোমরা।' পেছন পেছন বেরিয়ে গেল সে-ও।

দু'জন চলে যেতেই আটকে গেল দরজা। উপলব্ধি করল পেইন্টার, একাধিক টেক্কা ছিল অ্যান্টনের হাতে।

গুঙিয়ে উঠল সে, ক্যাটের বলা শেষ কথাটা মনে পড়ছে, আশা করছে কথাটা সত্য হোক।

ওকে নিরাপদে রাখব আমি।

সকাল ৩:৪০

ছোট কক্ষের নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থেকে, সাফিয়াকে ল্যাবে প্রবেশ করতে দেখল ক্যাট। বিশেষ স্যুট পরনে সাফিয়াকে দেখে মনে হচ্ছে যেন বিষাক্ত সাগরে পড়া একটুকরো পাথর।

এখানে পৌঁছে এক সেকেন্ড সময়ও নষ্ট করেনি দু'জন। সৌভাগ্যক্রমে রাস্তায় কারও সামনে পড়তে হয়নি, সেই সাথে অ্যান্টনের কার্ডের বদৌলতে পুরো ফ্যাসিলিটিতে অ্যাক্সেস পাচ্ছে। পুরো খালি ল্যাবটায় প্রবেশ করেছে ওরা। এখন পর্যন্ত কোন ঝামেলা পোহাতে হয়নি, তারপরও চিন্তিত ক্যাট।

জলদি করো, সাফিয়া।

উত্তেজনায় টান টান হয়ে রয়েছে ক্যাটের স্নায়ু। যথাযথ সেফটি প্রোটোকল মেনে ভেতরে প্রবেশ করল সাফিয়া। একটা কম্পিউটার স্টেশনে থামল ও, তার দিয়ে চারটি লেজার ক্যামেরা সংযুক্ত ওখানে। বড় নলের পিস্তলের মতো লাগছে ক্যামেরাগুলোকে। চুপসে পড়া এক অবয়ব কালো সিংহাসনে বসে আছে ক্যামেরাগুলোর মধ্যমণি হয়ে।

নিচে নামার সময় সাফিয়ার কাছ থেকে সব শুনেছে ক্যাট। সুদান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এই মমি। ওখানেই অদৃশ্য হয়েছিলেন প্রফেসর ম্যাককেব। এই প্রাচীন নারীর রহস্যভেদের দায়িত্ব বর্তেছিল সাফিয়ার কাঁধে। শত্রুর বিশ্বাস, এই দেহেই লুকিয়ে আছে রোগটার সম্ভাব্য প্রতিকার। যদিও সাফিয়ার বিশ্বাস, অন্য কোন কারণে রোগের প্রতিষেধক খুঁজছে হার্টনেল। কিন্তু সেই কারণটা অজানা রহস্য হয়ে আছে ওর কাছে।

কী-বোর্ডে চাপ দিল সাফিয়া, খুলে গেল একটা ট্রে। একটা রূপালি ডিস্ক বেরিয়ে এল, এটাতেই আছে সব তথ্য। প্লাস্টিকের একটা পাউচে ওটা রাখল সে। আগেই ক্যাটকে বলে রেখেছে, জীবাণুনাশক ব্যবহার না করে ডিস্কটা বের করা যাবে না। তাই, ব্যাগটা সিল করার চেষ্টা করছে সাফিয়া, কিন্তু মোটা হাতমোজা ঢাকা হাতে কাজটা বেশ কষ্টসাধ্য।

জলদি

হঠাৎ, দরজায় ধাক্কা দিল কেউ, লাফিয়ে উঠল ক্যাট। হলওয়ে থেকে শুনতে পেল পরিচিত কণ্ঠ।

'হ্যালো! হ্যালো!' কণ্ঠে ভয়ের ছাপ।

দরজা ঘেঁষে দাঁড়াল ক্যাট, 'রোরি?'

'বাঁচলাম বাবা! জলদি খোল।' কথার সুরে মনে হচ্ছে পুরো রাস্তা দৌড়ে এসেছে ছেলেটা। 'অ্যান্টন হামলা করেছে তোমার বন্ধুর উপর, ওদের রেখে পালিয়ে এসেছি আমি। এখনই চলে যেতে হবে আমাদের।'

'এখনও কাজ করছে সাফিয়া। দাঁড়াও, খুলে দিচ্ছি দরজা।'

ঝটকা দিয়ে খুলল সে দরজা, হাঁপাতে হাঁপাতে ভেতরে ঢুকল রোরি। ছেলেটার কলার ধরে মানব ঢাল বানিয়ে, বাকি পথটুকু টেনে আনল সে। কাজ শেষে, ফিরে তাকাল, হাতে উদ্যত পিস্তল। যেমনটা ভয় পেয়েছিল, হলওয়েতে দাঁড়ান একটা ছায়া পড়ল নজরে। ট্রিগার টিপে দিতে এক মুহূর্ত দেরি হলো না ক্যাটের।

একটা আর্তনাদ কানে এল, সেই সাথে পাল্টা গুলির আওয়াজ।

মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল বুলেট, পেছনে ঝনঝন শব্দে ভাঙল কাচ। চেঁচিয়ে উঠল রোরি। আড়াল ছেড়ে নড়ল না ক্যাট, ঝুঁকে আবার গুলি চালাল। বন্দুকধারী খোলা হলওয়েতে উন্মুক্ত ছিল, গুলির তোড়ে আড়াল নিল দ্রুত। মেঝেতে মোটা রক্তের ধারা নজর এড়াল না ক্যাটের।

সন্তুষ্ট হয়ে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল ও, আটকে দিল দরজা। বাইরে কোথাও তারস্বরে বেজে চলছে অ্যালার্ম। হাতের অস্ত্রটা তাক করল রোরির কপালে। ছেলেটার ডাকাডাকি শুনেই সন্দেহ হয়েছিল ওর, বুঝতে পেরেছিল কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। শেষ যে অবস্থায় দেখে এসেছিল অ্যান্টনকে, পেইন্টারের সাথে কোনভাবেই পেরে উঠার কথা না। তাই ওভাবে মানব ঢাল বানিয়েছিল ছেলেটিকে, ভেবেছিল ভুল হলে ক্ষমা চেয়ে নেবে।

তবে, ক্ষমার আর প্রয়োজন নেই এখন।

ছেলেটা নিখুঁত অভিনয় করেছে, স্বেচ্ছায় না হলে পারত না। শুরু থেকেই ওদের সবাইকে বোকা বানিয়েছে রোরি। এমনকি সাফিয়ার সহমর্মিতা পর্যন্ত আদায় করে নিয়েছে সে। অল্প কিছুক্ষণ আগেও, ওদের সবাইকে বোকা বানিয়ে ঠেলে এনেছে নিচের এই ল্যাবে।

রোরির চেহারায় নিখাদ আতঙ্ক, তবে ক্যাটের অস্ত্র এর কারণ নয়। বায়োল্যাবের দিকে নজর ছেলেটার। লক্ষ্য করল ক্যাট, দুটো বুলেট জানালার কাঁচ ভেঙে প্রবেশ করেছে ভেতরে।

পিছিয়ে গেল রোরি এক পা, 'আহ! না

মনের মধ্যে কু ডেকে উঠল ক্যাটের। ভেতরে নিজের পায়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে সাফিয়া, তবে মাথার হুডের কাঁচ ফেটে গিয়েছে এলোপাথাড়ি গুলির

আঘাতে। অল্পের জন্য মাথায় লাগেনি বুলেট। তবে, মমিটার মাথা খুঁজে নিয়েছে বিক্ষিপ্ত এক বুলেট, বিস্ফোরিত হয়েছে ওটা।

চেঁচিয়ে উঠল রোরি, 'জলদি রাসায়নিক বর্ষণের নিচে যাও, সাফিয়া।'

বিশ্বাসঘাতক ছেলেটার আচরণে অবাক হলো ক্যাট, তবে সমর্থন দিতে ভুলল না। 'জলদি করো, সাফিয়া।'

দু'জনের চিৎকারে সম্বিত ফিরে পেল সাফিয়া, দ্রুত নড়ে উঠল। উপরে একটা টাইমারের দিকে আঙুল তুলল রোরি, 'দু'মিনিট সময় আছে আমাদের হাতে। নিরাপত্তা বেষ্টনী ছিদ্র হওয়ায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে এই ল্যাব। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এখানকার সবকিছু।'

ধাতব দরজাগুলো ইতিমধ্যেই নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে।

'বন্ধ করার কোন উপায় নেই?'

'হয়তো আছে, কিন্তু সেটা আমার জানা নেই।'

শাওয়ার স্টেশনের দিকে দৌড়ে গেল সাফিয়া, হাত দিয়ে টিপে দিল ইমার্জেন্সি বাটন। দ্রুত রাসায়নিক জীবাণুনাশক বর্ষণ ঝরে পড়ল ওর উপরে, হাতে এখনও পাউচটা ধরে রেখেছে শক্ত করে। পুরো প্রক্রিয়া শেষ করে বের হলো সে, আতঙ্কিত হয়ে খুলে ফেলল স্যুট, নিচে ধূসর কভারঅল পরনে।

ল্যাবের দরজা বন্ধ হতে চলেছে, ধাতব পাত নেমে এসেছে অনেকখানি।

আতঙ্কে বড় বড় হয়ে গিয়েছে সাফিয়ার চোখ, তবে সংক্রমণের ভয়ে নয়। আগে এখান থেকে জীবিত বের তো হতে হবে!

শেষ দরজা পার হয়ে ওদের কাছে পৌঁছুল সাফিয়া। রোরির মুখে অপরাধবোধের ছায়া, 'তোমাকে আঘাত করা উচিত হয়নি। প্রতিজ্ঞা করেছিল ও, যে তোমাদের '

একবার ক্যাটের হাতে ধরা অস্ত্র, আরেকবার রোরির মুখের দিকে তাকাচ্ছে মেয়েটা। 'কী হয়েছে?'

'এখান থেকে বের হচ্ছি আমরা।' উত্তর দিল ক্যাট, স্থির ধরে রেখেছে হাতের পিস্তল। 'এবং তুমিও আসছ সাথে।'

দরজার কাছে এল সবাই, হলওয়েতে নজর বোলাল ক্যাট। অ্যান্টন এখনও ওখানে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে কিনা, জানা নেই ওর। তাই ঝুঁকি নিল না কোন। এমনিতেও শত্রুরা সচেতন হয়ে উঠেছে, লোকজন সব ছুটে আসবে এখানে। ওর বাঁচার আশা হট্টোগোলের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার মধ্যে। এমনিতেও রাতের এই সময়ে খুব বেশি প্রহরীর দায়িত্বে থাকার কথা নয়। কিছু বাড়তি সময় পাওয়া যাবে বলে ওর বিশ্বাস। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে রোরিকে টেনে আনল সামনে, মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে।

মেঝেতে রক্তের দাগ নজর পড়ল রোরির, 'অ্যান্টন

সাফিয়াকে নিজের পিছনে পাঠিয়ে দিল ক্যাট, পুরো স্টেশনের ম্যাপটা মাথায় গেঁথে নিয়েছে আগেই। সামনে আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে যাওয়ার রাস্তা আছে। ওদের মাথার উপর ঠিক দু' তলা উপরে ওটা।

অর্ধেক পথ পার হবার আগেই, দেয়াল ভেদ করে আগুনের গর্জন শুনতে পেল। কল্পনার চোখে দেখল, পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে পুরো ল্যাবরেটরি।

পালাবার সময় হয়েছে।

হলওয়ের শেষে লিফট, ছুটে গেল ওদিকে ওরা। সুইচ টিপে দিতেই খুলে গেল লিফটের খাঁচা। সবাই ঢুকে গেল ভেতরে, গ্যারেজে যাওয়ার বাটন চেপে দিল ক্যাট। লিফটের দরজা খুলে যেতেই, স্নো-ক্যাটের সারির দিকে ছুটে গেল সে। চারকোনা কেবিনের ভেতরটা অনেকটা ছোট ট্যাংকের মতো দেখতে।

অস্ত্রের মুখে রোরিকে তোলা হলো বাহনে। সবাই উঠে বসার পর, সাফিয়াকে পিস্তলটা দিল ক্যাট। বলল, 'সামনে থেক, কিন্তু নজর রেখ ওর উপর। যদি সামান্যতম সন্দেহ হয়, তবে টেনে দিবে ট্রিগার।'

পুরো ঘটনা এখনও বোধগম্য হয়নি সাফিয়ার, তবুও নড করল সে। গাড়ির ইগনিশনে চাবি লাগানোই ছিল, অবাক হলো না ক্যাট।

এখান থেকে কোন গর্দভ বাহন চুরি করতে যাবে?

আমিই সেই গর্দভ।

ইঞ্জিন চালু করল ক্যাট, গিয়ার টেনে দিল। কংক্রিটের মেঝের ওপর দিয়ে গড়াতে শুরু করল স্নো-ক্যাট। গ্যারেজের সিল করা দরজার দিকে গাড়ি নিয়ে গেল সে। দরজায় ব্যবহার করল অ্যান্টনের কী-কার্ড।

মৃদু আওয়াজের পর খুলে গেল দরজাটা।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ক্যাট, এখনও ওটা কাজ করছে বলে খুশি। তবে, বিপদ কাটেনি পুরোপুরি।

বাতাসের আর্তনাদ আছড়ে পড়ল স্নো-ক্যাটের বদ্ধ কেবিনের উপর, দ্বীপের মাঝে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ঝড়ের তাণ্ডব। আকাশ ছেয়ে গিয়েছে কালো মেঘে, হামলে পড়তে চাইছে যেন বাহনটার উপর। উত্তর-পূর্ব দিকে কোর্স নির্দিষ্ট করল ক্যাট, কুটিনিরপাক ন্যাশনাল পার্কের পাশের পর্বতটা গন্তব্য। একশ' গজ এগিয়ে যেতেই, পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল স্টেশন।

তবুও, রিয়ারভিউ মিররে খুঁজে চলেছে ওটাকে ক্যাট। জানে, পিছনে ধাওয়া করে আসবে শত্রুরা। হঠাৎ, একটা ভয় জেঁকে ধরল ওকে।

পেইন্টারের কী হয়েছে আসলে?

সতেরো
৩ জুন, সকাল ৯:১৮ ই.এ.টি.
সুদান মরুভূমি

হায় ঈশ্বর!

অবাক বিস্ময়ে ঘুমন্ত দেবতার পাথুরে বুক পা রাখল গ্রে। বাকিরাও প্রবেশ করেছে পেছন পেছন, হেলমেটের আলোয় দূরতম প্রান্তও নজরে পড়ছে। সবার অবাক বিস্ময় ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, এই অত্যাশ্চর্য স্থাপনা যে কাউকে স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম!

বড় একটা বেসবল স্টেডিয়াম এঁটে যাবে এখানে, বিশাল সব পাঁজরের হাড় খোদাই করা দেয়াল জুড়ে। ছাদ খোদাই করা আঁকা হয়েছে নিখুঁত কশেরুকার আকৃতি। মেরুদণ্ডের আকৃতি দূরতম প্রান্তের দিকে হারিয়ে গিয়েছে, গর্তের শেষে মানব ডায়াফ্রাম পর্যন্ত আছে।

'নিখুঁত বর্ণনা!' বিড়বিড় করে বলল জেন, 'পাঁজরের হাড়ের মাঝে সুতোর মতো অংশটা দেখ।'

'পাঁজরের মধ্যবর্তী মাংসপেশি-ইন্টারকোস্টাল মাসল্।' মন্তব্য করল গ্রে, শারীরবিদ্যা পড়াচ্ছে যেন।

কাঁধ সমান উঁচু দেয়ালে আলো ফেলল ডেরেক, দেয়ালটা রুমের অর্ধেকে এসে শেষ হয়েছে। 'বুকের মেডিস্টার্নাম নির্দেশ করছে ওটা।' আলো আরও উপরে ফেলল ও, ছাদ থেকে ঝুলে আছে মেঘাকৃতির বস্তু। 'থাইমাস গ্লান্ডও আছে দেখছি।'

কিন্তু শরীরের এই নিখুঁত বর্ণনা ওদের মূল আকর্ষণের বিষয়বস্তু নয়।

আরও গভীরে যেতেই, পুরো প্রকোষ্ঠটা নজরে এল। ঠিক মাঝখানে পাথুরে হৃদপিণ্ড, ঝুলে আছে পেশিবহুল রক্তের শিরাতে। মহাধমনীর শাখাটাও নজরে পড়ছে এখান থেকে। চার-প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ঠ হৃদপিণ্ড থেকে শাখা বেরিয়ে মস্তিষ্কে চলে গিয়েছে ধমনী।

পুরো কাঠামোটা বুকের অস্থির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ওজন শূণ্য মনে হয়।

'বাম নিলয়ের কাছে একটা দরজা আছে।' বলল জেন, কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করছে কাঠামোটা। তবে দরজাটা সিল করে দেওয়া হয়েছিল অনেক আগেই। ঠিক কী লুকিয়ে আছে এর ভেতরে?'

প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এগিয়ে গেল সবাই।

ভেতরে আলো ফেলল ডেরেক, 'খালি।'

নিরাশ হলো গ্রে, তবে অবাক হলো না। এই অত্যাশ্চর্য স্থাপনায় আগেই তোলপাড় চালানো হয়েছে। পেছনে ফেলে আসা আবর্জনা থেকে বোঝা যায়-কাজটা সাম্প্রতিক কালের। মেঝেতে টেবিল আর চেয়ার পাতা। দেয়ালের কোনায় বিছানা।

কেউ একজন থাকত ওখানে, বেশ অনেকদিন ধরেই। অবাক হলো জেন, তারপর হলো বিস্মিত। 'হয়তো আমার বাবাকে এখানেই রাখা হয়েছিল।' ফিরে তাকাল সে। 'কিন্তু কেন?'

চারপাশে নজর বোলাল গ্রে, শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করছে। মেঝেতে লম্বা লণ্ঠন পোঁতা, অথচ বাকি জায়গায় বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহৃত হয়েছে। বৈদ্যুতিক তার ধরে এগোল সে, জেনারেটরটা খুঁজে বের করতে চাইছে। একটা টেবিলে ডেস্কটপ কম্পিউটারের ধ্বংসাবশেষ পড়ে থাকতে দেখল। ভাবছে, হার্ডডিস্কটা থেকে কী কোন তথ্য বের করা সম্ভব? কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, জায়গাটা খালি করেছে যারা, ওরা এমন কোন সম্ভাবনা রেখে যাওয়ার মতো বোকা নয়।

কাছেই খালি একটা বুকশেলফ। কল্পনায় বিজ্ঞানীদের ওখানে বই খুঁজতে দেখল গ্রে। একসাথে কাজ করছে সব বিজ্ঞানী এই প্রকোষ্ঠের রহস্য উন্মোচনে।

অথচ এখন...জায়গাটা ফেলে চলে গিয়েছে সবাই।

প্রকোষ্ঠের আরও গভীরে, দেয়ালের দিকে নজর কোয়ালস্কির, 'দেখে যাও সবাই।'

সবাই রওনা দিল ওদিকে।

দুটো হাড়ের মাঝের ফাঁকা জায়গাতে আলো ফেলল বিশালদেহী লোকটা। রুমের দু'পাশেই এমন খুপরি লক্ষ্য করেছে গ্রে। ছোট পাথুরে ইট ছড়িয়ে আছে ওখানে। ভেতরে ছোট একটা কাঠের হাতি, বাঁকানো শুঁড়, হলুদ গজদন্ত। এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে গাছের বাকল, যাতে সত্যিকারের জন্তুর চামড়ার মতো খসখসে দেখায় হাতির অবয়ব।

'কী এটা?' জিজ্ঞাসা করল গ্রে।

ঝুঁকল জেন, 'ক্ষুদ্রকায় পাত্র। পিঠের উপর থেকে একেবারে নিচ পর্যন্ত লম্বা রেখা দেখা যাচ্ছে।'

'সাথে নিয়ে নেই?' জানতে চাইল কোয়ালস্কি, লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হাতিটার দিকে। বিশালদেহী লোকটার হাতি-প্রীতির কথা অজানা নেই গ্রে-র।

ওটার কাছে গেল জেন, কিন্তু বাঁধা দিল ডেরেক। 'জিনিসটা ক্ষতিকর হতে পারে।'

মুখ বিকৃত করল সে, 'আমার বাবা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করে দেখেছেন। বিপদ দেখলে প্লাস্টিকের প্যাকেটে মুড়িয়ে রাখতেন এটাকে। ওই খুলিটার মতো।' অন্য একটা খুপরির দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা। 'আর এটাই তো একমাত্র নয়।'

'তবুও, জীবাণু থাকতে পারে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল জেন, মেনে নিল ওর সতর্কবার্তা।

কিন্তু মুখ বেজার করে রইল কোয়ালস্কি।

'নিচের খুপরিটায় কী আছে?' জানতে চাইল গ্রে, সবার মনোযোগ সরানোর চেষ্টা করছে।

উঁকি দিল ডেরেক, 'পুরাতন কোন কবর মনে হচ্ছে।'

খুপরির ভেতরে তাকাল গ্রে। নজরে পড়ল সংকীর্ণ গভীর এক প্রকোষ্ঠ। অনায়াসে একটা দেহ এঁটে যাবে ওখানে। কিন্তু দেয়াল জুড়ে কালো ছায়া, মেঝেতে ছাই ও পোড়া হাড়ের স্তূপ।

ইদানীং পোড়ানো হয়েছে ওগুলো।

ভাবনার স্বপক্ষে সমর্থন যোগাতেই যেন, কাছেই পড়ে ছিল একটা গ্যাসোলিনের লাল বোতল।

ডেরেকও একই উপসংহার টানল, অন্যান্য কবরস্থানের দিকেও নজর দিল। 'সবগুলো মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলেছে ওরা, ধ্বংস করে দিয়েছে সব।'

সব পারেনি!

উল্কি আঁকা চামড়ার টুকরোটার কথা কল্পনা করল গ্রে। কবরস্থানের কোন মমির গা থেকেই কী ওটা কেটে নিয়েছেন প্রফেসর? সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে?

উঠে দাঁড়াল ডেরেক, 'কিন্তু মৃতদেহগুলো পুড়িয়ে দিল কেন? সংক্রমণের ভয়ে? নাকি সূত্র ধ্বংস করতে?'

রুমের মাঝ বরাবর ফিরে তাকাল জেন, 'হৃদপিণ্ডের ভিত্তিপ্রস্তরের চারপাশে কয়লা দেখেছি, বেশ পুরনো।'

কৌতূহলী গ্রে রওনা দিল ওদিকে।

হৃদপিণ্ডে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিছু থাকবে।

ওখানে পৌঁছে, হামাগুড়ি দিয়ে নিচু দরজাটা পার হলো সে। ভেতরের দেয়াল বেশ পুরনো, এক ঝাঁক প্রজাপতি খোদাই করা পাথরের দেয়ালে। বেশ কমনীয় এবং মেয়েলি সাজে সজ্জিত ভেতরটা।

অদ্ভুত কিছু চোখে পড়ল ওর।

'জেন, দেখে যাও।' ডাকল গ্রে।

ডেরেকের পিছু পিছু ভেতরে প্রবেশ করল জেন। দেয়াল দেখতে গিয়ে পাত্রের ভাঙা টুকরোয় পা দিল মেয়েটা। হাতে উঠিয়ে নিল ওটা, নীল রঙের টুকরোটায় ফেলল আলো।

কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল ডেরেক, 'নীলকান্তমণির ভাঙা টুকরো।'

'গামলার অংশ বলে মনে হচ্ছে।' পুরো কক্ষে নজর বোলাল জেন। 'মিশরীয়রা জাদুকরী বৈশিষ্ট্যের জন্য পাথরটিকে বেশ সম্মান করত।'

দেয়ালের কারুকার্যের দিকে নজর ডেরেকের, জেন আলো ফেলল ওখানে।

'বাহ! বেশ সুন্দর . বিড়বিড় করে বলল মেয়েটা। 'প্রজাপতি আমার সবসময়ই পছন্দ। মিশরীয়রা রূপান্তরের প্রতীক হিসেবে প্রজাপতির ছবি ব্যবহার করে। শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতির রূপান্তর।'

ফাঁকা জায়গাটা কী হিসেবে ব্যবহৃত হতো তা ভাবছে গ্রে। ছেঁড়া সুতোগুলো জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে।

জাদু এবং রূপান্তর।

অনুভব পারল, গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু সুতো জোড়া দেওয়ার কাজটা ওর নয়। একটা নির্দিষ্ট চিত্রতে আলো ফেলল সে। এই চিত্রটার কারণেই জেনকে ভেতরে আসতে বলেছে গ্রে।

মেয়েটা অবশেষে দেখল ওটা, বিস্ময়ে এক পা এগিয়ে এল।

এক প্রজাপতির চারপাশে দাগ দেওয়া, ভেতরে লেখা জেনের নাম!

'অবশ্যই বাবার কাজ।' বিড়বিড় করে বলল ও। হাত দিয়ে স্পর্শ করল ওটা, অতীতের সাথে মেলানোর চেষ্টা। কিন্তু দ্বিধা পেয়ে বসল ওকে, 'এই কাজ বাবা কেন করতে যাবেন?'

উত্তরটা দিতে চেষ্টা করল ডেরেক, 'যাযাবরের যে দলটা তোমার পিতাকে পেয়েছিল, ওরা বলেছে, তিনি বারবার তোমার নাম উচ্চারণ করছিলেন।' জেনের কাঁধে হাত রাখল সে। 'তিনি আশা করেছিলেন, যাতে এটা খুঁজে পাও তুমি।

এক পা পিছিয়ে গেল মেয়েটা, তাকাল ডেরেকের দিকে, এরপর গ্রে-র দিকে গেল নজর। 'আমি বুঝতে পারছি না।'

'তোমার বাবা ভেবেছিলেন, তুমি পারবে এই সমস্যার সমাধান করতে।' বলল গ্রে। 'মানে, যথেষ্ট সময় পেলে আরকি।'

অবাক হয়ে ভাবল গ্রে, এই একই কারণে শত্রুরা জেনকে খুঁজছে না তো। প্রফেসর যদি কোন সূত্র ফেলে যান, তবে জেন ওটা জানে বলেই হয়তো বিশ্বাস ওদের। রহস্যের জট খোলার জন্য মেয়েটাকে চাই ওদের।

তবে জেনকে বেশ ভীত এবং বিভ্রান্ত বলেই মনে হচ্ছে।

'খোঁজ চালিয়ে যাওয়া উচিত আমাদের।' বলল গ্রে। 'আরও সূত্র থাকতে পারে।'

রুম থেকে বেরিয়ে গেল সবাই, কিন্তু আশা হারাল না গ্রে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে ওকে, এখানেই লুকিয়ে আছে গুরুত্বপূর্ণ কোন সূত্র। সময়ের সাথে সাথে চাপ বাড়ছে যেন ওর উপর।

অনেকক্ষণ ধরে এখানে আছি আমরা।

সকাল ৯:৩৮

একমাত্র সতর্কবার্তা ছিল গড়িয়ে পড়া পাথর।

পাহাড়ের চূড়া থেকে ওর বাঁ দিকে গড়িয়ে পড়েছে পাথর। পাত্তা দিল না সেইচান, সুজুকি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাহাড়ের নিচে। চারপাশের পাহাড়ে লুকান রয়েছে গুহামুখটা, ওদিকেই রওনা দিল সে। আহমাদের মোটর সাইকেল নিয়ে এসেছে, ঘুরছে পুরো উপত্যকা জুড়ে। প্রায় চুয়াল্লিশ মিনিট হলো, ইউনিমগে রেখে এসেছে আহমাদ এবং কুকুরটাকে। বলে এসেছে, কোন ঝামেলা দেখলেই সাথে সাথে যেন হর্ন বাজায়। সাথে একটা রেডিয়ো এবং আরও কিছু নির্দেশনা দিয়ে এসেছে সেইচান।

ওদেরকে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা, নিশ্চিত জানে না সে। তবুও ধরে নিল পিছনে ধাওয়া করে আসছে শত্রুরা। সে মোতাবেকই প্রস্তুতি নিয়েছে ও, শত্রুদের প্রধান টার্গেটে পরিণত করেছে নিজেকে   চাইছে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। ছেলেটাকে একা ট্রাকে রেখে এসেছে, যাতে যারা নজর রাখছে তারা ততটা গুরুত্ব না দেয়। এই সুযোগে সুবিধা আদায় করে নিতে চাইছে। এতক্ষণে সবাই পৌঁছে গিয়েছে গভীরে।

বিশেষ করে জেন ম্যাককেব।

উপলব্ধি করেছে সেইচান, এই যুবতীই শত্রুদের মূল টার্গেট। শত্রুরা দেরি করবে পরিকল্পনা ঠিক করার জন্য। বাড়তি সময়টুকু তাই কাজে লাগাচ্ছে সে। আহমাদের মোটর সাইকেলটা পরীক্ষা করছে, চেষ্টা করছে বাহনটার সাথে মানিয়ে নিতে। বালুর উপর চলার জন্য বেশ ভাল বাইকটা, তবে পাথরের উপর চলার জন্য মোটামুটি। সন্দেহজনক পাহাড়টার গা ঘেঁসে চলছে সে, যাতে শত্রুদের নজর এড়িয়ে কিছুটা হলেও সুবিধাজনক অবস্থান নিতে পারে।

অন্য কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি ওর মাঝে, এমনকি হৃদপিণ্ডের নিয়মিত ছন্দে আসেনি কোন পরিবর্তন। বরং অনুসরণের প্রমাণ দেখে খুশি হয়েছে সে। অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহ টের পাচ্ছে সেইচান।

নজর আরও তীক্ষ্ণ হলো ওর।

শত্রুর চাল সহজেই অনুমেয়, অপেক্ষা করে খোলা জায়গায় অ্যামবুশ করাই ওদের লক্ষ্য। যেহেতু ওরা জেনকে জীবিত চায়।

কিন্তু তা হতে দিবে না সে।

স্কার্ফে ঢেকে রেখেছে সেইচান নিজের মুখ, রেডিয়োতে নির্দেশ দিল, 'আহমাদ, তৈরি হও।'

বাহনটার গতি একই রাখল ও।

ট্রাকের ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেল, বদ্ধ উপত্যকায় গর্জন করছে। অনেকক্ষণ আগেই আহমাদকে জিজ্ঞাসা করেছিল-গাড়ি চালাতে পারে নাকি ছেলেটা। প্রশ্নটাকে পুরুষত্বের অপমান বলে ধরে নিয়েছিল আহমাদ। যাই হোক, প্রমাণস্বরূপ পুরো উপত্যকায় দুই চক্কর দিয়েছে ছেলেটা। আশা করছে সেইচান, শত্রুরা ছেলেটাকে গাড়ি চালাতে দেখলে ভাববে, বিরক্তি কাটাতে কাজটা করছে ও। আবার পুরো উপত্যকার ভিতরে চক্কর মারবে।

কিন্তু আসল ঘটনাটা তো ভিন্ন!

উপত্যকায় প্রবেশ করছে সেইচান, গাড়ি আসছে সরাসরি ওর দিকে। হাত নাড়ল সে, গাড়ির গতিটা আরও বাড়ল শুধু। মোটর সাইকেলটা সর্বোচ্চ গতিতে নিয়ে গেল ও। গর্জে উঠেছে ইঞ্জিন, ধুলো উড়াল চাকা। খেপা ষাঁড়ের মতো গাড়ির বাম্পার লক্ষ্য করে ছুটছে ওটা।

উইন্ডশিল্ডের পেছনে আহমাদের চিন্তিত চেহারা নজরে পড়ল ওর। কিন্তু গতি কমাল না ছেলেটা। ঠিক একেবারে শেষ মুহূর্তে সুজুকি সরে গেল ইউনিমগের সামনে থেকে। সেইচান চায়, ট্র্যাক এবং ছেলেটা এখান থেকে বেরিয়ে যাক। একমাত্র বাহন আর শিশু, দুটোই রক্ষা করতে চায় ও।

ট্রাক সরে যেতেই, বাইকটা নিয়ে চক্কর কাটল সেইচান। সেই সাথে উরুতে বাঁধা হোলস্টার থেকে বের করে নিল পিস্তল। পাথর গড়িয়ে পড়েছিল যেদিক থেকে, ওদিকে নজর বোলাল সে। কয়েকটা ছায়া নজরে পড়ল শুধু। সাথে সাথে গুলি ছুঁড়ল সে। শত্রুর গায়ে লাগানোর জন্য নয়, বরং বাড়তি কিছু সময় পেতে কাজটা করেছে সেইচান। ওর বিশ্বাস, বাচ্চা ছেলেটার পিছনে ছুটবে না শত্রুরা। তাই হলো, ঊষর মরুতে চলে গেল ইউনিমগ। ওদের নজর থাকবে জেনের উপর।

তাই, যেন হয়।

শত্রুর নজর কাড়তে, উপত্যকার অন্ধকার ছায়ার মাঝ দিয়ে মোটর সাইকেল চালাল সে। আবারও একই দিকে চালাল গুলি। অবশেষে সাড়া এল, পেছনে বন্দুকের গুলি মাথা কুটল বালিতে।

বাহ!

নিজের গতি অক্ষুণ্ন রাখল সেইচান, দূরে থাকার চেষ্টা করছে। স্নাইপারের অবস্থান ধারণা করল সে, কয়েক পশলা বুলেট ছুঁড়ে দিল ওদিকে। আঁকাবাঁকা পাথুরে পথ দিয়ে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ছুটে চলছে সেইচান, হৃদপিণ্ডের গতি মিশে গিয়েছে বাইকের গতির সাথে। মুখে এক চিলতে বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছে ওর। সন্তুষ্ট সে; এতক্ষণে আহমাদ নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে যাওয়ার কথা।

মোটর সাইকেলটা ঘুরিয়ে নিল সেইচান, সোজা ছুটল গুহামুখটার দিকে। একটু সামনেই দেখা যাচ্ছে ওটা, কিন্তু গতি কমাল না সে। উল্টো হেডলাইটের উপর ঝুঁকে পড়ল। পূর্ণ গতিতে গুহামুখ দিয়ে ভেতরে হারিয়ে গেল সুজুকি।

লড়াইটাকে মাটির তলায় টেনে আনার সময় হয়েছে!

সকাল ৯:৫৩

ঘুমন্ত দেবতার বক্ষপিঞ্জর থেকে বের হওয়ার একমাত্র রাস্তায় সবার সাথে দাঁড়িয়ে আছে জেন। হৃদপিণ্ডের দিকে তাকাল সে, অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে ওটা। পিতার ফেলে যাওয়া বার্তার কথা ভাবছে এখনও মেয়েটা। কোন সূত্র নেই এর, নেই কোন অর্থ! পরবর্তী গন্তব্যের দিকে ফিরল ও।

দুই ফিট পুরু পাথুরে ডায়াফ্রাম বুকের শেষে, আলো ফেলল সে ওদিকে। উপর থেকে ঝুলতে থাকা পাথরখণ্ড নজরে পড়ছে। সুপ্রাচীন হাত এবং যন্ত্রপাতির বদৌলতে মসৃণ-চকচকে হয়ে উঠেছে ওটার উপরিভাগ।

'যকৃতের খণ্ড।' বলল ডেরেক, ডান হাতে নিজের বুক ঘষছে সে।

পেটের গহ্বরের ভেতর নিকষ কালো অন্ধকার, হেলমেটের আলো সেই অন্ধকার দূর করতে পারছে না।

অসুস্থ লাগছে জেনের, কিন্তু তা এই শারীরবিদ্যার নিদর্শনের জন্য নয় . বরং ভয়ে। ভয় পাচ্ছে, পাছে ওর বাবার ভরসা রাখতে ব্যর্থ হয়! একটা বার্তা রেখে গিয়েছেন তিনি, সেই বার্তাটা পৌঁছে দিতে গিয়ে মারা গিয়েছেন।

অথচ, আমি বার্তাটার অর্থ বুঝতে পারছি না!

ওর পাশে এসে দাঁড়াল ডেরেক, ওর দুর্দশা যেন অনুধাবন করতে পেরেছে। 'হয়তো আমাদের একটু বিশ্রাম '

ধমকে উঠল গ্রে, 'চুপ।'

শুনতে পেল জেনও, ইঞ্জিনের শব্দ। বাড়ছে।

ঘুরে দাঁড়াল সবাই, দৈত্যাকার অবয়বটার গলার কাছে আলো দেখা যাচ্ছে। কাছে আসছে আলোটা, মেঝেতে পিছলে যাচ্ছে চাকা, কমে যাচ্ছে গতি।

আহমাদের মোটর সাইকেল!

মাথা নিচু করে আছে চালক।

'সেইচান!' নাম ধরে ডাকল গ্রে।

দলটাকে আগেই দেখেছে মেয়েটা। সরাসরি এদিকে চলে এল সে, তীক্ষ্ণ ব্রেক কষল। কিন্তু নিজের সিট থেকে একচুলও নড়ল না। মাথায় হেলমেট নেই ওর, তবে নিরাপত্তামূলক মুখোশ পরে আছে। চারপাশে নজর বোলাল সেইচান, কিন্তু মুখে বলল, 'বন্ধুরা চলে এসেছে।'

'আহমাদ কোথায়?' জানতে চাইল গ্রে।

মোটর সাইকেলে বসেই পিঠ থেকে ব্যাগ খুলল সে, 'নিরাপদে আছে . . .অন্তত এখন পর্যন্ত। ট্রাকসহ পাঠিয়ে দিয়েছি।' ব্যাগটা ছুড়ে দিল গ্রে-র দিকে, লুফে নিল সিগমা কমান্ডার। 'জিনিসপত্র সব আছে এটায়। বাড়তি ম্যাগাজিন, ফ্ল্যাশব্যাং, স্মোক বোম-সব। কোয়ালস্কির পিযারও ভেতরে। শীঘ্রি নিচে নেমে এসে আমাদের শেষ করে দিতে চাইবে শত্রুরা।'

জেনের দিকে ফিরল সে, মেয়েটার মনের কথা পড়তে পারছে।

ওরা আমার জন্য এসেছে।

বাবার বার্তাটা আবার কল্পনা করার চেষ্টা করল ও।

জেনের হাত নিজের হাতে তুলে নিল ডেরেক, বুঝতে পারছে ওর মনের খবর। 'কী করব আমরা?'

একই প্রশ্ন গ্রে-রও, 'বের হওয়ার অন্য কোন রাস্তা আছে?'

শ্রাগ করল ডেরেক, 'আমি ঠিক জানি না। থাকতে পারে।'

ছেলেটার হাত শক্ত করে চেপে ধরল জেন, 'ঠিক বলেছে সে। এমন পবিত্র স্থাপনায় গুপ্ত পথ রাখতেন প্রাচীন লোকেরা।'

পুরো কাঠামোর কথা কল্পনা করল ডেরেক, 'মুখ দিয়ে প্রবেশ করেছি আমরা। এরা যদি শারীরবিদ্যা মেনে দেবতাকে বানিয়ে থাকে, তাহলে

গুঙিয়ে উঠল কোয়ালস্কি, 'মজা করো না তো।'

বিশালদেহী লোকটার কাঁধে হাত রাখল গ্রে। 'আশা করছি, ডেরেকের ধারণা সত্য। ওটাই আমাদের বের হওয়ার একমাত্র রাস্তা।'

আরও গভীরে প্রবেশ করল ওরা, মোটর সাইকেলে করে ওদের অনুসরণ করল সেইচান।

যকৃত শেষে, উপরে বড় একটা গোলক ঝুলতে দেখল সবাই। বিড়বিড় করে বলল ডেরেক, 'পিত্তথলি।' এত বিপদের মাঝেও কথার সুরে বিস্ময়ের আভাস।

এখনও লোকটার হাত ধরে রেখেছে জেন, ধাতস্থ হতে চেষ্টা করছে। পেটের আবরণ ঝিল্লির কাছে চলে এসেছে ওরা, হেলমেট এবং মোটরসাইকেলের হেডলাইটের মিলিত আলোয় নজরে পড়ল অবাক এক বিস্ময়!

দানবীয় আকারের একটা পাকস্থলী! একটা প্লীহাও আছে ওখানে। দেবতার নাড়িভুঁড়ির নিখুঁত অবয়বও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আরেকটু গভীরে। ভাঁজ করা ওমেন্টাম, রক্তবাহী শিরা, অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-সবগুলোই এই তলে আছে।

আরও উপরে, কশেরুকার অবয়ব ফুটে উঠেছে পাথুরে ছাদে, অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে আরও গভীরে। দেয়ালের দু'পাশ থেকে ঝুলে আছে বড় দুটো কিডনি। দেখে মনে হয়, না জানি কখন ধ্বসে পড়ে ওগুলো!

'ওই যে, ওখানে।' বলল সেইচান।

মোটর সাইকেলে করে গহ্বরের শেষ প্রান্তে পৌছে গেল সে।

একটা দরজা

আগ বাড়াল গ্রে, 'গ্রাসনালির ভেতরের অবস্থা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি।' কাঁধ নাড়ল সে। 'আরেকটি পথ সামনে চলে গিয়েছে।'

ভেতরে উঁকি দিল ডেরেক, 'অন্ত্রের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে পথ। হয়তো শেষ হয়েছে বের হওয়ার রাস্তায়। এই পথে পালানো হয়তো অসম্মানজনক হবে, কিন্তু আর কোন উপায়ও তো হাতে নেই।'

সোজা হলো গ্রে, এগিয়ে এল সেইচান। 'আহমাদের কাছে রেডিয়ো এবং জিপিএস আছে। বলে দিয়েছি, বের হয়ে আমরা রেডিয়ো করব ওকে।' জেনের দিকে ফিরে তাকাল সে, 'কিন্তু আমরা জানি, শত্রুদের মূল টার্গেট কে। অ্যাশওয়েলেই বোঝা গিয়েছে।'

না বলা শব্দগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করল গ্রে। 'তাহলে জেনকে নিয়ে বের হয়ে যাওয়া উচিত তোমার।' দলের বাকি সদস্যদের দিকে ফিরে তাকাল সে। 'কিন্তু তোমাদের বের হওয়ার সুযোগ করে দিতে শত্রুদের মনোযোগ অন্যদিকে সরাতে হবে। এই অবয়বটার ভেতর আটকে রাখতে হবে ওদের। যতক্ষণ না তোমরা বের হয়ে যেতে পারো

'ইউনিমগে চড়ে খার্তুমের দিকে রওনা দেবো আমরা। শত্রুরা টের পেলেই ধাওয়া করবে আমাদের, সরে যাওয়ার সময় পাবে তোমরা।'

'যাও তাহলে,' কঠোর স্বরে বলল সে, 'জিততে আমাদের হবেই।'

মনে হলো জেনের, ওকে সবাই বলের এক পাশ থেকে অন্য পাশে ছুঁড়ে দিচ্ছে। যেন তার কোন মতামতই থাকতে পারে না! ওদের কথা ডেরেকের কানেও

এসেছে। 'ঠিক বলেছে ওরা।' বলল যুবক। 'হ্যারল্ড তোমার জন্য বার্তা রেখে গিয়েছেন। তুমি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কোন ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।'

ডেরেকের চোখের নজর বুঝতে ভুল হয়নি জেনের। পৃথিবী রক্ষার চেয়েও ওকে রক্ষা করতে অধিক বদ্ধপরিকর সে।

'কিন্তু আমি জানি না বাবা-'

ওর হাতে মৃদু চাপ দিল ছেলেটা, 'জানবে।'

পাকস্থলীর শেষের দরজাটার দিকে জেনের নজর, 'কিন্তু আমাদের যদি ভুল হয়? ওদিকে যদি বের হওয়ার রাস্তা না থাকে?'

ভরসা দিল কোয়ালস্কি, 'অবশ্যই আছে, আমি নিশ্চিত।'

'কীভাবে এত নিশ্চিত হচ্ছ?'

'একটা বইয়ে পড়েছি।'

উত্তর শুনে গ্রে পর্যন্ত ধাঁধায় পড়ে গেল, 'কোন বই?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বিশালদেহী লোকটা, 'জীববিজ্ঞান বইয়ে।' গহ্বরের দিকে আঙুল তুলল সে, 'যে খায়, সে ত্যাগও করে।'

আর্তনাদ করে উঠল গ্রে।

হাসল জেন, মনের দুশ্চিন্তা কেটে গিয়েছে।

'ঠিকই বলেছে কোয়ালস্কি।' বলল ডেরেক।

মাথা ঝাঁকিয়ে পাকস্থলীর ভেতরের রাস্তা দিয়ে চলল সেইচান, মোটর সাইকেলে ঠেলে নিয়ে চলেছে। মরুভূমিতে পৌঁছানোর পর বেশ কাজে আসবে এই বাহনটা।

উপায়ন্তর না পেয়ে, ওকে অনুসরণ করল জেন। কিন্তু ডেরেক আটকে দিল তাকে।

'সাবধানে থেকো।' মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে বলল সে। এক মুহূর্তের মধ্যে মনে হলো চুমু খেতে যাচ্ছে ওরা। কিন্তু মুখে মুখোশ থাকায় সম্ভব হলো না। দু'জন দু'জনকে ছেড়ে দিল অবশেষে। বলল জেন, 'শীঘ্রি দেখা হবে।'

ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা, রওনা দিল সেইচানকে লক্ষ্য করে। পাকস্থলীর ভেতরে গ্যাস্ট্রিক প্রকোষ্ঠ, দেয়ালের মধ্যে কুঁচকে আছে কিছু আকৃতি। ভালো মতো লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারল, কুঁচকানো অংশটুকু মুখ। হাজার হাজার অভিব্যক্তিহীন চেহারা তাকিয়ে আছে ওর দিকে!

দৃশ্যটা এড়িয়ে গেল সে, যদিও গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল অজানা ভয়ে।

মোটর সাইকেলের ইঞ্জিন গর্জে উঠল, আকস্মিক শব্দে লাফিয়ে উঠল জেন। সেইচান বসে আছে ওটার উপর, পিছনের সিটে জেনও উঠে বসতে ইশারা করল সে।

'কী করছ-?'

'বসো এখানে।'

বাধ্য মেয়ের মতো মোটর সাইকেলে চড়ে বসল জেন।

'শক্ত করে ধরো।'

মেয়েটার কোমর সবেমাত্র জড়িয়ে ধরেছে জেন, সাথে সাথে ছুট লাগাল মোটর সাইকেল। আঁকাবাঁকা পথ সামনে, হেডলাইটের আলোতে রোলার কোস্টারের রাস্তা মনে হচ্ছে।

মাথা নিচু করে বসে আছে জেন।

কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই সেইচানের, বরং মনে হলো হাসছে সে। অবলীলায় এই কঠিন পথ ধরে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাহনটা।

আরও শক্ত করে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরল জেন, পাছে পড়ে না যায়।

হায় ঈশ্বর

সকাল ১০:০৮

উঁচু পাহাড় থেকে নজর রাখছে ভালিয়া।

দূর থেকে ছায়াঘেরা উপত্যকার দিকে তাকিয়ে আছে সে, চোখের সামনেই ক্রুগারের দলের শেষ মানুষটা অদৃশ্য হয়ে গেল গুহায়। ওদের সাথে যেতে পারত সে, কিন্তু পাহারায় থাকা মেয়েটাকে বিশ্বাস নেই ওর।

সেইচান।

বেশি কিছুক্ষণ আগে উপত্যকার আশপাশে মেয়েটাকে মোটর সাইকেল চালিয়ে নজরদারি করতে দেখেছে সে। বোঝার চেষ্টা করছিল ও, ঠিক কী চায় সেইচান? সন্দেহ করছে, শুধু পাহারা-ই দেয়নি, প্রাক্তন এই গিল্ড আততায়ী ওদের আটকানোর কোন ব্যবস্থাও করে রেখেছে।

ওদের উপস্থিতি সন্দেহ করেছে হয়তো মেয়েটা, অথবা হয়তো অগ্রিম পরিকল্পনা করেছে। সে জানে, ভালিয়ার দল ওদের পিছনে লেগেছে।

তাই পদক্ষেপ নিয়ে বাধ্য করেছে ওকে। ক্রুগারদের ভেতরে পাঠিয়ে দিলেও, পুরো মরুভূমি অরক্ষিত রাখার মতো বোকা নয় ভালিয়া। বিশ্বাসঘাতকিনীর চালে পড়তে আগ্রহী নয় সে।

নিজের কাজ সহজ করতে দ্বিতীয় ইউ.এ.ভি. ড্রোনটা উড়িয়ে দিল সে। র‍্যাভেনের সাহায্যে নজর রাখবে আশেপাশের অঞ্চলে। চার ফুট লম্বা পাখা ব্যবহার করে যন্ত্রটা উড়ে গেল উপত্যকার উপর দিকে। আরও ওপরে উঠল ওটা, পুরো ফাঁকা জায়গাটা ঘিরে চক্কর দিতে লাগল।

ড্রোনটাই হবে ওর চোখ, নজর রাখতে পারবে দূর থেকে দূরান্তরে।

হাতের মনিটরে দুটো দৃশ্য ভেসে উঠেছে। প্রথমটায়, দেখা যাচ্ছে, মরুর বুক চিরে ছুটে চলেছে একটা ট্র্যাক।

প্রথম র‍্যাভেনটা অনেকক্ষণ আগেই উড়িয়ে দিয়েছিল সে। ইউনিমগের উপর নজর রাখছে ওটা। মোটর সাইকেলে করে ক্রুগারের কোন লোককে পাঠাতে পারত ওটার পিছনে, কিন্তু দলের শক্তি কমিয়ে দিতে চায়নি বলে আর পাঠায়নি।

মূল টার্গেটি হলো জেন ম্যাককেব।

পাশাপাশি, র‍্যাভেন বিশেষ তরঙ্গে ঘিরে রেখেছে ট্র্যাকটাকে। যেকোন ট্রান্সমিশন আটকে দিবে ওটা। ইউনিমগ থেকে বাইরে যাবে না কোন সিগন্যাল, এমনকি বাইরে থেকেও আসবে না। সাহায্য খুঁজে পেতে কমসে কম এক ঘণ্টা সময় লাগবে ওর।

পাহাড়ের চূড়ায় শুয়ে পড়ল ভালিয়া, নজর রাখছে উপত্যকার দিকে।

পাছে ক্রুগারের লোক ব্যর্থ হয়, টার্গেটিরা বেরিয়ে যায় গুহা থেকে।

হাতের রাইফেল তুলে নিল সে।

তোমার জন্য অপেক্ষা করছি আমি।

আঠারো
৩ জুন, সকাল ৪:০৯ ই.ডি.টি.
এলেসমেয়ার দ্বীপ, কানাডা

'আশা করি, স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন আপনি।' বলল সাইমন হার্টনেল।

তাকাল পেইন্টার, হাতে হাতকড়া, পা স্টিলের চেয়ারে বাঁধা। ওকে নিয়ে কোন প্রকার ঝুঁকি নিতে আগ্রহী নয় শত্রুরা। অস্ত্রের মুখে এই ছোট লাইব্রেরিতে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে। জায়গাটা হার্টনেলের ব্যক্তিগত বাসস্থানের ভেতরে। চেয়ারের সাথে পেইন্টারকে বেঁধে ফেলার পর, বাইরে চলে গিয়েছে সব গার্ড। কিন্তু পুরোটা সময় একজন ছিল পুরোপুরি অনুপস্থিত।

অ্যান্টন।

কোথায় গেল লোকটা?

'ক্যাথরিন ব্রায়ান্ট কোথায়?' জানতে চাইল পেইন্টার।

'ভালো প্রশ্ন। শেষ ওকে দেখা গিয়েছে স্নো-ক্যাটে, ঝড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।'

খবরটা শুনে স্বস্তি পেল পেইন্টার।

যাক, পালাতে পেরেছে তাহলে।

'বেশ ক্ষতি করেছে আমাদের।' বলল হার্টনেল, 'হয়তো ক্যাথরিন নিজেও জানে না, কতটুকু!'

ক্যাটের বিশেষত্বই এটা।

'কিন্তু এর জন্য ভুগতে হবে ওর।' বলল হার্টনেল, ঘুরে এসে টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে, ছাত্রকে বকাঝকা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে স্কুলের শিক্ষক। 'আপনি এবং আমি, ভুল পথে চলে এসেছি। আপনি বিজ্ঞানপ্রেমী, বিজ্ঞানের কদর বুঝেন। আপনার সামনে আরও সৎ হওয়া উচিত ছিল আমার।'

কথা শুনতে শুনতে রুমের চারপাশে নজর বোলাচ্ছে পেইন্টার। একপাশের দেয়ালে কম্পিউটার স্টেশন, সারি সারি মনিটর। কিন্তু বাকি দেয়ালগুলোতে মেহগনি কাঠের শেলফ বানানো, সারি সারি বই সাজিয়ে রাখা হয়েছে কাঠের তাকে। সেই সাথে জাদুঘরের মতো নানা জিনিসপত্রও সাজানো। লম্বা মাস্তুলের একজোড়া জাহাজে আটকে গেল ওর নজর। উনিশ শতকের জাহাজ দুটোর নিখুঁত কাঠের মডেল।

ওর মনোযোগ নজর এড়াল না হার্টনেলের, 'এইচ.এ.এস. টেরর আর ইরেবাস। প্রাক্তন যুদ্ধজাহাজ, যা পরবর্তীতে এক্সপ্লোরেশন শিপে পরিবর্তিত হয়।'

নামগুলো আগেই জানা আছে পেইন্টারের, সেই সাথে জাহাজ দুটোর মর্মান্তিক ইতিহাসও। 'যতদূর মনে পড়ে, সুমেরুতে হারিয়ে গিয়েছিল জাহাজগুলো। উত্তর-পশ্চিম দিকের প্যাসেজটা খুঁজছিল ওরা।'

'হ্যাঁ। ১৮৯৬ সালে, কিং উইলিয়াম দ্বীপের উপকূলে বরফে আটকা পড়ে জাহাজ দুটো। এখান থেকে কাছেই জায়গাটা। বঞ্চনা, পাগলামি এবং মৃত্যুর ইতিহাস লেখা হয়েছে এদের ক্রুদের নিয়ে। সবাই মারা গিয়েছে, আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ও ছিল ওদের মধ্যে। জন হার্টনেল, মারা যাবার জন্যই যেন জাহাজটা বেছে নিয়েছিলেন তিনি।' দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে, 'সম্প্রতি ওখানে গিয়েছি আমি। সেই উদ্যমী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।'

'কিছু কিছু মানুষ অনেকদূর এগিয়ে যায়, মৃত্যুর স্বাদ ত্বরান্বিত করতে।'

পেইন্টারের বাঁকা কথায় কান দিল না সে, 'জনের ব্যাপারটা আলাদা। উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে মরেননি তিনি। বরফের ঠাণ্ডায় মমি হয়ে যাওয়া মৃতদেহটা পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে-সীসার বিষক্রিয়া মৃত্যু হয়েছে তার। ধাতব ক্যান থেকে আক্রান্ত হয়েছিল জাহাজের সবাই, উন্মাদে পরিণত হয়েছিল একেকজন।' নড করল সে জাহাজের দিকে। 'এই কাহিনিতেও লুকিয়ে আছে সতর্কবাণী, কিন্তু আপনি যেভাবে ভাবছেন ওভাবে নয়।'

'তবে কীভাবে?'

'আপনি কী জানেন, উচ্চহারে সুমেরুর বরফ গলার ফলে ওই প্যাসেজ ধরে এখন চলাচল করে বিলাসবহুল ক্রুজ শিপ? ওই একই রাস্তা ধরে, যেখান দিয়ে গিয়েছিল টেরর আর ইরেবাস।' ভ্রূকুটি করল ও। 'দূরদূরান্ত থেকে পৃথিবীর চূড়া দেখতে আসে ওরা, কিন্তু ওটা যে দুনিয়ার অন্তিম পরিণতির আভাস।'

'সেসব তো আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য।' সন্দেহের সুরে বলল পেইন্টার, লোকটাকে কথা বলাতে চাইছে। জানে, ক্লাইফ এনার্জির সি.ই.ও.-এর পছন্দের বিষয় এটি, ঠিকঠাক কথা বলাতে পারলে অনেককিছুই জানা যাবে। 'যাই হোক, খুব বেশি নাটুকে হয়ে গেল না ব্যাপারটা? অল্পতেই তো এত আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।'

'আছে, কারণ অবশ্যই আছে।' সোজা হয়ে দাঁড়াল হার্টনেল, 'সবারই উচিত আতঙ্কিত হওয়া। নজিরবিহীন দ্রুততায় বাড়ছে পৃথিবীর উষ্ণতা। নাসার গবেষণায় উঠে এসেছে, বরফ গলার গতি এতটাই বেড়েছে, গত হাজার বছরেও দেখা যায়নি এমন। মাসের পর মাস, বেড়েই চলছে এই গতি, গড় তাপমাত্রা রেকর্ড ভাঙছে বারবার। কুয়েতে সর্বকালের সব তাপমাত্রার রেকর্ড ভেঙে ১২৯ ডিগ্রিতে ঠেকেছে। শীঘ্রি পৃথিবীর বেশ কয়েকটি জায়গা গরমের কারণে বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে

পড়বে। বেড়েছে ঝড়ের প্রচণ্ডতা, গত পাঁচশ' বছরেও এত বিধ্বংসী ক্ষমতার ঝড় চোখে দেখেনি মানুষ।'

'আবহাওয়া সম্পর্কে আগে থেকে বলা যায় না কিছু।' শ্রাগ করে বলল পেইন্টার।

কথা বলার রোগে ধরেছে যেন হার্টনেলকে, 'এমন নজির একটা দুটো হলে কথা ছিল। কিন্তু শুধু গত বছরই এমন আটটি ভয়ঙ্কর ঝড় আঘাত হেনেছে আমেরিকায়। ভাবা যায়!' ডেস্কে ঘুষি মারল সে। 'আবার বলবেন না যে চিন্তার কিছুই নেই-এসব প্রাকৃতিক কারণে ঘটছে! এন.ও.এ.এ. শেষ কবে বেড়েছে পৃথিবীর তাপমাত্রা তা বের করেছে, তখনই শুরু হয়েছিল বরফ যুগের। গত শতাব্দীর চেয়ে দশগুণ বেশি বেড়েছে তাপমাত্রা, সর্বোচ্চ বিশগুণ বাড়ারও নজির রয়েছে। এমন চলতে থাকলে, পৃথিবীর অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়বে। আপনিই বলুন, এরপরও আতঙ্কিত হবে না?'

ব্যাঙ্গ করে বলল পেইন্টার, 'তবে কী করা যেতে পারে এখন? যতদূর জানলাম, বিপদসীমা অতিক্রম করে ফেলেছি আমরা।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল হার্টনেল, 'বিপর্যয় রুখতে এগিয়ে আসতে হবে কাউকে। এমন কেউ, যার আছে অভাবনীয় কল্পনাশক্তি, এবং বড় ঝুঁকি সামলে নেওয়ার মতো সদিচ্ছা। ম্যানহাটনের সেই প্রজেক্টের মতো দৃঢ় অঙ্গীকার, যা নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম ছিল খোদ বিশ্ব-পরিচালকরাও। সেই তার থাকবে যেকোন মূল্যে গোপন কথা গোপন রাখার দক্ষতাও।'

'সহজ ভাষায়, তুমি।' চোখ ছোট ছোট করে শত্রুকে বলল পেইন্টার। 'অরোরা স্টেশনে ঠিক কী করছ, বলো তো?'

কথা বলার নেশায় পেয়ে বসেছে হার্টনেলকে, 'বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ইতি টানব আমি, এমন এক শক্তির উৎস উপহার দিব পৃথিবীকে যা কখনওই নিঃশেষ হবে না।'

'কীভাবে?'

কাঁচের বক্সের ভেতরে বাঁধাই করা একটা নোটবুক হাতে ঘুরে দাঁড়াল হার্টনেল।

'এক বন্ধুর সাহায্যে।'

সকাল ৪:১৭

রাগে কাঁপছে সাইমনের গা, তাই কয়েকবারের চেষ্টায় অবশেষে কাচের বক্স খুলতে সমর্থ হলো সে। যত্নের সাথে নোটবুকটা বের করল, ঘুরে তাকাল ডারপা কর্মকর্তার দিকে।

সন্দেহ হচ্ছে ওর, লোকটা কথা বলিয়ে নিচ্ছে তাকে দিয়ে। কিন্তু ওসব থোড়াই কেয়ার করে সে।

'এটা নিকোলা টেসলার ব্যক্তিগত জার্নাল। বিজ্ঞানীর মৃত্যুর পর বাজেয়াপ্ত করেছিল আমেরিকার সরকার। কিন্তু ভেতরে লেখা কথাগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে।'

'তুমি নিশ্চয়ই পেরেছ?'

হাসল সে, বইটি রেখে দিতেই পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। 'ত্রিশ বছর লেগেছে আমার। তবুও সবকিছু জানতে পারিনি এখনও। লোকটা প্রকৃতপক্ষেই একজন রহস্যময় ব্যক্তিত্ব। নিজ থেকে যখন রহস্যময় হতে চান, তখন হয়ে উঠেন দুর্বোধ্য।' আবার নিজের চেয়ারে চলে গেল সাইমন, 'ব্যবহারিক প্রযুক্তির চেয়ে কল্পনায় অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এজন্যই টমাস এডিসনের নাম জানে সবাই, অথচ টেসলার তেমন পরিচিতি নেই। কারণ এডিসন তার সময়ের মানুষ ছিলেন, কিন্তু টেসলা? তিনি সময়ের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন বহুগুণ।'

'অনুমান করতে দাও। সেই সময় চলে এসেছে তাহলে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পেইন্টারের দিকে তাকাল সে। বুঝতে পারছে, যতটুকু ভেবেছিল তার চেয়েও প্রখর মস্তিষ্কের অধিকারী লোকটা। অন্তত সাধারণ কোন সরকারি কর্মচারীর চেয়ে অনেক বেশি।

'হ্যাঁ,' বলল ক্লাইফ এনার্জির সি.ই.ও.। 'লোকটা কেমন মানের প্রতিভাধর ছিলেন তা দেখাতে চাই আমি।'

কিছু দূরে চলে গেল পেইন্টারের নজর, 'তোমার অ্যান্টেনার কাঠামো। হার্পের উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ভার্সনেরও বেশি কিছু ওটা।'

'অবশ্যই। টেসলার স্বপ্নের বাস্তবায়ন আমার লক্ষ্য। যুদ্ধ ছাড়া এক পৃথিবী চাই, চাই সস্তা এবং অসীম শক্তির উৎস   সুস্থ, জীবিত একটি দুনিয়া।'

'এবং এই সবগুলোই দেওয়ার ক্ষমতা রাখ নাকি?'

'অবশ্যই, শুধু উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা। আমরা আগামী পরশু দিন একটা টেস্ট-রান চালাতে যাচ্ছি।'

'কোন ধারণা?'

'টেসলার ওয়ার্ডেনক্লাইফ প্রজেক্ট সম্পর্কে কতটুকু জানো?' আন্তরিক কণ্ঠে জানতে চাইল সাইমন, যেন বোঝাতে চাইছে পেইন্টারকে।

ভ্রূকুটি করল সিগমা ডিরেক্টর, 'শুধু জানি সেটা ব্যর্থ হয়েছে। তারহীন তড়িৎ শক্তি উৎপাদনের নেটওয়ার্ক তৈরি করতে চেয়েছিলেন তিনি। এটাই এই ধরনের প্রথম টাওয়ার ছিল।'

'তার ধারণার প্রমাণ ছিল ওয়ার্ডেনক্লাইফ, দুনিয়াকে দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন- এটা সম্ভব। ১৯০১ সালে নির্মাণ কাজ শুরু হয় ওটার। কিন্তু এক দশক আগের তত্ত্ব এবং পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল এর প্রযুক্তি আর নকশা। তিনি জানতেন, তারবিহীন শক্তি স্থানান্তরের জন্য এমন একটি পরিচালক দরকার, যা শক্তিটাকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। সম্ভাব্য দুটো উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি, মাটি এবং বায়ুমণ্ডল। টেসলা বিশ্বাস করতেন, মাটির অভ্যন্তর দিয়ে শক্তি স্থানান্তর সম্ভব। প্রাকৃতিক অনুরণনের কম্পাঙ্কের মাধ্যমে পুরো পৃথিবীতেই ছড়িয়ে দেওয়া যায় বিবর্ধিত শক্তি। আবার, বায়ুমণ্ডলের নির্দিষ্ট একটা পরিবাহী স্তর ব্যবহার করেও করা যায় একই কাজ।'

'আয়নমণ্ডল।'

নড করল সাইমন, 'তখনকার দিনে এমন স্তরের কথা ছিল শুধুই ধারণা, আয়নমণ্ডলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় ১৯২৫ সালে।'

'আবারও, টেসলা এগিয়ে ছিলেন নিজের সময়ের চেয়েও।'

'দুঃখজনক হলেও তাই সত্য। এই কারণেই, শুধুমাত্র মাটির দিকে নজর দিলেন তিনি। তাই তিনশো ফুট ভিত্তির উপর দাঁড়াল ওয়ার্ডেনক্লাইফ টাওয়ার, যাতে ভালোমতো ব্যবহার করা যায় ভূগর্ভস্থ শক্তি।'

'কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন তিনি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তার কারণও আছে। আয়নমণ্ডল ব্যবহারের মতো প্রযুক্তি তখন ছিল না। পরবর্তীকালে, আয়নমণ্ডলের অস্তিত্ব প্রমাণের পর, আরও কাজ করেছিলেন তিনি। ১৯৩১ সালে ঘোষণা দেন, নতুন এক শক্তির উৎস খুঁজে পেয়েছেন। টেসলার ভাষ্যমতে, 'সবার ধারণার বাইরে এক নতুন উৎস।' কিন্তু সেই উৎসটা কী, তা পত্রিকায় আসেনি কখনও।'

লোকটার বাড়তে থাকা উত্তেজনা নজর এড়ায়নি পেইন্টারের, 'কিন্তু তুমি জানো উৎসটা কী।'

টেসলার নোটবুকের উপর একহাত রাখল সাইমন। 'এখানেই আছে এর উত্তর।'

সোজা হয়ে বসল সিগমা ডাইরেক্টর, 'তড়িৎখাদক জীবাণুগুলোর কথা বলছ তুমি।'

বিস্ময় লুকাতে ব্যর্থ হলো ক্লাইফ এনার্জির কর্ণধার, তবে মুগ্ধ না হয়েও পারল না। 'বাহ! একদম ঠিক। লন্ডনে এই বিপজ্জনক জীবাণু নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তিনি।'

'ঘটনাটা কী ১৮৯৫ সালের? ডেভিড লিভিংস্টোনের মালিকানায় থাকা তালিসমানটির উপর গবেষণা চালিয়েছিল যখন কয়েকজন বিজ্ঞানী?'

নড়ে-চড়ে বসল সাইমন, চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছে।

কতটুকু জানে এই লোকটা?

'বইটাতে আর কী আছে?' জানতে চাইল পেইন্টার।

'টেসলা আগেই একটা নকশা করেছিলেন, জীবাণুটা এবং আয়নমণ্ডল সম্পর্কিত জানা সকল তথ্য কাজে লাগিয়েছেন তিনি এখানে। এখানে তৈরি স্থাপনাটির আদিরূপ ছিল ওটা। আবারও, প্রযুক্তি এবং শক্তির উৎস পিছিয়ে পড়ল টেসলার চেয়ে।'

'তাই তুমি সেই নকশা ব্যবহার করে উন্নত এবং প্রসারিত আকারে গড়ে তুললে অরোরা স্টেশনকে।'

'এটা আমার ওয়ার্ডেনক্লাইফ, স্থানীয় পরীক্ষাকেন্দ্র, ভবিষ্যতে যা ব্যবহৃত হবে বিশ্বজুড়ে।'

'কী এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য?'

'আগেই বলেছি, টেসলার উদ্দেশ্য এবং আমার উদ্দেশ্য এক-ই। বিশ্বব্যাপী শান্তি, সস্তা এবং অপরিমেয় শক্তি, সুস্থ একটি পৃথিবী।' অতিথির দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ল যেন সাইমন। 'মহৎ উদ্দেশ্য। তাই না?'

'অবশ্যই। খুশি মনেই তোমার পরিকল্পনার মাহাত্ম্য স্বীকার করছি আমি। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা নিয়ে প্রশ্ন আছে আমার মনে।'

'ড. আল-মায়াজকে নিয়ে আসার কথা বলছ?'

'নিয়ে আসা? কাজটা খুন এবং অপহরণ!'

নড করল সাইমন, মেনে নিল অভিযোগ।

নিজের হাতকড়া দেখাল পেইন্টার, 'আর এটাও।'

'দুঃখজনক। আমি এসব করতে চাইনি। খুন-খারাবির শুরু হয়েছে প্রফেসর ম্যাককেব পালিয়ে যাওয়ার পর থেকেই। যদি এত তাড়াহুড়ো না করতেন তিনি, তবে বেঁচে যেত অনেক প্রাণ।'

'মৃতদের দোষারোপ করা খুব সোজা।'

'কিন্তু তাতে তো আর সত্য মিথ্যায় পরিবর্তিত হয় না।'

ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠল সাইমনের ডেস্কের ফোন। কে ফোন দিয়েছে দেখে নিল সে।

আহ .

অতিথির দিকে ফিরে তাকাল সে, গার্ডকে ডেকে আনল, 'কিছু কাজ বাকি আছে আমার, এখনকার মতো আলোচনার ইতি টানতে হচ্ছে।'

'দাঁড়াও।' চেয়ারে নড়েচড়ে বসল পেইন্টার, 'টেসলার স্বপ্ন কীভাবে বাস্তবায়ন করতে চাইছ তুমি?'

হেসে নোটবুকটার দিকে তাকাল লোকটা, 'নাহয় এই মহৎ ব্যক্তিটার কাছ থেকেই শুনে নাও। যদিও তিনি সার্বিয়ান ভাষায় লিখেছেন, ইংরেজি অনুবাদটা তোমার রুমে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পড়ার পর আবার কথা বলব আমরা। তখন হয়তো এর গুরুত্ব পুরোপুরি বুঝতে পারবে।'

ভেতরে প্রবেশ করল গার্ড, শেকলে বাঁধা বন্দিকে নিয়ে গেল রুমের বাইরে। আবারও, একা হয়ে গেল সাইমন। ফোনের রিসিভারটা কানে ঠেকাল সে।

'অ্যান্টন, সবাই প্রস্তুত?'

'জি, স্যার। এখনই অনুসন্ধান দলের সাথে যোগ দিচ্ছি আমি।'

'বেশ, খুঁজে বের করো ওদের। ল্যাব থেকে চুরি যাওয়া তথ্য যেকোন মূল্যে ফিরিয়ে আনতে হবে।'

মমি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, গায়ে আঁকা উল্কি থেকে মারাত্মক জীবাণুটার প্রতিষেধক বের করার আশাও ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। রোরি এবং সাফিয়ার রাতের ওয়েবক্যাম কথোপকথন থেকে ধারণা করা যাচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা আবিষ্কার করতে যাচ্ছে ওরা।

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল অ্যান্টনের কর্কশ কণ্ঠ, 'রোরির যদি কিছু হয়

'আশা করি সে সুস্থ আছে।'

গত দুই বছরে বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা দু'জন। সাইমনও বাঁধা দেয়নি বরং সাহস যুগিয়েছে। যদিও অ্যান্টনের জন্য অভিজ্ঞতাটা বেশ অস্বাভাবিক এবং বিস্ময়কর ছিল। এর আগে ছেলেটার সাথে ওর বোনের ছিল এক প্রায় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। একই বৃন্তের দুটি ফুল যেন ভালিয়া আর অ্যান্টন, সেই কথাটাই প্রকাশ করছে ওদের দু'জনের মুখে আঁকা বিশেষ উল্কি। তবুও দু'জনের জন্যই বেশ কষ্টকর ছিল রোরির সাথে অ্যান্টনের মাখামাখির ব্যাপারটা, সামলে নিতেও বেশ সময় লেগেছে। তবে নিঃসঙ্গ ভালিয়া এখন আরও বেশি কাজের, আরও বেশি হিংস্র। ভাই-বোনের সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হওয়ায় এইদিক থেকে বেশ লাভবান হয়েছে সাইমন।

অবমাননার শিকার নারীর চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছুই নেই, তা সেই অবমাননা নিজের ভাই-ই করুক না কেন! তবে রোরির প্রতি অ্যান্টনের আবেগ এখন ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'অ্যান্টন।'

'স্যার?'

'ডিস্কটা শুধু খুঁজে বের করো। যেকোন মূল্যেই হোক না কেন, ওটা আমার চাই।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সিকিউরিটি ইনচার্জ, অবশেষে উত্তর মিলল।
'অবশ্যই, স্যার।'

সকাল ৪:৩২

'হ্যালো, হ্যালো

ক্যাট জানে, নিষ্ফল চেষ্টায় লিপ্ত সাফিয়া। স্নো-ক্যাটের যাত্রীর আসনে বসে আছে মেয়েটা, হাতে স্যাটেলাইট ফোন। চেষ্টা করছে থুল এয়ার বেসের সাথে যোগাযোগ করতে। অন্যদিকে ক্যাটের নজর ঝড় মোকাবিলা করে সামনে এগোনোর দিকে। হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস হামলে পড়ছে গাড়ির উপর, বাঁধা দিচ্ছে যেন গন্তব্যে পৌঁছুতে। বরফের ছোট ছোট টুকরো আছড়ে পড়ছে গাড়ির গায়ে।

কুটিনিরপাক ন্যাশনাল পার্ক এতক্ষণে পার হয়ে এসেছে বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু জি.পি.এস. না থাকায় নিশ্চিত হতে পারছে না। ফোন রেখে দিল সাফিয়া, জানালা দিয়ে বাইরের পর্বতের দিকে তাকাল। 'আরও একটু উপরে উঠতে পারলে হয়তো

'লাভ নেই,' বলল ক্যাট, গাড়িটার স্টিয়ারিং হুইলের উপর দিয়ে নজর। স্নো-ক্যাটের আলো বড়জোর কয়েক গজ পর্যন্ত ছড়াতে পারছে। জমে যাওয়া এক নদীর পাশ দিয়ে চলছে ওরা, বরফের নিচে নীল পানি নজরে পড়ছে। উপত্যকার কালো চূড়াগুলো নজরে পড়ছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে ঝড়ের প্রকোপে।

'আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটার অপেক্ষা করতে হবে।' বলল সাফিয়া।

'মূল সমস্যা আবহাওয়া নয়।' কালো মেঘের দিকে নজর ক্যাটের। 'এই ঝড় আলাদা। সৌরদহনের ফলে সৃষ্ট ভূ-চৌম্বকীয় ঝড় এটা। পুরোপুরি না থামার আগ পর্যন্ত স্যাটেলাইট সংযোগ পাওয়া যাবে না।'

'ঠিক বলেছ,' পেছন থেকে বলল রোরি। 'এক বা দু'দিন স্থায়ী হবে এই ঝড়।'

রিয়ারভিউ মিররে তাকাল ক্যাট, স্নো-ক্যাটের পেছনে খুঁজে পাওয়া দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে হাত বাঁধা হয়েছে ছেলেটার। এমনকী সিটবেল্টটাও লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোথাও যেতে পারবে না সে।

নিজের উপর মেয়েটার দৃষ্টি অনুভব করল রোরি, চিবুক নামিয়ে নিল।

আক্রান্ত সাফিয়ার জন্য ওর মনোযোগ মনে আছে ক্যাটের, ল্যাবরেটরির ঘটনায় বেশ অনুতপ্ত মনে হয়েছিল ছেলেটাকে। কিন্তু অ্যান্টনের রক্ত দেখার পর ওর মনের ভয়টাও লক্ষ্য করেছে ক্যাট। সন্দেহ করল, ছেলে দুটোর মধ্যে গভীর কোন সম্পর্ক রয়েছে।

সিগমা কমান্ডে, অ্যান্টনের অতীত জীবনের অভিযোগ দেখেছিল ক্যাট। ষোলো বছর বয়সেই চুরি এবং অসচ্চরিত্রের অভিযোগে দোষী হয়েছিল ছেলেটা।

তৎকালীন রাশিয়াতে সমকামিতা নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হতো।

বছর দুই আগে, প্রফেসর ম্যাককেবের অন্তর্ধানের নানা তথ্য মনে করল সে। পিতা-পুত্রের মধ্যে মনোমালিন্যের অভিযোগ ছিল। এমনকী জেনও সেই কথাগুলোই উল্লেখ করেছে।

এই ধারণাটি আগে মাথায় আসেনি ক্যাটের।

হয়তো এটাই একমাত্র কারণ নয়।

পুত্রের এই অস্বাভাবিকত্বের কথা হয়তো জেনে থাকবেন প্রফেসর, মেনে নিতেও পারেননি হয়তো নাকি বিষয়টি চেপে রেখেছিল রোরি? পিতা-পুত্রের মধ্যে দূরত্বের কারণ হয়ে তো দাঁড়ায়নি বিষয়টি?

কিছু ব্যাখ্যা বাকি রয়ে গিয়েছে রোরির, তবে এখন উপযুক্ত সময় নয়

'ক্যাট!'

সাফিয়ার হাতের ঝটকায় মনোযোগ ফিরে এল ওর। সামনে বিশাল একটা অবয়ব নজরে পড়ছে হেডলাইটের আলোয়। গাঢ়-ঝাপসা অবয়বটা মাথা নিচু করে আছে নদীর কিনারায়, বরফের ফাটল থেকে নদীর পানি পান করছে।

একটা কস্তুরী বলদ।

সংঘর্ষ এড়াতে তীক্ষ্ণ মোড় নিল স্নোক্যাট, কিন্তু সামনে কেবল জমাট বাঁধা পাতলা বরফের আস্তর। বরফ ভাঙার প্রতিটি শব্দ আঁতকে উঠল ক্যাট, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন বিপদ ছাড়াই বরফের নদী পার হয়ে গেল।

'দুঃখিত,' বলল ক্যাট, ভ্রূতে আঙুল বোলাল।

সামনে বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে চলছে ঝড়ের তাণ্ডব, কোনটাই অবজ্ঞা করার নয়।

'তোমার ঘুম প্রয়োজন।' নরম সুরে বলল সাফিয়া।

তা প্রয়োজন . . .তবে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য, অ্যালার্টে পৌঁছাবার আগে নয়।

সেটাই ওদের পরিকল্পনা। কুটিনিরপাক ন্যাশনাল পার্ক থেকে বেশ দূরে কানাডার ঘাঁটি, ওখানের দায়িত্বে আছে সামরিক বাহিনী। দুর্গের পাশাপাশি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রও চালায় ওরা। কিন্তু ন্যাশনাল পার্ক কানাডার দ্বিতীয় বৃহত্তম পার্ক। কম করে হলেও দেড়শ' মাইল পথ পারি দিয়ে পৌছুতে হবে ওখানে।

ভ্রমণ শেষ হতে সময় লাগবে বেশ, যদি ততক্ষণে শত্রুর ধরা না পড়ি আমরা।

রোরির দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল সে, 'অরোরা স্টেশনে কী কী যানবাহন আছে?'

আশ্বস্ত করল বন্দি, 'স্নো-মোবাইল, স্নো-বাইক। কিন্তু ওগুলো আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যবহৃত হয়। মূলত অরোরা একটা বৈজ্ঞানিক স্থাপনা, সামরিক ঘাঁটি নয়।'

উপলব্ধি করল ক্যাট, এই কারণেই পালিয়ে আসতে পেরেছে ওরা। বিচ্ছিন্ন স্থাপনাটায় ছোটখাটো সমস্যা মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত সিকিউরিটি গার্ড আছে, এরাই বিপদে এগিয়ে আসে।

'কিছু লোক সেসনা নিয়েও শিকার করে।' ভ্রু কুঁচকে বলল রোরি, 'খুব একটা মজার খেলা না, তবে অবদমিত আবেগ নিয়ন্ত্রণে কাজে দেয়।'

আকাশের দিকে তাকাল ক্যাট। ঝড়ের কারণে চাইলেও ওদের পিছনে সেসনা নিয়ে তাড়া করা সম্ভব হবে না। মন্দের ভালো আরকি!

কিন্তু এই এসব নিয়ে তেমন একটা ভাবছে না ক্যাট। পাশের সিটে বসে আছে সাফিয়া, বুকে চেপে ধরে রেখেছে স্যাটেলাইট ফোন। বারবার থুল এয়ার বেসে যোগাযোগের চেষ্টা করতে ওকে বলেছে ক্যাট। আশা করছে, ভূ-চৌম্বকীয় ঝড়ের মাঝেই সুযোগ পাবে কর্নেল ওয়াইক্রাফটের কাছে পৌছুতে। যদিও সেই সম্ভাবনা কম। তাই, সাফিয়ার নজর সরিয়ে রাখতে মেয়েটাকে ফোনে ব্যস্ত রেখেছে সে।

বাইরে তাকাল সাফিয়া, একহাত চিবুকে ঘষছে। মেয়েটার অঙ্গভঙ্গিতে ভীত হয়ে উঠল ক্যাট, কল্পনায় বায়োসেফটি স্যুটের ফাটল দেখতে পেল সে।

সংক্রমণ মোচনের জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছে তো সাফিয়া? নাকি ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছিল?

রোগের বিস্তার সম্পর্কে ড. কানোর সিদ্ধান্ত স্মরণ করল ক্যাট, কীভাবে মাত্র দুই ঘণ্টায় জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় মস্তিষ্ক!

উদ্ধার করতে এসে মেয়েটার সর্বনাশ দেখে ফিরে যেতে হবে না তো আবার?

স্নো-ক্যাটের ভেতর শব্দ করে চলছে হিটার, আবদ্ধ কেবিনে উষ্ণ হাওয়ার সঞ্চার করছে ওটা। সতর্ক করছে যেন যন্ত্রটা, হুমকির মুখে সাফিয়ার একার জীবনই নয়!

হঠাৎ করেই কেশে উঠল ইঞ্জিন, স্টিয়ারিং হুইলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যাট। তবে, থেমে গেল আওয়াজ, আবারও অবিরাম গতিতে চলতে থাকল গাড়ি। চেপে রাখা শ্বাস সশব্দে ত্যাগ করল ক্যাট, কিন্তু উদ্বেগ কমল না। উপলব্ধি করল সে, ছোটখাটো কাজে ব্যবহৃত হয় এইসব স্নো-ক্যাট। ঝড়ের মধ্যে দীর্ঘ পথ পারি দেওয়ার জন্য এগুলোর যত্ন করা হতো না।

গাড়ির ভেতরের সবাই যেন অনুধাবন করে নিল তিক্ত সত্যটা, তাই যেন চুপ করে রইল-যতক্ষণ না নতুন বিপদটা কানে এল। হিমবাহের মতো গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনতে পেল ওরা, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। হঠাৎ কয়েকটা গাঢ় অবয়ব দৃষ্টিগোচর হলো হেডলাইটের আলোতে। সামনে পথরোধ করে আছে বলগা

হরিণের পাল, নদীর স্রোতের মতো প্রবল আক্রোশে বয়ে চলল যেন দলটা। ঠিক যেভাবে আবির্ভাব ঘটেছিল, সেইভাবে ঝড়ের মাঝে হারিয়ে গেল প্রাণীগুলো।

পেছনের জানালার দিকে গলা বাড়িয়ে দিল সাফিয়া, 'এদের তাড়িয়ে এনেছে কে?'

সন্দেহ করল ক্যাট, উত্তরটা ওদের পেছনেই আছে কোথাও। গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল ক্যাট, ছুটে চলল বলগা হরিণের ছুটে চলা পথ লক্ষ্য করে। সতর্কবাণী হিসেবে নিয়েছে পুরো ব্যাপারটা।

আমাদের সন্ধান পেয়ে গিয়েছে কেউ!

সকাল ৪:৩৮

হাতের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিল পেইন্টার। ওর হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে গিয়েছে গার্ড, তবে পুরো দেহতল্লাশি করে নিয়েছে আগে। এরপর একটা কভারঅল পরতে দিয়েছে ওকে, তবে জুতো দেয়নি।

তবে, মূল সমস্যা এসব নয়।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে সে, ক্যাটের জন্য, সাফিয়ার জন্য।

সাফিয়া যে রুমটায় বন্দি ছিল, সেই রুমেই বন্দি হয়ে আছে ও। ঘরের মাঝে মেয়েটার গায়ের গন্ধ বিরাজ করছে এখন। হালকা জেসমিনের সুবাস স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ঊষর মরু এবং সবুজ মরূদ্যানে একসাথে ছুটে বেড়ানো দিনগুলির কথা। একই সাথে আসন্ন বিপদের কথাও ভাবাচ্ছে পেইন্টারকে।

রোরিকে সাথে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে ক্যাটে এবং সাফিয়া, জানে না সে ঠিক কতক্ষণ ওদের পিছু ধাওয়া করবে শত্রুরা। শুধু জানে, পুনরায় বন্দি করার আগ পর্যন্ত থামবে না এরা।

কানে এল কর্কশ আওয়াজ, পেইন্টারের নজর ঘুরে গেল ওদিকে।

আবার কী?

দরজার নিচের ছোট ফোকরটা খুলে গেল, ভেতরে ছুড়ে দেওয়া হল কিছু একটা। মেঝে ঘষটে পেইন্টারের পায়ে লেগে অবশেষে থামল ওটা। ঝুঁকে বস্তুটা হাতে নিল সে, ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ফোকর।

পেটমোটা একটা কাগজের বান্ডিল, পিন দিয়ে আটকানো। খুলতেই দেখল, ভেতরের পাতায় মোটা দাগ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ লাইন। সেই সাথে বেশ কয়েকটি ডায়াগ্রাম এবং চার্টও মোটা কালিতে কেটে দেওয়া। সবকিছু ওর সামনে উন্মুক্ত করতে চাইছে না সাইমন। কাগজগুলো সাথে নিয়ে রুমের ডেস্কে বসল সে। জানে, হাতে এসব কিসের কাগজ।

টেসলার কালো নোটবুকের অনূদিত প্রতিলিপি এটা।

যাক, অন্তত এই কাজ দিয়ে নিজেকে বিশ্বাসভাজন প্রমাণ করল হার্টনেল। তবুও, কালি দিয়ে ঢাকা অংশ থেকে বোঝাই যায়, ঠিক কী ঘটছে এখানে-সে সম্পর্কে ওকে কিছু জানতে দিতে চায় না লোকটা।

কিন্তু আমি যা পাব, তা-ই কাজে লাগাব।

তবে, হার্টনেল চায় সে কিছুটা হলেও জানুক। হয়তো ওর প্রতিভা এবং উদ্যমের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে। অথবা, হয়তো নিছক নিজের প্রশংসা শোনার অভিপ্রায় থেকেই লোকটার এই প্রচেষ্টা। শিক্ষিত একজন দর্শক সেই চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম।

সহযোগিতা করতে খুশিই হবে পেইন্টার।

প্রয়োজনে হাততালি দিতেও বাধা নেই, উদ্দেশ্য হাসিল নিয়ে কথা।

তবুও, লোকটা বোকা নয়। জানালা থেকেই সাইমনের স্থাপনা নজরে এল। ডারপার নাকের ডগায় বসেই করেছে সে ওসব। এমনকি ডারপার টাকা দিয়েই বাস্তবায়িত করেছে নিজের পরিকল্পনা। এই লোককে কোনক্রমেই অবমূল্যায়ন করা যাবে না।

পাতাগুলোয় নজর বোলাল পেইন্টার।

কাগজগুলো আমাকে দেওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

কিন্তু কী সেই কারণ?

আমার কাছ থেকে কিছু একটা চায় সে।

পৃষ্ঠা উল্টে চলল পেইন্টার, কাহিনি এগুতেই জমে বরফ হয়ে গেল যেন সে।

ঘটনা সুবিধের ঠেকছে না কারও জন্যই না।

উনিশ
৩ জুন, সকাল ১০:২২ ই.এ.টি.
সুদান মরুভূমি

দৈত্যাকার পেটের ভেতর আছে গ্রে, সেইচানের মোটরসাইকেলের আওয়াজ মিলিয়ে গেল। আশা করছে, সামনে নিশ্চয়ই কোন না কোন খোলা পথ থাকবে। আর যদি না-ও থাকে, সেইচান তৈরি করে নিতে পারবে একটা। জেন ম্যাককেবকে রক্ষা করবে মেয়েটা। তার উপর বিশ্বাস আছে সেইচানের, জানে বাকি সবাইকে রক্ষা করবে গ্রে।

পাকস্থলীর ধনুক আকৃতির খিলান পেরিয়ে এল কোয়ালস্কি, ইশারা করল ওকে দেখে। শত্রুদের জন্য বিশেষ আকর্ষণের ব্যবস্থা করেছে বিশালদেহী লোকটা। খাদ্যনালী হয়ে এইদিকে আসার একমাত্র রাস্তা ওটা। অন্য রাস্তাটা ডায়াফ্রামের দিকে গিয়েছে।

ওদের দল পাহারা দিচ্ছে ওদিকে, চেষ্টা করছে আড়ালে দাঁড়াতে। রাস্তাটা দিয়ে পাশাপাশি দু'জন হাটা সম্ভব নয়, একবারে একজনই যেতে পারবে। ক্ষুদ্রান্ত্রের শুরুর অংশের আড়ালে বসে আছে গ্রে, হাতের সিগ সয়্যার ধনুক আকৃতির খিলানের দিকে তাক করা। মনে মনে আফসোস করছে, আরও গোলাবারুদ সাথে রাখা দরকার ছিল।

ডানে ভাঙা টুকরোর আড়ালে আছে ডেরেক, ভাঙা অংশটা স্থাপনার দেহের কোন অঙ্গ। ভয়ে ভয়ে উপরে তাকাচ্ছে সে, আশংকা করছে মাথায় না যেন আবার কিছু পড়ে! লোকটার হাতে বেরেটা ৯৬এ১, পিস্তল ভালোই চালাতে জানে। নৃবিজ্ঞানীরা নিজের রক্ষার্থেই কাজগুলো শিখে নেয়, কারণ যুদ্ধবিধ্বস্ত বা সামরিক আইনে চলা শহরে প্রায়ই যেতে হয় ওদের।

কথাটা শুনে ডেরেককে নতুন একটা প্রস্তাব দিল কোয়ালস্কি, 'একটা চাবুক কিনে নিলে কিন্তু মন্দ হয় না তোমার।'

তবে, এখন বাড়তি যেকোন অস্ত্র পেলেই বর্তে যবে গ্রে।

পাকস্থলীর ভাঁজের আড়ালে আছে কোয়ালস্কি, আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করতে সামনের দিকে থাকছে সে। ওর কাঁধে একটা পিযার শটগান, পাইযোইলেকট্রিক ক্রিস্টাল ছুঁড়ে দেয় ওটা। সেই সাথে বেল্টে গুজে নিয়েছে .৫০ ক্যালিবারের পিস্তল।

সবাই নিশ্চুপ, কান পেতে আছে সামান্য আওয়াজ শোনার আশায়।

প্রস্তুতিস্বরূপ, সব আলো নিভিয়ে দিতে বলছে গ্রে। অন্ধকারে ওদেরকে নিশানা করা বেশ কঠিন হবে শত্রুর পক্ষে। শুধুমাত্র সেইচানের হেলমেটের আলোটা জ্বলছে, ভেতরে ঢোকার রাস্তাটা আলোকিত করে রেখেছে।

কোন নড়াচড়া টের পেল না গ্রে, কিন্তু একটা আওয়াজ কানে এসেছে ওর। পাশের প্রকোষ্ঠে নড়ছে কিছু একটা। হয়তো নাইট-ভিশন ব্যবহার করছে শত্রু।

কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল এক মুহূর্তে।

রাইফেলের গুলির আওয়াজ, ভেঙে গেল হেলমেটের বাতি, অন্ধকার হয়ে গেল পুরো কামরা।

ঠিক একই সময়, ঝলসে উঠল উজ্জ্বল আলো, কানে লাগল বিস্ফোরণের আওয়াজ। কেউ একজন কোয়ালস্কির পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে। ফ্ল্যাশ ব্যাংয়ের সাথে সংযুক্ত ছিল ওটা।

উজ্জ্বল আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল কোয়ালস্কি, তবে হাতের অস্ত্র গোলাবর্ষণ করল ওদিকে ঠিকই। ছোট ছোট ক্রিস্টালগুলো বিস্ফোরিত হলো শত্রুর উপর।

সময়টাকে কাজে লাগাল গ্রে, স্মোক বোম ছুঁড়ে দিল রাস্তার ওদিকে। ঘন ধোঁয়ায় ঢেকে গেল সব। ডেরেকও সমান তালে গুলি ছুড়তে লাগল।

রাস্তাটা মোটামুটি বন্ধ হয়ে যেতেই পিছিয়ে এল গ্রে। হেলমেট মাটিতে রেখে আলো জ্বেলে দিল। চেঁচিয়ে বলল বাকিদের উদ্দেশে, 'পিছাও, দুই নং অবস্থানে যাও সবাই।'

গ্রে-র সাথে সাথে পিছিয়ে এল ডেরেক, কিন্তু কোয়ালস্কি নিজের অবস্থানেই রইল। ডেজার্ট ঈগল থেকে অগ্নিবর্ষণ করে এগিয়ে গেল সামনে, কিছু একটা হাতে নিয়ে দৌড়ে পিছিয়ে এল।

'ভাবলাম, যদি লাগে।' দেঁতো হাসি কোয়ালস্কির মুখে, হাতে দুই রাউন্ড গোলা সহ একটা রাশিয়ান আরপিজি-৭-এ রকেট প্রোপেলড গ্রেনেড লঞ্চার।

ডায়াফ্রামের দিকে তাকাল গ্রে, উৎকণ্ঠা বেড়ে গিয়েছে ওর। শত্রুদের হাতে রকেট আছে-

কেঁপে উঠল পুরো দুনিয়া, ডায়াফ্রাম ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। প্রশস্ত রাস্তা তৈরি হয়েছে ওখানে, বিস্ফোরণের আঘাতে ছাদ থেকে বড় বড় চাঁই পড়ছে মাটিতে। পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো গ্রে-র দল।

ধোঁয়া এবং ধুলোতে ঢেকে গিয়েছে চারপাশ, সামনের কিছুই নজরে পড়ছে না আর।

গর্জে উঠল অস্ত্র, ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে সব।

একটি বুলেট এসে লাগল মেঝেতে রাখা হেলমেটে, সাথে সাথে নিভে গেল আলো।

কালিগোলা অন্ধকার গ্রাস করে নিল সবাইকে।

পাশ থেকে গুঙিয়ে উঠল ডেরেক, 'এখন?'

সকাল ১০:২৯

বিস্ফোরণের ধাক্কায় কেঁপে উঠল সেইচান, সেই সাথে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণও হারিয়ে বসল। সিটে আটকে থাকতে বেশ কষ্ট হচ্ছে জেনের। কিন্তু সামলে নিল সেইচান, ব্রেক চেপে থামাল বাহন।

গ্রে

পেছন ফিরে তাকাল জেন, 'কী ঘটছে ওখানে?'

'বদহজম হয়েছে দেবতার।' কঠোর কণ্ঠে বলল সেইচান, ফিরল সামনের দিকে। 'যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে, সময় হয়েছে আমাদের পালানোর।'

গতি বাড়িয়ে দিল সে, উড়ে চলল বাকি রাস্তাটুকু। এতক্ষণের আঁকাবাঁকা রাস্তা শেষে সোজা পথ মনে স্বস্তি এনে দিল।

'কাছাকাছি চলে এসেছি।' বলল জেন। 'মনে হচ্ছে মলাশয়ের ভেতর আছি এখন, নাড়িভুঁড়ির অংশে।'

এর আগেও তরুণ নৃবিজ্ঞানী স্থাপনাটার বিবরণ বলে সাহায্য করেছে। বর্তমান সুড়ঙ্গ আগের সুড়ঙ্গগুলো থেকে কিছুটা চওড়া। বাইরে থেকে যেমন মনে হয়, অভ্যন্তরীণ অঙ্গের কাঠামো ঠিক তেমন নয়। বিশাল বড় একটা ফুটবল খেলার মাঠে যেন পরপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে আকৃতিগুলো।

মোটরসাইকেলের হেডলাইট পথ দেখাচ্ছে সেইচানকে, কিন্তু ওর কান এখনও পড়ে আছে পেছনে। আঁচ করার চেষ্টা করছে ঠিক কী ঘটেছে ওখানে। বিস্ফোরণটা মরণপণ বন্দুকযুদ্ধ চলার ইঙ্গিত দিচ্ছে যেন।

কাঁধের উপর দিয়ে ইশারা করল জেন, 'সামনে দেখো, মলাশয়ের শেষ সীমানায় পৌঁছে গিয়েছি বলে মনে হচ্ছে।'

আক্ষরিক অর্থেই তাই।

বাইকের গতি বাড়িয়ে দিল সেইচান।

যত দ্রুত বের হতে পারবে এখান থেকে, তত দ্রুত শত্রুরা সরে যাবে। গ্রে এবং বাকিরা ওদের দু'জনকে বাঁচাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে।

এখন সেই উপকারটুকু ফিরিয়ে দেওয়ার পালা।

সংকীর্ণ পথের শেষে থামল মোটরসাইকেল, সামনের রাস্তাটা পাথরের স্তূপ দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে!

'যাহ!' হতাশ হয়ে বলল জেন।

সকাল ১০:৩২

মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে ডেরেক, মাথা ঝনঝন করছে ওর। পেছন পেছন আসছে কোয়ালস্কি এবং গ্রে। অন্ধকারে গুলি করছে ওরা, আলো বলতে শুধু ডেরেকের হেলমেটের আলো। ওটাকে এক বোল্ডারের আড়ালে রেখে এসেছে গ্রে। গোলাগুলির আওতার পুরোপুরি বাইরে থেকে জ্বলছে বাল্ব। যদিও খুব একটা কাজে আসছে না ওটা, আলো ছড়াতে পারছে না বেশিদূর। আবছা আলোতে শত্রুর অবস্থান দেখা তো যাচ্ছেই না, বরং ছায়ার আড়ালে লুকোনোর সুযোগ পাচ্ছে এরা।

'পেছানোর আর জায়গা নেই।' বলল কোয়ালস্কি।

ঠিকই বলেছে বিশালদেহী লোকটা।

একপাশে ভাস্কর্যের নাড়ি, অন্যপাশে স্ফীত পেট ঠেকেছে ছাদে। পেটের গর্তটার ভেতরে রয়েছে ওরা, আটকে পড়ার মতো অবস্থা।

ডেরেককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল কোয়ালস্কি, গুলি ছুড়ল একই সাথে। একজোড়া গাঢ় অবয়ব ছিটকে সরে গেল, হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

'যথেষ্ট দূরে এখনও।' বলল গ্রে।

কিন্তু কতক্ষণ পারবে নিজেদের রক্ষা করতে?

'আমার পিছনে আসো সবাই।' কাঁধে গ্রেনেড লঞ্চার তুলে নিল গ্রে।

'সাবধান।' মনে করিয়ে দিল কোয়ালস্কি, 'একটা রাউন্ড অবশিষ্ট আছে আর।'

গুলির আওয়াজ কানে আসতেই ঝাঁপ দিল ডেরেক। আগুনের হলকা ছুটে গেল, অনুসরণ করল ধোঁয়ার কুণ্ডলী। তবে, শত্রুদের দিকে তাক করেনি গ্রে, বরং ছাদের দিকে তাক করেছে অস্ত্র।

ঠিক ছাদও নয়।

সবাইকে পেছনে ঠেলে দিল গ্রে, 'সরো, জলদি...'

ঠিক জায়গামতো আঘাত হেনেছে রকেট। ছাদ থেকে বিশাল বৃক্কটা মেঝেতে পড়েছে, ভাস্কর্যটার আকার কম করে হলেও বড় একটা বাসের সমান হবে। শত্রু এবং গ্রে-র দলের ঠিক মধ্যখানে পড়েছে ওটা। আড়ালে রাখা হেলমেটের উপর পড়েছে কিছু একটা, মোমের মতো গুড়িয়ে গিয়েছে ওটা মুহূর্তেই।

আলো নিভে যাওয়াতে বাড়তি ফ্ল্যাশলাইটটা বের করল গ্রে, ধ্বংসস্তূপের দিকে ফেলল আলো।

ওর পিঠ চাপড়ে দিল কোয়ালস্কি, 'কেউ আসতে পারবে না এদিকে।'

আমরাও পারব না ওপাশে যেতে, ভাবল ডেরেক। অন্তত যতক্ষণ না পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসছে।

কিন্তু খুব জলদি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার কোন সম্ভাবনা নেই।

থামার বদলে, বেড়েই চলছে ধ্বংসযজ্ঞ, সময়ের সাথে সাথে বড় হচ্ছে ফাটল। বড় একটা পাথরের টুকরো খসে পড়ল উপর থেকে, কেঁপে উঠল মাটি। ধুলোতে ভরে গেল পুরো প্রকোষ্ঠ, এয়ার মাস্ক থাকায় বেঁচে গেল ওরা।

সরে গেল গ্রে, 'ভেঙে পড়ছে সব।'

সকাল ১০:৩৫

মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল জেন।

কিছুক্ষণ আগেও দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করছিল বের হওয়ার পথের প্রতিবন্ধকতা, হঠাৎ করেই মুখ থুবড়ে পড়েছে মাটিতে। সেইচানও ছিটকে পড়েছে দেয়ালে, মোটরসাইকেলটা ছিটকে পড়েছে ঠিক ওর গায়ে। কোনমতে বাহনটা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

দু'জন একসাথে তাকাল পিছনে, ধুলোর মেঘ ওখানে।

'এখান থেকে বের হতে হবে।' সতর্ক করল সেইচান, 'এখনই।'

কথাটাকে সমর্থন করতেই যেন কেঁপে উঠল গোটা দুনিয়া, উপর থেকে ভেঙে পড়ল ছাদের একাংশ। কেশে উঠল জেন, মুখোশের এক পাশ ভেঙে গিয়েছে পড়ে যাওয়ার সময়। মনে মনে গাল বকে ওটা ফেলে দিল সে।

নিজের মুখোশটা ওকে দিয়ে দিতে উদ্যত হলো সেইচান, কিন্তু বাঁধা দিল মেয়েটা।

'রাখ। একসাথে দু'জনেরই ঝুঁকি নেওয়ার কোন মানে নয় না।' বলল সে।

এত দূরে সংক্রমণের আশংকা করছে না বটে, তবে ঝুঁকি নিয়ে লাভ কী?

বদলে, বর্তমান বিপদ নিয়ে মাথা ঘামানোয় মন দিল জেন।

'বাকি সবকিছুর মতো এটাও চালাকি।' পাথরের স্তূপটায় চাপড় দিয়ে বলল সে।

'মানে?'

'দেখে প্রাকৃতিক মনে হলেও এটা মানুষের হাতে বানানো।' বলল জেন। 'এটাও ভাস্কর্যের অংশ।'

শ্রাগ করল সেইচান, ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে সব, 'বানানো হোক বা যাই হোক, রাস্তা তো শেষ।'

মাথা নাড়ল জেন, 'ঠিকই বলেছিল ডেরেক-পূর্বপুরুষেরা পালানোর জন্য গুপ্ত দরজা ব্যবহার করত সর্বদা।'

পরীক্ষা করে দেখল সে দেয়ালটা, হাত দিয়ে পরখ করল সন্তর্পণে।

অন্যপাশটা পরখ করতে নামল সেইচান।

পাথরের মাঝে একটা ফাটল নজরে পড়ল জেনের, 'দেখো।' চারকোনা একটা দরজা আবিষ্কার করেছে ও। 'সাহায্য করো।'

দু'জনে মিলে কাঁধ লাগিয়ে ঠেলে দিল দরজা, জোর লাগাতেই নড়ে উঠল পাথর। যতটা কঠিন হবে ভেবেছিল, তারচেয়েও সহজে খুলে গেল দরজা। প্যান্টে হাত মুছল জেন, 'বাবা হয়তো এই দরজাটা আগেই আবিষ্কার করেছিলেন, এমন কিছু তার চোখ এড়িয়ে যাওয়ার কথা না।'

দুঃখে ভরে উঠল মেয়েটার মন।

মোটরসাইকেলটা ঠেলে নিয়ে এল সেইচান, 'যেতে হবে আমাদের।'

নড করেই ওর সাথে হাত লাগাল জেন, বাইরে সূর্যের ঝলমলে আলো। একটা বড় শীলাখন্ডের আড়ালে এই দরজা। তাই, ওদের অবস্থান গোপন রইল। অন্য পাশে নেমে গিয়েছে পথ দুটো গোল পাহাড়ের মাঝ দিয়ে। অবিকল মানবদেহের পায়ুপথের মতোই আকৃতি লাভ করেছে এই বের হওয়ার পথ। যদিও, এটাকে পুরোপুরি প্রাকৃতিক বলেই মনে হচ্ছে।

নিচে নামতে শুরু করল ওরা।

মোটরসাইকেলের পাশাপাশি হাঁটছে সেইচান, কিন্তু ওর নজর পিছনের দিকেই।

ওর দুশ্চিন্তা পড়তে পারছে যেন জেন।

বাকিরা এখনও আটকে আছে ভেতরে।

সকাল ১০:৪০

পিছু হটছে গ্রে, পাশেই আছে কোয়ালস্কি এবং ডেরেক। পালাচ্ছে ধ্বসে পড়া অংশ থেকে। অনুশোচনা হচ্ছে ওর, এমন ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হবে বুঝতে পারেনি আগে।

ধুলোয় পুরোপুরি ঢেকে গিয়েছে প্রকোষ্ঠ, উঁচু স্তূপ জমেছে ভেঙে পড়া পাথরখন্ডের।

সামনের কিছুই নজরে পড়ছে না।

'আর কোন রাস্তা নেই?' বলল কোয়ালস্কি, বাকি দু'জনের দিকে তাকাল উত্তরের আশায়।

'রাস্তা বন্ধ, ফিরে যাওয়ার উপায় নেই।' ধ্বংসস্তূপের দিকে নজর গ্রে-র। মনে মনে প্রার্থনা করছে সে, জেন আর সেইচান যেন ওখান থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

'তুমি না বলেছিলে, আদিম লোকগুলো গুপ্তপথ তৈরি করে রেখেছে?' ডেরেকের কাছে জানতে চাইল কোয়ালস্কি।

শ্রাগ করল ডেরেক, 'পুরোটাই শারীরবিদ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত। মুখ দিয়ে প্রবেশ করেছি আমরা, যুক্তি হিসেবে একেবারে শেষ মাথায় পায়ুপথে বের হওয়ার রাস্তা হওয়ার কথা।'

হাত মুঠো করল বিশালদেহী লোকটা, ভাবছে, 'রাস্তা তো আরও থাকে মানে . . বোঝোই তো।'

উপলব্ধি করল গ্রে, ঠিক বলছে বিশালদেহী লোকটা। 'সম্ভব, ডেরেক?' তলপেটের দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'মূত্রনালি হয়ে বের হওয়া যেতে পারে কি?'

থমকে গেল ডেরেক, ভ্রূকুটি করল, 'হুম, তা পারে।' গ্রে-র দিকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নজরে তাকাল সে, 'তবে, আমার ধারণা আরও একটা রাস্তা আছে।'

সকাল ১০:৪৪

অবশেষে

সিকি মাইল দূরের ধুলোমাখা ট্রেইল দেখে দেঁতো হাসি খেলে গেল ভালিয়ার মুখে।

গত বিশ মিনিটে বেশ কয়েকবার কেঁপে উঠেছে মাটি, উপত্যকার মধ্য থেকে উঠেছে ধুলোর মেঘ। তবুও প্রহরায় একচুলও ফাঁকি দেয়নি ও। ক্রুগাররা ফিরে আসেনি এখনও, ভেতরে হয়তো কুরুক্ষেত্র বেঁধে গিয়েছে।

যদিও দলটি জয়ী হয়নি, তবুও গর্ত থেকে খরগোশদের বের করে তো এনেছে। সন্দেহ দূর করতে র‍্যাভেন পাঠাল। ওদের অনুসরণ করছে যন্ত্রটা।

মনিটরের উপর ঝুঁকল ভালিয়া, ভাঙা পাথুরে পর্বত দৃষ্টিগোচরে আসছে।

পাথুরে পথ পাড়ি দিয়ে নীল নদের দিকে যাচ্ছে মোটরসাইকেল আরোহীরা, পেছনে ওদের অনুসরণ করছে র‍্যাভেন। আরোহীদের একজনের মুখে স্কার্ফ বাঁধা, ঢেকে আছে মুখের একাংশ।

মুঠো শক্ত করল ভালিয়া, চিনতে পেরেছে কাপড়টা।

সেইচান।

তবুও, সন্দেহ দূর হলো না ওর। ধোঁকা দেওয়ার জন্য এমন কিছু করতেও পারে এরা। ড্রোনটা আরেকটু নিচে নামিয়ে পাঁক খাওয়ালো সে। যানটার কম দূরত্বই কাল হলো।

মোটরসাইকেলের পিছনে কে আছে তা নিশ্চিত হতে চায় সে। মাথায় হেলমেট লাগানো, সেইচানের কাঁধে মাথা রেখেছে মেয়েটা। সূর্যের আলো বিপরীত থেকে আসায় ভালো ছবি উঠছে না।

র‍্যাভেনটা আরও একবার নড়াল ভালিয়া, নিচু করল আরও একটু। যেকোন ভাবে চাইছে আরোহীর পরিচয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে। হঠাৎ করেই সোজা হয়ে বসল মেয়েটা, কিছু একটা সতর্ক করেছে ওকে।

গাল বকতে বকতে ড্রোন সরিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করল সে।

পুরোটাই চালাকি।

সোজা ক্যামেরার দিকে নজর গেল পেছনের আরোহীর।

সেইচান।

হাত নড়ে উঠল সেইচানের, গুলি ছুঁড়ল যান্ত্রিক পাখিটা লক্ষ করে। একটা গুলি সরাসরি লাগল ক্যামেরাতে, সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল সম্প্রচার।

মনিটরের সামনে থেকে উঠে এল ভালিয়া, নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের উপর বিশ্বাস আছে ওর। বুঝতে পেরেছে, বাহনটা চালাচ্ছিল জেন ম্যাককেব।

নিজের মোটরসাইকেল বের করল ভালিয়া, ডুকাটি ১০৮০এস, মরুভূমিতে চলার উপযোগী বিশেষ চাকা ব্যবহৃত হয়েছে এটায়। শত্রুর বাইকের সাথে তুলনা করলে, ওটা খরগোশ, এবং এটি কালো চিতা। এই খোলা মরুতে কোথায় পালিয়ে যাবে ওরা দু'জন?

বহনযোগ্য ইউ.এ.ভি. মনিটর হাতে তুলে নিল সে, অন্য র‍্যাভেনকে চালু করে দিয়েছে ওদের দু'জনকে অনুসরণ করতে। এইবার আর গতবারের ভুল করল না, যথেষ্ট উঁচুতে রাখল যান্ত্রিক পাখিটাকে। কাছাকাছি পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত শত্রুদের গতিবেগ নজরে রাখবে এটা দিয়ে।

খুব কাছেই যেতে হবে, এমন কোন কথা নেই।

অ্যাসল্ট রাইফেল পিঠে ঝুলিয়ে নিল সে। অস্ত্রটা রাশিয়ান একে৭৪এম, জিপি-২৫ গ্রেনেড লঞ্চার লাগানো ব্যারেলের নিচে।

নিজের মোটরসাইকেল চালু করল সে।

এইবার শুরু হলো আসল খেলা!

সকাল ১০:৫১

বিস্মিত গ্রে অনুসরণ করল ডেরেককে, আরও গভীরে প্রবেশ করছে ওরা। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'যদি ভুল না হয়, তবে গন্তব্য খুব বেশি দূরে না।'

সবার শেষে কোয়ালস্কি, বারবার ফিরে তাকাচ্ছে পিছনের দিকে। কেঁপে কেঁপে উঠছে বিশালদেহী লোকটা প্রতিটা আওয়াজে। উপর থেকে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে পাথরের টুকরো, বাতাসে কুয়াশার মতো ছড়িয়ে আছে ধূলিকণা।

সামনে পথ আরও সংকীর্ণ হচ্ছে, মেঝে উঁচু হচ্ছে প্রতিটা পদক্ষেপে। সামনের দিকে ইশারা করল ডেরেক, 'ওই তো, ওটা মূত্রাশয়।'

চেপ্টা বেলুনাকৃতির অবয়বের দিকে তাকাল গ্রে, পাশেই আরেকটি বিশাল অবয়ব চাপা দিয়ে রেখেছে ওটাকে। বলল সে, 'প্রস্রাবের মুখ দিয়ে বের হতে পারব ভাবিনি।'

'প্রথম যখন ঢুকেছিলাম ভেতরে, তখন একটা অসঙ্গতির কথা বলেছিলাম আমি। তুতুর নাম লেখার ব্যাপারে।'

হায়ারোগ্লিফিক চিত্রটার কথা স্মরণ করল গ্রে, শেষে হাঁটু গেড়ে থাকা একটা অবয়ব ছিল। 'ওটা নারীত্ববাচক চিহ্ন।'

'এতক্ষণ ভুল করেছি আমরা।' বলল ডেরেক, 'আমরা তুতু নামক দেবতার পেটে নই, দেবীর পেটে আছি।'

হাত তুলে মূত্রাশয়ের উপরের অবয়বটা দেখাল সে, 'ওটা জরায়ু।'

পুরো ব্যাপারটা আরেকবার ভেবে নিল গ্রে, পাথুরে হৃদপিণ্ডের ভেতরের দেয়ালেও ছিল প্রজাপতির চিহ্ন। খুব সম্ভবত অবয়বটা নারীদেহের প্রতিনিধি বলেই। 'কীভাবে বুঝলে?' জানতে চাইল গ্রে।

পেছন ফিরে তাকাল ডেরেক, 'খুব একটা কঠিন হয়নি। আমি যে স্তম্ভটার আড়ালে ছিলাম, ওটা খেয়াল করেছিলে?'

নড করল গ্রে, একই সময়ে উপর থেকে ধসে পড়ল কিছু। কী পড়ল তা দেখার চেষ্টা করল ডেরেক। লোকটা হয়তো ভয় পাচ্ছে, ভাবল গ্রে।

কিন্তু বদলে শারীরবিদ্যার দিকে নজর ডেরেকের।

'ওটা ছিল ডিম্বাশয়,' বলল ডেরেক। 'ওখান থেকেই এদিকে বের হওয়ার রাস্তার সন্ধান পেলাম আমি।'

ওই রাস্তা আমাদের নিয়ে এসেছে এখানে।

জরায়ুর দিকে ফিরে তাকাল গ্রে।

'এখান থেকে অবশ্যই বের হওয়ার রাস্তা থাকবে, নারীদের বাচ্চা জন্মদানের প্রতীকী হিসেবে।'

মূত্রাশয় এবং জরায়ুর দিকে আলো ফেলল গ্রে, গাঢ় একটা অবয়ব নজরে পড়ল ওর। 'একটা দরজা!'

বিকট আওয়াজে খসে পড়ল ছাদের একাংশ, দেবীর পিছনের অনেকটুকু অংশ ভেঙে গিয়েছে। বিশাল এক গর্ত তৈরি হয়েছে ওখানে, আরও কিছু অংশ নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে।

'যাও।' আদেশ দিল গ্রে।

ছুটে গেল সবাই, আশ্রয় নিল কাঁধ সমান উঁচু মূত্রাশয়ের আড়ালে। দরজা পর্যন্ত পথটুকু আলোকিত করে রেখেছে গ্রে, বেশ বড় একটা গর্ত তৈরি হয়েছে ওখানে। দৌড়ে সবাই ঢুকে গেল ফাঁকা জায়গাটির ভেতরে।

জরায়ুর ভেতরে সব চুপচাপ, বাতাসে ধুলোও নেই তেমন। কিন্তু ভেতরে ঢুকেই গভীর ভক্তি জেগে উঠল গ্রে-র মনে, বুঝতে পারল এটা একটা ক্যাথেড্রাল।

আলো উপরে তুলল সে। হৃদপিণ্ড এবং পাকস্থলীর মতো, এখানকার দেয়ালেও ছবি আঁকা। দেবদূতের মতো সুন্দর সব শিশু নেচে বেড়াচ্ছে দেয়ালচিত্রে।

ভয়ানক দৃশ্যটা প্রথম খুঁজে পেল ডেরেক, 'নিচে দেখো।'

নিচে আলো ফেলল গ্রে। এখানকার বাচ্চাদের ছবি আঁকা, তবে বেশিরভাগেরই দেহ বাঁকা, কুঁচকে গিয়েছে হাত-পা। ওদের দেখে মৃত বা অত্যাচারিত মনে হচ্ছে।

আশ্চর্যে মুখে হাত চলে গেল ডেরেকের, কিন্তু বাদ সাধল এয়ার-মাস্ক। 'দশম মহামারীর প্রতীক। নিচে মেঝের ছবিগুলো ছেলে শিশুর, উপরে দেয়ালগুলোর ছবি মেয়ে শিশুর।'

গ্রে-ও দেখল।

এখানকার সবকিছুই শিক্ষাদানের নিমিত্তে।

দরজার বাইরে বালি ঝরে পড়া দেখে বলল কোয়ালোস্কি, 'জলদি নড়ো, নয়তো বাচ্চা ছেলেগুলোর মতো অবস্থা হবে আমাদেরও।'

মাথা নিচু করে সারভিক্সের দিকে এগোল ওরা। ছাদ নিচু হয়ে আসছে ক্রমান্বয়ে। শেষে এক পর্যায়ে হামাগুড়ি দিয়ে পার হতে হলো জায়গাটা, তবে পার হওয়ার পর মাথা উঁচু করার মতো জায়গা পেল। সুড়ঙ্গের ভেতর আলো ফেলল গ্রে, জরায়ুর নালীর শেষে পাথর দিয়ে বন্ধ।

'বাহ! দেবী দেখি কুমারী।' বলে উঠল বিশালদেহী লোকটা।

গ্রে-র কনুই স্পর্শ করল ডেরেক, 'আলোটা নিভিয়ে দাও।'

অন্ধকার জেঁকে বসল ভেতরটায়। চোখ সয়ে আসতেই পাথরের ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ আলো নজরে এল ওর।

'রাস্তাটা বন্ধ হয়েছে খুব বেশিদিন হয়নি।' বলল ডেরেক, 'চেষ্টা করলে বের হওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব

আকস্মিক প্রবল বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল মাটি, পেছন থেকে আছড়ে পড়ছে বালি এবং ধুলো। সামনে আরও বড় বড় পাথরখণ্ড ভেঙে ভেঙে পড়ছে, আটকে দিচ্ছে বাইরে বের হবার রাস্তা।

'হাতে সময় নেই।'

পাথুরে সারভিক্সের পাশে আড়াল নিল সবাই। ওখান থেকেই শেষ রকেট টিউবটা আরপিজি লঞ্চারে লাগাল গ্রে।

'কান বন্ধ করো সবাই।'

পেটের উপর ভর দিয়ে শুয়েছে সে, নিশানা তাক করে ছুড়ল রকেট।

বিস্ফোরণের আগুন এবং আওয়াজে অন্ধ-বধির হয়ে গিয়েছে সে। কাঁধের উপর পড়ছে পাথর, কেউ একজন ওর পা টেনে ধরল।

ঝাঁপসাভাবে শুনতে পেল সে, 'দৌড়াও, জলদি।'

মাথা উঁচু করল গ্রে, দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে। সামনে শুধু একটা দৃশ্যই নজরে পড়ল ওর।

সূর্যের আলো।

সেই উজ্জ্বলতা ঢেকে দিচ্ছে গাঢ় কিছু ছায়া।

'দৌড়াও।' পেছন থেকে ঠেলে দিল কোয়ালস্কি। 'নয়তো বন্ধ হয়ে যাবে ফোকর।'

এতক্ষণে বুঝতে পারল গ্রে, সোজা ছুটে গেল ওটা লক্ষ করে। দৌড়ে এসে লাফ দিয়ে গর্তটার ওপাশে পড়ল সে, বালুর উপর পড়ে গড়ান খেল। ওকে অনুসরণ করেছে বাকি দু'জনও।

দ্রুত ওখান থেকে সরে গেল সবাই, নিরাপদ দূরত্বে থেকে ধ্বংসস্তূপ দেখতে লাগল।

'দিলে তো দেবীর সর্বনাশটা করে।' বলল কোয়ালস্কি।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল গ্রে, ডেরেকও সুস্থির নয়। বলল লোকটা, 'ট্র্যাক আছে ওপাশে।'

মরুভূমির দিকে তাকাল গ্রে, দূর থেকে একটা ট্রেইল নজরে পড়ছে।

সেইচান পেরেছে।

সকাল ১১:০২

পারব না আমরা।

মোটরসাইকেলের হাতল ধরে ঝুঁকে আছে সেইচান, উড়িয়ে নিয়ে চলছে বাহনটাকে। পনেরো মিনিট আগে, ড্রোনটাকে গুলি করে অকেজো করে দিয়েছিল সে। এরপর জেনের সাথে সিট বদল করে বসেছে চালকের আসনে। চেষ্টা করছে শত্রুর সাথে দূরত্ব বাড়িয়ে নিতে।

কিন্তু ভাগ্য সহায় হচ্ছে না।

এগিয়ে না থাকলে সহজে পৌঁছুতে পারবে না রুফায়। আগেই হামলা করে বসতে পারে শত্রু। আহমাদকে রেডিয়ো করার চেষ্টা করছে জেন, কিন্তু সাড়া পায়নি।

ঝুঁকিপূর্ণ বন্ধুর পথে পূর্ণ গতিতে বাহন ছুটিয়ে চলেছে সেইচান। ওর কোমর জড়িয়ে ধরে বসে আছে জেন। ডানদিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা। ওদিকে তাকাতেই একটা ধুলোর মেঘ দেখতে পেল সেইচান।

দৃশ্যটাকে মরীচিকা বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর।

এত দ্রুত কী ছুটে আসছে!

গতিবেগ কম করে হলেও একশ মাইল প্রতি ঘণ্টায়।

তবুও জানে সে, যা দেখছে সব সত্য। এত দ্রুতবেগে কে ধেয়ে আসছে ওদের দিকে, তাও অজানা নেই ওর কাছে।

দাঁতে দাঁতে চেপে গতি আরও বাড়াল সেইচান।

ধুলোর মেঘ চলে এসেছে কাছে, কালো-সোনালি মোটরসাইকেল ওটা। চালক নিচু হয়ে ঝুঁকে আছে সিটে, পাণ্ডুর বর্ণের সেই মেয়েটা! বালুর পাহাড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওদের পথে।

উপায় এখন একটাই, উঁচুতে উঠে আত্মগোপন করা।

লক্ষ্য স্থির হতেই, ইঞ্জিনের সর্বোচ্চ শক্তি নিংড়ে বের করায় মনোযোগ দিল সে।

জলদি

হুট করেই শুরু হলো পর্বত, দূর থেকে এতটা উঁচু মনে যায়নি। কিন্তু ফিরে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। মোটরসাইকেলটার পিছনের চাকায় নিজেদের ভর স্থানান্তর করল ওরা, যাতে সহজে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে পারে ওটা। বালু কামড়ে ধরল চাকা, তবে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে এগিয়ে গেল ঠিকই। গতি কমাল না সেইচান, গতি কমালেই গড়িয়ে পড়বে বাহন।

তবুও, বেশ কষ্ট হলো রাস্তাটুকু পার হতে। ঢাল বেয়ে উঠা শেষ হতেই, আচমকা ঢালু হয়ে গেল পথ। পাহাড়ের অপরপাশ বেয়ে পিছলে নেমে গেল মোটর সাইকেল। পিছনের চাকা যাতে বালির গভীরে দেবে না যায়, তার জন্য রীতিমতো যুদ্ধ করতে হলো সেইচানকে।

শিকারি ওদের চেয়ে আর মাত্র পঞ্চাশ গজ পিছনে-শঙ্কিত হয়ে উঠল সে। চেষ্টা করছে পালানোর উপায় খোঁজার।

হঠাৎ করে বিস্ফারিত হলো সামনের বালি, সরে যাওয়ার সময় নেই। নড়ে উঠল মোটরসাইকেল, উভয় আরোহীই ছিটকে পড়ল। কোনমতে পা দিয়ে আটকে নিজের পতন ঠেকাল সেইচান, কিন্তু জেনের কপাল ততটা ভালো নয়। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে সে, ঢাল শেষে তবে থামল পতন। শত্রু চলে এসেছে মেয়েটার পাশে, হাতের অস্ত্র থেকে ধোয়া বের হচ্ছে।

সিগ সয়্যারের জন্য হাত বাড়াল সেইচান, কিন্তু হোলস্টারে স্পর্শ করে দেখল ওটা খালি!

কিছুই করার নেই ওর।

প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথায় হেলমেট নেই, শুধু একটা স্কার্ফ। কিন্তু মেয়েটার দেঁতো হাসি ঠিকই টের পেল সে। কারণ, অতীতে অস্ত্রের ওপাশে ও নিজেই তো ছিল বহুবার।

জেনের কাছে এসে মোটরসাইকেল থামাল শত্রু।

থেমে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ, নতুন একটা আওয়াজ শোনা গেল।

কুকুরের ঘেউ ঘেউ!

বালুর পাহাড়ের অন্য পাশ থেকে আসছে শব্দ।

লোমশ একটা অবয়ব ছুটে আসছে ওর দিকে।

আনজিং।

উঁচু পাহাড়ের অন্য পাশ থেকে কালো কয়েকটি অবয়ব নজরে এল, সবার পরনেই মরু-আলখাল্লা। প্রত্যেকের হাতেই লম্বা নলের রাইফেল, শুয়ে অস্ত্র তাক করে আছে এদিকে। পাণ্ডুর বর্ণের মেয়েটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল ওরা। কিছু গুলি লাগল পাথরে, কিছু বালিতে। হঠাৎ আক্রমণে পিছু হটল প্রতিদ্বন্দ্বী, মোটরসাইকেল ঘুরিয়ে নিল। পালানোর পথ করে নিতে ফাঁকা গুলি বর্ষণ করল আক্রমণকারীদের উপর। দ্রুতগতিতে চালু করল ইঞ্জিন, শিকারের আশা ছেড়ে দিয়ে সরে গেল।

সেইচানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুরছানাটা, চেটে দিল মুখ। ওকে ঘিরে নাচতে শুরু করেছে।

'কীভাবে .?' সারি ধরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে নজর সেইচানের। 'কে..?'

হাত নাড়ল আহমাদ, হাসছে, 'রুফা থেকে এসেছে। তোমাকে খুন করতে।'

ওর বিস্মিত নজর দেখে হাতে চাপড় দিল বাচ্চা ছেলেটা, 'ওরা ভেবেছিল তুমি খুন করেছ গ্রামের দুই বয়স্ক মানুষকে। সকালে মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছে। অনুসরণ করে এসেছে পেছন পেছন।'

প্রতিশোধ নিতে!

গ্রামে ট্রাকের কাছে আসতে চাওয়া অবয়বটার কথা মনে পড়ল ওর। এই পাণ্ডুর বর্ণের মেয়েটাই এসেছিল ওই রাতে। খুনগুলোও খুব সম্ভবত সে-ই করেছে।

'আমার ট্র্যাক পেয়েছে ওরা।' বলল আহমাদ। 'আমি বললাম, তুমি খুন করোনি। তারপর দেখলাম তোমাকে।' হাত দিয়ে ধুলোমাখা ট্রেইলের অনুকরণ করল ছেলেটা। 'তোমার সাথে দেখা করতে এল।'

এবং রক্ষা করল বিপদ থেকে. . .

ততক্ষণে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে জেন, উপরে উঠে এল সে। ওদের সাথে পাহাড়ের চূড়ায় উঠল মেয়েটা। পাহাড়ের এককোনায় কয়েকটা স্যান্ডবাইক, উট রাখা। যাযাবরদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে হয়তো দলটা।

কিন্তু কিছু একটা নেই।

'ইউনিমগটা কোথায়?'

'কাছেই, বেশি দূরে না। আওয়াজ, খুব আওয়াজ।' হাত দুটো আবারও বাতাসে নাড়ল আহমাদ। 'লুকিয়ে আসা যায় না।'

দূরতম দিগন্তের দিকে ফিরে তাকাল সেইচান, নিতম্বের মতো দেখতে পাহাড় জোড়া নজরে পড়ছে এখান থেকেও। ঠিক পাহাড় দুটোর সংযোগস্থল থেকে ধুলোর মেঘ ছড়িয়ে গেল।

গ্রে

জেনও লক্ষ করেছে দৃশ্যটা, 'ওরা বের হয়েছে মনে হয়।'

আহমাদের কাঁধ ধরল সেইচান, 'একটা রাস্তাই আছে নিশ্চিত হবার।'

বিশ

৩ জুন, সকাল ৬:০৮ ই.ডি.টি.
এলেসমেয়ার দ্বীপ, কানাডা

ডেস্কে বসে আছে পেইন্টার, দ্বিতীয়বারের মতো পড়ছে বইটা। কাহিনি পড়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে সে। দুটো ভাগ হয়েছে গল্প, লন্ডনে নিকোলা টেসলার যাপিত জীবন, অন্যটা-নুবিয়ার মরুতে কাটানো সময়ের বিবরণ। দ্বিতীয়টাতে উল্লেখ আছে স্যার হেনরি মর্টন স্ট্যানলি এবং অন্যান্য লোকদের কথা। আছে স্যামুয়েল ক্লেমেন্স.

ওরফে মার্ক টোয়েনের কথাও

আনমনে মাথা দোলাল পেইন্টার।

বুঝতে পারছে, কেন নোটবইটা নিয়ে এখনও কোন সাড়া-শব্দ হয়নি। বর্তমান পরিস্থিতি নিজ চোখে না দেখলে ও নিজেই বিশ্বাস করত না। বিজ্ঞানীর বর্ণনা মতে, স্যার স্ট্যানলির আমন্ত্রণে তিনি এবং টোয়েন কাজ করছিলেন লন্ডনে। একটা মহামারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই রোগটাই ছড়িয়েছে এখন আবার। ডেভিড লিভিংস্টোনের পাত্রটার কথা পেইন্টারের অজানা নয়, পুরো ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করে ওই ঘটনা।

বাষ্পচালিত জাহাজে চড়ে আটলান্টিকে পাড়ি জমায় অভিযাত্রী দল, সেখানে একসাথে হয় সবাই। সরাসরি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যায় টেসলা, নিরাপত্তাজনিত কারণে তখন বন্ধ ছিল ওটা। ওখানেই মিশরীয় আর্টিফেক্টের উপর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এক অদ্ভুত নমুনা আবিষ্কার করেন তিনি। বুঝতে আর বাকী রইল না বিজ্ঞানীর, মাইক্রোস্কোপের নিচে রাখা লাল জীবাণুটাই মহামারীর কারণ।

জীবাণুর নাম দিলেন পেস্টিস ফুলম্যান, ল্যাটিন নামটির অর্থ "বজ্রের মহামারী"। এমনকী টেসলার আগেই, ব্রিটিশরা লক্ষ্য করেছিল ব্যাপারটা। ঝড়ের সময় বজ্রপাতের সাথে সাথে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল লাল পানি। যেন বায়ু থেকে চার্জ সংগ্রহ করছে! তাই, তড়িৎশক্তির উপর দক্ষ কাউকে প্রয়োজন হলো তাদের। সেই জন্য, স্ট্যানলিকে পাঠানো হলো আমেরিকা। প্রথমে এডিসনের কথা ভাবলেও, পরবর্তীতে টেসলাকেই ডেকে আনা হয়। বিষয়টি নিয়ে অবশ্য খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না বিজ্ঞানী নিজেও, তারই প্রকাশ ঘটেছে নোটবইয়ের পাতায়।

তবুও নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে রোগমুক্তির উপায় খুঁজতে লাগলেন টেসলা। অত্যধিক তড়িৎ প্রবাহের মাধ্যমে জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া সম্ভব। তবে তাতে রোগীও মারা যাবে একই সাথে। ফ্রান্সিস বেকনের মন্তব্য টুকে রেখেছেন বিজ্ঞানী, 'জীবাণু নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম হয়েছি আমি, তবে খুন করেছি রোগীকে।' ব্যর্থ প্রচেষ্টা এবং দুঃখজনক পরিণতির স্বাক্ষর এটি।

পরবর্তীতে, হতাশ হওয়ার বদলে তিনি হয়ে উঠলেন আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জীবাণু নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন নতুন উদ্যমে, চেষ্টা করলেন ওটাকে বোঝার। এমনকী পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চেষ্টা করেছেন ওটার কার্যকারিতা উদঘাটন করতে। তবে সেগুলো সব কালি দিয়ে ঢেকে দেয়া, সাইমন চায়নি পেইন্টার গোপন তথ্যগুলো জেনে যাক।

বাইরের দিকে তাকাল সে, বিশাল এবং সুসজ্জিত অ্যান্টেনার কাঠামোর দিকে ওর নজর।

অতীতের টেসলার চেষ্টা থেকে কিছু না কিছু অবশ্যই শিখেছে হার্টনেল। বইয়ের পাতায় আবার মনোনিবেশ করল সে।

একদম শেষে, নিজের গবেষণা থামিয়ে দিলেন টেসলা। অনুধাবন করলেন, কাজটা বেশ বিপজ্জনক, মূলত রোগটার ধর্ম বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান তিনি। বর্ণনায় উল্লিখিত অর্ধেক লোকই এই মতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলেন।

টেসলাকে লন্ডনে রেখে আসার পর, টোয়েন এবং স্ট্যানলি ছদ্মবেশে ভ্রমণ করলেন কায়রো। একটাই লক্ষ্য-লিভিংস্টোনের সূত্র ব্যবহার করে রোগটার উৎস এবং নিরাময় অনুসন্ধান।

সেই ব্যাপারে টেসলার কাছে লিখেছেন টোয়েন।

যেভাবে আমাদের বন্ধু সব তথ্য লুকিয়েছে-তা অতি চমকপ্রদ এবং বুদ্ধির পরিচায়ক। কিন্তু লিভিংস্টোনের কাছে ঋণী আমরা। সরাসরি নুবিয়ার মরুভূমিতে সে নিয়ে গিয়েছে আমাদেরকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, স্যার স্ট্যানলির স্মৃতির প্রতি বিশ্বাস রাখতে হচ্ছে আমাদের। কারণ, বিস্তারিত তথ্য লেখা লিভিংস্টোনের চিঠিটা হারিয়ে গিয়েছে বহু আগেই। তবুও, চলে এসেছি আমরা, আবার সেই ঊষর ভূমিতে, যেখানে আছে শুধু গাধা আর উট। আগামীকাল, মালবাহী গাড়িতে করে রওনা দেব সবাই। সাথে থাকবে

একদল শক্তিশালী আরব এবং কালো চামড়ার ইথিওপিয়ার লোক। আশা করি, যথেষ্ট অর্থকড়ি দেওয়া হয়েছে ওদের। অন্তত মাঝ মরুতে আমাদের ফেলে যাবে না ওরা।

টোয়েনের লেখা কথাগুলো পড়ছে পেইন্টার, পুরো ঘটনাটি বিস্তারিত লিখেছেন তিনি। অবশ্য, বিস্তারিত লেখার উদ্দেশ্য-পরবর্তীতে কেউ যাতে আসতে পারে এখানে। একটা উপত্যকা আবিষ্কার করেছিল দলটা, চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা। এখান থেকেই বাস্তবতাকে হার মানিয়েছে বর্ণিত কাহিনি। মমি, অভিশাপ এবং বালিচাপা পড়া মহৎ পাথুরে দেবী চলে এসেছে আলোচনায়।

টোয়েনকে স্মরণ করিয়ে দিল ওটা ঈশ্বরের মহত্ত্ব।

কল্পনায় তার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছি আমি, মুখ থুবড়ে আছেন মাটিতে, চাপা পড়েছেন কাঁধের বোঝার চাপে। অসীম ধৈর্য তার, অপেক্ষা করছেন উদ্ধারের আশায়। আমাদের মুক্তি ও পরিত্রাণই তার স্বপ্ন, নিজের জন্য নেই কোন চাহিদা। দেহটা ঠিক যেন আলোকবর্তিকা, অতীতের অন্ধকার ভেদ করে ভবিষ্যতের আলো দেখাচ্ছেন আমাদের।

বিশেষ মন্দিরে কিছু একটা অবশ্যই আবিষ্কার করছেন স্ট্যানলি ও টোয়েন। এক মাস পর, ইংল্যান্ডে ফিরে এলেন দু'জন। সেখানেই রোগমুক্তির উপায় খুঁজে পেলেন এবং ঠেকিয়ে দিলেন মহামারী।

কিন্তু রোগের প্রতিকার সম্পর্কে এখনও নিশ্চুপ টোয়েন। মনে হচ্ছে, মন্দিরে আরোগ্যের উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন তারা, প্রতিষেধক নয়। হতাশাজনকভাবে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে কিছুই লেখেননি মহৎ এই ব্যক্তি, তবে কারণটাও উল্লেখ করেছেন। সাবধান করে দিয়েছেন মন্দিরের ভেতর এবং বাহিরের বিপদ থেকেও।

তার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাব না আমি। ঘুমুতে দেব তাকে, শান্তিতে দেবো স্বপ্ন দেখতে। তিনি জানুন-আমাদের রক্ষা করেছেন।

ঘটনার শেষ হলো টেসলা এবং টোয়েন ফিরে আসার মাধ্যমে, পুরো বিষয়টি গোপন করে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন তারা দু'জন। একজনের কথা

উল্লেখ করে উপসংহার টানলেন টেসলা, আফ্রিকার মাটি এবং মানুষের প্রতি যার রয়েছে অসীম টান।

ডেভিড লিভিংস্টোনকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত আমাদের, সব ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি। এমনকী মহৎ ব্যক্তিটার স্বর্গীয় আত্মাও রক্ষা করেছে আমাদের নরকবাস থেকে। তার এই ত্যাগ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য . . . এবং তাতে ব্যর্থ হলে ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন।

বইটা বন্ধ করে দিল পেইন্টার, হাত রাখল ওটার উপর। দরজা খোলার আওয়াজ শুনতে পেল। উপরে তাকাতেই নজরে এল সিলিং-এ ঝোলানো ক্যামেরা। জানে সে, কে নজর রাখছে ওর উপর, অপেক্ষায় আছে ওর পড়া শেষ হওয়ার।

কাগজগুলো সরিয়ে রাখল একপাশে।

এবার, কাজ শুরু যাক।

সকাল ৬:৩২

বন্দির দিকে নজর সাইমনের, আবারও স্থান হয়েছে লোকটার ওই চেয়ারে। বরাবরের মতোই চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে হাত-পা। লোকটার বিশ্বাস অর্জন করতে চায় সে, অন্তত যাতে ওর সঙ্গীদের বের করে আনা যায় বাইরের ঝড় থেকে।

চুরি হওয়া তথ্যটুকু আমার বড়ই প্রয়োজন।

ডেস্কে হেলান দিয়ে বসল সাইমন, 'তাহলে এখন তুমি জানো পুরো কাহিনিটা।'

শ্রাগ করল পেইন্টার, 'আমার মনে হচ্ছে, এখনও আমি এখনও সেই অন্ধকারেই আছি। এখানে ঠিক কী ঘটছে তা বুঝতে পারছি না।'

'সত্যি বলতে, আমার অবস্থাও ঠিক তাই ছিল। টেসলার নোটবুক আমার হাতে এসে পৌঁছায় ১৯৮৫ সালে। তখন আমার পর্যাপ্ত আর্থিক সামর্থ্য ছিল না, যা এখন আছে। তাই, টেসলার গবেষণা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি আমি। ভেবেছিলাম, তাত্ত্বিক দিক থেকে এই প্রকল্প সম্পর্কে মত দিয়েছেন বিজ্ঞানী। এমন এক অণুজীবের অস্তিত্ব, মানব কল্যাণে তা ব্যবহার করা-কিছুই জানা ছিল না আমার।'

'কিন্তু এসব কিছুই এখন সত্য।'

শ্রাগ করল সাইমন, 'কিন্তু গুটি কয়েক বছর আগেও কেউ ধারণা করতে পারেনি এসব। কয়েক বছর আগে, ক্যালিফোর্নিয়ার কয়েকজন জীববিজ্ঞানী এমন এক

ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেছিল যা তড়িৎখাদক এবং তড়িৎবিকিরক। বেঁচে থাকে তড়িতের উপর ভিত্তি করেই।' হাসল সে। 'তুমি আমার কৌতূহল বুঝতে পারবে আশা করি।'

ভ্রূকুটি করল পেইন্টার, স্বীকার করে নিল যেন।

'ততদিনে আমার আর্থিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। তাই, সামনে এগোনোর পরিকল্পনা করলাম আমি।'

'লক্ষ-কোটি মানুষের উপকারের উদ্দেশ্যে?'

'না, কেবলমাত্র একজনের জন্য!' হাত নেড়ে কথা শেষ করল সে। 'যাই হোক, দেশ এবং দেশের বাইরে যারা এই ধরনের অণুজীব নিয়ে কাজ করে, তাদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করলাম। বাস্তব প্রয়োগ খুঁজতে শুরু করলাম, যেমন- ইঞ্জিনিয়ারিং বায়োকেবল, জীবন্ত ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে তড়িৎ স্থানান্তরের প্রক্রিয়া অথবা ন্যানোস্কেল প্রক্রিয়ায় তৈরি অণুজীব, যা দূষিত পরিবেশ পরিষ্কার করতে পারে। ভবিষ্যতে ওসবের কার্যকারিতা বেশ রোমাঞ্চকর।'

'সেই সাথে যথেষ্ট লাভজনকও।' বলল পেইন্টার। 'কিন্তু তোমার লক্ষ্য এটা নয়। টেসলার প্রকল্পের জন্য বিশেষ সেই অণুজীবটা খুঁজছ তুমি, যার উল্লেখ আছে ওই নোটবুকে।'

নড করল সাইমন, আরও একবার উপলব্ধি করল কতোটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার মানুষ বসে আছে আসনে।

সাবধানে পা ফেলতে হবে।

'কিছুই পেলাম না, তাই ফিরে গেলাম আবার বইটাতে। ওখানে লেখা টোয়েনের কাহিনি যে কোন কাল্পনিক গল্প নয়, তা অনুধাবন করলাম। লেখকের বর্ণনায় বারবার মনে হচ্ছিল, হাক ফিন এবং টম সয়ারের বদলে নিজেকে এবং নিজের কোন বন্ধুকে বসিয়ে দিয়েছেন!'

'তাই, বর্ণনাটা অনুসরণ করলে তুমি।'

'ঠিক আমি না। জীববিজ্ঞানীদের নিয়ে আর কাজ নেই আমার, শুরু করলাম নৃতাত্ত্বিকদের তহবিল দেওয়া। ওই অঞ্চলে যাদের আগ্রহ আছে, সবাইকে দেওয়া হলো অনুমোদন।'

'প্রফেসর ম্যাককেবের মতো।'

'না, আসলে তার ছেলেকে দিয়েছিলাম। যুবক সন্তান পিতার ছায়া থেকে বের হতে চাইছিল, কিছু একটা করতে চাইছিল নিজের জন্য। স্ট্যানলি এবং

লিভিংস্টোনের মধ্যে সম্পর্ক অনুসন্ধানের বুদ্ধিটা ওকেই দেই আমি। আশা ছিল, ছেঁড়া সুতো জোড়া দিতে পারবে সে। যখন ব্যর্থ হলো সে, পিতার সাহায্য চাইল। কিন্তু আড়ালে কলকাঠি নাড়ছে অন্য কেউ তা বুঝতে দিল না।'

'এবং প্রফেসর সফল হলেন।'

'পুরোপুরি নয়, কিছুটা বলা যায়। মূলত মাঠ পর্যায়ের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে সফল হয়েছেন তিনি। এই অঞ্চল সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতা, পুরনো কাগজে লিখে রাখা লিভিংস্টোনের সূত্র-এসব মিলিয়ে খোঁজ করা শুরু করলেন প্রফেসর। নিজের ছেলেকে সাথে নিয়ে চষে বেড়িয়েছেন এই এলাকা।' হাত উঁচু করল সাইমন, 'ধর্মের অনিষ্ট ছিল না এই কাজে, বরং বৈজ্ঞানিক কৌতূহল মেটানোর একটা যৌথ প্রয়াস ছিল কেবল।'

'মানলাম, কিন্তু এরপর কী হয়েছিল?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সাইমন, 'যেমনটা বলেছিলাম, প্রফেসরের জন্যই আমরা বিপদে পড়েছি। মন্দিরে ফেলা তার প্রথম পদক্ষেপ থেকে শেষ পদক্ষেপ পর্যন্ত অজস্র মানুষের মৃত্যুর কারণ তিনি। আমি সেই ক্ষতিটা কমানোর চেষ্টা করছি কেবল।'

পেইন্টারের মুখের তিক্ত অভিব্যক্তি থেকে বোঝা গেল, কথাগুলো বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেনি সে। তবুও বলল লোকটা, 'যাও, মেনে নিলাম। বাকি কাহিনি বলো। ধরে নিচ্ছি, টেসলার পেস্টিস ফুলম্যান জীবাণু পেয়েছ তুমি। কিন্তু ওটা দিয়ে ঠিক কী করতে চাইছ?'

কথাগুলো বলার জন্য ডারপা কর্মকর্তাকে বাহবা না দিয়ে পারল না সাইমন। 'তারবিহীন শক্তি প্রকল্প বাস্তবায়নের একমাত্র অন্তরায় ছিল একটা ব্যাটারি না পাওয়া। যেমনটা আগেই বলেছিলাম, আয়নমণ্ডল ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। সেটার জন্য ওখানে প্রয়োজন একটা ব্যাটারির, যা শক্তি সঞ্চয়ের পাশাপাশি শক্তি ছড়িয়ে দিতেও পারবে।'

ঘটনা বুঝতে পেরে চোখ বড় বড় হয়ে গেল পেইন্টারের, 'অণুজীবটাকে জীবন্ত ব্যাটারি হিসেবে ব্যবহারের স্বপ্ন দেখেছিলেন টেসলা!'

'জাদুঘরের পরীক্ষাগুলো তার এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন সমর্থন করেছিল। তিনি ধারণা করেছিলেন, আর আমি তা প্রমাণ করে দিয়েছি। এই অণুজীব হাজার বছর না বাঁচলেও অন্তত একশ বছর বাঁচতে পারবেই-যতক্ষণ খাবারের সরবরাহ পাচ্ছে ওটা।'

'অন্য কথায়, বিদ্যুৎ।'

'অবশ্যই। এই জীবাণু শুধুমাত্র জীবন্ত ব্যাটারিই নয়, সেই সাথে অবিনশ্বরও।'

সকাল ৬:৪০

চেয়ারে বসে আছে পেইন্টার, পুরো বিষয়টি ভেবে চক্কর খাচ্ছে মাথা।

লোকটা উন্মাদ . জ্ঞানী . কিন্তু বদ্ধ উন্মাদ।

হার্টনেলের দিকে ফিরল সে, 'আয়নমণ্ডলে এই জীবাণুর চাষ করার পরিকল্পনা করতে চাইছ তুমি?'

এমন আরও একটি পরিকল্পনার কথা কানে এসেছে ওর। আয়নমণ্ডলে প্লাজমা ব্যবহার করে রেডিয়ো সিগন্যাল বর্ধিত করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে বিমান বাহিনী। সেই সাথে এমন কিছু ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পেয়েছে বিজ্ঞানীরা, যেগুলো বেঁচে থাকতে পারে ওখানে। ওসবের খাদ্য হচ্ছে অক্সালিক এসিড।

তাই, এটাও সম্ভব।

কিন্তু এই পরিকল্পনা

'বিশেষভাবে বানানো মালবাহী বিমান তৈরি আছে এখানে, ওসব থেকে উঁচুতে ছেড়ে দেওয়া হবে আবহাওয়া বেলুন। প্রতিটা বেলুনে সোয়া টন জীবাণু ধরবে। বায়ুমণ্ডলের নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছুতেই বোমার সাহায্যে ফাটিয়ে দেওয়া হবে ওটা।'

ভয়ে দম আটকে আসছে পেইন্টারের, কল্পনায় দেখল ভয়ংকর দৃশ্যটা। মরুভূমির ওই মন্দির থেকে হার্টনেল নমুনা নিয়েছে হয়তো, তা-ই বয়ে এনেছে এখানে। লোকটার উদ্দেশ্য জানতে পেরে বুঝতে পারল কেন এই স্টেশনটায় ভূগর্ভস্থ অংশ রাখা হয়েছে।

'অরোরা।' বলল সে, 'ওটার সাহায্যেই উপর থেকে শক্তি সংগ্রহ করবে তুমি।'

'যদি আমার হিসাব-নিকাশ ভুল না হয় এবং অতীতে নির্মিত প্রোটোটাইপ সত্য দেখিয়ে থাকে। এই অণুজীবগুলো সেই শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে সক্ষম।' আকাশের দিকে তাকাল লোকটা, 'কল্পনায় পুরো বায়ুমণ্ডল জুড়ে টেসলার পেস্টিস ফুলম্যান দেখছি আমি। জীবিত ইলেকট্রনিক ব্যাটারি। প্রাকৃতিক শক্তিও সঞ্চয় হবে এই আয়নমণ্ডলেই, সৌর বাতাসে চালিত হবে।'

'অসীম শক্তির উৎস হবে ওটা।'

পেইন্টারের দিকে নজর ফিরল ওর, 'নিকোলার মতো, আমিও চাই পুরো বিশ্ব জুড়ে থাকবে এই পাওয়ার প্ল্যান্ট, এমনকী ঘরেও। হাজার হাজার টেসলা কয়েল ঝুলে থাকুক আকাশে-এই আমার আশা।'

বেশ বৃহৎ কর্মযজ্ঞ।

'একবার ভেবে দেখো। কোন জ্বলন্ত কয়লা নেই, নেই জ্বালানি ধ্বংস, বাতাসে নেই বাড়তি কার্বন ডাই-অক্সাইড। সেই সাথে বাড়তি আরেকটু সুবিধা।'

'কী?'

'জীবাণুর লাল আস্তরণ প্রাকৃতিক সানস্ক্রিনের কাজ করবে। খুব হালকা, তবে পৃথিবীকে জ্বলন্ত উনুন হওয়া থেকে বাঁচাবে।'

লোকটার কল্পনার শক্তিকে বাহবা না দিয়ে পারল না পেইন্টার, কিন্তু সেই সাথে মাথায় রাখল-একটু এদিক-ওদিক হলেই পুরো প্রকল্পটা দুর্যোগে পরিণত হবে। বিশেষ করে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, সমস্যা অবশ্যম্ভাবী।

'কিন্তু এই জীবাণুটা মারাত্মক মৃত্যু ডেকে আনতে পারে যেকোন মুহূর্তে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সাইমন, 'সেজন্যই দরকার ছিল প্রতিষেধকের। স্থানীয় পর্যায়ে এই পরীক্ষাটি করতে চাইছিলাম আমি। ভূ-চৌম্বকীয় ঝড়ের কারণে পরিস্থিতি নিখুঁত হয়ে দাঁড়িয়েছে, আয়নমণ্ডলে শক্তি সঞ্চার সহজ হবে।'

'কিন্তু তোমার কাছে তো প্রতিষেধক নেই।'

'থাকবে, যদি তোমার সহকর্মীকে সহযোগিতা করাতে রাজি করাতে পারো। ছিনিয়ে নেয়া জিনিস ফেরত নিতে চাই। ড. আল-মায়াজ এবং রোরি সমাধান প্রায় করেই ফেলেছিল বলে আমার বিশ্বাস। এমন কিছু পেয়েছিল ওরা যা দিয়ে আমরা প্রতিষেধক আবিষ্কারে সক্ষম হবো।'

হার্টনেলের ব্যতি-ব্যস্ততার কারণ বুঝতে পারল পেইন্টার, 'যদি আমি সাহায্য না করি?'

শ্রাগ করল লোকটা, 'তবুও চলবে পরীক্ষা।'

আঁতকে উঠল পেইন্টার, 'কী? পাগল হয়েছ তুমি?'

'না, এখনও হইনি। কিন্তু আত্মবিশ্বাস আছে, ক্ষতি হবে না। ব্যর্থ হয়েছিলেন টেসলাও, তবে ক্ষতি হয়নি কারও। তেমন কিছু হলে অ্যান্টেনার সাহায্যে অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক প্রবাহ দিয়ে ধ্বংস করে দিব সব।'

ফ্রান্সিস বেকনের কথাটা মনে পড়ল পেইন্টারের।

জীবাণু নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম হয়েছি আমি, তবে খুন করেছি রোগীকে।

সাবধানতা অবলম্বন না করলে এই উন্মাদও ওই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটাবে।

'তবে, অবশ্যই কাজটা করতে চাই না আমি।' বলল হার্টনেল, 'সেজন্যই তোমার সাহায্য দরকার।'

সকাল ৬:৫০

ক্যাটের দেহ অবসন্ন প্রায়, নিজ গতিতেই চলছে স্নো-ক্যাট, হাত দিয়ে কোনমতে ধরে রেখেছে স্টিয়ারিং। পেছন থেকে ঝড়ো হাওয়া ঠেলছে গাড়িটাকে, নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে নিয়ে চলছে যেন। কালো মেঘে ঢেকে আছে গোটা আকাশ, হারিয়ে গিয়েছে শুভ্র পর্বতের চূড়া।

এই অনন্ত উষাতেও ঝড়ের রূপ শ্বাসরুদ্ধকর।

বিশাল উপত্যকা হারিয়ে গিয়েছে তুষারের চাদরে, নিচে ক্ষীণ ধারার স্রোত বয়ে চলছে। এখনও জমাট বেঁধে আছে ওটা, তবে কিছু জায়গায় গাঢ় নীল রং। হ্রদে গ্রীষ্মের ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে মাত্র। ঠিক মাঝখানেই একটা গাঢ় অন্ধকার দ্বীপ জেগে আছে।

'হ্যাযেন হ্রদ,' বিড়বিড় করে বলল ক্যাট।

তাকাল সাফিয়া, হেলান দিয়েছে জানালায়।

দ্বীপের মানচিত্র মনে আছে ক্যাটের, 'যদি এটাই সেই দ্বীপ হয়, তবে অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে দিয়েছি এতক্ষণে।'

'তোমার বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন,' বলল সাফিয়া। 'গত দু'ঘণ্টায় পিছনে কাউকে দেখিনি আমরা।'

বলগা হরিণের আকস্মিক আবির্ভাবের পর, স্নো-ক্যাট পাথুরে রাস্তায় চালিয়ে নিয়ে এসেছে ক্যাট। সাবধানে এড়িয়ে গিয়েছে বরফ, নিজেদের চিহ্ন লুকিয়ে চলেছে যতটুকু সম্ভব। সে জানে না অনুসরণকারীরা এখনও আছে নাকি পেছনে, অথবা আদৌ ছিল কিনা।

'হয়তো ঠিক বলেছ তুমি। অন্তত পা দুটো মেলতে হবে আমার।'

'আমারও পা ব্যথা হয়ে গিয়েছে।' পেছন থেকে বলল রোরি।

এত জলদি, বন্ধু!

ক্ষীণধারার এক পুকুরের কাছে এসে থামল ক্যাট, এখান থেকে পানি নিয়ে নিতে পারবে। জরুরি অবস্থায় ব্যবহারের জন্য রাখা পানি শেষ করে ফেলেছে সাফিয়া।

'ফুলগুলো দেখো।' স্বপ্নালু হয়ে বলল সাফিয়া।

গাড়িটার দুপাশ জুড়েই মেরু পপি এবং বেগুনী সেক্সিফ্রেজে ভরা। এমনকী পাথরগুলোও ঢেকে আছে শ্যাওলা এবং হলুদ ছত্রাকে।

এতক্ষণের রিক্ততা দেখে এই জীবনের চিহ্ন দেখতে ভালো লাগছে ক্যাটের। 'পানি ভরছি আমি।'

'রোরি?' জানতে চাইল সাফিয়া।

'ভেতরেই থাকুক।' এক কথায় বলে দিল ক্যাট।

শুনে আশাহত হলো রোরি।

খালি বোতল নিয়ে বাইরে বের হলো ক্যাট, হাত থেকে বোতলগুলো ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে যেন বাতাস। ঠাণ্ডার প্রভাবে পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠল সে। বাতাস বেশ শুষ্ক, নাকে লাগছে বরফের গন্ধ। দ্রুত হ্রদের কাছে ছুটে গেল সে, ভরে নিল খালি বোতলগুলো। কয়েক সেকেন্ড পানির ছোঁয়াতেই হাত অসার হওয়ার যোগাড়।

বোতলগুলো জড়ো করে গাড়ির দিকে ছুটল সে, পালানোর সময় পার্কা তুলে নেওয়ার সময় পায়নি।

এই বাতাসে আর থাকতে পারবো না আমি।

স্নো-ক্যাটে চড়ে বসল ক্যাট, লাগিয়ে দিল দরজা। সাফিয়া ঘুরে বসল রোরির দিকে, প্রশ্ন ছুড়ে দিল, 'ওই মন্দিরে ঢোকার পর কী হলো?'

মাথা নাড়ল রোরি, 'বাবা প্রথমে গেলেন ভেতরে, আমাকে আরও দু'জন সার্ভে ক্রুর সাথে বাইরে রেখে গেলেন।'

অন্যদিকে ফিরল রোরি, দুঃসহ স্মৃতি ভুলতে চাইছে যেন, 'একজন ক্রু বুবি ট্র্যাপে পড়েছিল, চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম আমি। ভেতরে ঢুকতে চেয়েছিলাম আমি, বাবার নিষেধাজ্ঞা মনে পড়ল। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কথা জানতেন তিনি, বিপদটা জানা ছিল। তাই, নিরাপত্তার খাতিরে সবাইকে বাইরে থাকতে বলে গিয়েছেন। সেই সাথে আক্রান্তদের রেখে এসেছেন পেছনে।'

'তুমি কী করলে?'

উপহাস করল যেন ছেলেটা, 'আতংকিত হয়ে গিয়েছিলাম। তাই ফোন দিলাম হার্টনেলকে।'

কাহিনির অংশবিশেষ আগেই শুনেছে ক্যাট, হার্টনেলের আর্থিক সহায়তার কথা জেনেছে। বদলে রোরি ওর পিতাকে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছে।

'মেডিকেল টিম পাঠিয়ে দেয় সে।' ব্যাখ্যা করল রোরি। 'বাকিটুকু সামলে নিল ওরা। প্রথমে ভাবা হয়েছিল সবাইকে নিয়ে যাওয়া হবে হাসপাতালে, কিন্তু পরবর্তীতে সবকিছু বিবেচনা করে হত্যা করা হয় সবাইকে।'

'হার্টনেলের সিদ্ধান্তে?' জানতে চাইল ক্যাট। লোকটা কথা গোপন রাখতে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে।

'না, বাবার।' উত্তর দিল ছেলেটা। 'আমার ধারণা, পুরো জায়গাটায় একা থাকতে চেয়েছিলেন তিনি। রোগ-বালাই ছড়ানোর ব্যাপারে তিনি কিছু ভেবেছিলেন বলে মনে হয় না। মানে, তার শেষ কাজগুলো দেখে তাই মনে হয়।'

'তাহলে, বেঁচে গিয়েছিলেন তোমার পিতা।'

'হুম, অনমনীয় জেদের কারণে। আরও দু'জন বেঁচে ছিল। কিন্তু মারা গিয়েছে পাঁচজন।'

'এরপর?' জানতে চাইল সাফিয়া।

'বন্ধ করে দেওয়া হলো সব। আমি প্রকল্পের কাজের জন্য চলে এলাম এখানে।'

ছেলেটার হাতের কাঁটা আঙুলের দিকে নজর ক্যাটের, 'এবং নিশ্চিত করলে তোমার বাবার সহায়তা।'

নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে শ্রাগ করল সে। 'দুর্ঘটনায় আঙুলটা কাটা পড়ে আমার। এমনিতেও কেটে ফেলতে হতো।

'বিগত বারোটা মাস এই রোগের প্রতিষেধক খুঁজেছেন বাবা। উল্কি আঁকা মেয়েটাকে তিনিই আবিষ্কার করেছেন, এমন আরও অনেক নিদর্শনও পেয়েছেন। সবগুলোর টিস্যু পরীক্ষা করেছেন তিনি, চেষ্টা করেছেন উত্তরটা খুঁজে বের করতে।'

'কিন্তু কাজ হয়নি?' বলল সাফিয়া।

'শেষদিকে উনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকী নিজেও মমিকরণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেন, অতীতের মানুষের পথে হাঁটার জন্য।' নম্র সুরে বলল রোরি, 'এরপর পালিয়ে গেলেন। তিনি অপেক্ষা করছিলেন সঠিক সময়ের, তখন কেবল দু'জন গবেষক এবং দু'জন গার্ড ছিল ওখানে। অস্ত্রাগার ভেঙে অস্ত্র তুলে নিলেন তিনি।'

'সবাইকে খুন করেছেন তিনি?'

'শুধু গার্ডদের, গবেষকদের বেঁধে রেখে পালিয়েছেন।' জমাট হ্রদের দিকে তাকাল রোরি। 'আমি ঠিক বুঝতে পারি না অনেক মানুষের মৃত্যুর কারণ কেন হলেন তিনি?'

রোরির সান্ত্বনার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তবুও বলল ক্যাট, 'মনে হয় না তিনি তেমন কিছু চাইছিলেন। মমিকরণ প্রক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, প্রতিষেধক খুঁজে পাননি। জানতেন তিনি মারা যাবেন। কিন্তু তবুও লোকালয়ে পৌঁছুতে চাইলেন, সবাইকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য হয়তো।'

ঘুরে দাঁড়াল রোরি, চোখ ভরা জলে, 'কিন্তু কাজটা করা উচিত হয়নি তার, আমি চাইনি বাবার মৃত্যু হোক।'

ছেলেটার দিকে ফিরল সাফিয়া, হাত রাখল হাঁটুতে।

তবে ক্যাট সহানুভূতি দেখাল না।

পিতার মৃত্যুর জন্য রোরি-ই দায়ী।

'তারপর?' জানতে চাইল ক্যাট, 'হার্টনেল কেন তোমার বাবার সব কাজ ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল? কেন লেগেছিল তোমার বোনের পিছনে?'

'বাবার প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে শুরু হয়েছিল নতুন জল্পনা-কল্পনা। হার্টনেল ভয় পাচ্ছিল, বাবার খোঁজের সূত্র ধরে ওই জায়গাটা যদি কেউ বের করে ফেলে।'

'তাই প্রমাণ লোপাট করতে শুরু করল সে।' ভ্রূকুটি করল ক্যাট।

'লন্ডন এবং মন্দির, দু জায়গাতেই। মরু থেকে সব তুলে নিয়ে আসলো সে, এমনকি সেই মমিটাও। বাবা ওটাকে প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।'

এখন মেয়েটাও উধাও, আছে শুধু ডিজিটাল কিছু রেকর্ড।

সাফিয়ার পকেটের দিকে তাকাল ক্যাট।

'আর জেন?' বলল সাফিয়া।

'বাবা পালানোর আগে কয়েকটা অদ্ভুত চিহ্ন এঁকে গিয়েছিলেন, সবগুলোতে জেনের নাম। সাইমনের বিশ্বাস, বিশেষ কোন মানে আছে এর। প্রতিষেধক খুঁজতে সহায়ক হতে পারে সে। বাবা হয়তো আমাদেরকে যা বলেনি তা বলে গিয়েছে ওকে।' নিচের দিকে তাকাল ছেলেটা। 'তবে আমার মনে হয়, বাবা ওকে বিদায় জানিয়েছেন শুধু।'

রোরি ঘুরে দাঁড়াল, কথা বলা শেষ।

ক্যাটের দিকে চিন্তিত নজরে তাকাল সাফিয়া, পানির বোতলের দিকে বাড়াল হাত। হাতটা কাঁপছে ওর।

'সাফিয়া...?'

মেয়েটার মুখ উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছে, খেয়াল করল ক্যাট। হাত রাখল ওর গালে, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

'তোমার শরীর বেশ গরম।'

সকাল ৬:৫৮

লাইব্রেরি থেকে পেইন্টার ক্রো বের হওয়ার পর, চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল সাইমন। চিন্তা-ভাবনা করে সহযোগিতা করতে রাজী হওয়ার জন্য সময় দিয়েছে এক ঘণ্টা। যদি এতে কাজ না হয়, তবে প্রয়োজনে কঠোর হবে সে।

আশা করি তার প্রয়োজন হবে না।

বিশ মিনিট আগে শেষ কথা হয়েছিল অ্যান্টনের সাথে, ঝড়ের কারণে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি পরে। শুধুমাত্র উঁচু জায়গা যেমন পাহাড়ের চূড়া থেকে সিগন্যাল পাঠাতে পারবে অ্যান্টন, নইলে সম্ভব হবে না বেসের সাথে যোগাযোগ করা। শেষ জানতে পেরেছিল, স্নো-ক্যাটকে অনুসরণ করছে ওরা।

বসে বসে নানান কথা ভাবছে সাইমন, মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে নানান চিন্তা। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সে, হাতে তুলে নিল ফোন। প্রকল্পের প্রধানের কাছে ফোন দিল সে। লোকটার নাম ড. সুনীল কাপুর। দুইদিন পরের পরীক্ষাটা এই পদার্থবিদ তদারকি করছেন।

'স্যার?' উত্তর দিল কাপুর।

'পরিকল্পনা পাল্টাচ্ছে।'

'জি, স্যার।'

জুয়া খেলতে চলেছে হার্টনেল। যদি মেয়ে দুটো কোনভাবে অ্যান্টনের হাত ফসকে পালিয়ে যায়, তবে শেষ হয়ে যাবে সব।

এত কাছে এসে ফিরে যেতে দেব না আমি।

ওর পরিকল্পনা একটাই, এই ব্যবস্থাটার সত্যতা অনুধাবন করা। যদি মেয়ে দুটো সফলও হয়, তবুও ঝামেলা ছাড়াই শেষ হবে পরীক্ষা।

প্রকল্পটা এখন যেকোন মানুষের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এমনকি আমার চেয়েও।

'সময় পালটাচ্ছি আমরা।'

'কখন স্যার?'

'আজ।'

একুশ
৩ জুন, দুপুর ২:০২ ই.এ.টি.
খার্তুম, সুদান

ঠাণ্ডা পানির শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে আছে গ্রে, গা পুরোপুরি উদাম।

পায়ের আঙুলে আটকে আছে বালি। দেহের প্রতিটি মাংসপেশি ব্যথায় চিৎকার করছে। সাবান এবং গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করেছে গা, তবুও আটকে আছে ময়লা। সবার শেষে গোসল করছে সে, তাই সময় নিচ্ছে নিজেকে গুছিয়ে নিতে-নিজের চিন্তাগুলোকে জড়ো করতে। পানি পড়ার ঝিরিঝিরি শব্দ এবং শীতলতা সাহায্য করছে মনকে স্থির রাখতে।

তিন ঘণ্টা আগে, ডেরেক এবং কোয়ালস্কির সাথে মরুভূমিতে হাঁটছিল সে। সেইচানের মোটর সাইকেলের ট্রেইল অনুসরণ করছিল ওরা। ঠিক তখনই খেয়াল করল, দূরের আকাশ ঢেকে গিয়েছে ধুলোতে। বেশ কয়েকটি বাহন একসাথে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ঠিক মাঝখানে ইউনিমগ, দুইপাশে সারি সারি মোটরসাইকেল। দলটার পিছনে উটের ঝাঁকও আছে। ঝাঁকটা সামাল দিতে বেশ গলদঘর্ম আরোহী।

ওদের অগ্রযাত্রা নজরে পড়ল কোয়ালস্কির, 'এই সৈন্যদলের আশাতেই এতক্ষণ ছিলাম আমি।'

বাকিদের সাথে যোগ দিল গ্রে-র দল, রওনা দিল সোজা খার্তুমের দিকে। যাযাবরের ট্রেইল অনুসরণ করল ওরা। ইউনিমগের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নিল গ্রে। মনক্ষুণ্ন হলো আহমাদ, বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে ওর। সেইচানের ধারকৃত মোটরসাইকেলের অবস্থা বেশি একটা ভালো না, নিজের বাহনের এই অবস্থা দেখে আরও মন খারাপ হয়েছিল বাচ্চাটার। তবে বেশ বড় অংকের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পর হাসি ফুটে উঠেছে ওর মুখে। আত্মীয়ের সাইকেলে চড়ে চলে গেল আহমাদ, সাথে গেল কুকুরটাও।

ফিরতি পথেও মোটর সাইকেলে রইল সেইচান, আকাশে নজর রাখছে। তবে নতুন করে কোন ড্রোন বা অন্য কোন বিপদের মুখে পড়ল না ওরা। নিরাপদেই খার্তুমে ফিরে এসেছে সবাই। শহরের শেষ মাথার এক সস্তা হোটেলে উঠেছে পুরো দল।

এত ঘটনা ঘটার পরও, যে তিমির থেকে শুরু করেছিল ওরা, সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে এখনও। মহামারী থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় খুঁজে পায়নি। গোসলে ঢোকার আগে, ডেরেক এবং জেনকে একসাথে টেবিলে বসে আলোচনা করতে দেখে এসেছে গ্রে। ওদের দু'জনকে খুব একটা আশান্বিত মনে হয়নি।

খুলে গেল বাথরুমের দরজা, স্বচ্ছ পর্দার আড়াল থেকে এক অবয়ব নজরে পড়ল। গায়ের জামা খুলতে খুলতে এদিকে আসছে সেইচান, পুরোপুরি নগ্ন হয়ে গ্রে-র সাথে যোগ দিল ও। ঠাণ্ডা পানির প্রবাহে কেঁপে উঠল মেয়েটা, কোমর জড়িয়ে ধরল তার। সেইচানকে আরও কাছে টেনে নিল সে। গ্রে গরম পানির নবের দিকে হাত বাড়াতেই, নিষেধ করল মেয়েটা। আরও শক্ত করে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরল ও। এমন মুহূর্ত ওদের দু'জনের জন্যই বেশ দুর্লভ। মেয়েটাকে এমন নরম হতে আর দেখেনি গ্রে, তবে তাই বলে খুব যে খারাপ লাগছে তা নয়। কোন কথাই বলল না ও, জানে সে-ও ঠিক তাই চাচ্ছে। এখন কথা বলার সময় নয়, ভবিষ্যতের কথা বলে বর্তমানকে নষ্ট করার কোন মানে হয় না।

আরও কাছাকাছি হলো দু'জন, একে অন্যের দেহের উষ্ণ স্পর্শ টের পাচ্ছে। কামনা জেগে উঠছে গ্রে-র মনে, কিছুক্ষণ পর চুমু খেল দু'জনে। কিন্তু ঘটনা বেশিদূর গড়ানোর আগেই, কেউ একজন টোকা দিল দরজায়। আলাদা হয়ে গেল দু'জন, ঠিক মাঝখানে ঝরছে শাওয়ারের পানি, ঠাণ্ডা পানি দু'জনের মাঝে দূরত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে আরও।

'গ্রে!' কোয়ালস্কি এসেছে।

চোখ বন্ধ করল সে, 'ওকে খুন করব আমি।'

'যাও,' চাপা গলায় বলল সেইচান।

'মঙ্ক ফোন করেছে, জলদি এসো।'

পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল গ্রে, কিন্তু ঘুরে দাঁড়াল ওর প্রেয়সীর দিকে। আগের একটি প্রস্তাবের কথা এখনও মনে আছে ওর, 'বলো, এখানে কোন ফায়ার এস্কেপ খুঁজে পেয়েছ তুমি।'

'ফায়ার এস্কেপ?' পর্দার কাছে এসে দাঁড়াল মেয়েটা, পুরো দেহটা নজরে পড়ছে। 'সুযোগ তো এসেই ছিল। কিন্তু এখন তো আর তা সম্ভব না। কিন্তু আবারও কখনও জিজ্ঞাসা কোরো। কে জানে, পেয়েও যেতে পারি।'

পর্দা টেনে দিল সেইচান।

উষ্ণ বাতাসে দেহ শুকিয়ে নিল গ্রে, পুরনো কাপড়গুলোই আবার চড়াল গায়ে। তবে, একটু আগের শীতল পানির নিচে অনুভূত স্বর্গীয় অনুভূতির কথা ভুলল না।

অবশ্যই ওকে খুন করব আমি।

বেডরুমে গেল গ্রে, স্যাটেলাইট ফোনটা রেখে গিয়েছে কোয়ালস্কি। ফোনটা তুলে কানে ধরল সে।

'মঙ্ক?'

'খবর কী এখানকার?'

বদ্ধ গোসলখানার দরজাটার দিকে তাকাল সে, 'বেশ গরম। কায়রোর কী অবস্থা?'

'উত্তরটা পেয়েছ?' গোলাগুলির আওয়াজ কানে এল গ্রে-র। 'নামরুতে আক্রমণ হয়েছে। কয়েকটা গর্দভ মিলে বলছে, এ সবই নাকি আমেরিকার দুরভিসন্ধি, সবকিছুর জন্য দায়ী এই বেসটা।'

'সবসময় যা হয়।'

'মোটামুটি। রোগটার প্রতিষেধক খুঁজে পেলে?'

'এখনও পাইনি। তবুও, সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি আমরা।' গলার সুর নরম হলো ওর। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'আপাতত আছি। আমেরিকান এবং মিশরীয় বাহিনী সাহায্য করছে। কিন্তু ঝামেলা মিটতে সুখবর প্রয়োজন।'

'নিজের খেয়াল রেখো।'

'যথা আজ্ঞা, বন্ধু।'

ফোন রেখে দিল সে।

বাকিদের দিকে রওনা দিল গ্রে, তবে আগের থেকে এখন আরও বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু একটা মেসেজ দেরি করিয়ে দিল ওকে। নম্বরটা দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

বাবার অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন ঠিক আছে। সময় করে ফোন দিও। খুব গুরুতর কিছু নয়, কিন্তু তোমার জানা উচিত।

গুঙিয়ে উঠল সে, ভাইয়ের নম্বরে ফোন দিল।

প্রয়োজনের সময় পালানোর সুযোগ নেই।

বেজে উঠল ফোন, কিন্তু ওপাশ থেকে ধরল না কেউ। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভয়েস মেইলে চলে গেল ওটা।

'কেনি, মেসেজ পেয়েছি। ফোন দিও বা মেসেজ পাঠিও। কখন কী হচ্ছে জানিও আমাকে, যতটুকু সম্ভব সাহায্য করব আমি।'

ফোন রেখে দিল সে, হতাশা জেঁকে ধরেছে ওকে। বাবার সাথে থাকতে পারছে না বলে। তবে, এখানকার কাজ পড়ে আছে। চোখ বন্ধ করল সে, মাথা নাড়ল।

একেকবারে একেক ঝামেলা।

এটাই এখন ওর মন্ত্র।

পাশের ঘরে গেল সে, ডেরেক এবং জেনকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন অগ্রগতি?'

চোখ মিটমিট করল জেন, 'হয়তো   কিন্তু বুঝতে পারছি না।'

সকাল ২:২৪

ঠোঁট কামড়াল জেন, কাগজের দিকে নজর ওর। আইপ্যাডে কাজ করছে ডেরেক। ওর বাবা রেখে গিয়েছে এক গুপ্ত বার্তা, নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়েছেন সেই বার্তা পৌছে দিতে। বাবার বিশ্বাস ছিল, সে বুঝতে পারবে সব। কিন্তু এই রহস্য সমাধানে ব্যর্থতা-কেন যেন নিজেকে সেই ভালবাসা যোগ্য মনে হতে দিচ্ছে না।

'দেখাও আমাকে।' বলল গ্রে, 'কথা বলো।'

নড করল সে।

কে বলেছে আমাকে একা এই রহস্য ভেদ করতে হবে?

বাবা কী ওকে শেখায়নি, সত্যিকারের অনুসন্ধান দলীয় উদ্যমেই হয়ে থাকে? অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিজে কৃতিত্ব নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না বাবা, তবুও প্রকাশিত কাজে বাবার নামই কোন না কোনভাবে উপরে চলে আসত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেন, 'পাথুরে হৃদপিণ্ডের গায়ে প্রজাপতিকে গোল চিহ্নিত করে আমার নাম লিখেছেন বাবা। প্রজাপতি আমার পছন্দ বলেই ভেবেছিলাম বাবা এঁকেছেন শুধু আমার স্মৃতির জন্যই।'

'কিন্তু তুমি তা ভাবছ না।'

'আমার বাবা বেশ দয়ালু ছিলেন, উদারচেতাও। কিন্তু আবেগী ছিলেন না কখনওই।'

'না, তা তিনি ছিলেন না।' একমত হলো ডেরেক।

'তাই তার এই চেষ্টাটার নিশ্চয়ই কোন না কোন অর্থ আছে।' বলল গ্রে।

'বেশ ভাবলাম, ঠিক কেন তিনি আমাকে এই ছবি দেখাতে চাইলেন। মিশরীয় শিল্পকর্মে প্রজাপতি বেশ পরিচিত, রূপান্তর বোঝাতে ব্যবহৃত হয় এটি। ছবির প্রজাপতিটা টাইগার মোনার্ক বা ডানিয়ুস ক্রিসিপাস গোত্রের, এই অঞ্চলে পাওয়া যায় এই দুই প্রজাতি।'

'এটা নিয়েই কথা বলছিলাম আমরা।' বলল ডেরেক। 'নাম দুটো শুনতেই কিছু একটা মনে পড়ল আমার। লিভিংস্টোনের পুরনো চিঠিতে নামটা দেখেছি আমি। সেটাই জেনকে দেখালাম।'

ট্যাবলেট থেকে কাগজের ছবি বের করে গ্রে-কে দেখাল সে।

'শুঁয়োপোকা এবং প্রজাপতির স্কেচ।' নামটা পড়ল গ্রে, 'ডানিয়ুস ক্রিসিপাস, যেমনটা বলেছিলে।'

ছবিটিতে আঙুল রাখল জেন, 'যদি এটা টাইগার মোনার্ক না হয়, তবে পাখা দুটো অসঙ্গতিপূর্ণ। বাবা জানেন আমি এ দুটোকে চিনতে ভুল করবো না।'

সামনে ঝুঁকল গ্রে, 'লিভিংস্টোনের অন্য একটি মানচিত্র হয়তো। গুবরে পোকাটা যেমন ছিল।'

নড করল জেন, 'মিশরীয় ছবিতে আরেকটি গুপ্ত মানচিত্র।'

'কিন্তু মানচিত্রটা কোথায়?' জানতে চাইল গ্রে।

'দেখো।' ছবিটা ট্যাবলেটে বড় করল ডেরেক, পাখাটায় ইশারা করল।

এরপর কাজে নামল সে, 'নিচের পাখায় যদি এই দাগগুলো মুছে দেই, তবে এমন একটা চিত্র পাওয়া যায়। কয়েকটি হ্রদ এবং খালের সংযোগস্থল বলেই মনে হচ্ছে। এককোনায় একটা নদীর কাছে ক্রস চিহ্ন এঁকেছেন লিভিংস্টোন।'

'সঠিক জায়গাটা খুঁজে বের করেছ তুমি।' বলল গ্রে।

নড করল ডেরেক, 'আমাদের বর্তমান অবস্থান থেকে কাছেই সঠিকভাবে বললে, নদীর পাশে।'

মানচিত্রের উপর লিভিংস্টোনের প্রজাপতিটার ছবিটা রাখল সে।

ব্যাখ্যা করল ডেরেক, 'দেখো, ভিক্টোরিয়া হ্রদ কীভাবে মিলে গিয়েছে, সেই সাথে ছোট হ্রদগুলোও।'

ট্যাবলেটটা হাতে তুলে নিল গ্রে, 'ক্রসচিহ্নটা রোয়ান্ডা থেকে বের হয়ে ভিক্টোরিয়া হ্রদে পড়া ছোট নদীটার উপর পড়েছে।'

উত্তেজনা দেখা দিল জেনের কণ্ঠে, 'আমার বিশ্বাস, নীল নদের উৎসস্থল খুঁজছি আমরা।'

'অথবা উৎসগুলোর একটা।' যোগ করল ডেরেক, 'ভিক্টোরিয়া হ্রদে আরও অনেকগুলো নদী এসে মিশেছে, নীল নদের সঠিক উৎস নিয়ে তাই বিতর্কের শেষ নেই।'

ভ্রূকুটি করল গ্রে, কিছু একটা ভাবছে।

ওর দিকে ঘুরল জেন, 'কোন সমস্যা?'

সোজা হলো গ্রে, ম্যাককেবের লুকিয়ে রাখা টেস্টটিউবটা বের করল সে। ভেতর থেকে চামড়ার টুকরোটা বের করে আনল, দেখতে লাগল হায়রোগ্লিফটা।

'যদি ভুল না হয় আমার,' বলল সে, 'এই অংশটুকুর অর্থ, নৌকা নিয়ে নদীর উৎসে যাও। এবং হাতি আর হাতির হাড় নিয়ে কিছু একটা লেখা আছে।'

টুকরোটা হাতে তুলে নিল জেন, পিছিয়ে নিল হাত, 'নদীর উৎস বলতে নীল নদের উৎসকেই বোঝাচ্ছে হয়তো।' ডেরেকের দেখানো মানচিত্র দেখাল সে। 'এই ক্রসচিহ্ন আঁকা জায়গাটাতেই যেতে বলছে।'

'এতোটা নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?' জানতে চাইল ডেরেক, 'এখানকার লেখা গুরুত্বপূর্ণ কিনা তা-ই তো জানি না আমরা।'

হায়রোগ্লিফিক্সের শেষ চিহ্নটায় আঙুল রাখল গ্রে, 'সিংহ এবং মেয়েটা দেখ, তুতুর প্রতীক না এটি?'

'লিভিংস্টোনের আরিয়াবোলসেও ছিল এই চিহ্ন।' যোগ করল গ্রে। 'তালিসমানের মতো এইটাতেও চিহ্ন দুইটা একইদিকে আছে।'

মেয়েটার দিকে ফিরে তাকাল গ্রে, 'তোমার বাবাও হয়তো এই একই কারণে মমি থেকে এই অংশটা কেটে নিয়েছিলেন, চেয়েছিলেন লুকিয়ে রাখতে ওটাকে। শেষে নিরাপত্তার খাতিরে বালু-চাপা দিয়ে দেন, পিছনে সূত্র রেখে দেন অনুসরণের জন্য।'

'হাতির কথা ভুলে গেলে চলবে না।' মনে করিয়ে দিল কোয়ালস্কি, উত্তেজনায় চোখ চকচক করছে বিশালদেহী লোকটার। 'ওই সুন্দর ছোট হাতিটার কথা মনে আছে? সুড়ঙ্গের ভেতরে দেখেছিলাম যেটা?'

নড করল জেন, বুঝতে পারল ছেড়া সুতোগুলো জোড়া লেগে যাচ্ছে। কিন্তু এখনও অনেক কিছুই জানা বাকি। 'ঠিক বলেছে কোয়ালস্কি।'

হঠাৎ করেই বিমর্ষ হয়ে গেল ডেরেক, 'ওই পটগুলোতে যদি রোগের প্রতিষেধক থাকে?'

ধমকে উঠল কোয়ালস্কি, 'যখন বলেছিলাম তখন নিতে দিলেই তো পারতে।'

'না।' বলল জেন। 'বাবা সবকিছুই পরীক্ষা করে দেখেছেন, ওখানে থাকলে ঠিকই খুঁজে পেতেন তিনি।'

'তাছাড়া ওটাই কাঙ্ক্ষিত বস্তু হলে, আমাদেরকে আর জিনিসটা খুঁজে পেতে হতো না। তার আগেই অন্যরা নিয়ে পালাত।' যোগ করল গ্রে।

ডেরেকের মানচিত্র দেখাল জেন, 'উত্তরটা ওখানেই আছে। বাবা জানতেন, কিন্তু নিজে যেতে পারেননি। যারা তাকে বন্দি করেছিল, তাদের কাছে গোমর ফাঁস করেননি তিনি।'

'তাই পালিয়ে এসেছিলেন, সাহায্য জন্য।' জেনের দিকে ফিরল ডেরেক, 'জানতেন যে ব্যর্থ হতে পারেন, তাই সূত্র রেখে গিয়েছেন মেয়ের জন্য।'

ডেরেক ঠিক বলছে, জানে জেন। চোখের অশ্রু বাঁধা মানছে না, ঘুরে দাঁড়াল সে।

পাশের ঘর থেকে প্রবেশ করল সেইচান, তোয়ালে দিয়ে ভেজা চুল থেকে পানি ঝারছে। সবার দুশ্চিন্তা এবং উত্তেজনা টের পেয়েছে মেয়েটা, 'কী হচ্ছে এখানে?'

হাসল গ্রে, 'তোমার ব্যাগ গোছানোর সময় হয়েছে।'

হাত দুটো একসাথে ঘষল কোয়ালস্কি, 'হাতি খুঁজতে যাচ্ছি আমরা।'

সকাল ৩:০৩

আর কোন ঝুঁকি নিতে চাইছে না ভালিয়া।

খার্তুমের বাইরে ছোট একটা এয়ারস্ট্রিপে অপেক্ষায় আছে সে। সূর্য উত্তাপ ছড়াচ্ছে বালু এবং কংক্রিটের মেঝেতে। জায়গাটা কোন মানচিত্রে নেই, মাদক চোরাচালানিরা আর সুদানিজ সামরিক বাহিনী শুধু ব্যবহার করে। পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর মুখ বেশ মোটা অংকের টাকা দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

বলা চলে, জায়গাটার কোন অস্তিত্বই নেই।

বাস্তবতা বিচারে নিজেকে সান্ত্বনা দিল সে, এটাই ওর সঠিক ঘর। দাদীর ড্যাগার দিয়ে মার হত্যাকারীকে খুন করার পর, দুই ভাইবোন পালিয়ে যায়। আশ্রয় নেয়

এমনই এক স্থানে, যেখানে কেউ তাকায় না। তখন, দু'জনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক ছিল।

ছিল . কিন্তু এখন নেই।

নতুন বাসস্থান খুঁজে নিয়েছে অ্যান্টন, সেই সাথে নতুন হৃদয়।

তবে, তাই হোক।

অতীত জীবনে ফিরে যাবে সে, ওর ভাই সাথে থাকুক বা না থাকুক। বড় একটা ট্রাক পাশ দিয়ে চলে গেল, দূর থেকে ওদের দিকে হাত নাড়ল সুদানিজ আর্মি। সেসনার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে, ট্রাকের দিকে নজর।

চারজন লোক নিয়ে ট্রাক থেকে নামল ক্রুগার, মরুভূমির লড়াই থেকে বেঁচে ফিরেছে ওরা। মোট দলের চারজন মারা গিয়েছে ওখানে। ক্রুগারের মুখে বেদনার ছাপ, সহকর্মীদের হারানোয় কিছুটা বিমর্ষ। লোকটাকে পরিকল্পনার অদল-বদল বোঝাতে বেগ পেতে হলো না একটুও।

নড করল লোকটা, রক্তাক্ত হাত মুঠো পাকাচ্ছে, 'হুম, ভালোই শোনাচ্ছে পরিকল্পনাটা। আর আমি নিশ্চিত করছি, ওদের ফ্লাইট রোমাতে যাচ্ছে।'

মরুর যাযাবরের হাতে অ্যামবুশ হওয়ার পর থেকে, শত্রুদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলছে ভালিয়া। সেইচান আর জেন আবার এক হয়েছে ওদের দলের সাথে, আকাশ থেকে নজর রেখেছে ওদের উপর র‍্যাভেন। ইউনিমগে সেই ছোট ছেলেকে দেখেছে সে। গতকালই কাজ সেরে এসেছে, ট্রাকের চাকায় জি.পি.এস. লাগিয়ে দিয়েছে গোপনে। কাজ শেষে আবার যোগ দিয়েছে ক্রুগারের সাথে।

বড় করে দম নিল মেয়েটা। হেরে গিয়েছে ও, অনেক দিন পর নিজেকে ব্যর্থ মনে হচ্ছে। অতীতের ভুলগুলো কাজ সমাধার মাধ্যমে শুদ্ধ করত। জেন ম্যাককেবের উপর নজর রাখতে গিয়ে ট্রাকের উপর থেকে নজর সরে গিয়েছিল ওর। এমনকি র‍্যাভেনটাও সরিয়ে নিয়ে এসেছিল। তাই বাচ্চাটা সুযোগ পেয়েছিল গ্রামের লোকগুলোর সাথে দেখা করার। পুরো বিষয়টা ভালিয়ার অজান্তেই ঘটেছে।

কিন্তু এমন ভুল আর হবে না।

ক্রুগারের সাথে দেখা করার পর, ট্রাকের জি.পি.এস. ট্র্যাকার দিয়ে দলটার যাত্রাপথ চিহ্নিত করেছে সে। খার্তুমের এক হোটেলে উঠেছে দলটা। কিন্তু যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখছে, ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়েছে। লেসার মাইক্রোফোন ব্যবহার করে পৌনে মাইল দূর থেকে ওদের কথায় আড়ি পেতেছে সে। যন্ত্রটার অবলোহিত রশ্মি জানালায় আঘাত করেছে, কাঁচের কম্পন থেকে কথাগুলো শব্দে রূপান্তরিত

করছে। কিন্তু এই প্রযুক্তিগুলো একদম নিখুঁত নয়। কিছু কিছু শব্দ শোনা যায় না। মোটামুটি শত্রুদলের পরিকল্পনাটার সারমর্ম শুনতে পেরেছে সে। তারপরও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পাঠিয়েছে ক্রুগারকে।

একটা বুশপ্লেন ভাড়া করেছে ওর টার্গেট, সেসনা ২০৮ ক্যারাভান মডেলের। ওটা দিয়ে রোয়ান্ডা যাবে এরা। সে-ও অনুসরণ করবে ওদের, একই বিমানের সামরিক সংস্করণে করে। বিমানটা ক্রুগার জোগাড় করেছে, লোকটার বন্ধুর বিমান ওটা। যুদ্ধবিমান হিসেবে ওটা ব্যবহার করে বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠী, এমনকী ইরাকও।

বিমানের পাখার নিচে সুসজ্জিত দুটি এ.জি.এম.-১১৪ হেলফায়ার মডেলের মিসাইল লাগানো।

সন্তুষ্টিতে ঠোঁটের কোণ ঝুলে পড়ল মেয়েটার। অন্যের গোলামি অনেক হয়েছে। অন্যের কথা শুনতে শুনতে এবং ভুলের জবাবদিহি করতে করতে হাঁপ ধরে গিয়েছে ওর। আবারও মুক্ত হতে চায় সে, ধ্বংস করে দিতে চায় এই পৃথিবীকে। সেক্ষেত্রে, নিয়মনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ হওয়া যাবে না।

'নতুন পরিকল্পনা?' বিমানে উঠতেই ওকে জিজ্ঞাসা করল ক্রুগার।

ভেতরে প্রবেশ করল সে, 'হ্যাঁ, সবাইকে খুন করব আমরা।'

পর্ব চার

রঙিলা জঙ্গাল

বাইশ
জুন ৩, সকাল ১০:০৮ ই.ডি.টি.
এলেসমেয়ার আইল্যান্ড, কানাডা

গার্ডরা যখন পেইন্টারকে নিতে এল, ততক্ষণে পরিস্থিতির আঁচ পেয়ে গিয়েছে ও।

আটটা পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিল হার্টনেল। ক্যাট আর সাফিয়াকে ধরতে সাহায্য করবে কিনা, সেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবার কথা ছিল তার। সময় পেরিয়েছে আরও দুই ঘন্টা আগেই। আর এতক্ষণে কিনা দু'জন প্রহরী এসে ওর ঘরে প্রবেশ করছে! অস্ত্রের মুখে ওকে পার্কা আর মোটা বুট পরতে বাধ্য করল তারা। এরপর হাতের কব্জিদুটো সামনে এনে হাতকড়া পরিয়ে হাঁটার আদেশ দিল।

কেন এই ঘন্টা দুয়েকের দেরি? ক্যাট আর সাফিয়ার কিছু হয়নি তো? নাকি পেইন্টারের সাহায্যের আর দরকার নেই হার্টনেলের? তাই যদি হয় তো এখন ওকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

পরনের পোশাক এবং মুক্ত গোড়ালির ইঙ্গিতটা পরিষ্কার, সম্ভবত অনেকটা পথ হাঁটতে হবে পেইন্টারকে। তা-ও সম্ভবত ঠান্ডা কোন পরিবেশে। প্রহরীদের পরনে ভারী পোশাক। প্রশ্ন করার চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু উত্তর পায়নি।

অথচ বাইরের দিকে না যেয়ে, নিচের দিকে যাচ্ছে ওরা।

কিছুই বুঝতে পারছে না পেইন্টার।

হচ্ছেটা কী এখানে?

অনেকক্ষণ হাঁটার পর, ইস্পাতের এক দরজার সামনে এসে উপস্থিত হলো ওরা। কী-কার্ড ব্যবহার করে দরজা খুলল এক প্রহরী, সে-ই ভেতরে প্রবেশ করল প্রথমে। পরেরজন তার অ্যাসল্ট রাইফেল দিয়ে ধাক্কা দিল পেইন্টারের পিঠে।

ভারী কাপড়ের কারণটা সাথে সাথে বুঝতে পারল পেইন্টার। দ্বীপের পাথর কেটে বানানো একটা টানেল সামনে পড়েছে। প্রকৃতি থেকে আলাদা করে রাখা হলেও, বাতাসে রয়েছে সুমেরুর শীতলতা। নিঃশ্বাস নেবার সাথে সাথে তা পরিণত হচ্ছে বাষ্পে। সোজা কয়েকশ গজ এগিয়ে গিয়েছে রুক্ষ টানেলটা। ছাদের সাথে ঝুলতে থাকা বাতির আলোই যা একটু উজ্জ্বলতা জোগাচ্ছে।

যেতে যেতে দেয়ালে হাত বুলাল পেইন্টার।

মনে হচ্ছে কোন খনির টানেল!

কোথায় যাচ্ছে, তা আচমকা আন্দাজ করতে পারল সে। টানেলের ও-মাথায় একই রকম আরেকটা ইস্পাতের দরজা। দরজা খুলে আধুনিক বিশ্বে আবার প্রবেশ করল পেইন্টার।

মূল বেসের এই বর্ধিতাংশটার দেয়াল বলতে বিস্ফোরণক্ষম জানালা। সবগুলো মুখ করে আছে উপর থেকে দেখা গর্তটার দিকে। বেস স্টেশনের এই অংশটা প্রায় কোয়ার্টার মাইল লম্বা গর্তটাকে পুরোপুরি ঘিরে ধরতে পারেনি। তবে অর্ধেকটা ধরেছে সফলভাবেই, অনেকগুলো ওয়ার্কস্টেশনে ভাগ করা হয়েছে দেয়ালটাকে। ল্যাব কোট আর কভারঅল পরে মনিটরের উপর ঝুঁকে আছে অনেকে। কথা-বার্তার আওয়াজ নেই বললেই চলে, যেন কোন গির্জায় অবস্থান করছে সবাই।

হয়তো আসলেই করছে . . .তবে এই গির্জায় উপাস্য হচ্ছে বিজ্ঞান।

পুরু জানালার কাছে এসে পেইন্টার দেখতে পেল, আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে কালো মেঘ। নিচে, পুরাতন গর্তটার উপর বসে আছে হার্টনেলের স্বপ্নের ওয়ার্ডেনক্লাইফ টাওয়ারের নবতম সংস্করণ। ইস্পাতের থাম জানালার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে, বিশাল একটা পিরামিডের সৃষ্টি করেছে ওগুলো। শেষ হয়েছে তামার তৈরি বিশাল বিশাল ইলেকট্রোম্যাগনেটের আঙটিতে। ওগুলো আবার ঘিরে ধরে আছে এক সুপরিবাহী বৃত্তাকার গোলককে।

নাহ, গোলক বললে ভুল হবে।

আকাশ থেকে টাওয়ারটাকে দেখে মনে হয়েছে, নিখুঁত কোন গোলক। কিন্তু নিচ থেকে দেখে পেইন্টার বুঝতে পারছে, ওরা আসলে একটা বিশালাকৃতি ডিমের শীর্ষটা দেখেছে!

ক্লাইফ এনার্জির লোগোটা মনে পড়ল ওর-কলম্বাসের ডিম।

ইচ্ছা করেই কি ওভাবে বানানো হয়েছিল লোগোটা?

'আহ, এসে পড়েছ দেখ!' সাইমন হার্টনেল ওর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল। লোকটার পরনে একটা রুপালী পার্কা, এই মুহূর্তে অবশ্য জিপ খোলা। 'অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য দু:খিত।'

'তোমার সময়মতোই তো চলছি আজকাল।' চারপাশের ব্যস্ততার উপর থেকে ঘুরে এল পেইন্টারের নজর। 'কী হচ্ছে এখানে? ব্যস্ততা অনেক বেশি বলে মনে হচ্ছে!'

'তা ঠিক, এই মুহূর্তে সবাই ব্যস্ত।'

বলতে বলতেই আরেকদিকে রওনা দিল লোকটা, পেইন্টারকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিতে হলো না। দুই প্রহরী এখনও পিঠের সাথে লেগে আছে, তাই আর কোন উপায়ও নেই। হার্টনেল চলতে চলতে সঙ্গী জুটিয়ে নিল একজন। ছোটখাটো ইন্ডিয়ান লোকটার চেহারা চিন্তায় কুঞ্চিত।

হার্টনেল পরিচয় করিয়ে দিল। 'ইনি ড. সুনিল কাপুর।'

প্রখ্যাত পদার্থবিদের নাম শুনেই চিনতে পারল পেইন্টার। লোকটা প্লাজমা নিয়ে করা তার কাজের জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছে। বিশেষ করে বাষ্পীভূত ধাতু

ব্যবহার করে প্লাজমা বানাবার জন্য। হার্টনেল যে শুধু নিকোলা টেসলার উপর ভরসা করে নেই, তা তো পরিষ্কার।

'রিমোট মনিটরিং সিস্টেম শেষ বারের মতো চেক করে নিচ্ছি আমরা,' বলল হার্টনেল। 'ব্যাপারটা খুব উত্তেজনাকর।'

কাপুরকে দেখে অবশ্য উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে না। বারবার বাইরের ইস্পাতের পিরামিডের দিকে তাকাচ্ছে সে। তবে হার্টেনেলের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

টাওয়ারের কমান্ড স্টেশনের পাশ দিয়ে যাবার সময়, নতুন একটা জানালা দেখতে পেল পেইন্টার। এই জানালার মুখ আবার বিপরীত দিকে। গতি কমিয়ে কাছের একটা গুহার ভেতর উঁকি দিল সে। এটা বাইরের ওই গর্তের মতোই গভীর, তবে কালো পানিতে ঢুবে আছে মেঝে। অবশ্য ভেতরে ঝুলতে থাকা আলো দেখে মনে হচ্ছে, উজ্জ্বল লালচে তরল ভরিয়ে তুলেছে গর্তটাকে।

সুমেরুর ঠান্ডা বাতাস এতক্ষণ যা করতে পারেনি, এই দৃশ্যটা তাই করে দেখাল। জায়গায় যেন জমে গেল পেইন্টার। এই তাহলে হার্টনেলের স্বপ্নের উৎস, তার জ্বালানী।

টেসলার পেসটিস ফুলমেন প্রজাতির চাষ করেছে হারামজাদা! হাজমাত স্যুট পরিহিত মানুষ হাঁটছে গর্ত থেক বেরিয়ে আসা ক্যাটওয়াক ধরে। তাদের হাতে ক্লিপবোর্ড, নিচের হ্রদ থেকে বেরিয়ে ছাদ পর্যন্ত চলে যাওয়া ইস্পাতের টিউবের উপর আলো ফেলছে তারা।

হায় ঈশ্বর

'উঠে পড়ো সবাই,' হার্টনেল একটা ট্রেনের বগির দিকে ইঙ্গিত করল। রাস্তাটা গর্তের ঢালু দেয়াল বেয়ে উপর থেকে নিচের দিকে গিয়েছে।

নির্দেশ পালন করল পেইন্টার। একটা কাচের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে ও। 'মনে হচ্ছে তুমি নির্ধারিত সময়ের আগেই কাজে নেমে পড়তে চাচ্ছ?'

'ঠিক ধরেছ। সব মিলিয়ে মনে হলো, এটাই ভালো হবে।'

যুক্তিটা বুঝতে পারছে পেইন্টার। ক্যাট আর সাফিয়া যেহেতু পালাতে সক্ষম হয়েছে, তাই যেকোন মুহূর্তে বাইরের সাহায্য নিয়ে উপস্থিত হতে পারে তারা। তাই ঝুঁকি নেবার কোন অর্থ হয় না।

হার্টনেলের দিকে ফিরল পেইন্টার। 'তুমি তাহলে এই টেস্ট রানের অংশ হিসেবে আয়নোস্ফিয়ারে অণুজীবগুলো ছড়িয়ে দিতে যাচ্ছ?'

'আধা-খেচড়া কাজ করে লাভ কী?'

এবার ড. কাপুরের দিকে ফিরল পেইন্টার। 'আপনার এতে কোন আপত্তি নেই?'

হার্টনেলের দিকে তাকাল একবার ভারতীয় পদার্থবিদ, তারপর পেইন্টারের দিকে ফিরে নড করল কেবল।

এতোটা আগ্রহী বলেও মনে হচ্ছে না।

'আমরা সবদিক চিন্তা করেই নামছি।' ওকে আশ্বস্ত করার প্রয়াস পেল হার্টনেল।

আকাশের দিকে তাকাল পেইন্টার। 'যখন ওগুলো জমিনের দিকে ছুটে আসবে, তখন কী কী হতে পারে তা তুমি আগে থেকে কল্পনাও করতে পারবে না। কে জানে, হয়তো বায়ুমন্ডলে আগুন ধরিয়ে দিতে যাচ্ছ তুমি!'

বিরক্ত দেখাল হার্টনেলকে। 'এই যুক্তিগুলো প্রথম অ্যাটমিক বোমার সময়ও দেখানো হয়েছিল। তাতে কিন্তু ম্যানহাটন প্রজেক্ট টেস্ট রান বন্ধ করে দেয়নি। এমনকি হার্পের নামেও সেই ধরনের অভিযোগ আছে।'

কথা সত্য।

'যদি এসব ছোটখাটো আর প্রায় অবাস্তব ভয়ে ভীত হয়ে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকি, তাহলে কোনদিন কোন কাজই শেষ করতে পারব না।' হার্টনেল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আমাদের পূর্বপুরুষরা এভাবে চিন্তা করলে আজকে গুহায় বসে শীতে কাঁপতে হত আমাদের, আগুন আর পেতে হত না!'

অচিরেই গর্তের কানায় পৌঁছে গেল বগিটা, তীব্র বেগে বইতে থাকা বাতাস ও তুষারের ভেতর পা রাখল ওরা। এতক্ষণ খুলে রাখা হলেও এখন বন্ধ করা হলো জিপার। ইস্পাতের অ্যান্টেনার জঙ্গলের দিকে রওনা হলো দলটা। উরুর সমান মোটা তার পাথরের উপর দিয়ে ছুটে গিয়েছে।

নুড়ি বিছানো একটা পথ ধরে এগিয়ে গেল হার্টনেল, পিছু পিছু অন্যরা। কথা বলছে না কেউ, উবু হয়ে হাঁটছে। পার্কার হুডগুলো মাথার উপরে তুলে আত্মরক্ষার প্রয়াস পাচ্ছে ঠান্ডার প্রকোপ থেকে।

পেইন্টারের ডানে, বেশ খানিকটা দূরে, হ্যাঙ্গারের ভেতর থেকে বের করে রাখা হয়েছে একটা বোয়িং কার্গো জেট। মনে হচ্ছে, ঝড়ে ওটার কোন ক্ষতি হবে না। অবশ্য গত একঘন্টায় বাতাসের তীব্রতাও কমে এসেছে অনেকটা।

পেইন্টার জানে, ওই জেটের পেটে কী তোলা হয়েছে।

রাস্তার শেষ মাথায় ওদের জন্য অপেক্ষারত ছিল দুটো গাড়ি। একটা দেখতে গলফ কার্টের মতো, সম্ভবত ওটায় চড়ে হার্টনেল আর কাপুর শেষবারের মতো সবকিছু দেখতে যাবে।

হলোও তাই, অন্য বাহনটাকে দেখাল হার্টনেল। 'ওই স্নো-ক্যাটটা তোমার জন্য।' এরপর দেখাল কাছের একটা টিলা। 'যোগাযোগের ব্যাপারটা ওই টিলার উপরে একটা কুটিরে থাকা মানুষ দেখে। তুমি ওখানেই থাকবে। অ্যান্টনের সাথে যোগাযোগ করে ড. আল-মায়াজ আর তোমার সঙ্গীর চুরি করা জিনিসটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে। আমাদের জন্য ব্যাপারটা যেমন জরুরী ' অশুভ শোনাল লোকটার কণ্ঠ। ' .ওদের জন্যও জরুরী।'

'যদি মানা করি?'

আহত দেখাল হার্টনেলকে। 'তোমার ইচ্ছা। সমস্যার কারণ হতে পারো, আবার হতে পারো সমস্যার প্রতিকার। এখন তোমার যেটা মন চায়।'

পেইন্টার বুঝে নিল, এখানে সমস্যার কারণগুলোকে খুব দ্রুতই সরিয়ে নেয়া হয়।

অস্ত্রধারী দুই প্রহরীর দিকে তাকাল একবার ও। 'আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।'

'আমি এরচাইতে বেশি কিছু চাই না।' ঝড়ের দিকে তাকাল হার্টনেল। 'যেকোন সমস্যার মুখোমুখি হলে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই করা উচিৎ। এতেই দুনিয়াটা আরও ভালো জায়গা হয়ে উঠবে।'

মাথা ঝাঁকাল পেইন্টার।

আমারও তাই ইচ্ছা।

সকাল ১০:৫৫

ডিজেলের শেষ বিন্দুটা ওদের গাড়ির তৃষ্ণার্ত ট্যাঙ্কের ভেতর ফেলল ক্যাট। কাঁপতে কাঁপতে ভাবল, এতটুকু তেলে এই রুক্ষ পথ ধরে আরও আশি মাইলের মতো যাওয়া যাবে। ইঞ্জিনের যত্ন নিলে হয়তো আরও বেশি কিছুদূর। তবে অ্যালার্টে অবস্থিত কানাডিয়ান আউটপোস্টে যে পৌঁছান যাবে না, সেটা নিশ্চিত।

হাঁটাও তো আর সম্ভব না, ভাবল ক্যাট।

পার্কা নেই, সেই চেষ্টা করতে হলে জমে মরতে হবে।

তার উপরে সাফিয়ার শারীরিক অবস্থার কথাও ভাবতে হবে। ক্রমেই বেড়ে চলছে ওর শরীরের তাপমাত্রা। জ্বর বাড়ছে, ছয় ঘণ্টা আগে ল্যাবে অণুজীবটা আক্রান্ত করেছে ওকে। তাই সম্ভবত রোগটা এখনও প্রাথমিক পর্যায়েই আছে।

ক্যাট ও রোরির কোন সমস্যা হচ্ছে বলে মনে হয় না। কিন্তু অসুস্থ এই রমণীর সাথে এভাবে এক বাহনে আবদ্ধ রয়েছে বলে, বেশিক্ষণ এই অবস্থা থাকার কথা নয়।

কিন্তু আর কী-ই বা করার আছে আমার?

স্নো-ক্যাটে উঠে বসে আবার চালাতে শুরু করল গাড়ি। লেক হ্যাযেনের উত্তর-পশ্চিম পাড় ধরে এগোচ্ছে ওরা। লেকটা চল্লিশ মাইল লম্বা আর মাত্র আট মাইল প্রশস্ত। সোজা অ্যালার্টের দিকে চলে গিয়েছে লেক হ্যাযেন। কিন্তু কপাল মন্দ, লেক শেষ হবার পরও প্রায় একশো মাইল বাজে পথ ধরে এগোতে হবে। এর মাঝে রয়েছে পাহাড় .সেই সাথে হিমবাহও।

তবে কপাল ভালো, বাতাস ও তুষারঝড়, দুটোরই প্রকোপ কমে আসতে শুরু করেছে। বেশিক্ষণ এই পরিস্থিতি থাকবে না, আবার শুরু হবে প্রবল ভাবে। পশ্চিম থেকে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকা আকাশ কালো হয়ে আছে!

ওদিকে তাকানো মাত্র পাহাড়ে ছোট ছোট অনেকগুলো আলো দেখতে পেল ক্যাট। মনে মনে প্রার্থনা করল, ওটা যেন বজ্রপাত হয়। অসম্ভব কিছু না, তবুও অ্যাক্সেলটরে দাবিয়ে দিল পা। পশ্চিম দিকে একটা চোখ রাখল, কিন্তু আলো আর দেখতে পেল না।

প্যাসেঞ্জারের সিটে বসে থাকা সাফিয়া নড়ে উঠল হঠাত করে, মেয়েটার ঠোঁট শুকিয়ে গিয়েছে, চোখে ঘোলা দৃষ্টি। 'গরম '

'জ্বরে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে।' বলল ক্যাট। 'বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করো।' বলেই রিয়ার ভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে একবার রোরিকে দেখে নিল।

'সাফিয়ার চিকিৎসা দরকার,' ফিসফিস করে বলল ছেলেটা। 'যদি ফিরে যাই তো

ক্যাট জানে, কাজটা করলে সাফিয়ার মৃত্যু আরও নিশ্চিত করা হবে। স্টেশনের ওরা নিশ্চয়ই সবার আক্রান্ত হবার ঝুঁকি নেবে না। আর তাছাড়া, এত কষ্ট করে নিয়ে আসা তথ্য ফেরত দিতে চায় না ক্যাট। এই তথ্যের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে সাফিয়া, হয়তো এখন জীবন দিয়েই চুকাতে হবে তার মূল্য!

তাই-নাহ, কোনক্রমেই ফিরে যাবে না ওরা।

উইন্ডশীল্ডের দিকে গেল রোরির নজর। 'ক্যাট, দেখ! হ্রদের উপরে

ছেলেটার দেখান দিকে তাকাল ক্যাট। ডান দিকে তিনটা তাঁবু দেখা যাচ্ছে! বরফে ঢাকা পড়ে গিয়েছে প্রায়। প্রত্যেকটার সামনে একটা ছোট, বৃত্তাকার গর্ত। সেটার পাশে আবার লম্বা থাম দাঁড়িয়ে আছে, ক্যাটদের গাড়ির আওয়াজ শুনে বাইরে বেরিয়ে এসেছে মাছ-শিকারীরা। পশমের কোট আর মোটা প্যান্টে ওদেরকে দেখতে মনে হচ্ছে ছোটখাটো কোন ভালুক।

'আমার ধারণা, ওরা ইনুইট।' সামনের দিকে ঝুঁকে বলল রোরি।

সাফিয়া কোন আগ্রহ দেখাল না, এমনকী নজরই সরিয়ে ফেলল মেয়েটা। 'আলো .চোখে লাগছে।'

ভয় পেয়ে গেল ক্যাট। মস্তিষ্কে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার একটা অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে আলোকভীতি, আলোর উৎস থেকে নজর সরিয়ে নেয়া।

সাফিয়ার মাথা ঝুঁকে পড়ল পেছন দিকে। 'এত উজ্জ্বল আলো

সকাল ১১:০৪

সূর্যের দিক থেকে মুখ সরিয়ে নেবার প্রয়াস পেল সাফিয়া। আলোটা চোখে খুব লাগছে। সেই সাথে প্রচন্ড উত্তপ্ত মনে হচ্ছে সূর্যকে, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

'সাফিয়া, সাফিয়া .পান করো

কণ্ঠটার উৎস খোঁজায় মন দিল সাফিয়া।

চোখের সামনে দুনিয়াটা দুলছে। মরীচিকার মাঝে অদ্ভুত একটা সাদা ভূমি দেখতে পাচ্ছে সাফিয়া। কানে শুনছে দূর থেকে ভেসে আসা বজ্রপাতের আওয়াজ।

'কয়েক ঢোক মাত্র

আচমকা উধাও হয়ে গেল সেই ভূমি। সামনে কেবল বালি আর মৃত্যু। মাছি ভনভন করতে থাকা অগণিত পেট ফোলা লাশ পড়ে আছে চারপাশে। তারপরও এগিয়ে যাচ্ছে ও, সামনে অদূরেই নদী। সেখানে ওকে পৌঁছাতেই হবে।

কাছে গিয়ে টের পেল, যেটাকে প্রাণদায়ী নদী মনে করেছিল, সেটা আসলে রক্ত-গঙ্গা!

আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল সাফিয়া, প্রার্থনা করছে।

'পান করো, সাফিয়া

নদীর ওপাশের আকাশটা কালো, তাকে মাঠ বানিয়ে খেলা করছে বজ্র। আচমকা ওর দিকে, দুনিয়ার দিকে ছুটে এল সে! যেন চুরমার করে দেবে সবকিছু।

এক পা পিছিয়ে এল সাফিয়া, তারপর আরেক পা। আ .আসছে .

ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন বরফ বয়ে গেল ওর কণ্ঠ দিয়ে, ভিজিয়ে দিল ওর গলা।

'শান্ত হও, সাফিয়া। প্লিজ

আবারও মরীচিকার মতো কেঁপে উঠল দুনিয়া। সূর্যের আলো কমে আসছে, বালু রূপ নিচ্ছে বরফে। ছায়াগুলো জমে সেখানে জন্ম নিল এক চেহারা

.পরিচিত এক চেহারা।

'ক্যাট?'

'শান্ত হও সাফিয়া, শান্ত হও। খিঁচুনি উঠেছিল তোমার।' চেষ্টা করেও ফোঁপানো থামাতে পারছে না মেয়েটা।

'কী হয়েছে?'

'খারাপ .খুব খারাপ কিছু একটা আসছে।'

সকাল ১১:৩২

অন্তত, নিয়ম মেনে চলে এরা।

বরাবরের মতোই, কুটিরের দরজা খুলে প্রথমে ভেতরে প্রবেশ করল এক প্রহরী। এরপর পিঠে অ্যাসল্ট রাইফেলের ধাক্কা খেয়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল পেইন্টার।

সবশেষে রয়েছে দ্বিতীয় প্রহরী। ভেতরে ঢোকার আগে একনজরে নিজের অবস্থান দেখে নিল সিগমা কমান্ডার। এক পাশে সুমেরুর তুন্দ্রা, অন্য পাশে অরোরা স্টেশন।

কার্গো জেটটাও আছে, আগে যেখানে দেখেছিল সেখানেই। পেছন দিকটা খোলা। অনেকগুলো ফর্কলিফট সেদিকে এগোচ্ছে। ওই ছোট অংশটুকু ছাড়া, নড়াচড়ার আর কোন লক্ষণ নেই কোথাও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার একঘরের বাঙ্কারটা দেখল পেইন্টার। একপাশে অগোছালো বিছানা, ওটার পেছনে রয়েছে যোগাযোগের যন্ত্র। কয়েকটা রেডিয়ো ও সাবমেরিনের সাথে যোগযোগ করার জন্য একটা ভি.এল.এফ.ও আছে।

এসবের মাঝখানে বসে আছে ভারী গড়নের এক যুবক, কানে হেডফোন। অতিথিদের দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে সে। কেউ একজন প্রবেশ করেছে টের পেয়ে হাত তুলল।

'কী খবর, রে?' জানতে চাইল প্রথম প্রহরী।

অন্যজন পেইন্টারকে আবারও খোঁচা দিল।

সময় হয়েছে।

শরীর বাঁকিয়ে এক পা পেছনে চলে গেল পেইন্টার। রাইফেলের নল ওর পেটের দিকে চেয়ে আছে এখন। কালক্ষেপণ না করে হাত তুলে হ্যান্ডকাফের চেইনের অংশটা গলিয়ে দিল প্রহরীর ঘাড় দিয়ে। এরপর লোকটার কোমর জড়িয়ে ধরে, নিজেকে সহ প্রবেশ করল ভেতরে।

এদিকে প্রথম প্রহরীও দাঁড়িয়ে নেই, ঘুরে দাঁড়িয়ে সে গুলি ছুঁড়ল পেইন্টারের অবস্থান লক্ষ্য করে।

তবে গুলি খাবার কোন শখ নেই পেইন্টারের, এরইমধ্যে বসে পড়েছে ও। সামনে ধরে রেখেছে দ্বিতীয় প্রহরীকে। লোকটাই দয়া পরবেশ হয়ে হজম করে নিল অধিকাংশ বুলেট। এবার হাতদুটোকে লোকটার সামনে নিয়ে এল সে, এমনভাবে যেন পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছে লোকটা। আহত প্রহরীর অস্ত্রে হাত ঠেকতেই, চোখ বন্ধ করে ছুঁড়তে শুরু করল গুলি।

কপাল গুণে অরক্ষিত প্রহরীর বুকে আর হাঁটুতে গিয়ে লাগল দুটো বুলেট। ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে মেঝেতে আছড়ে পড়ল বেচারা। তাক ঠিক করে আর একটা মাত্র গুলি ছুঁড়ল পেইন্টার। কাজ হলো সেটাতেই। এদিকে ওর আলিঙ্গনে আটকা পড়া প্রহরী শ্বাস নেবার জন্য হাঁসফাঁস করছে। ওকে শেষ করে দিয়ে রাইফেলটা রেডিয়ো অপারেটরের দিকে ঘোরাল পেইন্টার। ঘটনার আকস্মিকতায় একদম বোকা বনে গিয়েছে ছেলেটা।

'রে, এক কাজ করো। তোমার ওই বন্ধুর পকেট থেকে আমার এই হাতকড়ার চাবিটা নিয়ে এসো তো।'

ইতস্তত করল রে, কিন্তু লোলুপ কালো নলটার দিকে নজর পড়তেই উবে গেল তার ইতস্ততা।

হাতকড়া খোলা হলে, অপারেটরকে বিছানার সাথে বাঁধল পেইন্টার। বাড়তি সাবধানতার জন্য একটা মোজা গুঁজে দিল ছেলেটার মুখে। ডাক্ট-টেপও বাদ পড়ল না।

'শোন রে, আমার বন্ধুরা বাইরে কোথাও আছে। তাই তোমার আপত্তি না থাকলে আমি ওই স্নো-ক্যাট নিয়ে বন্ধুদেরকে খুঁজতে যাব। তোমার কোন আপত্তি নেই তো?'

ডানে-বায়ে প্রচন্ড গতিতে মাথা নাড়াল ছেলেটা, তবে মুখে কোন রা নেই।

মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে, দুই মৃত গার্ডের পকেট থেকে বাড়তি ম্যাগাজিন নিয়ে নিল পেইন্টার। অস্ত্র হাতে নিয়ে উঠে বসল স্নো-ক্যাটে।

আসল খেলা তো এবার শুরু হলো মাত্র।

দুপুর ২:৪৫

অরোরা অ্যারের কমান্ড স্টেশনের হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে সাইমন। বিশাল টাওয়ারটা যেন উচ্চস্বরে ঘোষণা করছে টেসলার প্রতিভা। ওটার দিকে তাকানো মাত্র বুক ধুকপুক করছে সাইমনের।

শুধু টেসলাকে নয়, আমাকেও প্রতিভাবান বলে প্রমাণ করেছে টাওয়ারটা।

টেস্ট ফায়ারিঙয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সবাই। বার-বার চেক করে দেখা হচ্ছে সব। ওর সামনের সবগুলো সবুজ বাতিই জ্বলছে এই মুহূর্তে।

বাঁয়ের পর্দায় দেখতে পাচ্ছে বোয়িং কার্গো জেটটাকে। রানওয়ে ধরে ছুটছে ওটা, গতি বাড়ছে ধীরে ধীরে। মোটা পেটে সাইমনের উপহার নিয়ে ছুটে যাচ্ছে স্বর্গ ছুঁতে।

হাসি ফুটে উঠল সাইমনের চেহারায়।

আচমকা পেছন থেকে ভেসে এল হট্টগোলের আওয়াজ। ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটা দেখে-কালো ওভারঅল পরিহিত এক ব্যক্তি ওর দিকেই ছুটে আসছে। লোকটা অ্যান্টনের দলের, চিনতে পারল সে।

'স্যার?'

সাইমন মনে মনে প্রার্থনা করল, লোকটা যেন ভালো কোন সংবাদ-বহনকারী হয়। কিন্তু মলিন চেহারাটা ওকে বুঝিয়ে দিল, ওর আশা বৃথা। 'কী হয়েছে?'

'আমরা এই মাত্র জানতে পারলাম, প্রহরীদের খুন করে আমাদের বন্দি টিলায় অবস্থিত কুটির থেকে পালিয়ে গিয়েছে। রেডিয়ো অপারেটরের মতে, লোকটা একটা স্নো-ক্যাট নিয়ে বন্ধুদের খুঁজতে গিয়েছে। অস্ত্র আছে তার কাছে।'

রাগে মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে গেল সাইমনের হাত। গাল দুটোও লাল, নিজেকে সামলাতে বেগ পেতে হচ্ছে খুব। বোঝাই যাচ্ছে, এই পেইন্টার ক্রো লোকটা ডারপার সাধারণ কোন ইনভেস্টিগেটর নয়। বড় করে দম নিল একটা।

ছোট ছোট ব্যাপার ধরতে নেই।

আসলে কিছুই হয়নি। মেয়ে দুটো পালিয়ে গিয়ে কিছু ঝামেলায় ফেলেছে বটে। কিন্তু তা সহজেই সামাল দেবার মতো। পেইন্টার পালালেও পরিস্থিতির এমন কোন উনিশ-বিশ হয়নি।

অন্তত আমার পরিকল্পনার জন্য হয়নি

বড় করে আরেকটা দম নিল সে। 'অ্যান্টনকে জানাও। চোখ খোলা রাখতে বলবে।'

'ইয়েস, স্যার।' ঘুরে দৌড় লাগাল প্রহরী।

মাথা নাড়ল সাইমন, পেইন্টারের এই চেষ্টা বৃথা।

পালিয়ে সে যাবেটা কোথায়?

দুপুর ১:০৪

কার্গো জেটের বিশাল বড় পেটের মাঝে লুকিয়ে আছে পেইন্টার।

পায়ের নিচে টের পাচ্ছে জেটটার চারটা ইঞ্জিনের কম্পন। ঝড়ো বাতাসে কাঁপছে বিমানটা, সেই সাথে কাঁপছে পেইন্টারের চারপাশে রাখা সব কার্গো। মনে হচ্ছে বুঝি পিষে মারার পণ করেছে!

এই বিমানটা একটা সি-১৭ গ্লোবমাস্টার। সাধারণত সৈন্য, অস্ত্র এমনকী ট্যাঙ্ক বহনের জন্য সেনাবাহিনী এটা ব্যবহার করে। জিনিসটা এমনভাবে বানানো যে আকাশে ভাসমান অবস্থায় পেছনে হ্যাচ দিয়ে সব কার্গো ফেলে দিতে পারে নিচে। এখন অবশ্য আর বানানো হয় না এই দানবটাকে, তবে হার্টনেল যে টাকা ঢেলে একটা কিনে নিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

টিলা থেকে নেমে, প্রথমেই পেইন্টার স্নো-ক্যাটটাকে নিয়ে অনেকটা দূর চলে এসেছে। তারপর ফাঁকা জায়গার দিকে তাক করে একটা ক্রোবার গুঁজে দিয়েছে গ্যাস পেডালে। নিজে গাড়িটা থেকে নেমে এলেও, এই বুদ্ধি যে বেশিক্ষণ ওদেরকে বোকা বানাতে পারবে না তা জানে। অবশ্য বেশিক্ষণ ওর দরকারও ছিল না। সবার অলক্ষ্যে অলস দাঁড়িয়ে থাকা গ্লোবমাস্টারে ফিরে আসতে পারলেই ও খুশি।

ঝড়ের আড়াল নিয়ে চুপিচুপি বিমানের কাছে এসে অবস্থান নিয়েছিল পেইন্টার। যখন নেভি সিল ছিল, তখন এরকম দানব চালিয়েছে। তবে তা অনেক আগের কথা। যাই হোক, ওর অভিজ্ঞতা বলে, এমন বিশাল বিমানে চাইলেই যে কেউ আত্মগোপন করে থাকতে পারে।

তাই তাড়াতাড়ি টারমাকের পাশে এসে লুকিয়ে পড়েছিল দানবটার দেহের আড়ালে। ফর্কলিফট উধাও হয়ে গেলে আর দেরি করেনি। উঠে এসেছে হোল্ডে।

যেমনটা ভেবেছিল, পুরোটা জায়গা জুড়ে শুধু কার্গো আর কার্গো। একেক পাশে নয়টি সারিতে এবং প্রতি সারিতে মোট দুটো করে অ্যালুমিনিয়ামের ক্রেট সাজানো। একেকটা সম্ভবত পেইন্টারের সমান হবে, প্রতিটার সাথে প্যারাশুট লাগিয়ে রাখা। একটা বিশেষ ডেলিভারি সিস্টেমের উপর বসে আছে ক্রেটগুলো, চাইলে আসমানে থাকা অবস্থাতেই পেছনের হ্যাচ দিয়ে সব বের করে দেয়া যাবে।

ক্রেটের পেছনে অবস্থান নেবার জন্য দেরি করল না পেইন্টার। একদম নিচু হয়ে বসে পড়ল সে। যদিও মনে হয় না যে খুব সতর্কতার সাথে এই হোল্ড খুঁজে দেখবে কেউ। প্রতিটা ক্রেটের পাশে লাল রঙের চিহ্ন আঁকা। একনজর দেখলেই বোঝা যায়, বিপদজনক কিছু আছে ওতে।

কী আছে, তা পেইন্টারের খুব ভালোমতোই জানা।

পেসটিস ফুলমেন।

প্যারাশুটগুলো সম্ভবত বিশেষ নিয়মে বানানো। ক্রেটগুলো বাইরে বেরোতে শুরু করলেই ফুলতে থাকবে ওগুলো। প্রাণঘাতী কার্গো নিয়ে উঠে যাবে আরও উপরে। নির্ধারিত উচ্চতায় পৌছান মাত্র বিস্ফোরিত হবে ক্রেটগুলো।

ব্যাপারটা কল্পনা করতেই ঘাড়ের পেছনের লোম দাঁড়িয়ে গেল পেইন্টারের।

এখানে আসাটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি!

তেইশ

জুন ৩, বিকাল ৫:০৮ সি.এ.টি.
আকাগেরা ন্যাশনাল পার্ক, রোয়ান্ডা

চলার উপরে থাকতে হবে।

দিগন্ত রেখার নিচে চলে এসেছে সূর্য। আলো আর বেশিক্ষণ থাকবে না। এই সময়টুকুর সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে চাইছে গ্রে। মঙ্কের সাথে কথা বলার সময় শোনা গোলাগুলির আওয়াজের কথা মনে পড়ে গেল ওর। প্রতি ঘন্টায় কায়রোর পরিস্থিতি সঙ্গীন থেকে সঙ্গীনতর হচ্ছে।

তাই এখানে পাওয়ার মতো কিছু থাকলে, যত দ্রুত সম্ভব পেতে হবে ওকে।

রোয়ান্ডার দ্বিতীয় বৃহত্তম লেক, লেক ইহিমার দিকে তাকিয়ে আছে গ্রে ওর দলকে নিয়ে। একটা কাঠের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। খার্তুম থেকে বিমানে করে বিজ্ঞানী লিভিংস্টোনের ম্যাপের চিহ্ন দেয়া জায়গার যতটা সম্ভব কাছে চলে এসেছে সে। আকাগেরা ন্যাশনাল পার্কের কর্দমাক্ত রানওয়েতে নেমেছে বিমান। এখন অপেক্ষা করছে স্থানীয় গাইডের। লোকটার নাকি এখানে কাজ করার অভিজ্ঞতা পঁচিশ বছরের ।

টেবিলের উপরে খুলে রাখা ম্যাপ দেখে গ্রে-র মনে হলো, খুব অভিজ্ঞ একজনকেই দরকার ওর। প্রায় পাঁচশো বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই পার্ক। এরমাঝে রয়েছে তৃণময় সমতলভূমি, আছে প্যাপিরাসের জলাভূমি এবং টিলা ভর্তি জঙ্গল। অগণিত লেক আর জলাভূমির যেন গোলকধাঁধা সাজিয়ে বসে আছে পার্কটা। সবগুলো একটা আরেকটার সাথে সংযুক্ত, প্রতিটা কাগেরা নদীর শাখা। পার্কের পূব দিকের সীমান্ত ঘেঁষে বয়ে গিয়েছে নদীটা।

ম্যাপে আঁকা নদীটার গতিপথের উপর হাত বুলিয়ে দিল জেন। 'এটাই সঠিক শাখা, তাই না?'

খার্তুমে থাকাকালীন সময়ে দলটা লেক ভিক্টোরিয়ায় গিয়ে শেষ হওয়া সব নদীর গতিপথ দেখেছে। হোয়াইট নাইলের সমস্ত পানির উৎপত্তিস্থল ওই লেকটা। গ্রে-রা ব্যস্ত ছিল লিভিংস্টোনের ম্যাপে এসব নদীর কোনটাকে দেখান হয়েছে, তা আবিষ্কারে। কাগেরা নদীর গতিপথ দারুণভাবে মিলে গিয়েছিল ম্যাপে দেখান নদীর সাথে। ভিক্টোরিয়ার পশ্চিম দিক দিয়ে বেরিয়ে ওটা উগান্ডা আর তানজানিয়ার মাঝ দিয়ে চলে গিয়েছে। স্পর্শ করেছে রোয়ান্ডার সীমান্ত।

কিন্তু পুরোপুরি একশো শতাংশ নিশ্চিত নয় ওরা।

'এটা দেখ,' বলল ডেরেক।

গাইডের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ট্যাবলেট নিয়ে আরও গবেষণা চালিয়েছে ছেলেটা। এখন তারই ফল দেখাচ্ছে সবাইকে।
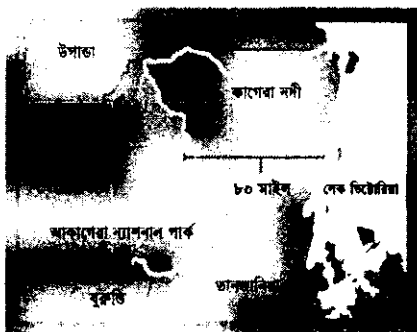
'যেমনটা দেখছ,' বলল ডেরেক। 'এই পার্কটা লেক ভিক্টোরিয়া থেকে আশি মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।'

'তাতে কী?' জানতে চাইল গ্রে।

লিভিংস্টোনের প্রজাপতি এবং শুঁয়োপোকা আঁকা একটা স্কেচ সবাইকে দেখল ডেরেক। মনোযোগ দিল শুঁয়োপোকার উপরে।
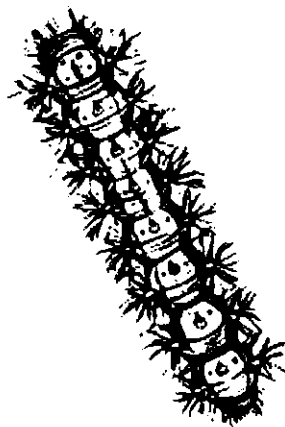
'মোট আট খন্ডে এটাকে এঁকেছেন লিভিংস্টোন। আমার ধারণা, লিভিংস্টোন এই পোকাটাকে তার ম্যাপ পড়ার একটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। অনেকটা গজ মারার লাঠির মতো।'

নড করল গ্রে। 'আট খণ্ড মানে আশি মাইল।'

একেবারে অকাট্য প্রমাণ না হলেও, ওরা যে সঠিক পথেই আছে তা এখন মনে হচ্ছে দলটার। এমনকী জেনের ঠোঁটেও হাসি দেখা গেল। বোঝা গেল, এই নিশ্চয়তাটুকু দরকার ছিল সবার।

ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ লেক আর আকাশ দেখছিল সেইচান। এবার ঘুরে দাঁড়াল। 'আমার মনে হয় গাইড লোকটা এসে পড়েছে।'

মোটরের গুঞ্জনের শব্দ শুনে ডেকের একপাশে চলে এল সবাই। অদ্ভুতদর্শন একটা জলযান ওদের দিকে আসছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এই জীবনে বহু পথ পাড়ি দিয়েছে যন্ত্রটা। ক্ষত-বিক্ষত সবুজাভ ধাতব হালটা বসে গিয়েছে জায়গায়-জায়গায়, উইন্ডশীল্ডও ফুটো। মনে হয় যেন বুলেট আঘাত হেনেছিল ওখানে।

'পানি কম,' মন্তব্য করল সেইচান। 'এখানে নোঙর ফেলতে পারবে বলে মনে হয় না।'

চালক লোকটাকে সেসব নিয়ে খুব চিন্তিত বলে মনে হলো না।

'গতিও কমাচ্ছে না দেখি,' এক পা পিছিয়ে এসে বলল ডেরেক।

পোতাশ্রয়ের কাছে পৌছাল যন্ত্রটা, কিন্তু থামল না। তীরে যখন পৌছাল, তখনও গতি কমায়নি চালক! কারণটা চোখের সামনেই দেখতে পেল ওরা। জলযানের নিচে ট্যাঙ্কের মতো চাকা লাগানো! উভগামী বাহনটা এসে থামল ওদের রেইলের একেবারে পাশে।

হাসল চালক, গ্রেদের চোখের তারায় বিস্ময় দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছে। 'মুরাহো,' স্থানীয় কিনয়ারওয়ান্ডা ভাষায় সম্ভাষণ জানাল সে। পরনে তার খাকি সাফারি জ্যাকেট ও খাকি প্যান্ট। বয়স ষাট হলেও, স্বাস্থ্য অটুট। কেবল কিছুটা পাক ধরেছে কালো চুলে।

'আকাগেরায় স্বাগতম।' বলল সে। 'আমার নাম নোয়া মুতাবাজি : সাথে করে বিশাল জাহাজ আনিনি বটে-' বলে জলযানের উপর চাপড় বসাল সে। 'তবে আশা করি হতাশ হবে না।'

ওর এই আগমনই একমাত্র বিস্ময়কর ব্যাপার নয়, একা আসেনি গাইড।

কোয়ালস্কি দুই ধাপ পিছিয়ে এল। 'ভুল দেখছি না তো? ওটা সিংহ নাকি?'

পেছনের সিটে বসে ছিল পশুরাজ, এবার উঠে দাঁড়াল। হাই তুলে যেন দেখিয়ে দিল গোলাপি জিহ্বা ও লম্বা শ্বদন্ত।

'আহ,' বলল গাইড লোকটা। 'এই হচ্ছে আমার নেভিগেটর। ওর নাম রোহো। সোয়াহিলি ভাষায় যার অর্থ ভূত।'

পশুটার সাথে দারুণ মানিয়েছে নাম। ওটার গায়ে সাদা চামড়া, চোখ উজ্জ্বল হলুদাভ। সাদা চামড়ার সিংহ দেখা বিরল ঘটনা। এই প্রাণীর ক্ষেত্রে এমনটা অ্যালবিনিজম নয়, বরঞ্চ লিউসিজমের কারণে ঘটে। লিউসিজম হলে রঙ ধারণে ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে দেহ।

নেভিগেটরের ঘাড়ে আদর করে হাত বুলিয়ে দিল নোয়া, 'এখনও বাচ্চা।'

'এই যদি বাচ্চা হয়...' আঁতকে উঠল কোয়ালস্কি।

এমন কথা বলার কারণটা বুঝতে পারছে গ্রে। পশুটার ওজন কম করে হলেও একশো পাউন্ড হবে।

'হ্যাঁ।' গাইড লোকটা ইংরেজি ভালোই বলতে পারে, তবে কিছুটা ব্রিটিশ টানে। 'সামনের মাসে ওর জন্মদিন।' বলতে বলতে আরেকটু রোহোর কাঁধের সাদা পশম দেখাল নোয়া। 'ওর কেশর এখনও পূর্ণাঙ্গ হয়নি। আসলে এখনও গর্জন করতেই শেখেনি আমার বাছা, আরও কয়েকমাস লাগবে।'

গড়গড় করে উঠল রোহো, এমনভাবে গাইডের হাতে কামড় বসাবার ভান করল যেন অপমানিত বোধ করছে।

জেনকে দেখে মনে হলো, পশুটাকে আদর করার জন্য তর সইছে না ওর। 'পেলেন কীভাবে ওকে?'

গম্ভীর হয়ে গেল নোয়ার চেহারা। 'বছর দুয়েক আগে, আমাদের পার্কে নতুন করে নিয়ে আসা হয়েছিল সাতটি ট্রান্সভাল সিংহ। অনেকদিন ধরেই পার্কে সিংহ নেই। তাই এদের সাথে যদি একদিন কালো গন্ডার যোগ করা যায়, তাহলে আকেগারা ফিরে পাবে তার হারানো জৌলুস-এমনটাই ছিল সবার ভাবনা।'

'তারপর?' চাপ দিল জেন।

'ওই সাতজনের মাঝে ছিল একটা সিংহী। বেচারি যখন আসে, তখন গর্ভবতী ছিল। তিনটা বাচ্চার জন্ম দিয়েছিল সে, তাদের মাঝে রোহো একজন। যেহেতু বুনো পরিবেশে বাচ্চাদের বেঁচে থাকার হার কম, তাই আমরা ওকে ওর মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছি। অন্য দুই বাচ্চার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা এতে বাড়ে। আর তাছাড়া, ওর এই বিরল চামড়ার জন্য পোচারদের হাতে মারা পড়ারও একটা সম্ভাবনা ছিল। পোচাররা আসলে শিকার করার সময় অতশত ভাবে না। তাই হয়তো রোহোর পাশাপাশি, সিংহের পুরো দলটাকে হত্যা করত।'

'এজন্য নিজের সাথে রেখেছেন?'

'ট্রেনিং দেয়ার ব্যাপারও আছে। আশা করি আরেকটু বড় হলে ওকে ছেড়ে দিতে পারব। ওর এখন যা বয়স, সে বয়সে অন্যান্য বাচ্চাদের শিকার শেখানো হয়। তাই যেখানেই যাই, সাথে করে নিয়ে যাই রোহোকে।'

সূর্যের দিকে একবার তাকাল গ্রে। 'আমাদের রওনা দেয়া উচিৎ। সূর্য ডোবার আগে আমি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে চাই।'

নোয়া ওর জলযান থেকে ডেকে নেমে এল। 'আমাকে আগে ম্যাপে দেখাও জায়গাটা।' এক লাফে নেমে এল রোহোও। 'ওকে ভয় পাবার কিছু নেই।' সবাইকে আশ্বস্ত করল সে।

টেবিলের উপর এখনও বিছানোই আছে ম্যাপটা, গ্রে গাইডকে নিয়ে সেদিকে এগোল। এই সুযোগে পশুরাজের সাথে পরিচিত হতে লাগল অন্যরা।

'আমরা এখানে যেতে চাই।' লিভিংস্টোনের ম্যাপের চিহ্নিত জায়গার সাথে মেলে, এমন স্থান দেখাল গ্রে।

বড় করে শ্বাস নিল নোয়া। 'কেন, তা জানতে পারি?'

'কোন সমস্যা?'

'আফ্রিকার অন্যান্য জায়গার মতো পর্যটক আসে না আকেগারায়। সাধারণত আমি যখন বের হই, তখন একটাই সাফারির ব্যবস্থা করা হয় পার্কে। তা-ও আমরা যাই দক্ষিণে। উত্তরে তো কেউ ভুলেও যায় না।'

'কেন?'

'পথ ভালো না। পাহাড় আছে, আছে ঘন জঙ্গল। বলতে গেল একেবারে অগম্য জায়গা। অনেকের ধারণা, ওই ঘন জঙ্গলে ভূতের রাজত্ব। পোচার আর বিদ্রোহীরাও ওখানে পা রাখার সাহস করে না।'

উভগামী যানটার দিকে তাকাল গ্রে। 'আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ওই জিনিসটা কি আমাদেরকে দেখানো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে?'

'ধারে-কাছে তো অবশ্যই পারবে। তবে হাঁটতে হবে...' শ্রাগ করল লোকটা। 'কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম না। তোমরা আসলে কী খুঁজছ?'

'হাতি।'

চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল নোয়ার, সেই সাথে স্বস্তিও ভর করল চোখের তারায়। 'তাহলে তো একদম সোজা। অতদূর যাবার দরকার নেই। কাছেই তোমাদেরকে অনেক হাতি দেখাতে পারব। দক্ষিণেই আছে।'

'উত্তরে নেই হাতি?'

জবাব দেবার আগে প্রশ্নটা মনে-মনে নেড়ে-চেড়ে দেখল নোয়া। 'এখনও পর্যন্ত নেই। পার্কে আমরা পুনরায় হাতির আবাস গঠন করেছি-প্রায় নব্বইটা হাতি আছে এখন। অবশ্য তারা দক্ষিণেই থাকে বেশিরভাগ সময়। এমনকী তারাও উত্তরের এলাকায় যেতে চায় না।'

'হাতির আবাস গড়েছেন মানে?' কথাটা কানে লেগেছে গ্রে-র।

'১৯৭৫ সালের দিকে আমরা পার্কে নিয়ে এসেছিলাম হাতি, এই রোহোর বাবা-মায়ের মতোই।'

'তার আগের পালটার কী হয়েছে?'

আবার শ্রাগ করল গাইড। 'পোচার, শিকারী এরা সব মেরে সাফ করে দিয়েছে বলেই জানি। ষাট বছর আগে এখান থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল হাতি।'

উধাও হয়ে গিয়েছে মানে?

হতাশা পেয়ে বসল গ্রেকে। দেরি করে ফেলেছে ওরা?

তা-ও আবার কয়েক দশক দেরি?

মাথা নাড়ল নোয়া। 'যুবক বয়সে যখন এখানে আসি, তখনকার গাইডদের মুখে শুনতাম পার্কের গৌরবের গল্প। তখন অনেক পাল বাস করত এখানে। এমনকী লাজুক বুনো হাতিও ছিল। জঙ্গলের দক্ষিণ দিকটা ছিল ওদের দখলে। এখন অবশ্য সেই দিন গত হয়ে গিয়েছে। সামনে ফিরবে হয়তো।'

'আপনি নিশ্চিত?' প্রশ্ন করল গ্রে।

'গৌরব ফিরে পাবার ব্যাপারে?'

'নাহ, বুনো হাতি উধাও হবার ব্যাপারে।' ম্যাপের দিকে তাকাল গ্রে। 'লাজুক ছিল হাতিগুলো; এর অর্থ-তারা না কোথাও ভ্রমণ করত, আর না কারও সামনে আসত। হয়তো তাদের দুয়েকজন এখনও বাস করে ওখানে।'

সন্দিহান দেখাল নোয়াকে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল গ্রে। 'খুঁজে দেখতে তো আর দোষ নেই?'

বিকাল ৫:৩১

ডেরেকের সাথে নোয়ার উভযানের মাঝখানে বসেছে জেন।

সামনে বসেছে গ্রে, পাশে সেইচান। কোয়ালস্কি পেছনে বসে নজর রাখছে সেদিকে, শটগানটাকে ফেলে রেখেছে কোলের উপর।

বিপদ ভুলে চারপাশের সুন্দর দৃশ্য অবলোকন করার চেষ্টা করছে জেন।

চারিদিক থেকে ওদেরকে ঘিরে রেখেছে লেক ইহেমার পানি, নীলচে আকাশ প্রতিফলিত হচ্ছে সেই পানিতে। মনে হচ্ছে যেন পুরো লেকে আছে কেবল ওরাই। তবে জেন জানে, প্রাণের অভাব নেই ওই পানিতে। জলহস্তীর দল গা ভাসিয়ে শুয়ে রয়েছে, মাঝে মাঝে মস্ত হাঁ করে ভয় দেখাচ্ছে ওদের। প্যাপিরাসের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে আছে কুমীরের দল।

ঘাড় বাঁকানো সারস মাছ খুঁজছে পানিতে। অবশ্য এই লেকের ওরাই একমাত্র মাছ শিকারি নয়। আচমকা আসমান থেকে নেমে এল একটা আফ্রিকান ঈগল, দুই ঠোঁটের মাঝে একটা রুপালী মাছ পাকড়াও করে আবার উড়াল দিল। হাজারও পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে চারপাশে, সবগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেন। এই এলাকার সৌন্দর্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলাটা বড় সহজ একটা ব্যাপার। কিন্তু না, হাতে এখনও অনেক কাজ আছে।

আচমকা থাপ্পড়ের আওয়াজে সম্বিত ফিরল ওর।

ডেরেক নিজের হাত ডলছে প্রাণপণে। জেন বুঝতে পারল, কিছু একটা কামড়িয়েছে ওকে। এই এলাকায় এমন অনেক মশা বা মাছি জাতীয় প্রাণী আছে, যাদের একটা কামড়ই মৃত্যু ঘটাবার জন্য যথেষ্ট। ওয়েস্ট নাইল, ডেঙ্গু, ইয়েলো

ফিভার এমনকী জিকাও ছড়ায় তারা। যতদূর জানে ও, এসব জীবাণুর সবগুলোই ফ্ল্যাভিভাইরাস। যে অণুজীবটার পেছনে লেগেছে ওরা, তারাও সেই গোত্রের ভাইরাস বহন করে চলছে নিজেদের ভেতরে।

সিটের উপর গা ছেড়ে দিয়ে বসল মেয়েটি, ডেরেকও তাই করল। ছেলেটার হাত টেনে নিয়ে গুটিসুটি মেরে তার বুকের উপর মাথা দিল জেন। ডেরেক সম্ভবত মেয়েটার মনের অবস্থা বুঝতে পারল। 'আমি কী ভাবছি শুনবে? ভাবছি ডেভিড লিভিংস্টোন আর তার মতো অন্যান্য অভিযাত্রীদের কথা। এই জলাভূমি ধরেই এগিয়েছেন তারা। পরিবেশের সাথে, বুনো প্রাণীর সাথে, আর-' হাত তুলে রক্তের একটা ফোঁটা দেখাল ও। '-প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম শিকারির বিরুদ্ধে লড়াই করে।'

ঘাড় বাঁকাল ডেরেক। 'লিভিংস্টোন অবশ্যই এই এলাকায় এসেছিলেন। স্ট্যানলি তো তাকে লেক তানগানিয়াকার তীরবর্তী একটা গ্রামে খুঁজে পেয়েছিলেন! এখান থেকে মাত্র কয়েকশো মাইল দূরেই জায়গাটা। স্ট্যানলি বাড়ি ফিরে এলেও, লিভিংস্টোন কিন্তু রয়ে গিয়েছিলেন। নীলের উৎসের খোঁজে ব্যয় করেছেন বাকি জীবন। কাজেই তার এখানে আসাটা অস্বাভাবিক কিছু না।'

'আমি শুনেছি, ওই গ্রামের এক যোদ্ধা তাকে তালিসমানটা উপহার দেয়।'

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। 'সেই একই গোত্র তাকে সম্মান জানায় পরে, তার হৃদপিন্ড কবর দেয় একটা মোবোলা তাল গাছের নিচে।'

'তারপর মমি করে রাখে তাকে।' পিতার ভাগ্যের কথা মনে পড়ে গেল জেনের।

'সম্মান দেখাবার জন্য। তার সব জিনিসপত্রসহ একটা বাকলের কফিনে করে তার মরদেহ পাঠিয়ে দেয় পরিবারের কাছে। এখন ওয়েস্টমিনিস্টারে শুয়ে আছেন তিনি।'

'এসব কী আসলেই দরকার ছিল? একটা মাত্র মানচিত্রের জন্য নিজের জীবন খোয়ালেন ভদ্রলোক।'

'হুম। সেই সাথে এখানকার অধিবাসীদের যে সাহায্য করেছেন, তার কথা ভুলে গেলে চলবে না। ওদের দাস ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে লড়তে শিখিয়েছেন। তারচেয়ে বড় কথা, জ্ঞানের জন্য করা কোন পরিশ্রমই বৃথা নয়। ম্যাপে আঁকা প্রতিটা লাইন আমাদেরকে এই সুন্দর দুনিয়া আর সেখানে আমাদের অবস্থানের ব্যাপারে জানিয়েছে।'

হাসি উপহার দিল ওকে মেয়েটি। 'তুমি, ড. র‍্যাঙ্কিন, মানুষ হিসেবে আমার চাইতে ভালো।'

'সে কথা মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই।' মেয়েটাকে কাছে টানল ডেরেক।

লেকের প্রায় শেষ মাথায় পৌঁছে গিয়েছে ওরা, এবার প্রবেশ করেছে ছোট ছোট হ্রদ, পাহাড় আর জলাভূমির গোলকধাঁধায়। ওদের উভযানের কার্যকারীতা এখন

বোঝা গেল। গভীর পানি, পিচ্ছিল কাদা, বালু বা উঁচু ঘাস-কোন কিছুই যানটাকে থামাতে পারল না।

তবে সবাই কিন্তু সন্তুষ্ট নয়।

জেনের পেছন থেকে আপত্তি ভেসে এল। 'ব্যাটা আমাকে চাটছে কেন?'

পিছু ফিরে মেয়েটা দেখে, রোহো বসে বসে কোয়ালস্কিকে নাক দিয়ে গুঁতাচ্ছে। ঠেলেও সরাতে পারছে না লোকটা। সামনে থেকে মন্তব্য করল সেইচান, 'তোমাকে পরখ করে দেখছে, কোয়ালস্কি। বোঝার চেষ্টা করছে, খেয়ে মজা পাবে কিনা।'

চোখ পাকিয়ে সেইচানের দিকে তাকাল নোয়া। 'তোমার ঘামের সাথে থাকা লবণ চাটছে।'

কথাটা বিশালদেহীকে শান্ত করতে ব্যর্থ হলো। 'তারমানে সত্যি সত্যি আমার স্বাদ চেখে দেখছে ব্যাটা!'

বিকাল ৫:৫৫

কোন পদক্ষেপ নেবার আগে, যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করতে চাইছে ভালিয়া।

কো-পাইলটের সিটে বসে, সেসানাটাকে আরেকবার ঘুরিয়ে আনার নির্দেশ দিল সে। প্রশস্ত হ্রদের পানিতে প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছে ও। পেছনের কেবিনে বসে কার্গোর দরজা খুলে রেখেছে ক্রুগার, একটা হাতে ধরে আছে বাইনোকুলার। টার্গেটকে লেক, জলাভূমি আর ঘাসের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখছে।

একবার ভালিয়ার মনে হলো, সেসানা নিয়ে ডাইভ দেয়। হেল-ফায়ার মিসাইল একটা কী দুটো ছুঁড়লেই আর উভযানটাকে দেখতে হবে না। এতে কাজ হলেও, শান্তি পাবে না মেয়েটি। নানীর দেয়া অ্যাথেমির বাট স্পর্শ করল ও।

নাহ, এভাবে খুন করায় শান্তি নেই।

শুধু তাই নয়, বাস্তবতাকেও মাথায় রাখতে হবে। এরা কোথায় যাচ্ছে, তা জানাটাও জরুরি। সময় এলে ওদের খুঁজে বের করা গুপ্তধন ছিনিয়ে নেয়া যাবে।

তারপর সেটা বিক্রি করবে সবচেয়ে বেশি দাম হাঁকা মানুষের কাছে।

আশার কথা হলো, সেই মানুষটার সাথে যোগাযোগও আছে ভালিয়ার। এই পরিস্থিতির ব্যাপারে ব্যক্তিগত আগ্রহ আছে সেই মানুষের, পকেটটাও যথেষ্ট ভারী।

সাইমন আর আমার ভাই চুলোয় যাক।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেলে প্রাক্তন প্রভু, গিল্ডের শেখানো আপ্তবাক্য মনে করল ও: অপেক্ষা করো সঠিক সময়ের। এখন পর্যন্ত ভালিয়ার প্রতিটা ব্যর্থতার পেছনে কারণ ছিল একটাই-তাড়াহুড়ো করা। এখন হিসেব করে ফেলতে হবে প্রতিটা পা।

ঠিক ওর লক্ষ্যের মতো।

সেইচানের চেহারা ভেসে উঠল ওর মানসপটে।

'সূর্য ডুবতে যাচ্ছে!' ক্রুগার চিৎকার করে জানাল।

নড়ে উঠল ভালিয়া, র‍্যাভেন ইউ.এ.ভি.টা আছে কেবিনে। 'পুরোপুরি অন্ধকার হবার আগে কিছু করার দরকার নেই।'

সন্ধ্যা নামলে ড্রোনটাকে পাঠাবার পরিকল্পনা করেছে ভালিয়া। বাতাসে ভাসমান যন্ত্রটা থার্মাল পদ্ধতি ব্যবহার করে সহজেই শিকারের উপর নজর রাখতে পারবে। কিন্তু দিনের বেলা বের করলে সেটা শত্রুর চোখে ধরা পরে যেতে পারে। ওটাকে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা উঠে যাবে আরও উপরে, সঠিক মুহূর্তটা এলেই নেমে আসবে নিচে। ক্রুগার ও তার দলের লোকরা নিচে নেমে দখল করবে জায়গাটা। নামবে ভালিয়া নিজেও। পাইলটকে অবশ্য বলা হলো ল্যান্ডিঙয়ের জায়গাটাকে ঘিরে চক্কর খেতে। আদেশ হলেই যেন সেসনার মিসাইল ছোঁড়ে।

আর যদি মনে হয় যে শিকার তার অভিযানে ব্যর্থ হয়েছে, তাহলে মিসাইল ছুঁড়েই কাজ সারবে। এতে কাজ হবে হয়তো, কিন্তু মনের জিঘাংসা মিটবে না।

প্রথম পরিকল্পনাটাই বেশি পছন্দ ভালিয়ার।

তাই নিচের দিকে তাকিয়ে শত্রুর সফলতা কামনা করল।

সন্ধ্যা ৬:৩৫

নোয়ার কথার অর্থ এতক্ষণে মাথায় ঢুকেছে।

সামনের অন্ধকার জঙ্গল দুর্ভেদ্য নয়, অভেদ্য বলে মনে হচ্ছে। চল্লিশ মিনিট আগে জলাভূমি ছেড়েছে উভযান। উত্তরে পাহাড়গুলো যেন মুখব্যাদান করে চেয়ে আছে। একেবারে চূড়াটা গ্রানাইটের, কিন্তু বাকিটা ঘন জঙ্গল।

তবে হাল ছাড়েনি জেন ও ডেরেক। এখনও ওদের এগোবার জন্য সেরা পথটা বের করার কাজে লেগে আছে। পার্কের হাইড্রোলজিকাল ও টপোগ্রাফিকাল ম্যাপগুলো ব্যবহার করছে তারা। ওদের বিশ্বাস পাহাড় থেকে বের হয়েছে যে নদী; সম্ভবত লিভিংস্টোনের ম্যাপে কাগেরা নদীর যে ছোট শাখাটাই সেটা।

অবশ্য এই তত্ত্ব ছাড়া এগোবার মতো আর কোন পথ নেই ওদের হাতে। তাই এগিয়ে গেল ওরা। কিছুক্ষণের মাঝেই ভিজে গেল পুরোপুরি। অবশ্য এতে রোহো না কোয়ালস্কি, কার বেশি মেজাজ খারাপ হয়েছে তা বলা মুশকিল। দু'জনেই খানিক পর-পর প্রতিবাদ জানাচ্ছে। মড়ার উপর খড়ার ঘা হিসেবে একদম হঠাত করে নেমে গিয়েছে তাপমাত্রা।

নোয়ার উভযানে করে অনেকটা পথ এগোল ওরা, তবে শেষ পর্যন্ত থামতে হলো একটা জলপ্রপাতের সামনে এসে। নদী ধরে আর এগোবার উপায় নেই।

জলপ্রপাতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সামনের দৃশ্য দেখে নিল গ্রে। এখান থেকে বনটাকে আরও বেশি ঘন বলে মনে হচ্ছে।

নোয়াও যোগ দিল ওদের সাথে। 'এখানেই রাস্তার শেষ, সামনে এগোতে হলে পায়ে হেঁটে এগোতে হবে।'

অন্যদের দিকে তাকাল গ্রে, সবার চোখে-মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

জেন বুঝতে পারল ব্যাপারটা। 'এতদূর যখন আসতে পেরেছি, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আরও কিছুদূর এগোতেও পারব।'

ডেরেককে অতটা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বলে মনে হলো না, তবে মাথা নেড়ে সায় জানাল সে।

নোয়া ওদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে, কাঁধে রাইফেল ঝোলাল। শিষ বাজাতেই উভযান থেকে নেমে ওর পাশে এসে দাঁড়াল রোহো। পশুটার গলায় লাল একটা কলার বেঁধে দিল নোয়া, নিচ থেকে একটা কালো ওজন ঝুলছে।

বিনা প্রতিবাদে কলারটাকে মেনে নিল রোহো।

'শক কলার।' ব্যাখ্যা করল নোয়া।

'ব্যাপারটা পাশবিক হয়ে গেল না?' ভ্রু কুঁচকে গিয়েছে জেনের।

'দরকারি জিনিস। দেখে যেমনই মনে হোক না কেন, রোহো এখনও বাচ্চা। আপনমনে খেলতে খেলতে হারিয়ে যেতে পারে ও, আহত হতে পারে। তবে চিন্তা করো না।' পকেট থেকে একটা ছোট বিপার বের করে দেখাল গাইড। 'শকের মাত্রা আমিই নিয়ন্ত্রণ করি। এক থেকে দশ পর্যন্ত আছে মাত্রা। তিন খুব একটা বেশি ব্যবহার করতে হয়নি। এক ও দুই আসলে কাঁধে টোকা দেবার মতো।'

গ্রে-র পাশে এসে দাঁড়াল সেইচান। 'কোয়ালস্কির জন্য ওরকম একটা কলারের ব্যবস্থা করা যায় না?'

'আমি শুনে ফেলেছি।' সেইচানের পেছন থেকে বিশালদেহীর কণ্ঠ ভেসে এল।

'শুনিয়েই তো বললাম।' জানাল সেইচান।

সবাই উভযান থেকে যার যার জিনিস পত্র নিয়ে নামার পর, এগোতে শুরু করল দলটা।

আগের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা হয়েছে গ্রে-র। তাই গুহায় ব্যবহার করা হয়, এমন অনেকগুলো হেলমেট নিয়ে রেখেছে ও। এবার সবাইকে একটা একটা করে বুঝিয়ে দিল। সামনে কী অপেক্ষা করছে, জানা নেই। কিন্তু বনটা এতটাই ঘন যে মনে হচ্ছে বুঝি মাটির নিচে চলে গিয়েছে ওরা।

দলবদ্ধভাবে জলপ্রপাতের পাশ দিয়ে যাওয়াটা খুব একটা কঠিন হলো না। দড়ি, লতা, শিকড় ইত্যাদি ব্যবহার করে সহজেই এগোতে পারল। তিন-চতুর্থাংশ পথ

ওঠার পর, একটা শৈলশিরায় এসে বিরতি নিল ওরা। পরিশ্রমে লাল হয়ে গিয়েছে ডেরেকের চেহারা, হাঁপাচ্ছে জেনও।

নোয়াকে দেখে মনে হচ্ছে, আরও কয়েক ঘন্টা এভাবে চললেও বুঝি কোন কষ্ট হবে না। জলপ্রপাতের অন্য দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'আজকের বিনোদন সম্ভবত আমরাই সরবরাহ করছি।'

ছোট ছোট অনেকগুলো বানর গোত্রীয় প্রাণীকে বসে থাকতে দেখল গ্রে।

'পাপিও আনুবিস,' বলল নোয়া।

'ভয় পাওয়ার মতো কিছু না তো?'

'নাহ, ওদেরকে না ঘাঁটালে, ওরাও ঘাঁটাবে না।' জানাল নোয়া।

জেন দম ফিরে পেয়েছে। 'বেবুনগুলো আমাদেরকে দেখে অবাক হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা স্বাভাবিক। পার্কে পর্যটক এতটাই কম আসে যে এই প্রাণীগুলো এখনও মানুষকে ভয়ও করতে শেখেনি। গত মাসের কথাই ধরো, এক মহিলা রাতে ঘুম থেকে জেগে দেখে-একটা নীল বানর এসে ওর পাশে বসে ঘুমাচ্ছে, বিশ্বাস হয়!'

বেবুন দলের দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল কোয়ালস্কি। 'ওদের একটা যদি আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। তাহলে-'

বিশালদেহীকে চুপ করিয়ে দিল গ্রে। 'চলো, এগোন যাক।'

সমস্যা ছাড়াই জলপ্রপাতের দেয়াল ধরে বাকি পথ উঠে এল ওরা। একদম উপর থেকে নদীকে মনে হচ্ছে কালো জঙ্গলের মাঝে হারিয়ে যাওয়া কোন সাপ!

'মনে হচ্ছে যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগে পা রেখেছি।' বলল ডেরেক।

'অনেকাংশেই সত্য কথাটা।' ম্যাচেটি বের করে এনেছে নোয়া, দরকার হলে বন কেটে পথ করে নেবে। কাছেই রয়েছে রোহো, লেজ নাড়ছে নার্ভাস ভঙ্গিতে।

'রোয়ান্ডার এই অংশটা পূর্ব আফ্রিকান রিফট ভ্যালির অংশ। লেক ভিক্টোরিয়ার পশ্চিম দিকটা ঘিরে রেখেছে এই ভ্যালি। লেক তানগানিয়াকা থেকে শুরু হয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতিতে এগিয়ে শেষ হয়েছে নীল নদের বেসিনের ধারে।

'ওই পাহাড়গুলো আফ্রিকার প্রাচীনতম পাহাড়গুলোর একটা। এই জঙ্গলের বয়সও কম না!'

চুপচাপ এগোতে থাকল দলটা, যেন চারপাশের জীবন্ত ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। এক মাইল এগোবার পর, সাহস দেখাতে শুরু করল রোহো, মাঝে মাঝেই নোয়ার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সে। এটা শুঁকছে, ওটা দেখছে। তবে কিছুক্ষণ পরপর এসে গাইডের হাতে আদর খেয়ে যেতে ভুল করছে না। গর্বিত

পিতার মতো মাথা উঁচু করে হাঁটছে নোয়া। সিংহটার কানে কানে বলছে, 'ডাগুকুন্ডা, রোহো। ডাগুকুন্ডা।'

স্থানীয় ভাষার একটা বর্ণও জানে না গ্রে। তবে বুঝতে পারছে যে এই ডাগুকুন্ডা অর্থ-আমি তোমাকে ভালোবাসি।

অনুভূতিটা যে উভমুখী-তা পরিষ্কার।

এক লাইনে হাঁটছিল ওরা, রাস্তা একটু চওড়া হলে নোয়ার পাশে চলে এল গ্রে। 'আপনি পার্কের চাকরিতে ঢুকলেন কীভাবে?'

কথার কথা হিসেবে প্রশ্নটা করেছিল গ্রে, কিন্তু নোয়ার চেহারা দেখে বুঝল- স্পর্শকাতর ব্যাপারে হাত দিতে ফেলেছে। 'যুবক বয়সে আমি কিগালিতে বাস করতাম।'

'রাজধানীতে?'

'হ্যাঁ, ষোলো বছর বয়সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেই। ১৯৯৪ সালের মাঝেই পদন্নোতি পেয়ে কর্পোরাল হই।'

লোকটার কণ্ঠের বিষাদের কারণ এবার বুঝতে পারছে গ্রে। ওই বছরের জুলাইতে রোয়ান্ডায় ঘটে ইতিহাসের অন্যতম জঘন্য হত্যাকান্ডের ঘটনা। হুটু গোত্র দ্বারা পরিচালিত সরকার টুটসি গোত্রকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অনেকের মতে, মাত্র একশো দিনে প্রাণ হারায় দশ লাখ টুটসি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল নোয়া, নজর বনের দিকে। 'আমি হুটু গোত্রের।'

আর কিছু বলার দরকার হলো না তার।

ফিরে এসেছে রোহো, বোবা প্রাণীটা যেন তার প্রভুর দুঃখ আঁচ করতে পেরেছে। এবার তাকে অগ্রাহ্য করল নোয়া, এতদিন ধরে ঢেকে রাখা স্মৃতিগুলো আজ মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে।

বেশ কয়েক মিনিট চুপ থাকার পর আবার বলল, 'এখানে থাকতে ভালো লাগে। পশুদের কাছ থেকে অনেককিছুই শেখা যায়। কীভাবে বাঁচতে হবে, তার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এরা ' বলতে বলতেই মিইয়ে গেল ওর গলা।

বাক্যের অবশিষ্টাংশটুকু পূরণ করে নিল গ্রে।

.যখন তোমার বাঁচার কোন অধিকারই নেই!

পিছিয়ে এল গ্রে, নোয়াকে একাকী ছেড়ে দিল। বুঝতে পারছে, এখন লোকটাকে সঙ্গ দিতে গেলেই বরং সে বিরক্ত হবে।

আবারও চুপচাপ এগোতে লাগল ওরা। এসে উপস্থিত হলো বনের এমন এক জায়গায়, যেখানে নদীর পানি বেড়ে দুই পাশে উপচে পড়ছে। গ্রে-র দৃশ্যটা দেখে আমাজনের কথা মনে পড়ল। প্লাবন হলে ওখানকার অনেক বনভূমি পরিণত হয় জলাভূমিতে। তবে এই জায়গায় অমনটা হয় বলে মনে হলো না।

ম্যাচেটি ব্যবহার করে পথ বানাচ্ছে নোয়া। 'সাপের ব্যাপারে সাবধান। অনেক চোরাবালিও আছে কিন্তু।'

'গ্রে, তুমি আমাদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা জায়গাগুলোতে বেড়াতে নিয়ে যাও।' ঘোঁত করে উঠল কোয়ালস্কি।

কমে এসেছে ওদের চলার গতি। ভাগ্য ভালো, পানি বেশি হলেও কখনও হাঁটু পর্যন্তও উঠছে না। মাঝে-মাঝেই আশেপাশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ছোট ছোট জলাভূমি। জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি নজরে পড়ছে থেকে থেকে।

'গ্যালাগো,' বলল নোয়া। 'ছোট ছোট স্তন্যপ্রায়ী প্রাণী, ভয়ের কিছু নেই।'

আরও প্রায় বিশ মিনিট হাঁটার পর, গ্রে-র কাঁধ স্পর্শ করল জেন। 'ডান দিকে তাকাও। ওগুলো কি আলো, না ভুল দেখছি?'

মেয়েটার দেখান দিকে তাকাল গ্রে। জলমগ্ন বনের মাঝে থেকে থেকে উজ্জ্বল আভা দেখা যাচ্ছে। অবাক হয়ে সবাইকে নির্দেশ দিল ও। 'যার যার হেলমেটের আলো বন্ধ করে দাও।'

নির্দেশ পালিত হওয়ামাত্র দেখা গেল নাটকীয় এক দৃশ্য। আগে যা মনে হয়েছিল, তারচেয়েও বেশি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত সেই আভা। কিছু কিছু জায়গায় ওগুলো হালকা, কিছু জায়গায় একটু গাঢ়। দেখে মনে হয় বুঝি জ্যাকসন পোলোক রং-তুলি নিয়ে এসে জলচিত্র এঁকেছেন।

'এরকম কেন হচ্ছে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল ডেরেক।

'কোন ধরনের মস বা ফাঙ্গাস হতে পারে।'

তা পারে, কিন্তু তাই বলে এতগুলো...এত ধরনের রঙে!

কিছুই বুঝতে পারছে না ও।

নোয়ার দিকে ফিরল গ্রে। 'আপনি আগে এমন কিছু দেখেছেন কখনও?'

মাথা নাড়ল গাইড। 'না।'

দলের আরেক সদস্য, রোহোও দেখেনি কখনও। এগিয়ে গেল সে আলোর উৎসের দিকে লক্ষ্য করে।

'রোহো, না!' পকেট হাতড়াতে শুরু করল নোয়া, সেই সাথে এগিয়ে যাচ্ছে পশুটার দিকে।

হেলমেটের বাতি জ্বালিয়ে পিছু নিল গ্রে। অন্যরাও এগোল। এদিকে নোয়া বার বার চাপছে ওর হাতে ধরা যন্ত্রটা, কিন্তু লাভ হচ্ছে না। রোহোর মাঝে থামার কোন লক্ষণই নেই।

অলঙ্কৃত বনটার কাছে পৌঁছান মাত্র রোহোর গুঙিয়ে ওঠা কানে এল ওদের, নিশ্চয় শকের মাত্রা বাড়িয়েছে নোয়া। চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল পশুটা।

তাড়াতাড়ি রোহোর পাশে গিয়ে দাঁড়াল নোয়া। লোকটাকে দেখে ওকে ঘিরে ধরল রোহো। 'বাবারিরা, রোহো।' ক্ষমা চাইছে গাইড। 'বাবারিরা।'

অদ্ভুত এই জোড়ার সাথে মিলিত হলো গ্রে-র দলটা। কাছ থেকে আরও দারুণ দেখাচ্ছে পানির আভাগুলোকে।

'কী সুন্দর!' ফিসফিসিয়ে বলল জেন।

ওর কথা শুনে যেন প্রতিক্রিয়া দেখাল বন।

ওটার একদম গভীর থেকে উঠে এল নিচু একটা গরগরে শব্দ। মনে হলো যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে অগণিত মানুষে কথা বলার আওয়াজ। কিন্তু একটা শব্দও বোঝা যাচ্ছে না।

অপ্রাকৃত আওয়াজটা শোনা মাত্র শিউরে উঠল গ্রে, নোয়ার কথা মনে পড়ে গেল ওর। লোকে বলে, এই জঙ্গলে নাকি ভূত বাস করে!

সেইচান আঁকড়ে ধরল ওর হাত। 'আমাদের এখান থেকে সরে পড়া দরকার।'

এক পা পিছিয়ে এল গ্রে।

কিন্তু অলঙ্কৃত বনটা দ্রুততায় ওকে হার মানিয়েছে। ও নড়ে ওঠার আগেই, নড়ে উঠেছে সে।

চব্বিশ

জুন ৩, দুপুর ২:৩৮ ই.ডি.টি.
এলেসমেয়ার আইল্যান্ড, কানাডা

ভয়ের চোটে জেগে আছি, নইলে এতক্ষণে অজ্ঞান হয়ে যেতাম।

কার্গো হোল্ডে লুকিয়ে আছে এখনও পেইন্টার, বিমানটা যে আরেকবার ঘুরতে শুরু করেছে তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে।

ঝড়ো বাতাসে প্রচন্ড ঝাঁকি সহ্য করার পর, বোয়িংটা এখন উঠে এসেছে মোটামুটি শান্ত বাতাসে। একঘন্টা ধরে কেবল ঘুরছে ওটা। খুব সম্ভবত পেসটিস ফুলমেন ভরা আঠারোটা ক্যানিস্টার ফেলে দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্রু। কিন্তু নিচের বাতাস আর উপরের জিওম্যাগনেটিক ঝড়ের কারণে, অরোরা স্টেশনের সাথে যোগযোগ রক্ষা করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

আর নয়তো বাড়তি সাবধানতা দেখাচ্ছে সবাই।

নিজেও তাই করল। বায়োহ্যাজার্ড চিহ্নটার পাশে গাল রেখে সাবধানে এগোল।

পুরোটা সময় চুপচাপ বসে থেকে নষ্ট করেনি ও। বিমানে আর কতজন আছে সেটা বের করার চেষ্টা করেছে। কালো ওভারঅল পরা অ্যান্টনের দুই লোককে দেখেছে ও, দু'জনেই অস্ত্রধারী। তাদের হাঁটার পদ্ধতি, পাহারার নিয়ম এসবও দেখে নিয়েছে। কপাল মন্দ, হাঁটার উপরেই আছে উভয়েই। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে না একদম।

কিছুক্ষণ আগে আরেকটু হলে ধরাই পড়ে যেত বিমানে এক ক্রুর হাতে। লোকটার তলপেট খালি করার দরকার ছিল। কিন্তু বিমানের একমাত্র টয়লেটটা ব্যস্ত ছিল বলে, তাড়াহুড়ো করে চলে এসেছিল পেছনের হোল্ডে। ওখানে রিফিল টিউব আছে, যেটা আসলে বাইরে মুখ করা ফানেল। লোকটা এতকাছে এসে দাঁড়িয়েছিল যে চাইলে তার ঘাড়ে হাত রাখতে পারত পেইন্টার। অবশ্য এতে লাভও হয়েছে, লোকটার কোমরে অস্ত্রসহ একটা হোলস্টার দেখেছে ও। ধরে নিয়েছে, আরও কমপক্ষে দুইজন লোক আছে ফ্লাইট ক্রু হিসেবে। সেই সাথে আছে আরেকজন লোডমাস্টার, কার্গো ফেলে দিতে সাহায্য করার জন্য।

অন্যান্য যাত্রী বলতে আরও ছয় জন বৈজ্ঞানিক। বেচারাদের চেহারায় ভয়ের ছাপ, কথা-বার্তা বলার ধরন দেখে মনে হচ্ছে সবাই সিভিলিয়ান।

গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেরিয়ে পড়লে দুই অস্ত্রধারী প্রহরীর একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে এই ছয়জন বৈজ্ঞানিকের দেহেও গুলি লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। তাতে অবশ্য কোন লাভও নেই। ঝামেলার আভাস পাওয়া মাত্র ফ্লাইট ক্রু ককপিটে

ঢোকার দরজাটা বন্ধ করে দেবে। বুলেটপ্রুফ দরজায় ঘুষি মারা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না পেইন্টারের। তাছাড়া লোডমাস্টার চাইলে ভেতর থেকেই হ্যাচ খুলে দিতে পারে।

তাই আরও সহজ একটা পরিকল্পনা সাজিয়ে নিয়েছে।

দুই সারির সামনে রয়েছে মোট দুটো লাল রঙের ইমারজেন্সি শাট-ডাউন বোতাম। ওগুলো চাপামাত্রা ওখানকার হাইড্রোলিক জায়গায় জমে যাবে। ফলে পেছনের হ্যাচের দিকে আর ঠেলে নিতে পারবে না ক্রেটগুলোকে। পরিকল্পনাটায় দুটো সমস্যা। প্রথমত, হোল্ডে বিদ্যুত সরবরাহ শুরু হবার আগে ওই দুই বোতাম হাজার চেপেও কোন লাভ হবে না। বিদ্যুত সরবরাহ করা হবে কার্গো ফেলে দেবার একেবারে শেষ মুহূর্তে। আর দুই, ও বোতাম চাপলেও, লোডমাস্টারের ক্ষমতা আছে আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করার।

তাই এই দুয়ের মাঝে যেটুকু সময় পাবে পেইন্টার, সেটা ব্যবহার করেই সবাইকে থামিয়ে দিতে হবে।

আর তা সম্ভব হতে পারে মাত্র একটা উপায়ে

হোস্টেজ .বন্দি

আচমকা বিজ্ঞানীদের মাঝে উত্তেজনা দেখা গেল। আয়োনাস্ফিয়ার ধরে ছুটে আসা ঝড়টার দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কী সব আলোচনা করছে তারা।

'প্লাজমার স্পাইকটা দেখ। নিঃসন্দেহে এইচ.এস.এস.।'

'কো-রোটেটিং ইন্টারঅ্যাকশন রিজিওন হতে পারে।'

'সি.আই.আর.? নাহ। জি-স্কেল দেখ, এতবেশি হবার কথা না।'

হোল্ডে কোন জানালা নেই বলে, অরোরা বোরিয়ালিসের দৃশ্যটা কেবল কল্পনা করতে পারছে পেইন্টার। এখনও সূর্য ভেসে রয়েছে আসমানে, কিন্তু বছরের এই সময়টা নিচু হয়েই থাকে সে। ইস, যদি দেখতে পারতাম-ভাবল ও।

সম্ভবত আশপাশ দিয়েই যাচ্ছিল কোন জ্বীন। পেইন্টারের দুর্ভাগ্য, আশাটা শুনে ফেলল সে!

চারপাশটা হাইড্রোলিকের গুঞ্জনে ভরে উঠল। ঘাড়ের উপর দিকে তাকিয়ে দেখে, বিমানের পেছনটা হাঁ হয়ে যেতে শুরু করেছে। সেই হাঁ-এর ফাঁক গলে ভেতরে প্রবেশ করছে উজ্জ্বল সূর্যালোক।

আনন্দধ্বনি ভেসে এল সামনে থেকে, হাততালিও দিয়ে উঠল কেউ।

দুই সারির ভেতরে আরও ভালোভাবে সেঁধাল পেইন্টার। এই মুহূর্তে আকাশে নিচু হয়ে ঝুলতে থাকা সূর্যের দিকে এগোচ্ছে বিমান। ফলে ওদের পিছু ফেলে আসা ঘন নীল আসমান পরিষ্কার দেখতে পেল পেইন্টার। অরোরা বোরিয়ালিসের

সৌন্দর্যে মুহূর্তের জন্য হতবাক হয়ে গেল পেইন্টার। আর তাই মোটরের আওয়াজটা শুরু হবার সাথে সাথে শুনতে পেল না।

ক্রেটের সারিগুলোকে পেছনের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে!

পেইন্টারের আগেই মনে হচ্ছিল, এককেবারে একটা করে সারি বের করে দেবে লোডমাস্টার। এতে ক্রেটের সাথে লেগে থাকা বেলুনগুলোর একটা আরেকটার সাথে জট পাকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

কপাল খারাপ, যে সারিতে লুকিয়ে আছে ও, সেটাকেই প্রথমে ফেলে দেয়া হচ্ছে।

শেষ বার হোল্ডে নজর বুলিয়ে নিল পেইন্টার, মনের মাঝে সবার অবস্থান গেঁথে নিচ্ছে। তারপর লুকাবার জায়গা থেকে বেরিয়ে নিচু হয়ে দৌড় দিল। লাল বোতমটার কাছে পৌঁছা মাত্র হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরল ওটা।

থমকে গেল ক্রেটের সামনের দিকে অগ্রযাত্রা।

চমকে উঠে সবাই তাকাল ওর দিকে, একটা জলজ্যান্ত মানুষ কীভাবে শূন্য থেকে উদয় হলো তা বুঝে উঠতে পারছে না।

এবার বন্দিদের হুমকি দেবার পালা...

লাফ দিয়ে একদম কাছের ক্রেটের পেছনে লুকাল পেইন্টার। সবার নজরের আড়ালে থেকে উল্টো দিকের ক্রেটের সারির দিকে তাক করল অস্ত্র। 'কেউ নড়বে না। নড়লেই আমি গুলি শুরু করব।'

দেখা যাক, জীবনের প্রতি এদের প্রেম কতটা।

বোঝা গেল, ওর হুমকিটা ফ্লাইট ডেকে থাকা লোডমাস্টার পর্যন্ত পৌঁছায়নি। কেননা এবার চালু হয়েছে দ্বিতীয় মোটর। উল্টো দিকের ক্রেটগুলোকে এখন ঠেলে নেয়া হচ্ছে খোলা হ্যাচের দিকে। বন্দি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে পেইন্টারের। নিশ্চয় লোডমাস্টার ধরে নিয়েছে, যান্ত্রিক কোন গোলযোগের কারণে প্রথম মোটরটা কাজ করছে না। তাই দ্বিতীয় সারিই আগে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে ব্যাটা, কিন্তু এতে তো পেইন্টারের চলবে না।

এদিকে এগিয়ে গিয়ে যে অন্য লাল বোতামটা টিপবে, সেটাও পারছে না পেইন্টার। আস্তে আস্তে সবগুলো ক্রেট এগিয়ে যাচ্ছে খোলা দরজার দিকে।

হাইড্রোলিকের যান্ত্রিক হাতটা নিজের চোখের সামনে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল পেইন্টার। তারপর ওটার দিকে তাক করল অস্ত্র, গুলি ছুঁড়ে যদি বন্ধ করা যায়! সাবধানতার সাথে দুটো গুলি ছুঁড়ল ও, বদ্ধ জায়গায় বেশি গুলি ছোঁড়াও সম্ভব না।

লক্ষ্যে গিয়ে লাগল গুলি। কিন্তু কাজ হলো না কোন।

গার্ডদের একজন ওর এই গুলি ছোঁড়াকে আক্রমণ ধরে নিয়ে ভয়ে নিজেও গুলি ছুঁড়ল। আড়ালে ছিল বলে একটাও লাগল না পেইন্টারের দেহে।

তবে লাগলেই বুঝি ভালো হত।

কেননা কাছ থেকে ছোঁড়া গুলির সামনে অ্যালুমিনিয়ামের কেসিং দাঁড়াতেই পারল না। ওটা ভেদ করে পেইন্টারের মাথার উপরে এসে লাগল গুলি।

ঝর্ণার মতো বেরোতে শুরু করল লালচে তরল, ভিজিয়ে দিল পেইন্টারকে। ভয় ও আতঙ্কের চিৎকার শুনে ও বুঝতে পারল, ক্রেটের সামনের দিক থেকেও নিশ্চয়ই একইভাবে ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে।

মরার উপর খড়ার ঘা হয়ে উপর থেকে ভেসে এল হিসহিস শব্দ।

ধ্যাত্যারিকা . .

প্যারাস্যুট রূপী বেলুনে আঘাত লেগে ফুলতে শুরু করেছে ওটা। নিশ্চয়ই বুলেট আঘাত হেনেছে ওটার ইনফ্লেশন ট্যাঙ্কে। যে-কারণে বানানো হয়েছিল ওটাকে, সেই কাজটাই করল বেলুনটা-ছুটে গেল খোলা হ্যাচের দিকে। ক্ষতিগ্রস্ত ক্রেটটাকে সারির মাঝখান থেকে টেনে নিয়ে গেল সাথে।

লাফ দিয়ে সরে গেল পেইন্টার, ধাক্কা খেল হালের সাথে। আরেকটু হলেই ওর মাথা গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল প্রায় পৌনে এক টন ওজনের ক্রেট।

সারিতে বসে থাকা অন্যান্য ক্রেটেও লাগল আঘাত। তবে লাভ হলো এতে একটা। এগোতে থাকা ক্রেটটাকে থামিয়ে দিল এরা। ফুলে উঠে ফেটে গেল বেলুন, সারির উপরে আছড়ে পড়ে জট পাকাল।

এদিকে অন্যদিকের যান্ত্রিক হাতের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, সেটা তার কাজ করেই চলছে। একটার পর একটা ক্রেট হারিয়ে যাচ্ছে হ্যাচের ফাঁক দিয়ে। পরক্ষণেই আবার নীল আকাশের পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে সাদা মাশরুম।

নয়টা বেলুন উঠতে শুরু করল আকাশ পানে। অসহায়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার রইল না পেইন্টারের। আচমকা সামনে থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ, 'হয়েছেটা কী এখানে?'

ঘুরে দাঁড়াল পেইন্টার, বুঝতে পারছে যে এই লোকটা প্লেনের লোডমাস্টার।

ভেজা মুরগির দশা হয়েছে ওর, শ্রাগ করে বলল, 'অবাক হচ্ছ? আমার অবস্থা ভেবে দেখ একবার!'

দুপুর ৩:৩৯

এই তো আরেকটু

সাফিয়ার উপর উবু হয়ে বসে আছে ক্যাট, মেয়েটার মাথায় চেপে ধরে রেখেছে একটা ঠান্ডা পানিতে ভেজানো কাপড়। প্রথমবার খিঁচুনি হবার সাথে সাথে ক্যাট প্রায় অজ্ঞান মেয়েটাকে স্নো-ক্যাট থেকে বের করে ইনুইটদের তাঁবুতে নিয়ে

এসেছে। বাইরে থেকে দেখে যেমনই মনে হোক না কেন, লেক হ্যাযেনে বসবসরত এই যাবাবরদের তাঁবুতে আরামের সব উপকরণ আছে।

তাগাক, জোফেস, নাটান-তিন ইনুইট মাছ-শিকারী যথা সম্ভব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু ওরাও আক্রান্ত হতে পারে ভেবে, সেই সাহায্য ফিরিয়ে দিয়েছে ক্যাট। তবে তাদের তাঁবু আর প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি বাধ্য হয়েই ব্যবহার করতে হচ্ছে ওকে। ওগুলোর ভেতরে অ্যাসপিরিনও ছিল। নিজে তিনটা গিলেছে, রোরিকেও বাধ্য করেছে তিনটা গিলতে। ছোট জায়গাটার মাঝেই পায়চারী করছে ছেলেটা। ক্যাট বুঝতে পেরেছে, ওকে বেঁধে রেখে আদপে কোন লাভ নেই। যাবেটা কোথায়? স্নো-ক্যাটের চাবি ওর কাছে। ইনুইটদের বাহন বলতে তুষারে পরার জুতা আর কুকুর-চালিত একটা স্লেজ। তারচেয়ে বড় কথা, একঘন্টা আগে ওটা নিয়ে অ্যালার্টের দিকে সাহায্যের জন্য রওনা দিয়েছে নাথান।

লেক হ্যাযেনে একটা ছোট রানওয়ে আছে। অবশ্য এখন ওটা তুষারে ঢাকা, খুব একটা ব্যবহারও হয়নি। তাই ক্যাম্প অ্যালার্ট থেকে সাহায্য আশার সম্ভাবনা একদম উড়িয়ে দেয়া যায় না।

তাগাক আর জোসেফকে প্রহরা দিতে অনুরোধ করেছে ক্যাট। স্টেশন থেকে ধাওয়াকারীদের কেউ এলে যেন সাথে সাথে সাবধান করে দিতে পারে। অস্ত্র আছে দু'জনের হাতে।

গুঙিয়ে উঠল সাফিয়া, হাত-পা ছুঁড়ছে। ক্যাট একটা ডিজিটাল থার্মোমিটার পেয়ে মেপে দেখেছে ওর জ্বর: ১০৩.৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট! বেশি হলেও, প্রাণ কেড়ে নেবার মতো নয়। তবুও মাথাটাকে রক্ষা করার জন্য ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে কাপড় চেপে রেখেছে ও মাথায়। মাঝে মাঝেই রোরিকে নতুন করে ভিজিয়ে আনার জন্য পাঠাচ্ছে। একটা সাফিয়ার ঘাড়ের নিচে, আর আরেকটা কপালে রাখছে।

ঠাণ্ডার স্পর্শে কিছুটা হলেও শান্ত হয়ে এসেছে সাফিয়া, নতুন করে আর খিঁচুনি হয়নি। এই জ্ঞান পাচ্ছে, আবার এই হারাচ্ছে। কখনও ওদের চিনতে পারছে, কখনও পারছে না।

জ্বরমগ্ন স্বপ্ন দেখে বিড়বিড় করে উঠছে বারবার।

কাছে চলে এল রোরি, 'মিশরীয় কপ্টিকে কথা বলছে বলে মনে হচ্ছে।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'পুরোপুরি নই। এতে হয়তো কিছু যায় আসে না। ড. আল-মায়াজ মিশরীয় ইতিহাসে দক্ষ, ভাষাটাও ভালোভাবেই জানে। হয়তো প্রলাপ বকছে।'

ওর দিকে তাকাল ক্যাট, 'কিন্তু তোমার তা মনে হয় না।'

'আমার বাবা আর অন্যরা যখন অসুস্থ হলেন, তখন নানা ধরনের দৃষ্টিভ্রম দেখার কথা বলেছিলেন।'

'উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর ও মস্তিষ্কের প্রদাহে তা অসম্ভব কিছু না।'

'তা না, কিন্তু প্রত্যেকের ভ্রমই ছিল প্রায় হুবহু এক-মিশর, বালু আর রোগ নিয়ে!'

'তাতেও কিছু যায় আসে না। হয়তো তোমার বাবা গরম এবং তার রোগ-ভীতি থেকে ভ্রমগুলো দেখেছিলেন।'

'হতে পারে। কেননা কিছু কিছু ভ্রমের সাথে সাফিয়ার ভ্রমের কোন মিল নেই।'

'তাহলে তো আমার কথাই ঠিক।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রোরি। 'আসলে বাবা আমার মাথায় আস্তানা গেঁড়েছেন।'

'মানে?'

'ইন্টারনেট ব্যবহার করে লম্বা সময় আলোচনা করতাম আমরা। এসব ব্যাপারে তার নিজস্ব তত্ত্ব ছিল। তার ধারণা, এই অণুজীবগুলো স্মৃতি ধারণ করতে পারে। যখন কেউ আক্রান্ত হয়, তখনও তার স্মৃতি নিজের মাঝে ধরে রাখে। পরবর্তীতে আক্রান্ত ব্যক্তি তখন সে অনুসারে দেখে ভ্রম।'

'তা করে অণুজীবের কী লাভ?'

'তার ধারণা ছিল, কেবল প্রবল স্মৃতিগুলোই ধারণ করে রাখে এরা। খুব সম্ভবত ভয়ের কোন স্মৃতি। এতে করে মানব-মস্তিষ্ককে আরও বেশি উজ্জীবিত করে তোলা যায়। অণুজীবরা খাবারও পায় বেশি, তাই পরবর্তী সেটাই দেখে আক্রান্ত ব্যক্তি-'

'-যেন দ্রুতই খাবার পেতে পারে তারা।' মাথা ঝাঁকাল ক্যাট। 'যুক্তি আছে কথায়, তবে এতে আমাদের কী লাভ?'

'বাবার মতে, এই স্মৃতি ধরে পেছনে গেলে বাইবেলের মহামারীর স্মৃতিও পাওয়া যাবে।'

'কীভাবে?'

'তার বিশ্বাস, অণুজীবের যে প্রজাতি তাকে এবং সাফিয়াকে আক্রান্ত করেছে, সেটার উৎপত্তি হয়েছে নীল নদের পানি যখন লাল হয়েছিল তখন। তাই যুক্তি বলে, এই অণুজীবেরা সেই সময়ের স্মৃতি নিজেদের মাঝে ধারণ করে রেখেছে।'

'এতদিন ধরে!'

'আমাদের জন্য এতদিন। কিন্তু অণুজীবের জন্য নয়। সাইমন হার্টনেল পরীক্ষা করে আবিষ্কার করেছে-এরা অমর। খাবার না পেলে এরা ঘুমিয়ে পড়ে।' শ্রাগ করল রোরি। 'তবে যা বললাম, এসব বাবার তত্ত্ব। সাফিয়ার মুখে প্রাচীন মিশরের ভাষা শুনে মনে পড়ে গেল।'

তত্ত্বটা আপনমনে নেড়ে-চেড়ে দেখল ক্যাট। মানুষের স্মৃতি সঞ্চিত থাকে হিপোক্যাম্পাস এলাকায়। তবে আধুনিক কিছু গবেষণা মতে, সেসব স্মৃতি প্রথমে জমা হয় স্বল্প সময়ের জন্য। পরে সেগুলো বৈদ্যুতিক স্মৃতি হিসেবে হাজারো সাইন্যাপ্সে জমা করে রাখা হিপোক্যাম্পাস।

আর্কিয়ন প্রজাতির রূপ-পরিবর্তনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথাও মনে পড়ে গেল ক্যাটের। তাই এরা মানব-মস্তিষ্কের স্মৃতির ছক নিজেদের মাঝে ধরে রাখতে পারবে-এমনটা ভাবা কি বাড়াবাড়ি হয়ে যায়?

কেঁপে উঠল সাফিয়া, মেয়েটার ঠোঁট নড়ছে।

আচমকা ভয়ে শিউরে উঠল ক্যাট, কে জানে মেয়েটার মাথায় কী দৃশ্য মঞ্চায়িত হচ্ছে!

রোরি কাছে এসে সাফিয়ার কানে কানে বলল, 'খেরে, নিম পে পু-রান?'

ক্যাটে জানতে চাইল, 'কী বললে?'

'ওর নাম জিজ্ঞাসা করলাম, প্রাচীন কপ্টিক ভাষায়।'

'কেন-'

অস্ফুট কণ্ঠে জবাব দিল সাফিয়া। 'সাবাহ পে পা-রান .সাবাহ।'

পিছিয়ে এল রোরি, চোখে-মুখে ভয়।

'কী হলো?'

একবার ল্যাপটপের দিকে তাকিয়েই আবার সাফিয়ার দিকে নজল ফেরাল ছেলেটি। 'বলছে, ওর নাম সাবাহ!'

'তো?'

'সিংহাসনে বসা মেয়েটির নাম উদ্ধার করতে পেরেছিল সাফিয়া, যার কাছ থেকে সংক্রমণটা পেয়েছে ও। সেই মেয়ের নাম ছিল সাবাহ।'

এই তথ্যটাকেও অবচেতন মনের দায় বলে অস্বীকার করতে চাইল ক্যাট।

কিন্তু

রোরির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'নামটা জানলে কী করে?'

'ট্যাটুতে লেখা ছিল।'

এক মুহূর্ত কী যেন ভেবে সাফিয়ার পকেট থেকে সরিয়ে নেয়া ডিস্কটা বের করল ক্যাট। তারপর রোরির হাতে ধরিয়ে দিয়ে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল ল্যাপটপটা। 'দেখ, আর কিছু বের করতে পারো কিনা।'

আগ্রহের সাথে কাজে নেমে পড়ল রোরি। সাফিয়ার দিকে মন দিল ক্যাট। আরেকবার জ্বর মেপে দেখল, নতুন করে পানিতে ভিজিয়ে আনল কাপড়। সেই সাথে বাধ্য করল আরেকটা অ্যাসপিরিন গিলতে।

বেশ কিছুক্ষণ পর, তাঁবুর পর্দার বাইরে থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল। 'হ্যালো,' জোসেফের কণ্ঠ চিনতে পারল ক্যাট, ইনুইটের মাঝে সে-ই বয়োজ্যেষ্ঠ। 'কে যেন আসছে। পাহাড় থেকে অনেকগুলো হেডলাইটের আলো দেখতে পাচ্ছি।'

উঠে দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে নিল ক্যাট।

আমারও কাজে নামার সময় হয়েছে .

দুপুর ৩:৫৮

সাবাহ পে পা-রান

উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়ে শতবারের মতো হেঁটে চলছে সে। অতিক্রম করে যাচ্ছে জল-মহিষের মরদেহ। পাখি, এমনকী শকুনও মরে পড়ে আছে বালিতে। বাঁয়ের গ্রাম থেকে ভেসে আসছে চিৎকার, কান্না আর বিলাপের সুর।

তবুও রক্তাক্ত নদীটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ও। কুমীর ভাসছে পানিতে, পেট উপরের দিকে। নলখাগড়ায় ঝুলছে মরে শক্ত হয়ে যাওয়া ব্যাঙের দেহ। চারিদিকে কেবল মাছির রাজত্ব। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই উঠছে নামতে তাদের দঙ্গল।

সেই সাথে দেখতে পাচ্ছে আরও অগণিত দৃশ্য।

-মৃত্যুপথযাত্রী একটা বাচ্চাকে বুকের কাছে ধরে রেখেছে সে।

আমার বাচ্চা এটা।

-শ্বাস নেবার জন্য খাবি খাচ্ছে এক বাচ্চা মেয়ে, এদিকে জ্বলছে তার দেহ।

আমিই সেই মেয়ে।

-খোদাদ্রোহের অভিযোগে পাথর ছুঁড়ে মারা হচ্ছে এক কুঁজঅলা বুড়িকে।

নিজের দেহে ওই সব পাথরের আঘাত অনুভব করতে পারছি আমি।

আরও অনেক .অনেক এমন দৃশ্য।

শত শত নারী যেন ও। ও সাবাহ এবং যাদের স্মৃতি বহন করে চলছে, সেসব নারীও। হেমেত নেজার .ঈশ্বরের আশির্বাদের ধারণ-পাত্র ও। পানিটাকে নিজের ভেতর নিতে শিখেছে এই সব নারীরা, নিজেদের ভয়গুলো চেপে রাখতে জানে যাতে স্মৃতিগুলো বিকৃত না হয়ে পড়ে। পরবর্তী নারীর কাছে পৌঁছে দেয় সেই স্মৃতি, যাতে বিস্মৃতির অতলে সেগুলো হারিয়ে না যায়।

এই স্মৃতি বহন করা এক অভিশাপ।

এই জ্ঞান বহন করা এক আশির্বাদ।

আমি এখন আর শুধু আমি নই।

কর্দমাক্ত তীরে পৌঁছে আরেকবার দিগন্তের দিকে তাকাল সে। নদীর ওপাশে দুনিয়া শেষ হয়েছে অন্ধকারের দেয়ালে রূপ নিয়ে। ঝড় গিলে নিয়েছে সূর্যকে, অথচ তার ক্ষুধা মেটেনি। চিৎকার করে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে বজ্র, হাজারো ক্রুদ্ধ স্ট্যালিয়নের পায়ের আঘাতে সৃষ্টি হয়েছে যে বালুঝড়ের। ও জানে, এই হচ্ছে অতীত

.জানে, এই হচ্ছে ভবিষ্যৎ।

নবতম মেয়েটির সাথে কথা বলল ও।

সবাইকে সাবধান করে দিতেই হবে।

বিকাল ৪:০৫

'পরিস্থিতি পুরোপুরিভাবে অনুকূল।' সাইমনকে নিশ্চিত করল ড. কাপুর।

কন্ট্রোল স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন, গত একঘন্টা ধরেই। রাগ ও আনন্দের মাঝে দুলছে সাইমনের মন।

আচমকা পেইন্টার ক্রো কীভাবে বিমানে গিয়ে হাজির হলো, তা বুঝে উঠতে পারছে না সে। মনে হচ্ছে যেন ক্রো বা দাঁড়কাকের মতোই হারামজাদা উড়ে গিয়ে জুড়ে বসেছে। মাত্র নয়টা ক্রেট ভাসতে পেরেছে বাতাসে, নয়টা এখনও রয়েই গিয়েছে। এদিকে বিমানটার হ্যাচ বন্ধ হবার পথে!

আয়নোস্ফিয়ারের মানচিত্রের দিকে নজর গেল ওর। ছোট ছোট বিন্দু ক্রেটগুলোর অবস্থান দেখাচ্ছে। ওকে মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে নড করল কাপুর। 'নয়টা দিয়েও কাজ হয়ে যাবে। তবে সেক্ষেত্রে আরেকটু সময় অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।' পর্দায় আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখাল লোকটা। 'আমাদের বীম ঠিক ওখানে গিয়ে আঘাত হানবে। অবশ্য খুব বেশি সময় অপেক্ষাও করা যাবে না, নইলে কমে আসবে অণুজীবের ঘনত্ব।'

'কতক্ষণ পর ছুঁড়তে চাও?'

'দশ মিনিট।'

'বেশ।' উত্তেজনায় বৃদ্ধাঙুলের উপর ভর দিয়ে উঠছে নামছে লোকটা।

আর দশ মিনিট, তারপরেই টেসলার স্বপ্ন সফল হবে-সেই সাথে আমারও।

ফোন বেজে উঠল একটা হাতের কাছে। ওটার রিসিভার কানে ঠেকাতেই শুনতে পেল ঝিরঝির আওয়াজ। তবে কে ফোন করেছে-তা জানা আছে। লাইনটা ওর ব্যক্তিগত। 'অ্যান্টন?'

'আমরা মেয়েদেরকে খুঁজে পেয়েছি, স্যার।'

'তথ্য?'

'দশ মিনিটের মাঝে হাতে চলে আসবে।'

সময়ের কথা শুনে মুখে হাসি ফুটে উঠল সাইমনের।

অ.সা.ধা.র.ণ

'কী করতে হবে, তা তো জানোই।' বলল কেবল।

'মেয়েদের নিয়ে কী করব?'

আরেকটা পর্দার দিকে তাকাল হার্টনেল, এটায় দেখাচ্ছে ঘূর্ণায়মান বিমানটাকে। পেইন্টার ক্রো আর কোন ঝামেলা করতে পারবে না। তাই মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখারও দরকার নেই।

'ঝামেলা চুকিয়ে ফেল।'

'বুঝতে পেরেছি।'

উত্তেজনা বশে রাখতে পারছে না সাইমন। হাঁটছে সামনে-পেছনে। ওর সামনের বোর্ডে যতগুলো বাতি আছে, সবগুলোয় জ্বলছে সবুজ আলো।

ওর মনে হলো, প্রায় অনন্তকাল পর ফিরে এল কাপুর।

'কী?' জানতে চাইল সাইমন।

হাসি ফুটে উঠল পদার্থবিদের চেহারায়। নিজের কনসোলে চাবি ঢুকিয়ে বলল, 'আমরা তৈরি।'

সাইমনের মনে হলো, এই মুহূর্তটাকে অবিস্মরণীয় করে রাখার জন্য কিছু একটা বলা উচিৎ। কিন্তু না, কথার চাইতে কাজে বেশি বিশ্বাস রাখে ও। নিজের কনসোলে গিয়ে চাবিটায় মোচড় দিল তাই।

অবশেষে

'টাওয়ারের উপরের দিকটা দেখুন।' বলল কাপুর।

মুখ তুলে চাইল হার্টনেল। তামার আঙটিগুলো ঘুরতে শুরু করেছে, সেই সাথে ঘুরছে বিশাল ইলেকট্রোম্যাগনেটগুলো। ধাতব আবাসের মাঝে সুপারকন্ডাকটর দিয়ে বানানো টাইটেনিয়ামের আবরণ সম্বলিত ডিমটা ধীরে ধীরে পাক খাচ্ছে, ওটার মাথা নিচের দিকে।

'অসাধারণ।' ফিসফিস করে বলল কুপার।

আস্তে আস্তে বেড়ে চলল আঙটির গতি। চুম্বকগুলো এখন ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে উল্টো হতে শুরু করেছে ডিমটা। ওটার সংকীর্ণ মাথা আকাশের দিকে তাকাতে চাইছে।

দম বন্ধ করে এক পা এগিয়ে এল সাইমন, পিছু পিছু কুপার। ডিমের মাথা আকাশের দিকে না হওয়া পর্যন্ত দম ছাড়ল না।

দুনিয়া কাঁপানো আওয়াজ করে টাওয়ারটা থেকে আসমান পানে ছুটে গেল নিখাদ প্লাজমার একটা বীম। কন্ট্রোল স্টেশন জুড়ে আনন্দের চিৎকার শোনা গেল। টাওয়ারের গোড়া থেকে বেরিয়ে নীলচে শক্তি এঁকে-বেঁকে হারিয়ে যাচ্ছে ইস্পাতের জঙ্গলে।

প্লাজমার বীমটা গিয়ে আছড়ে পড়ছে মেঘের উপর। শক্তিটাকে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টায় বার বার ঝলকে উঠছে বজ্র। কিন্তু তাতে কি আর বীমটাকে থামানো যায়? সোজা উঠে যাচ্ছে ওটা, উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে অবশেষে আঘাত হানল।

আয়নোস্ফিয়ারে বীমটা আছড়ে পড়তেই, শক্তির ছটা দেখা গেল ওখানে। তৈরি হলো এমন উজ্জ্বল এক অরোরা যে নজর সরাতে বাধ্য হলো সাইমন।

পাশ থেকে ওর দিকে একটা গগলস এগিয়ে দিল কাপুর।

হাত দিয়েই চোখের উপরে কাচের অংশটা ধরল সাইমন, পরার তর সইছে না। এদিকে শক্তি প্রবাহে কোন বিরতি নেই, আর তাই বিরতি নেই অরোরার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতেও।

'আপনি সফল, স্যার।' অভিনন্দন জানাল কাপুর। 'কাজ হচ্ছে।'

হাসল সাইমন।

অবশেষে

বিকাল ৪:২১

গোলমাল হয়েছে কোথাও।

গ্লোবমাস্টার বিমানটার খোলা পেছনের হ্যাচের কাছে দাঁড়িয়ে আছে পেইন্টার। হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে একটা বেলুনের ছেঁড়া অংশ। বাইরে ঝড়ের মাঝখান দিয়ে ছুটে গিয়েছে একটা অগ্নিস্তম্ভ। সেই শক্তি পেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে অরোরা। সুমেরুর সূর্যকেও সে লজ্জা দেবে উজ্জ্বলতায়।

ত্বকের সাথে লেগে থাকা অণুজীবগুলো বাতাসে শক্তির অস্তিত্ব টের পেয়ে যেন নড়ে-চড়ে উঠছে। পেছন দিকে তাকাল পেইন্টার, ক্ষতিগ্রস্ত ক্রেট থেকে বেরনো লালচে তরল উজ্জ্বল হয়ে চলছে!

খোলা দরজার দিকে গড়িয়ে এগোল সেই তরল।

চিৎকার করে তাড়াতাড়ি একটা হার্পের পেছনে সেঁধিয়ে গেল পেইন্টার।

'বিমানের নাক নিচু করো।'

বিষাক্ত ওই তরল বিমান থেকে বেরিয়ে যাক, তা চায় না পেইন্টার।

লোডমাস্টার আসার পর, ওকে অন্যান্য যাত্রীদের কাছ থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। একমাত্র ওই এসেছে পেসটিস ফুলমেনস-এর স্পর্শে। পেইন্টারের কোন সন্দেহ নেই, গুলি করে মারা হতো ওকে। কিন্তু ওই তরলের একটা ব্যবস্থা করা দরকার, এবং অন্য কেউ নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মেথর বনতে একদম ইচ্ছুক নয়।

তাই ওর ঘাড়েই এসে পড়েছে দায়িত্বটা। এই মুহূর্তে হাঁ হয়ে আছে পেছনের হ্যাচ, বেলুনের জন্য বন্ধ হচ্ছে না। ওটা ঠিক না করা পর্যন্ত অবতরণের অনুমতিও দিচ্ছে না অরোরা স্টেশন।

তারমানে, আপাতত বিমানের ক্রুদের ওকে দরকার।

সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে, অণুজীব ভর্তি বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে তারা। তারপরও তাদের মিথ্যা আশার বেলুন ফুটো করতে একদম ইচ্ছুক নয় পেইন্টার।

নইলে যে আমাকে মরতে হবে।

প্রচন্ড শব্দের ধাক্কায় কেঁপে উঠল বিমানটা, সেই সাথে হলো কানফাটানো আওয়াজ। বুঝতে পারল পেইন্টার, ওদের বিমানে বাজ পড়েছে।

উন্মুক্ত আকাশের দিকে নজর ফেরাল পেইন্টার। যেমনটা ভয় পাচ্ছিল, বাইরের দৃশ্য পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। অরোরা বোরিয়ালিস এখন দখল করে নিয়েছে আকাশটাকে।

প্রায়শই ওখান থেকে মাটির দিকে ছুটে যাচ্ছে বজ্র।

এই দৃশ্যটার কথা আগে পড়েছে পেইন্টার। একে বলে: উর্ধ্ব বায়ুমন্ডলের বজ্রপাত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আয়নোস্ফিয়ারে অনুপ্রবেশ ঘটছে উজ্জ্বল প্লাজমার। আদর করে অনেক নামেই ডাকা হয় এই ইফেক্টকে-স্প্রাইট, নীল জেট এবং এলফ। কিন্তু এত বড় পর্যায়ের ইফেক্ট আগে দেখেনি পেইন্টার।

অনেকগুলো উজ্জ্বল নীলচে গোলক ভাসছে বাতাসে, পরক্ষণেই পরিণত হচ্ছে লালচে অগ্নিগোলকে। নিচের ঝড়টা কিন্তু বিনা প্রশ্নে মেনে নিচ্ছে না ওটার অবস্থান। সে-ও ছুঁড়ে দিচ্ছে বজ্র। ফলশ্রুতিতে স্বর্গ আর আকাশের মাঝে চলছে আগুনের উন্মাদ নৃত্য।

পেইন্টারের জানা আছে, এরকম ঝড়ের একটা মাঝারী নমুনার মাঝেও হাজারো হিরোশিমার শক্তি রয়েছে। আর চোখের সামনে যেটাকে দেখছে, সেটার ক্ষমতা মাঝারী নমুনার কম করে হলেও দশগুণ।

দেখতে দেখতে পেইন্টার টের পেল, আয়নোস্ফিয়ার আর ঝড়ের মাঝে একটা মিথস্ক্রিয়া দেখতে পাচ্ছে ও। দুটোই একে-অন্যের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে ধারণ করছে প্রবলতর রূপ।

স্টেশনের ওরাও নিশ্চয়ই তা ধরতে পেরেছে। আচমকা বন্ধ হয়ে গেল প্লাজমার প্রবাহ।

কিন্তু তার আগেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

সাইমন হার্টনেল সম্ভব করেছে অসম্ভবকে।

আকাশে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে সে।

পঁচিশ

জুন ৩, রাত ৮:০৫ সি.এ.টি.
আকাগেরা ন্যাশনাল পার্ক, রোয়ান্ডা

'কেউ নড়ো না,' সাবধান করে দিল গ্রে।

এখন কেবলমাত্র ওর নিজের হেলমেটের আলো জ্বলছে। নোয়া যেখানে রোহোর পাশে বসে আছে, সেখানে চলে গেল সে। অন্যরা পেছনেই আছে।

জায়গাটায় পৌঁছাতে যেভাবে হেঁটেছে দলটা, তাতে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়েছে পানিতে। আকাশে উদিত তারকারাজির প্রতিবিম্ব তৈরি হয়েছে পানিতে, কাঁপছে এখন সেটা। যে আভা দেখতে পাচ্ছিল এতক্ষণ, সেটা খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছে। অন্ধকার জায়গায় অসংখ্য ছোট ছোট আভার কিছুটা হলেও আলোর উৎস হিসেবে কাজ করার কথা। কিন্তু হয়েছে উল্টোটা, আরও বেশি অন্ধকার হয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে গ্রে-র। সেই সাথে এ-ও মনে হচ্ছে-রঙের একটা বড় এলাকা বুঝি বন জুড়ে ঘোরা-ফেরা করছে। রঙ আঁকা ক্যানভাসটা বুঝি প্রাণ ফিরে পেয়েছে, ঘুরছে এদিক-ওদিকে। ওরা এখানে আসার আগে কানে শুনতে পাচ্ছিল অস্ফুট আওয়াজ। কিন্তু এখানে এসে দেখে, সব চুপ। প্লাবিত জঙ্গলে এখন ভর করেছে নীরবতা।

'এই জঙ্গলে আছে কিছু একটা, কিন্তু কী?' জানতে চাইল নোয়া, সেটাও ফিসফিস করেই।

গড়গড় করে উঠল রোহো, প্রভুর পাশ থেকে সরে সাবধানতার সাথে সামনে এগোল। পেটটা নেমে এসেছে নিচে, লেজটা পানির তলের ঠিক উপরে।

'রোহো, ওইয়া।' বকা দিল নোয়া, ফিরে আসছে বলছে সিংহটাকে।

লোকটার কাঁধ স্পর্শ করল গ্রে। 'যেতে দিন।'

ওর হেলমেটের আলো যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানকার এক টুকরা অঙ্কিত জঙ্গল আচমকা আলাদা হয়ে রোহোর দিকে এগোল।

আঁতকে উঠল জেন।

নড় ওঠা জঙ্গলটাও রোহোর মতোই সাবধানে এগোচ্ছে। ছোট একটা অবয়ব দেখা গেল, সিংহটার মতোই কৌতূহলী, সম্ভবত বয়সও কাছাকাছি। ছোট একটা লাল রঙা শুঁড় উঠে গেল উপর, আগন্তুকের গন্ধ শুঁকছে।

এবার নড়ে উঠল জঙ্গলের বড় একটা অংশ, তারপর আরও অনেকগুলো।

নিচু চিৎকার শোনা গেল আচমকা।

'হাতি!' অবাক কণ্ঠে বলল নোয়া।

কৌতূহলী, ছোট, বাচ্চা হাতিটা লম্বায় টেনে-টুনে গ্রে-র কোমরের সমান হবে। ইতস্তত করল বেচারা, আদেশ মানবে না এগিয়ে যাবে বুঝতে পারছে না। বড় বড় কান দুটো একবার ঝাপটালো সে।

হেডলাইটের আলোয় বাচ্চা হাতি আসামাত্র গ্রে বুঝতে পেল, রোহোর দিকে ওটার এগিয়ে আসার আরও একটা কারণ আছে। ওটার ত্বক জঙ্গলের মতোই উজ্জ্বল রঙে রাঙানো হলেও, আসলে সেটা গোলাপি-সাদা। রোহোর মতো এই বাচ্চাও অ্যালবিনো! নিশ্চয়ই দু'জনের মাঝের এই মিলটা দেখতে পেয়েছে বাচ্চাটা।

ছোট ছোট কালো চোখে এখন সে দেখছে রোহোকে, রোহো কিন্তু থেমে নেই। সাবধানতা বজায় রেখে এগিয়ে চলছে সে, তবে মাথা নিচু করে। উৎসাহ দিল হাতির বাচ্চা। শুঁড় তুলে শিস বাজাল।

আর কোন কিছুর দরকার হলো না।

লাফিয়ে সামনে এগোল রোহো, উত্তেজনায় সব সাবধানতা ভুলে গিয়েছে। ওর কাজ-কর্ম দেখে উৎসাহ পেল হাতির লাজুক বাচ্চাও। পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে গেল ওটা, গ্রে বুঝতে পারল, অ্যালবিনো বাচ্চাটা আসলে মদ্দা। পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়াল সে, একটু আগে শোনা নিচু চিৎকারটা এবার একটু জোরালো হলো।

কিন্তু পাত্তা দিল না যেন বাচ্চা হাতি। এগিয়ে এসে সদ্য বানানো বন্ধুর সাথে মিলিত হলো পানিতে। একসাথে খেলতে শুরু করল তারা।

'আমরা কী করব?' ফিসফিস করে জানতে চাইল নোয়া।

শ্রাগ করল গ্রে। 'আপাতত রোহোকেই আমাদের হয়ে দূতিয়ালি করতে দাও।'

আস্তে আস্তে খেলার পরিধি বাড়তে শুরু করল দু'জনের। অন্ধকারে কিছুটা সয়ে এসেছে গ্রে-র দৃষ্টি। ক্যানোপির নিচে অন্ধকার অবয়ব দেখতে পাচ্ছে ও, তাদের দেহও এই বাচ্চার মতো রঙে রাঙানো।

'এদের গায়ে রঙ মাখিয়েছে কে?' নিচু কণ্ঠে জানতে চাইল জেন।

ভালো প্রশ্ন।

অন্ধকারে শোনা ফিসফিসানি আওয়াজ মনে পড়ে গেল গ্রে-র।

আর কে আছে এখানে?

মুখ খুলল নোয়া, ওর কণ্ঠে বিস্ময়। 'আমার ধারণা .ওরা নিজেরাই নিজেদের গায়ে রঙ মাখিয়েছে।'

ভ্রু কুঁচকে উঠল গ্রে-র। 'তা কী করে সম্ভ-'

ভারী কিছু পানিতে পড়ার আওয়াজ এবং আর্তনাদের শব্দ ওকে চুপ করিয়ে দিল। মদ্দাটা যেখানে রোহোর সাথে খেলছে, সেদিকে তাকাল সবাই। দু'জনে একটা ছোট দ্বীপে গিয়ে উঠেছে। রোহোকে দেখতে পাচ্ছে ওরা, পরক্ষণেই আবার সে ছুটে গেল দ্বীপটার দিকে।

তাড়াতাড়ি সেদিকে এগোল দলটা।

দ্বীপটার একপাশে পৌঁছে গেল ওরা। এদিকে ওদের কিছুটা দূর থেকে অনুসরণ করে সেদিকেই ছুটে গেল রঙিন একটা দেহ।

কিন্তু মদ্দাটার কোন হদীস নেই।

'ওই যে!' আচমকা ইঙ্গিত করল নোয়া।

পানি থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরে পাগলের মতো নড়ছে একটা শুঁড়।

'পেছনে থাকো সবাই।' সাবধান করে দিল গ্রে।

দুই পা এগিয়ে এসে ডাইভ দিল পানিতে। হেলমেটটা বাঁধাই আছে, ওটার পানিরোধী বাতি আলো দিচ্ছে। ছোট দ্বীপ মতো অংশটার নিচে চলে এলো ও, হাতে ঠেকল কাদা। যে সে কাদা নয় এটা, হাত পড়লেই যেন গিলে নিতে চাচ্ছে।

আচমকা সামনে পড়ল একটা অবয়ব।

এগিয়ে গেল গ্রে। হাতির বাচ্চার পা একদম গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গিয়েছে কাদায়। ভয়ে বারবার নড়াচড়া করছে প্রাণীটা, এতে সমস্যা বেড়েছে কেবল। আরও বেশি করে ডুবে যাচ্ছে সে কাদায়। বাচ্চাটার দেহের পাশে হাত রাখল গ্রে, নিশ্চিত করার প্রয়াস পাচ্ছে।

তারপর আবার মাথা তুলল পানির উপরে। 'কম্বল আর দড়ি চাই!' চিৎকার করে বলল ও। এরপর দ্বীপটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'আমরা ওই গাছটাকে ব্যবহার করব।'

'বুঝতে পেরেছি।' কোয়ালস্কি এরইমধ্যে কাজে নেমে পড়েছে। নোয়াও পিছিয়ে নেই। এক গোছা দড়ি বের করে এনেছে সে। এদিকে জেন আর ডেরেক ব্যস্ত কম্বল বের করার কাজে।

সবকিছু গ্রে-র দিকে ছুঁড়ে দেয়া হলো।

দ্বীপটার দিকে এগোল সেইচান। 'তাড়াতাড়ি, গ্রে।'

ওদের আলোর সীমার ঠিক বাইরে হাঁটা চলা করছে একটা বিশাল অবয়ব। সম্ভবত বাচ্চাটার মা সে। আপাতত সামনে আসছে না, বুঝতে পারছে যে দলটার লক্ষ্য ওর বাচ্চাকে সাহায্য করা।

গ্রে জানে, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবে না মা।

ভয়ে এখন বিস্ফারিত হয়ে যাচ্ছে বাচ্চাটার নাকের ফুটো।

আবার ডাইভ দিল ও। আটকা পড়া পশুটার কাছে গিয়ে ভেজা কম্বলটা ওটার সামনের পায়ের ঠিক পেছনে ঢুকিয়ে দিল। বুকটা ঢাকা পড়ে যেতেই, ওটার নিচ দিয়ে পেঁচিয়ে দড়ি বাঁধল গ্রে।

এবার উপরে গিয়ে বাচ্চাটার পিঠের উপর বাঁধল রশি, কাজ শেষ হতেই কোয়ালস্কির দিকে ছুঁড়ে দিল অন্য প্রান্ত। বিশালদেহী লোকটা যেন লুফে নিল রশি। একটা গাছের সাথে পেঁচিয়ে, প্রাণপণে টানতে লাগল।

বাচ্চাটার সাথেই রইল গ্রে। ওটার শুঁড়ের প্রান্ত হাত দিয়ে ঢেকে, নাকের ফুটো পরিষ্কার রাখার প্রয়াস পেল। বাচ্চাটাকে শান্ত রাখার চেষ্টাও করল, বোঝাতে চাইল-ও একা নয়।

প্রাণপণ শক্তিতে টানছে কোয়ালস্কি, যদিও মনে হচ্ছে সফল হতে পারবে না। ডেরেক আর নোয়া যোগ দিল ওর সাথে। কাজ হলো এবার, ইঞ্চি ইঞ্চি করে উঠে আসতে লাগল বাচ্চাটার দেহ।

'চালিয়ে যাও!' উৎসাহ দিল গ্রে।

শেষ একবার ঘোঁত করে সর্বশক্তিতে টান দিল কোয়ালস্কি। হার মানতে বাধ্য হলো কাদা। অবশেষে পানি থেকে উঠে এলো বাচ্চাটা। গ্রে পাশেই রইল ওটার। দ্বীপে ওঠার পর, দড়ি আর কম্বল সরালো।

কাঁপছে বাচ্চাটা, নাড়া খেয়েছে প্রচন্ড।

ওকে দেখে মা-হাতিটা ডাক ছেড়ে উঠল।

যথেষ্ট হয়েছে খেলা-ধুলা, মায়ের দিকে মুখ করল বাচ্চাটা। কিন্তু এগোল না, পানিকে ভয় পাচ্ছে! ঝুঁকে এসে ওটার কানের পেছনের অংশে চুলকে দিল নোয়া। 'ওয়াকিযে, উমসোর।' বাচ্চাটাকে শান্ত করার প্রয়াস পেল সে। পথ দেখিয়ে দ্বীপের অন্যপাশে নিয়ে গেল ওটাকে। এদিকে পানিও কম, পায়ের নিচে কাদাও কম। 'ভয় পেয়ো না বাছা, তুমি নিরাপদ আছ।'

ওদেরকে অনুসরণ করল গ্রে, তবে কয়েক গজ পেছনে থেকে। একসাথে এতজনকে দেখলে মাদী হাতিটা ভয় পেয়ে যেতে পারে।

নতুন হওয়া বন্ধুর পাশেই রইল রোহো, মাঝে মাঝে নাক দিয়ে গুঁতা দিচ্ছে। মায়ের কাছাকাছি পৌছা মাত্র একছুটে মাদীটার পাশে চলে গেল বাচ্চাটা। মা-ও খুশি, শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল বাচ্চাটাকে।

কিছুক্ষণের মাঝেই ঘুরে দাঁড়াল দু'জন, রওনা দিল বনের দিকে।

'সাথে যাব?' জানতে চাইল জেন।

নড করল গ্রে। 'এজন্যই তো এসেছি।'

হাঁটতে শুরু করল ওরা, কিন্তু ওদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল আরেকজন।

বিশালদেহী এক মদ্দা পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। এর দেহের রঙগুলো দেখে মনে হচ্ছে বুঝি যুদ্ধসাজে সেজেছে। শুঁড় তুলে দাঁড়িয়ে আছে সে, যেন হলদে দাঁতগুলোকে দেখাচ্ছে। মদ্দাটার পেছনের অন্ধকারে নড়ছে আরও কিছু বিশালদেহীর অবয়ব।

এক হাত তুলে সবাইকে থামাল নোয়া। 'একে রাগাতে চাই না।'

'কোন সন্দেহ নেই।' অস্ফুট কণ্ঠে বলল কোয়ালস্কি। 'বাচ্চাটাকে বাঁচালাম, আর এই হলো তার প্রতিদান!'

যেন ওর সখেদোক্তি শুনতে পেয়েই, ডাক ছাড়ল মা-হাতি।

একবার সেদিকে তাকাল মদ্দা, তারপর শুঁড় নামিয়ে পথ থেকে সরে দাঁড়াল।

'বেচারা মনে হয় বকা খেয়েছে।' বলল সেইচান।

'হাতির পাল সাধারণত মাতৃ-তান্ত্রিক হয়।' নোয়া ব্যাখ্যা করল। 'পালের নেত্রীও হয় মহিলা।'

শ্রাগ করল সেইচান। 'আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।'

হাতিদের পিছু পিছু এগিয়ে গেল দলটা। হাতিরা কাছেই আছে, তবে অন্ধকারে। ওদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা হচ্ছে, বুঝতে পারল গ্রে। কে জানে, কতক্ষণ ওদের উপস্থিতি সহ্য করে এরা। তবে আশা করল, অন্তত ওদের কাজ শেষ করার আগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে হাতিদের এই মনোভাব।

বেশ অনেকক্ষণ হাঁটার পর, রঙিলা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। এতক্ষণে হাতিদের সংখ্যা সম্পর্কে আঁচ করতে পারল গ্রে। সবার দেহেই উজ্জ্বল রঙ মাখানো। কম করে হলেও ত্রিশটা হবে। অধিকাংশই প্রাপ্ত বয়স্ক, তবে কয়েকটা বাচ্চাও আছে।

এদিকে আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে হাতিদের দেহের উজ্জ্বলতা, একই কথা খাটে বনটার ব্যাপারেও!

গুঁড়ি আর নিচু হয়ে থাকা ডালের কিছু নমুনা সংগ্রহ করল নোয়া। শুঁকল, ঘষল, এমনকী হাতে ঠেকিয়ে স্বাদও গ্রহণ করল লোকটা।

'হুম

'কী?' জানতে চাইল গ্রে।

'জৈবিকভাবেই উজ্জ্বল মাসরুম আর ফাঙ্গাস। মাইসেলিয়া আর স্পোর বানাবার অঙ্গ গুঁড়ো করে এই রঙ বানানো হয়েছে।' চারপাশের অন্ধকার হতে শুরু করা জঙ্গলের দিকে তাকাল ও। 'ওরা নিশ্চয়ই দূর-দূরান্ত থেকে নমুনা এনে এই প্রাচীন বন সাজিয়েছে।'

'কারা?'

'আগেও বলেছি তোমাকে,' ভ্রু কুঁচকে তাকাল নোয়া। 'হাতিরা।'

রাত ৮:২৫

সামনে এগিয়ে গেল ডেরেক, গ্রে-র মতো সে-ও চমকে গিয়েছে। জেন তার সঙ্গী হলো, তবে মেয়েটার চেহারায় যতটা না চমক খেলা করছে, তারচেয়ে বেশি রয়েছে বিস্ময়।

'তা কী করে সম্ভব?' জানতে চাইল ডেরেক। 'আমরা ফিসফিসানি কণ্ঠ শুনেছি। এখানে নিশ্চয়ই কোন বুনো গোত্র বাস করছে।'

ফিরে তাকাল নোয়া। 'নাহ, ওই কণ্ঠও আসলে হাতিদের তৈরি।'

শব্দ করে দম ফেলল কোয়ালস্কি। 'আমি জানি হাতিরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান, তাই বলে কথা বলা?'

'ওরা কথা বলতে পারে না .নকল করতে পারে।' যেদিক দিয়ে এসেছে, সেদিকটা দেখাল নোয়া। 'হাতিরা যে শব্দ নকল করতে পারে, তা আমরা জানি। এমনকী ট্রাকের ইঞ্জিনের শব্দও পারে। মানুষের মতো কণ্ঠ নকল তো ওদের জন্য একেবারেই সহজ।'

বনের ভেতর দিয়ে এগোতে থাকা একটা বিশাল ছায়ার দিকে তাকাল জেন। 'কিন্তু এখন কেন করল?'

'নিশ্চিত করে বলতে পারব না, তবে আমার ধারণা-আমাদেরকে ভয় দেখাবার জন্য। একটা কথা নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, পাহাড়ে পা রাখা মাত্র ওরা আমাদের আসার কথা বুঝতে পেরেছিল।'

'আর রঙিলা বন?' জানতে চাইল গ্রে।

'ওটা দেখা আমাদের সৌভাগ্য। সম্ভবত কোন বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করছিল ওরা। আমরা জানি, হাতিপালের মধ্যে জটিল ধরনের অনুষ্ঠান পালনের প্রবণতা রয়েছে। আমরা ছাড়া ওরাই একমাত্র স্তন্যপ্রায়ী, যারা দুঃখ প্রকাশের জন্য লাশ কবর দেয়।'

ঘাড়ের উপর দিয়ে তাকাল ডেরেক। 'তাহলে এভাবে জঙ্গলটাকে সাজানোর কী মানে?'

'তা আমি জানি না, সেটা ওদেরকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে।' হাসল নোয়া। 'তবে এটা জানি, এই বিশাল প্রাণীগুলো বেশ দক্ষ আঁকিয়ে। রঙ এবং প্যাটার্নের প্রতি তাদের বিশেষ আগ্রহ আছে।'

নড করল জেন। 'মনে আছে আমার, লন্ডন চিড়িয়াখানার গিফট শপে, হাতিদের আঁকা ছবি বিক্রি হয়!'

'তাই বলে এই বুনো পরিবেশেও?'

'এমন ঘটনা যে আগে কখনও ঘটেনি, তা কিন্তু নয়,' নোয়া জানাল। 'অনেক সময়ই হাতি রঙ তৈরি করে একে অন্যের দেহে মেখে দেয়। যা বলছিলাম, আমরা সম্ভবত বিরল কোন অনুষ্ঠান দেখতে পেয়েছি। বাতাসে ভাব-গাম্ভীর্য বজায় আছে, টের পাচ্ছ না?'

পাচ্ছে ডেরেক।

'সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উপস্থিত হয়েছি বলে,' বলে চলছে নোয়া। 'আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চেয়েছে ওরা। হয়তো সেইজন্যই আমাদেরকে এখন আবার সাথে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছে। বাচ্চাটাকে রক্ষা করা ছাড়াও, হয়তো সেই অনুষ্ঠানে আমাদের কোন ভূমিকা আছে।' পাশে হাঁটতে থাকা সিংহটাকে আদর করল ও। 'রোহোর কৃতিত্বকেও খাটো করা যাবে না।'

দুই প্রজাতির দুই কমবয়সী প্রতিনিধির হাসা-খেলার দৃশ্য মনে পড়ে গেল ডেরেকের। তবে নোয়া সেজন্য বলেনি কথাটা।

'মদ্দা হাতি আর মা-হাতির দিকে ভালোভাবে তাকিয়েছিলে?' জানতে চাইল নোয়া। 'বাচ্চাটার মতো ওর দু'জনও কিন্তু অ্যালবিনো!'

'কিন্তু ওরা পুরোপুরি সাদা নয়,' বলল জেন। 'হালকা লালচে বাদামী বলা যায়।'

'ওইটা হাতিদের বৈশিষ্ট্য। অ্যালবিনো হাতিরা এমনিতে জন্মায় গোলাপি হয়ে, বয়সের সাথে সাথে গাঢ় হতে থাকে দেহের রং। একেবারে সাদা হাতি বিরল।' রোহোকে আদর করল লোকটা। 'সম্ভবত ওদের মতো জিনগত সমস্যার ভুক্তভোগী একজন সাথে থাকায় আমরা বাড়তি সুবিধা পেয়েছি।'

'কারণটা যাই হোক না কেন,' বলল গ্রে। 'আমাদেরকে সাথে যাবার অনুমতি দিয়েছে, এতেই আমি খুশি।'

বনের ভেতরের দিকে এসেছে ওরা, যতই এগোচ্ছে ততই বড় হচ্ছে গাছের আকার। পানি এখন ছোট ছোট খন্দে আটকা। জঙ্গলের স্বাভাবিক সব শব্দ ফিরে আসতে শুরু করেছে। বানরের কিচির-মিচির, পাখির চিৎকার এসব শুনতে পেল গ্রে।

চোখে সমীহ নিয়ে চারিদিকে তাকাল নোয়া। 'যদি পুরো পালই অ্যালবিনো হয়, তাহলে বনের এত গভীরে বাসা বাঁধার একটা কারণ বোঝা যাবে। রুক্ষ আফ্রিকান সূর্যের নিচে থাকলে প্রাণীগুলো অন্ধ হয়ে যেতে পারে, হতে পারে নানা ধরনের চর্মরোগ। এখানে ওদের টিকে থাকতে সমস্যা হবে না।'

'লুকাতেও হবে না।' বলল গ্রে।

'হ্যাঁ, পোচারদের জন্য তো অ্যালবিনো যেকোন পশু তো এক কথায় স্বর্ণখনি! এটাও একটা কারণ হতে পারে। লাজুকতা বা নৈশজীবে পরিণত হবার জন্যও হয়তো এই কারণই দায়ী।'

পরবর্তী এক মাইল হেঁটে পার হলো ওরা কোন কথা না বলে।

কৌতুহলী বাচ্চাটা আবার ফিরে এল ওদের কাছে, ভয় ভুলে গিয়েছে। ওর সাথে এল তার মা-ও। তবে মা-হাতি কিছুটা দূরে দূরে থাকছে, নজর রাখছে সন্তানের প্রতি।

ওদেরকে এক দফা শুঁকল বাচ্চাটা, খোঁচা দিল। বিশেষ করে গ্রে-র প্রতি ওর নজর। শুঁড় দিয়ে এমনভাবে গ্রে-র কব্জি ধরল, যেভাবে মানুষ একে-অন্যের হাত ধরে।

'তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে,' বলল নোয়া।

'কাজ করে কে, আর ধন্যবাদ পায় গ্রে।' ঘোঁত করে উঠল কোয়ালস্কি। 'গ্রে তো শুধু গিট্টু বেঁধেছে! টানাটানিটা করল কে শুনি?'

অবশেষে শেষ হলো জঙ্গল। একটা বিশাল ক্লিফের কাছে এসে থামল সবাই। ওদের অনেক উপরে, একটা কালো ঢেউ ঝুলছে যেন। নোয়ার মুখে শোনা এই এলাকার বর্ণনা মনে পড়ে গেল ডেরেকের-এই এলাকা আফ্রিকার অন্যতম প্রাচীন এলাকা। এখানে পৃথিবীর বুকে ফাটল ধরে জন্ম হয়েছে পাহাড়ের।

সামনের দৃশ্য দেখে কথাটা বিশ্বাস করতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হচ্ছে না ডেরেকের। দেয়ালটাকে দেখে মনে হচ্ছে, পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে বুঝি কেউ ওটাকে তুলে এনে স্থাপন করেছে মাটিতে। অগণিত ছোট-ছোট ফাটলে ভরে আছে ওটা।

পালটা ওদের দিকে এগিয়ে এল, সামনে এবং পেছনে একটা করে লম্বা লাইন গঠন করেছে। মিছিলটার লক্ষ্য বিশেষ একটা ফাটল, আশেপাশের ফাটলগুলোর সাথে যার কোন পার্থক্য নেই।

'পেছনে দেখ,' ফিসফিস করে বলল নোয়া। 'একেবারে পেছনে

ঘুরে গেল সবার চেহারা।

তিনটা মদ্দা হাতি উল্টো দিকে হাঁটছে। বড় বড় পাতা দিয়ে মুছে ফেলছে ওদের পায়ের ছাপ।

'নিজেদেরকে লুকাচ্ছে!' বলল গ্রে।

'আমাদের পার্কের অনেক হাতিকে এই ধরনের পাতা ব্যবহার করে মাছি তাড়াতে দেখেছি। একবারের কথা বলি-খড়ার মৌসুমে একটা হাতি পানির জন্য গর্ত খুঁড়ল। তারপর সেটা যেন বাষ্পীভূত হয়ে না যায়, তা নিশ্চিত করতে চিবানো গাছের বাকল আর বালু ব্যবহার করে ঢেকে দিল! পুরো গ্রীষ্ম এভাবে নিজের কুপটার দেখা-শোনা করল সে। আমি জানি এরা দারুণ বুদ্ধিমান। মগজ ব্যবহার করে বেঁচে থাকার, সমস্যা সমাধানের, একত্রে কাজ করার উপায় বের করে। এমনকী নানা যন্ত্রও ব্যবহার করতে জানে এরা। কেন যে মানুষ আনন্দের জন্য বা নিছক দাঁতের জন্য এদেরকে খুন করে!'

সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে গাইডের হাত স্পর্শ করল জেন।

কোয়ালস্কিকেও চিন্তিত মনে হলো, তবে ভিন্ন কারণে। 'হাতিরা নিজেদের সাথে সাথে আমাদের ছাপও ঢেকে দিচ্ছে। ব্যাপারটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়তো?'

সামনের দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে। 'বোঝার মাত্র একটাই উপায় আছে।'

রাত ৯:২০

উত্তেজনায় দম নিতে কষ্ট হচ্ছে জেনের, ডেরেকের গায়ের সাথে প্রায় লেগে রয়েছে মেয়েটা। সামনের রহস্য ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, আবার সেই সাথে রয়েছে দুশ্চিন্তাও।

যদি কিছুই না পাওয়া যায়?

বিশালদেহী পশুরা একের পর এক বিস্ময় উপহার দিয়ে চলছে বটে, কিন্তু দিনশেষে তো তারা কেবলই হাতি। তাদের কাছ থেকে শিক্ষণীয় এমন কী আছে শুনি? আর তাছাড়া, এসবের সাথে মিশরের উত্তপ্ত বালির কী সম্পর্ক? কী যোগযোগ মোজেসের সেই দশটা মহামারীর সাথে?

লাইনের প্রথম হাতিটা একটা ফাটলের ভেতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পিছু পিছু অন্যরা। অবশেষে এল মানব-দলটার পালা। ভেতরে প্রবেশ করে একবার উপরের দিকে তাকাল জেন, আঁতকে উঠল প্রায় সাথে সাথেই। দুই পাশেই পর্বত-গাত্র। অনেক উপরে জন্মেছে গাছ, তাদের ঘন সন্নিবেশনের ফলে ক্যানোপি তৈরি হয়েছে পথের উপরে।

দুই দেয়ালের মাঝে আবদ্ধ জেনের নাকে এসে লাগছে হাতির গন্ধ। মল আর চামড়ার ঘ্রাণে ভরে আছে জায়গাটা। ভয় গিলে অন্যদের অনুসরণ করল সে। আস্তে আস্তে সরু হতে শুরু করেছে রাস্তাটা। একবার তো মনে হলো, মদ্দা হাতিগুলো আটকে যাবে ফাটলে! কিন্তু না, নিরাপদেই পার হলো তারা।

মনে হচ্ছে, মাইলের পর মাইল হেঁটে যাচ্ছে। তবে প্রকৃতপক্ষে এক মাইলও হবে কিনা সন্দেহ। অবশেষে দেয়াল সরে যেতে শুরু করল, সর্বশেষ বাঁধা এসে উপস্থিত হলো সামনে।

হাতির দলটাকে বাঁয়ে সরে যেতে দেখল জেন। ওদিকে একটা ঢালু পথ আছে, শেষ হয়েছে জেনদের সামনেই। পথ ধরে উপরে উঠে গেল হাতিরা, ছোট বাচ্চাগুলো তাদের মায়েদের লেজ ধরে উঠল। জেনের মনে হলো, এভাবেই শত শত বছর ধরে হাতির পাল উঠছে এই পথ বেয়ে। কিছুক্ষণ পর রাস্তাটা দেখে বুঝতে পারল, ঠিক ছিল ওর ভাবনা। অগণিত হাতির পায়ের ছাপ দেখা গেল ওতে।

এই রাস্তার প্রয়োজনীয়তাও ধরা পড়ল মেয়েটার চোখে।

দুটো উঁচু দেয়ালের মাঝখানে সেতু হিসেবে কাজ করছে পথটা।

তবে ওটা দেখে প্রাকৃতিক সৃষ্টি বলে মনে হলো না ওর।

ডেরেকও একই সিদ্ধান্তে উপনীয় হয়েছে। নিচু হয়ে সেতুর কর্কশ তলে আঙুল বোলাল সে। 'সাদা চুনাপাথর।' সোজা হলো ছেলেটা। 'পাহাড়টা গ্রানাইটের। এই জিনিস প্রাকৃতিক নয়। নিশ্চয়ই অন্য কোথাও থেকে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে।'

ঢালু পথের পাশে গিয়ে দেয়ালটা দেখল জেন। ওটা বানানো হয়েছে বড় বড় পাথর দিয়ে, একেকটা ছোট ছোট গাড়ির সমান হবে। আগেও এই ধরনের চুনাপাথরে তৈরি ব্লক দেখেছে ও।

গিজার পিরামিডে

'এগুলো হাতির বানানো না।' বলল ডেরেক। 'যন্ত্র ব্যবহারে তারা যত দক্ষই হোক না কেন, এসব বানাতে পারবে না।'

পেছনে থাকা হাতির দল ওদেরকে বেশিক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দিল না। অনেকটা বাধ্য হয়েই আবার এগোতে শুরু করল জেন।

দেয়ালের ওপাশে, ক্লিফটা অনেক লম্বা একটা বৃত্তের রূপ নিয়ে একটা ছোট উপত্যকাকে ঘিরে রেখেছে। ওটার অন্যপাশে আবারও শুরু হয়েছে সেই সরু রাস্তা। কিন্তু উপত্যকার দৃশ্য জেনের সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিল।

ওতে জঙ্গলের একটা অংশ আছে, যদিও দেখে মনে হচ্ছে কোন দক্ষ মালীর হাতে গড়া বাগান। অন্যান্য হাতি ওদের আসা দেখে সম্ভাষণ জানাচ্ছে। এখানকার হাতিদের অনেক বয়স্ক দেখাচ্ছে, চামড়া ঝুলে পড়েছে। সম্ভবত ভ্রমণ করতে পারবে না, এমন দুর্বল বৃদ্ধদেরকে রেখে গিয়েছিল হাতিরা।

ভ্রমণ শেষে আসা পালটা উপত্যকার ভেতর ছড়িয়ে পড়ল, মনে হচ্ছে যেন বাড়িতে ফিরেছে! জেন জানে, হাতিরা সাধারণত যাযাবর হয়। বাড়ি বানায় না কোথাও। অথচ এই পালটা আলাদা। হয়তো তাদের জিনগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই আলাদা হয়ে বাস করছে।

তবে এগুলোর কোনটাই পুরোপুরিভাবে ওর মনোযোগ আটকে রাখতে পারল না।

ডান দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। উপত্যকার ওদিকের কোনায় অবস্থিত একটা ছোট ডোবার দিকেই ওর মন। ওটার অর্ধেক খোলা আকাশের নিচে, বাকি অর্ধেকটার উপরে রয়েছে ক্লিফ। মেয়েটার মনে হলো, নিশ্চয়ই এই পাহাড়গুলোর ভেতর থেকে উৎসারিত ঝর্ণা, ওই ডোবার পানির উৎস। গ্রানাইটের যে ছাদটা ছায়া হয়ে আছে, ওটা থেকে ভেসে আসছে ভাস্বরতা। পরক্ষণেই আবার পানির উপরে নেমে আসছে আলোটা। আবার হারিয়ে যাচ্ছে .কিছু ছড়িয়ে পড়ছে উপত্যকা জুড়ে।

'জোনাকি।' বলল নোয়া।

তবে জোনাকির আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল ডোবার উজ্জ্বল লাল পৃষ্ঠতল।

কী দেখছে, তা কাউকে বলে দিতে হলো না।

'হায় ঈশ্বর ' বিড়বিড় করে উঠল ডেরেক।

ওদের চোখের সামনেই একটা কিশোর হাতি এগিয়ে গেল ডোবার দিকে, পানিতে শুঁড় ডুবিয়ে চোঁ-চোঁ করে টেনে নিল তরল! আঁতকে উঠল জেন, কিন্তু হাতিটাকে দেখে মনে হলো না যে ওর কোন অসুবিধা হচ্ছে!

উপত্যকায় ওদের অবস্থান নিয়ে হাতিদের কোন আপত্তি আছে বলে মনে হচ্ছে না, অধিকাংশ ওদেরকে পাত্তাও দিচ্ছে না। যার যার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাচ্ছে। তবে কয়েকটা বিশালদেহী মদ্দা দাঁড়িয়ে আছে পাশেই, নজর রাখছে।

'কিছু বুঝতে পারছ?' জানতে চাইল গ্রে।

দলনেতার দিকে নজর দিল জেন। 'কোথায় আছি, তা সম্ভবত ধরতে পারছি।'

এবার গ্রে-র নজর দেবার পালা।

'আমরা দাঁড়িয়ে আছি নদীর ঠিক মুখে। বাবার ফেলে যাওয়া ট্যাটুতে এই জায়গার কথাই লেখা ছিল। সবকিছু এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি।'

ভ্রু কোঁচকাল কোয়ালস্কি। 'আমি পারছি না।'

ডেরেকও ধরতে পেরেছে। 'হাজারো বছর আগে আবহাওয়ায় সম্ভবত একটা বিশাল পরিবর্তন আসে। এমন এক বর্ষা ঋতু হয়েছিল, যা আগে কখনও হয়নি। এই এলাকা প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল সেই বর্ষায়। ফলে কাগেরা নদীতে বান এসে পানি উপচে পরেছিল তার শাখা-প্রশাখাতেও।'

কল্পনার চোখে যেন সেই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে জেন। 'আমরা যে ডুবে যাওয়া জঙ্গল পার হয়ে এলাম, ওটা সম্ভবত পুরোপুরিই ডুবে গিয়েছিল। সেই পানি এসে প্রবেশ করেছিল এই উপত্যকাতেও '

.মিশে গিয়েছল বিষাক্ত ওই ডোবার পানির সাথে।' কথা শেষ করল ডেরেক। 'ফলে অণুজীবগুলো উপত্যকা থেকে বেরোবার একটা পথ পেয়েছিল। কাগেরা নদী হয়ে পৌছে গিয়েছিল লেক ভিক্টোরিয়াতেও।'

উত্তর দিকে তাকাল গ্রে। 'যার শেষ হয়েছিল নীল নদে?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল জেন। 'যেখানেই গিয়েছিল, সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল মৃত্যু। সেই সাথে জন্ম দিয়েছিল অন্যান্য মহামারীরও। হয়তো থেরার সেই আগ্নেয়গিরির উদগীরণই আবহাওয়া এই বিশাল পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল।'

লম্বা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল গ্রে, পরিষ্কার হচ্ছে সবকিছু। 'তারপর নিশ্চয়ই মিশর থেকে কেউ খুঁজতে খুঁজতে এসে উপস্থিত হয়েছিল এখানে।'

এবার জেনের কথা শেষ করার পালা। 'সেই মহামারী যেন আবার না ছড়ায়, সেজন্য বানিয়েছে এই লম্বা দেয়াল। ভবিষ্যতে বন্যা হলেও যেন পানি উপত্যকা থেকে বেরোতে না পারে, সেজন্য পরিখা খনন করেছিল।'

'শুধু তাই না,' বলল গ্রে, হাতিদের দিকে এখন নজর ওর। 'আমাদের মতো নিশ্চয়ই তারাও এদের বেঁচে থাকার উপায় নিয়ে ভেবেছিল। আমরা জানি, সেই সময়ও এখানে বাস করছিল এই বিশালদেহীরা। কেননা ট্যাটুতে সেরকমই উল্লেখ আছে।'

কপালে হাত রাখল জেন। 'কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই উপত্যকার পানি খেয়ে ওরা বেঁচে আছে কী করে? প্রকৃতিগতভাবে প্রাপ্ত রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার জোরে? নাকি জিনগত কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে?'

'আমার কিন্তু কোনটাই মনে হয় না।' গ্রে-র জবাব।

'কেন?'

'কেননা মিশর থেকে যে এসেছে, সে ওই প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। তোমার কি মনে হয়, মানুষটার কাছে জটিল সব পরীক্ষা করার যন্ত্রপাতি ছিল? অসম্ভব, অন্য কোন উপায় আছে।' ডোবার দিকে তাকাল ও। 'হাতিরা এমন বিনা দ্বিধায় পানি পান করছে কেন?'

'খুব সম্ভবত ওই পানি এদেরকে বিবর্তনগত দিক থেকে সাহায্য করছে।' নিজের মতো জানাল নোয়া।

লোকটার দিকে ঘুরল গ্রে। 'কেমন ধরনের সাহায্য?'

'এদিকে জীবনের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে পানি। প্রতিটা প্রজাতি শুষ্ক মৌসুমের জন্য যার যার মতো করে পানি সংরক্ষণের পদ্ধতি আবিষ্কার করে। অতীতেও এমন হাজারো শুষ্ক মৌসুম এসেছে-গিয়েছে। কোন কোনটা তো এক দশক জুড়ে ছিল!' উপত্যকার দিকে ইঙ্গিত করল নোয়া। 'তোমাকে হাতি নির্মিত কূপের কথা বলেছিলাম না? এটাকে তারই আরেকটা বিস্তৃত রূপ ধরে নাও। যদি একমাত্র তোমার প্রজাতিই এই পানি পান করে টিকে থাকতে পারে, তাহলে অন্য কোন প্রজাতির সাথে দখল নিয়ে লড়াই করতে হবে না!'

যুক্তিটা পছন্দ হয়েছে ডেরেকের, তবে আরেকটা প্রশ্নও উদয় হয়েছে সেই সাথে। 'কিন্তু এই পানি পান করাটা এরা শিখল কীভাবে?'

হাসল নোয়া। 'হাতিরা যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি ধৈর্যশীল। ধাঁধাঁ সমাধান করতে ভালোবাসে এরা। হয়তো দশকের পর দশক লেগে গিয়েছে সঠিক পদ্ধতিটা আবিষ্কারে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের যেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে তা হলো, কীভাবে ওদের কাছ থেকে সেই পদ্ধতিটা শিখে নেয়া যায়? আবিষ্কৃত কিছু একটা নতুন করে আবার আবিষ্কারের কী দরকার?'

সেই হাজারো বছর আগে যে এসেছিল, তার মনেও কী একই ভাবনার উদয় হয়েছিল? মনে মনে ভাবল জেন।

আধুনিক একটা উদাহরণ টেনে নিজের মন্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণের প্রয়াস পেল নোয়া। 'কেনিয়ার কথা বলি। বিশেষ একটা গাছের পাতা চিবিয়ে প্রসব বেদনা শুরু করে হাতিরা। ওদের কাছ থেকে শিখে এখন স্থানীয়রাও সেই পাতাকে কাজে লাগায়। তাই বুঝতেই পারছ, আমাদের বিশালদেহী বন্ধুদের কাছ থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে।'

'ধরে নিলাম আপনার কথা ঠিক। তাহলে আমরা শুরু করব কোত্থেকে?' জানতে চাইল জেন।

গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ওরা, এবার সেখান থেকে সরে এসে উপত্যকার দিকে নজর দিল গ্রে। 'তোমার বাবা যে 'ট্যাটু করা' চামড়ার টুকরা সরিয়ে রেখেছিলেন, তাতে শুধু হাতির কথা ছিল না। হাতির হাড় নিয়েও কিছু একটা লেখা ছিল।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল জেন। 'হ্যাঁ।'

নোয়ার দিকে ফিরল গ্রে। 'আপনি বলছিলেন, একমাত্র হাতিরাই দু:খ প্রকাশার্থে তাদের মৃতদেরকে কবর দেয়। খুলে বলবেন?'

'কাজটা করে ওরা মৃতদেরকে সম্মান দেখাবার উদ্দেশ্যে। প্রথমে কিছু সময় দেহটার কাছে দাঁড়িয়ে সন্তাপ করে ওরা। তারপরে কবর দেবার উদ্দেশ্যে মাটি, ডাল-এসব লাশটার উপর ছড়িয়ে দেয়। হাড়গুলোকে তারা পবিত্র আর সম্মানের বস্তু বলে মনে করে। এমনও দেখা গিয়েছে যে কোন পাল যখন অন্য কোথাও যায়, তখন হাড়গুলোকে সাথে করে নিয়ে যায়!'

'এই পালের হাড়গুলো তাহলে কোথায়?' জানতে চাইল গ্রে। 'এরা যেমন গোপনীয়তা পছন্দ করে, তাতে হাড়গুলোকেও লুকিয়ে রাখলে অবাক হব না।'

'ঠিক। তবে ওগুলো লুকিয়ে রাখলেও, ধারে-কাছে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে বলে আমার ধারণা।' ডেরেক উপত্যকার পেছন দিকের ফাটলের দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওদিকে থাকতে পারে।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল গ্রে। 'চলো, খুঁজে দেখা যাক।'

কিন্তু ওরা রওনা দেবার আগেই, দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করল সেইচান। 'আমাদের জানা মতে, এই জায়গায় প্রবেশ করা বা এখান থেকে বেরোবার রাস্তা মাত্র একটাই। তোমরা যাও, আমি পাহারা দেই।'

রাজি হলো গ্রে। 'রেডিয়ো-যোগাযোগ রেখো, দরকার হলেই ডাকবে।'

কোমরে থাকা বড় বন্দুকটায় চাপড় বসালো সেইচান। 'চিন্তা করো না, আমার ডাক তুমি শুনতে পাবে।'

রোহোকে পাশে নিয়ে বিষাক্ত ডোবা পার হলো ওরা। তীরের অনেকটা দূর দিয়ে ঘেঁষে এগোল, ওদের আসতে দেখে নড়া-চড়া লক্ষ্য করা গেল হাতিদের মাঝে। একটা যুবক মদ্দা তো ছুটেই এল ওদের দিকে। ভয়ে জমে গেল সবাই, কিন্তু গজ দশেক দূরে থাকতেই থেমে গেল ওটা। কান নাড়িয়ে ফিরে গেল আবার।

'যৌবনের গরম দেখাচ্ছে,' ব্যাখ্যা করল নোয়া।

'টিনেজাররা যেমন হয় আরকি।' কোয়ালস্কির জবাব।

বাকি পথে আর কোন সমস্যা হলো না।

ক্লিফের ফাটলের কাছে পৌঁছে নড করল নোয়া। 'হাতির গোরস্তানের ধারণাটা এখন পর্যন্ত কিংবদন্তি।' সবাইকে আগে থেকেই সাবধান করে দেয়ার প্রয়াস পাচ্ছে যেন। 'বয়স্ক হাতিরা মরার জন্য কোন একটা বিশেষ জায়গা বেছে নেয় না। সম্ভবত এই গোত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।'

জেন অতটা নিশ্চিত নয়, এই গোত্রের কোন কিছুই আসলে গতানুগতিক না। ফাটলের কাছে এসে দাঁড়াতেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পথ রোধ করল এখন পর্যন্ত দেখা সবচাইতে বড় মদ্দা হাতিটা।

'এই ব্যাটা নিশ্চয় টিনেজার না।' রুষ্ট কণ্ঠে বলল কোয়ালস্কি।

'এখন কী?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল ডেরেক।

উত্তরটা এল মদ্দাটার পেছন থেকে। কর্কশ একটা ডাক শুনতে পেল ওরা, মানুষ হলে হয়তো বলত বুকে কফ জমেছে। আরও একটা মুহূর্ত ওদের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে রইল মদ্দাটা। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন সরে জায়গা করে দিল।

'আমাদের সাথে কেউ দেখা করতে চাইছে বলে মনে হচ্ছে,' ডেরেকের মন্তব্য।

বাধা সরে যেতেই ফাটলের ভেতর পা রাখল দলটা। মদ্দা সাথে সাথে গিয়ে দাঁড়াল ফাটলের সামনে, পথ রোধ করল যেন ওদের। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করল ওদের, পারতপক্ষে কোন আওয়াজ করছে না। ওর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন কোন পবিত্র স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

নয়তো পবিত্র কারও সামনে

সামনে ফাটলটা আরও অন্ধকার হয়ে এসেছে, মাথার উপরে ক্যানোপি হয়েছে আরও ঘন। গ্রে-র হেলমেটের আলোয় পথ দেখতে অবশ্য কোন অসুবিধা হচ্ছে না। আঁকা-বাঁকা পথ। তবে শেষ হয়েছে একটা গোলাকৃতি জায়গায়।

এখানেই রাস্তার পরিসমাপ্তি।

সামনের জায়গাটার মেঝে ভর্তি হয়ে আছে ডাল-পালার স্তূপে। কিছু অখণ্ড আছে, কিন্তু টুকরা-টুকরা। কয়েকটার নিচ থেকে উঁকি দিচ্ছে হলদে দাঁত, আবার কয়েকটার নিচে সাদা হয়ে যাওয়া হাড়। জায়গাটার একদম পেছনে রয়েছে লম্বা গাছের ছোট জঙ্গল, এছাড়া প্রাণের আর কোন চিহ্ন নেই আশেপাশে। সাদা বালুতে ঢেকে আছে

মাটি, মাঝে মাঝে রয়েছে কিছু গোলাকৃতি নুড়ি। মনে হচ্ছে যেন কোন প্রাচীন সাগরের ভেতর থেকে উঠে এসেছে অগণিত ভাঙা খোলস।

পা বাড়াল জেন, বুঝতে পারল এতক্ষণ ভুল ভেবেছে।

পায়ের নিচে বালু বা খোলস নেই, আছে ভাঙা হাড়!

একদৃষ্টিতে নিচের দিকে চেয়ে রইল মেয়েটা। ভয়ে ভরে আছে মন, কল্পনার চোখে দেখতে পেল-শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হাতির পাল এখানে এসে লুটিয়ে পড়েছে মরার জন্য। কালের করাল থাবায় তারা আজ পরিণত হয়েছে বালুতে।

কোয়ালস্কিকে দেখেও অসন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে। 'কিংবদন্তি না ছাই!'

তবে সেখানে শুধু ওরাই নেই।

আশেপাশের নড়া-চড়া দেখে বোঝা যাচ্ছে, একগাদা হাতি রয়েছে জায়গাটায়। একেবারে চুপচাপ নড়ছে তারা, শোক প্রকাশ করছে। ভয়টা অনেকটাই কেটে গেল জেনের, বুঝতে পারল এখানে শ্রদ্ধার নিদর্শন রেখে যাচ্ছে হাতিরা। তাদের সত্যিকারের দুঃখ প্রকাশ করছে। একটা স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কমবয়সী এক মদ্দা, তার চোখ দিয়ে বেয়ে পড়ছে পানি।

এখানে ঢোকার সময় বিশালদেহী মদ্দাটা যে বাঁধা দিয়েছিল, তা এমনি এমনি দেয়নি।

আমাদের এখানে আসার কোন অধিকার নেই।

কিন্তু ডেরেক যেমনটা বলেছে, কেউ একজন দেখা করতে চায় ওদের সাথে।

বয়-বৃদ্ধ এক হাতি কষ্টে-সৃষ্টে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। মাদী হাতিটার চামড়া ধূসর-সাদা, পায়ের নিচে পড়ে ভাঙতে থাকা হাড়ের মতোই। শুঁড় দিয়ে ওদেরকে কাছে ডাকল যেন সে!

এগিয়ে গেল দলটা, বুঝতে পারছে যে এটুকু সম্মান মাদীটার প্রাপ্য।

'আমার ধারণা, হাতিটা প্রায়ান্ধ।' ফিসফিস করে বলল নোয়া।

সম্ভবত তাই; কেননা গ্রে-র হেলমেটের আলো তার চেহারার উপরে পড়লেও, পলক ফেলল না প্রাণীটা।

ওদের দেখা দেখি এগিয়ে এসেছে হাতিটাও, সামনে শুঁড় বাড়িয়ে রেখেছে সে।

দৃষ্টির চাইতেও সূক্ষ্ম কোন অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রথমে জেনের কাছে এলো মাদীটা। শুঁকল জেনকে, এরপর মেয়েটার কোমর আলতো করে জড়িয়ে ধরল। জেনকে অন্যদের থেকে আলাদা করে কাছে টেনে নিল মাদী হাতি।

ভয় পেয়ে পেছন ফিরে চাইল মেয়েটা, কিন্তু নোয়া অভয় জোগাল। তাই নিজেকে বিশালদেহী হাতির হাতে ছেড়ে দিল জেন। কয়েক পা এগোতেই ওর কোমড় থেকে সরে গেল শুঁড়।

তারপর দলের অন্যদের দিকে তাকাল বয়োবৃদ্ধ হাতি, শুঁড় দিয়ে কাছে আসার ইঙ্গিত করল দলের এক সদস্যকে।

'কোমেযা, রোহো,' এবারও সাহস জোগাল নোয়া। 'যাও।'

এগিয়ে গেল সিংহ-শাবক, ওর কেশর বরাবর শুঁড় বুলিয়ে দিল মাদী হাতি। জেনের পাশে অনেকটা টেনেই দাঁড় করাল ওকে।

রাজসিক পশুটার সামনে দাঁড়িয়ে রইল দু'জন। ওদের সামনে মাথা নত করল হাতিটা, কপালের উঁচু হাড় ঠেকাল জেনের বুকে। পশুটার সাদা, কোঁকড়ানো পাপড়ি পরিষ্কার দেখতে পেল জেন। একই সাথে শুঁড় দিয়ে হাতিটা জড়িয়ে ধরল রোহোকে। গলার ভেতর থেকে তৃপ্তির আওয়াজ বেরিয়ে এল।

যখন মাথা তুলল, তখন বড় বড় চোখে দেখা গেল অশ্রু।

রাত ৯:৩২

জেন আর রোহোর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা পালের রাণীকে ভালোভাবে দেখছে গ্রে। ওটার সাদা শুঁড়ের গোলাপি অগ্রভাগ আলতো ভঙ্গিতে ঘুরছে দুই জনের দেহে।

'করছেটা কী?' ফিসফিস করে জানতে চাইল ডেরেক।

মাথা নাড়ল নোয়া। 'শোক প্রকাশ করছে। কেন বা কার জন্য, তা জানি না।'

'স্মৃতিচারণ করছে রাণী।' বলল গ্রে।

ওর দিকে ঘুরে তাকাল ডেরেক।

যুবক যে ব্যাপারটা ধরতে পারেনি, তা অবাক করল গ্রেকে। 'একজন মহিলা .আর একটা সিংহ।'

বড় বড় হয়ে গেল ডেরেকের চোখ। 'মানে

'আমাদের মাঝে কেবল ওদেরকেই বেছে নিয়েছে রাণী। ব্যাপারটা কাকতাল হতে পারে না।' লিভিংস্টোনের তেলের পাত্রে এবং ওই সমাধিতে অঙ্কিত চিহ্নের কথা মনে পড়ে গেল গ্রে-র। 'হয়তো নীলের উৎস খোঁজার জন্য এখানে এসেছিল কোন মহিলা, সাথে ছিল একটা সিংহ। মিশরীয়রা তো বিড়ালের পূজা করত, অনেকসময় পোষা শিকারি হিসেবে সিংহও পালত। তাই না?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল ডেরেক। 'ইতিহাস বলে, ফারাওরা প্রায়শই করত কাজটা। মানছি, হাতির স্মৃতিশক্তি ভালো। তাই বলে হাজারো বছর অতীতের স্মৃতি সে মনে রাখবে কী করে!'

'সাধারণত রাখার কথা না। কিন্তু ওই হাতিটা যে রেখেছে, তা বোঝাই যাচ্ছে। কীভাবে, তা এখনও ব্যাখ্যা করতে পারব না। হয়তো বিবর্তনের যে সুবিধার কথা

আমরা আলোচনা করছিলাম, সেটা এক-পাক্ষিক নয়!' নোয়ার দিকে ফিরল সে। 'হাতিদের বড়-সড় মগজের কথা বলছিলেন একটু আগে।'

'হ্যাঁ। অন্য যেকোন স্থলবাসী প্রাণীর চাইতে বড়। প্রায় এগারো পাউন্ডের মতো। আমাদের মগজের মতই নিউরোন আছে ওতে।'

মাথা ঝাঁকাল গ্রে। 'সুতরাং ধরে নেয়া যায়, বিদ্যুতের প্রতি আসক্তি আছে, এমন অণুজীবের বাসস্থল হিসেবে অমন একটা মস্তিষ্ক একেবারে আদর্শ। হয়তো উভয়ের জন্যই লাভজনক, এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করতে পেরেছে দুই পক্ষ। হয়তো অণুজীবটা হাতির মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক কর্মকান্ড বাড়ায়, বিনিময়ে কোনভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বয়ে নিয়ে যায় স্মৃতি।'

কোয়ালস্কির কথায় ওর চিন্তায় বাধা পড়ল। 'হাতিটা নড়ছে দেখো। সেই সাথে আমাদের দু'জনকে নিয়ে যাচ্ছে যেন কোথায়!'

বয়োবৃদ্ধ রাণী ঘুরে দাঁড়িয়ে জায়গাটার অন্যপ্রান্তের দিকে এগোচ্ছে, সেই সাথে শুঁড় নেড়ে তাকে অনুসরণ করার অনুরোধ করছে জেন আর রোহোকে।

'চলো,' ওদের পিছু নিল গ্রে, তবে অবশ্যই কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে।

জঙ্গলের কাছে নিয়ে গেল ওদেরকে হাতিটা। ওখানে একটা বাচ্চা আর তার মা মিলে শুষ্ক ডাল জড়ো করছে। শুঁড় দিয়ে রোহো আর জেনকে থামাল রাণী।

থমকে দাঁড়াল গ্রে-ও।

চারপাশের গাছগুলোর দিকে তাকাল ডেরেক। 'তাল, মোবোলা তালের গাছ!'

আবিষ্কারটার গুরুত্ব বুঝতে পারল না গ্রে।

ব্যাখ্যা করল ডেরেক। 'লিভিংস্টোন যখন মারা যান, তখন তার হৃদপিন্ডটা একটা মোবোলা তাল গাছের নিচে কবর দেয়া হয়। তার লাশটাকে ইংল্যান্ডে পাঠানোও হয় একই গাছের তৈরি কফিনে পুরে।'

'কেন?'

'এই গাছের বাকলে ট্যানিং করার জন্য উপযোগী রেসিন আছে। স্থানীয় লোকেরা মমিকরণের জন্যও সেটা ব্যবহার করে।'

ভ্রু কুঁচকে স্তূপ করে রাখা ডালগুলোর দিকে তাকাল গ্রে। এসবই যে ওই বিশেষ ধরনের তাল গাছের, সেটা বাজী ধরে বলতে পারে। হাতিরাও কি একই উদ্দেশ্য ব্যবহার করছে গাছটাকে? এই তথ্যের গুরুত্ব আরও বিশাল, সেটা বুঝতে পারছে গ্রে। কিন্তু কী সেই গুরুত্ব, তা ধরতে পারছে না।

'এরা কী করছে?' জানতে চাইল কোয়ালস্কি।

সঙ্গীর কণ্ঠের ঘৃণা গ্রেকে বাধ্য করল বাচ্চা আর তার মায়ের দিকে নজর ফেরাতে। স্তূপকৃত কবরের ভেতর থেকে একটা হাড়ের টুকরা বের করে এনেছে মা। দেখে মনে হচ্ছে, ওটা মাথার হাড়। আলতো করে হাড়টাকে মাটিতে রেখে

পায়ের চাপে টুকরো টুকরো করে ফেলল। এরপর একটা টুকরা তুলে নিয়ে পুরে দিল মুখের ভেতর! বাচ্চাটাকেও একই কাজ করার জন্য উৎসাহ দিল।

মুখ নড়ছে মায়ের, সম্ভবত মাড়ির দাঁতের নিচে ফেলে চাবাচ্ছে হাড়ের টুকরাটাকে। প্রায় আধ মিনিট ধরে চাবাল সে, তারপর ছোট একটা গোল নুড়ি তার ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে এল। হাড়ের টুকরা ওটা!

পায়ের দিকে তাকাল গ্রে, মাটি ঢেকে আছে চূর্ণ করা হাড়ে। গোল নুড়িতে ভর্তি চারপাশ।

এসব কী?

কি যেন ধরি ধরি করেও ধরতে পারছে না বলে মনে হচ্ছে! গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা চোখের সামনেই আছে, কিন্তু সে সেটাকে ঠিক পাকড়াও করতে পারছে না।

ধাঁধার টুকরা সব হাতেই আছে, ধাঁধাটাকেই দেখতে পাচ্ছি না কেবল।

জায়গাটার দূর প্রান্তের দিকে তাকাল ও। হাড়ের গোরস্তানের সাদাটে আভা এখন নানা রঙে সজ্জিত। ওটার উৎস খুঁজে পেতে একটা মুহূর্ত সময় লাগল গ্রে-র। আকাশের দৃশ্যকে প্রতিফলিত করছে মাটিতে থাকা হাড়।

আকাশের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল ও।

কিছুই বুঝতে পারছে না।

মনে হচ্ছে যেন অরোরার জন্ম হয়েছে এখানে।

যেন ওই অদ্ভুত দৃশ্যের ইঙ্গিত পেয়েই একসাথে চিৎকার করে উঠল হাতিরা। এমনকী বয়োবৃদ্ধ রাণীও তার শুঁড় তুলে বিলাপ করল।

অন্যদের দিকে তাকাল গ্রে।

এই নাটকের কিছুই বুঝতে পারছে না!

রাত ৯:৫৫

সেসনার উন্মুক্ত পার্শ্ব-দরজা দিয়ে আকাশে রঙের নাচন দেখছে ভালিয়া। সবুজ আর নীলের যেন মেলা বসেছে। কী দেখছে তা জানে মেয়েটা, আর্কটিকে এমন অরোরা দেখেছে বহুবার।

দৃশ্যটার পাখায় ভর করে ওকে ছেয়ে বসেছে কুসংস্কার। মনে হচ্ছে যেন অ্যান্টনের তরফ থেকে কোন সতর্কবার্তা এসেছে। ওরই জন্য।

মাথা নেড়ে চিন্তাটাকে সরিয়ে দিল ভালিয়া।

ক্রুগার আর তার দল ওর পাশেই হেলমেট, স্যুট এসব পরে তৈরি। পিঠে বাঁধা আছে প্যারাস্যুট।

‘তৈরি তুমি?’ চিৎকার করে জানতে চাইল সে।

কথা না বলে শুধু বৃদ্ধাঙুল দেখাল ক্রুগার।

সারারাত শিকারের পিছু পিছু এগিয়েছে ওরা, র‍্যাভেনটার ইনফ্রারেড চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি শিকার। নিজেদেরকে ক্যানিয়নের ভেতরে আবদ্ধ করে ফেলেছে তারা। যা মনে হচ্ছে, এক পাল হাতির আবাস ওখানে। ব্যাপারটার অস্বাভাবিকত্ব অনেকটা বাধ্যই করেছে ভালিয়াকে পদক্ষেপ নেবার জন্য।

তবে শিকার যা জেনেছে, তা জানার আগে কাউকে খুন করবে না ওরা।

ওই ক্যানিয়নের উত্তর দিক থেকে নিচু হয়ে এগোবে পাইলট। ক্রুগার আর ওর দলের তিন সৈনিক যার যার এ.কে.৭৪এম. অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে তৈরিই আছে। অস্ত্রটার নিচে আবার রয়েছে গ্রেনেড লঞ্চার। অন্ধকারে অবতরণ করবে ওরা, তবে নাইট ভিশন গগলস থাকবে বলে অসুবিধা হবে না। পিছু পিছু নামবে ভালিয়া নিজে। তবে ওর লক্ষ্য থাকবে ক্যানিয়নের প্রবেশ পথটা দখল করার দিকে। যাতে শিকার পালাতে চাইলেও, সফল না হয়। সাইলেন্সার লাগানো হেকলার অ্যান্ড কচ এম.পি.৭এ১ সাবমেশিনগান রয়েছে ওর সাথে। রাত্রে দেখার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত সাইট আছে বলে অসুবিধা হবে না। চারটা অতিরিক্ত ম্যাগাজিন নিয়ে নামবে ভালিয়া, প্রতিটায় চল্লিশ রাউন্ড করে ধরে।

তবে ওর সেরা অস্ত্রটা বাঁধা রয়েছে কব্জিতে।

আজ রাতে রক্তের স্বাদ গ্রহণ করবে অস্ত্রটা। বিশেষ চিহ্নটা একেবারে হাড় পর্যন্ত গভীর করে আঁকবে ভালিয়া; শিকার বেঁচে থাকতে থাকতে যদি পারে, তাহলে তো আরও ভালো।

নিচু হয়ে গিয়েছে বিমান, যাত্রীদের নামাবার জন্য প্রস্তুত। নিজেও প্রস্তুত বিমানটা, হেলফায়ার মিসাইল দিয়ে ভালিয়া আর ওর দলের পেছনে থাকা সবকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতে পারে।

অরোরা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে ধরেছে, ব্যাপারটাকে আর সতর্কবার্তা হিসেবে নিল না ভালিয়া, নিল আহ্বান হিসেবে।

আরও নিচু হয়ে গেল বিমান, ক্রুগার তাকাল ওর দিকে।

নড করল ভালিয়া।

শুরু হোক নরক যাত্রা

.শিকারের জন্য।

একে একে পাঁচজন মানুষ নেমে পড়ল বিমান থেকে।

ছাব্বিশ

জুন ৩, বিকাল ৫:০১, ই.ডি.টি.
এলেসমেয়ার দ্বীপ, কানাডা

বাতাসে ভাসতে থাকা বিদ্যুতের ফলে পেইন্টারের দেহে সৃষ্টি হচ্ছে শিহরণ। একটা রশি ধরে, নিজেকে খোলা হ্যাচের মুখে ছেড়ে দিল ও। স্থির বিদ্যুত খেলে গেল ওর মাংসপেশি জুড়ে। ব্যথাটা অগ্রাহ্য করে কাজে মন দিল সে।

কার্গো হোল্ডের খোলা মুখ দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশ

আগুন ধরে গিয়েছে যেন তাতে!

বাতাসে ওজন গ্যাসের গন্ধ। দেহের প্রতিটা পশম উঠে দাঁড়িয়েছে। তবে ওর মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে আকাশ। অরোরার দমবন্ধ করা সৌন্দর্য হতবাক করে দিয়েছে ওকে। ছোট ছোট বিদ্যুত-স্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্ছে ওখানে, বজ্রের আলোয় উদ্ভাসিত নিচের মেঘ। বার বার বজ্রাঘাতে কেঁপে কেঁপে উঠছে বিমান। একটা প্যাট অ্যান্ড হুইটি কোম্পানির ইঞ্জিনে ধরে গেল আগুন!

'এখন কী করব আমরা?' পেইন্টারের উল্টো দিকের রশি ধরে ঝুলছে লোডমাস্টার, জানতে চাইল সে।

হোল্ডের দিকে একবার তাকাল পেইন্টার। অ্যালুমিনিয়ামের ক্রেটটার ওপাশে খাড়া করানো অস্থায়ী দেয়াল খসে পড়েছে। বিজ্ঞানীদের দেখা যাচ্ছে এখন, কাজে ব্যস্ত। লোডমাস্টারের প্রশ্নের জবাব খুঁজছে তারা। অ্যান্টনের দুই লোক ব্যস্ত কার্গো নেটে থাকা ক্রেটগুলোকে সামলাবার কাজে। পায়ের কাছে পড়ে থাকা উজ্জ্বল তরলকে পাত্তাই দিচ্ছে না।

আগে তো এই মুহূর্তে বাঁচা নিয়ে কথা .তারপর না ভবিষ্যতের চিন্তা।

বাইরে যেন প্রকৃতি আতসবাজির খেলায় মেতেছে। শত্রু আর মিত্রের মাঝে কোন বিভেদ নেই এখন।

চিৎকার করল পেইন্টার, 'অবস্থা আরও খারাপ হতে চলেছে!'

লোডমাস্টারের নাম উইলেট, কম বয়সী যুবক ও। পেইন্টারের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল সে। যুবকের প্রশ্ন পরিষ্কার টের পেল সিগমা কমান্ডার।

অবস্থা এর চাইতে খারাপ হবে কী করে!

স্টারবোর্ডের দিকে ইঙ্গিত করল পেইন্টার। অন্ধকার মেঘের একটা অংশের ঘূর্ণন ভয় ধরিয়ে দেবে যে-কারও মনে। বিশাল ঘূর্ণিটা যেন শক্তি আর আগুনের তৈরি। ওটার চারপাশে নেচে বেড়াচ্ছে বজ্র। তারচেয়ে ভয়ঙ্কর কথা, উপরে অবস্থিত বোরিয়ালিস ইঞ্চি ইঞ্চি করে নেমে আসছে ঘূর্ণির দিকে।

বিগত বেশ কিছুক্ষণ ধরে দৃশ্যটা দেখছে পেইন্টার। মনে হচ্ছে যেন আয়নোস্ফিয়ারে ফাটল ধরেছে, যেকোন মুহূর্তে ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। কারণটাও আন্দাজ করতে পারছে ও। অগ্নিময় আকৃতিটার ঠিক মাঝখানে দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল লালচে আভা।

আভাটা বড় পরিচিত পেইন্টারের।

আগেই সন্দেহ করেছিল, ক্ষতিগ্রস্ত ক্রেট থেকে বিষাক্ত তরল বেরিয়ে প্রবেশ করেছে বায়ুমন্ডলে।

এখন তার প্রমাণ পেল।

প্রতিটা কণাকে মানসচোখে ও দেখতে পেল সুপারকন্ডাকটার হিসেবে। কালো মেঘের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অপরিসীম শক্তি বের করে আনছে ওগুলো। একটা চেইন রিঅ্যাকশনের জন্ম দিয়েছে ওরা, যেটা ছড়িয়ে পড়ছে বাইরের দিকে। অতি সত্বর হাজারো পারমাণবিক বোমার শক্তি নির্গত করবে।

লোডমাস্টারের দিকে ফিরল পেইন্টার। 'তোমার পাইলটকে বলো, ওই ঘূর্ণি থেকে দূরে নিয়ে যায় যেন এই বিমানটাকে।'

যত জলদি সম্ভব

মাথা ঝাঁকাল উইলেট, দৌড়ে গেল সামনের দিকে।

দম বন্ধ করে চেয়ে রইল পেইন্টার, তবে কিছুক্ষণের মাঝেই নাক ঘুরল বিমানের।

এ যাত্রা বেঁচে-

পোর্টের দিকের মেঘ থেকে একেবারে আচমকা জন্ম নিল আগুনের এক নতুন স্তম্ভ। বিমানটা ওদিকেই যাচ্ছিল। সংঘর্ষ এড়াবার জন্য দ্রুত বিমানটাকে ঘোরাতে চাইল পাইলট। কিন্তু বিশাল যন্ত্রটাকে পাখার উপর ভর করে ঘোরানো কী এতটাই সহজ? ছিঁড়ে গেল কার্গো নেট। ক্রেটের নিচে গিয়ে পড়ল অ্যান্টনের এক লোক।

আগুনকে এড়াবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে গ্লোবমাস্টার, সেই ফাঁকে নতুন হুমকির দিকে তাকাল পেইন্টার। এটার উৎস কই, তা সে জানে।

অরোরা স্টেশন।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল পেইন্টার।

হারামজাদা কী ভেবে করল কাজটা?

বিকাল ৫:১২

'আমাদের আর কোন আশা নেই।' ফিসফিস করে বলল সাইমন হার্টনেল।

কন্ট্রোল স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে ও। জাহাজ ডুবলেও যেমন ক্যাপ্টেন জলযানকে পরিত্যাগ করে না, তেমনি সে-ও অরোরাকে পরিত্যাগ না করার ব্যাপারে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এদিকে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে স্টেশনের সব অ্যালার্ম, সবাইকে পরিত্যাগের নির্দেশ দিচ্ছে সে। মনিটরে দেখতে পাচ্ছে সাইমন, স্নো-ক্যাট আর স্নো-মেশিনগুলো ছুটে পালাচ্ছে। দৌড়েও পালাচ্ছে অনেকে, ভয়ার্ত অবয়বগুলোর পরে থাকা পার্কা উড়ছে পতপত করে।

কয়েকজন শুধু রয়ে গিয়েছে স্টেশনে, সাহায্য করছে সাইমনকে।

দৌড়ে এল ড. কাপুর, চেহারা ঘামে ভিজে জবজব করছে। 'বেশি হয়ে গিয়েছে।' মাথা নাড়ল সে। 'ধরে রাখতে পারবে না। বন্ধ করে দিতে হবে যন্ত্র।'

'নাহ, ধরে রাখতেই হবে।'

পায়ের নিচে প্রবল কম্পন অনুভব করল সাইমন। চোখের সাথে গগলস শক্ত হয়ে এঁটে আছে। বিশাল টাওয়ারটার দিকে চাইল সে, যেন ইচ্ছাশক্তি দিয়েই খাড়া রাখবে ওটাকে। নীলচে আগুন নেচে বেড়াচ্ছে ঘূর্ণায়মান সুপারকন্ডাকটর জুড়ে, যেটার বিস্তৃতি একেবারে গর্ত পর্যন্ত। ওটার মেঝে রূপ নিয়েছে প্লাজমার সাগরে। মোটা গ্লাস ভেদ করেও গায়ে এসে লাগছে ফার্নেসের উত্তাপ।

সাইমন জানে নিচের শক্তিটুকু আসলে পৃথিবীর ভেতর থেকে উঠে আসা শক্তির একটা অংশ কেবল। পরীক্ষামূলকভাবে ফায়ার করার সময়ও এমনটা হয়েছিল, তাই বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছে আগেই। কাপুরের দলের সঙ্গে থেকে ও নিজে যেসব সমস্যা হতে পারে, তা নিয়ে ভেবে রেখেছিল আগে থেকেই। অনেক হিসাব নিকেষের পর একটা সমাধানে উপনীত হয়েছে ওরা।

টেসলার ডিজাইন অনুসরণ করে ওয়ার্ডেনক্লাইফ টাওয়ারটাকে শুধু শক্তি পরিবহণের জন্যই নয়, শক্তি সংগ্রহ করার জন্যও তৈরি করা হয়েছে। টেসলার স্বপ্ন ছিল সহস্র এমন টাওয়ার তৈরি করা যেগুলো বিশ্বকে ঘিরে থাকা একটা শক্তির সমুদ্রে শক্তি দিতে পারবে। সেই সাথে প্রতিটা যেন সেই শক্তি সমুদ্র থেকে শক্তি শুষে নিতে পারে, সেদিকেও মনোযোগ দিয়েছিলেন তিনি। এতে করে সবার জন্য নিশ্চিত হবে শক্তির বন্টন।

ভবিষ্যতের কথা ভেবে, সাইমনও তাই করেছে।

এখনও সেটাই করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

কাপুর আর ও মিলে টাওয়ারের প্রান্তিকতা উলটে দিয়েছে, এর আগে এমনটা করেনি ওরা। কিন্তু এখন আর কোন উপায়ও নেই। দেখতে একই মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে সেটা শক্তি ছুঁড়ছে না আর। উল্টো শুষে নিচ্ছে শক্তি।

ওর টাওয়ার এখন পরিণত হয়েছে লাইটনিং রডে।

তবে এই শক্তিকে তো কোথাও না কোথাও পাঠাতে হবে, তাই না? আবারও টেসলায় খুঁজতে হলো তার উত্তর। টাওয়ারটা বানাবার সময়, নিচের শক্ত পাথরে গেঁথেছিল সেটার ভিত্তি। স্থাপত্য-বিদ্যার প্রয়োজনীয়তার জন্যই কাজটা করেছিল সে। কিন্তু ব্যাপারটার সাথে টেসলার ডিজাইনের তিনশো ফুট পাইলিঙয়ের মিল দেখে চমতকৃত হয়েছিল।

টেসলা চেয়েছিলেন সেই পাইলিং ব্যবহার করে পৃথিবীর ভেতরে শক্তি পৌঁছে দিতে। এতে করে সারা দুনিয়ায় পৌঁছে দেয়া যেত সেই শক্তি।

টেসলা পারেননি, কিন্তু তার যুক্তিতে কোন ভুল ছিল না।

সাইমন এখন চাইছে আকাশের আগুনকে টেনে এনে পৃথিবীর গভীরে পৌঁছে দিতে। ওর আশা, শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীর দুই স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে। উপরে আয়নোস্ফিয়ার আর নিচে পৃথিবী।

সে চেয়েছিল ওর টাওয়ারটাকে বিশাল একটা টেসলা কয়েল হিসেবে ব্যবহার করে আকাশের সাথে মাটির সংযোগ ঘটাবে। উপরের আগুনের সাথে দেখা করিয়ে দেবে জমিনের শক্তির। কপাল ভালো হলে, একটা ভারসাম্যে এসে পৌছাবে দুই শক্তি।

কিন্তু কপালটা যে ওর ভালো নয়।

কেঁপে উঠছে পায়ের নিচটা, প্রবল এক কম্পন ওকে ছুঁড়ে দিল কনসোলের উপরে। কাচ ভাঙার আওয়াজ শোনা গেল। কুঁকড়ে গেল সাইমন, ধরেই নিয়েছে যে টাওয়ারের দিকে মুখ করে থাকা খোলা জায়গাটার কাচ ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু না, ডান দিকে বিশাল কাচের আস্তরণগুলো আছড়ে পড়েছে এই মুহূর্তে। ওগুলো কী ঢেকে রেখেছিল, তা পরিষ্কার মনে আছে সাইমনের। অন্ধকার ডোবাটার চিত্র ভেসে উঠল ওর মনে।

'স্যার!' চিৎকার করে সমাগত বিপদটার প্রতি ওর মনোযোগ টেনে আনল কাপুর। 'বন্ধ করে দিতে হবে। ভোল্টেজ খুব বেশি ওঠা-নামা করছে, প্লাজমার স্রোত যাওয়া-আসা করছে দুই দিকেই।'

'আমরা কি সেটাই চাই না?' প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল সাইমন। 'আমরা তো ধরেই নিয়েছিলাম, এরকম কোন সংযোগ স্থাপিত হলে একটা ভারসাম্য আসবে।'

মাথা নাড়ল কাপুর, 'আপনি বুঝতে পারছেন না।'

'তাহলে বোঝাও।'

'দুই শক্তির স্রোত ' বোঝাবার মতো শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না বিজ্ঞানী, হাত দিয়ে দেখাচ্ছে তাই। 'একটা উপরে যাচ্ছে আর আরেকটা নিচে নামছে। ওদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আর শক্তি এক। তাই একে অন্যের উপর সুপারইম্পোজ হতে শুরু করেছে। সংস্পর্শে আসা মাত্র একটি স্রোত বাড়িয়ে দিচ্ছে অন্যটির তীব্রতা।'

হাঁ করে শ্বাস নিল সাইমন, পরিস্থিতির ভয়াবহতা এতক্ষণে বুঝতে পারছে। 'তাহলে স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তৈরি হবে তো!'

কল্পনার চোখে শক্তির একটা কম্পনরত সুতা দেখতে পেল ও, আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝখানে চিরস্থায়ী যোগসূত্র স্থাপন করেছে ওটা।

টাওয়ারের দিকে ভয়ার্ত চোখে চেয়ে রইল কাপুর। 'বিশাল একটা সার্কিট হবে!'

সামনের দিকে লাফ দিল সাইমন। এতবড় একটা সার্কিট বেশিক্ষণ টিকবে না। শর্ট-সার্কিট হবেই, হলে আর দেখতে হবে না। আসমান ও জমিন, দুটোই ধ্বসে পড়বে।

চাবি ঘুরিয়ে বিদ্যুতের প্রবাহ বন্ধ করে দিল সে, এতেই সবকিছু বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা।

কিন্তু হলো না।

আরও কয়েকবার চেষ্টা করল ও, লাভ হলো না কোন।

'নিজেই নিজের শক্তি জোগাড় করছে টাওয়ারটা,' এক পা পিছিয়ে এল কাপুর। 'সার্কিটটা পুরো হয়ে গিয়েছে।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল সাইমন।

আমরা দেরি করে ফেলেছি।

বিকাল ৫:১৮

'দাঁড়াও!'

জন'স আইল্যান্ডের দূরের পাশটা ধরে প্রচন্ড গতিতে ছুটে যাচ্ছে স্নো-ক্যাট। লেক হ্যাযেনের বরফ থেকে উঁকি দিচ্ছে কালো পাথরের চাঁই। দেখে মনে হচ্ছে, আর্কটিক-সমুদ্রের ভেতর থেকে মাথা-চাড়া দিয়েছে কোন সাবমেরিন। পার্থক্য কেবল একটাই, এই সাবমেরিন চার মাইল লম্বা আর আধ মাইল চওড়া।

শক্ত হয়ে প্যাসেঞ্জারের সিটে বসে রয়েছে তাগাক। ওর বাবা, জন রয়েছে পেছনে। দু'জনের হাতেই রাইফেল।

গত পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে অ্যান্টনের লোকদের সাথে লুকোচুরি খেলছে ক্যাট। প্রথমে ভেবেছিল, স্নো-ক্যাটটা নিয়ে শত্রুদেরকে সাফিয়া আর অন্যদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেবে ও। কিন্তু দুই ইনুইট সে কথা কানেই তুলল না। ভয় দেখাবার জন্য সংক্রমণের কথাও বলল। জন সেসব পাত্তা না দিয়ে ছেলেকে নিয়ে উঠে বসেছিল স্নো-ক্যাটে।

কপাল ভালো ক্যাটের যে ওরা ভয় পায়নি!

ঝড় আরও তীব্র রূপ ধারণ করেছে। এতে অবশ্য গা-ঢাকার দেবার জন্য সুবিধাই হয়েছে ক্যাটদের। তবে দুই ইনুইটের এখানকার হ্রদ আর দ্বীপ সম্পর্কিত জ্ঞানের জন্যই এতক্ষণ টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে ও। শুরুতেই স্নো-ক্যাটের আলো ব্যবহার করে শত্রুপক্ষের নজর নিজের দিকে টেনে নিয়েছে মেয়েটা। বরফের মাঝে লুকিয়ে থাকা তিনটা চামড়ার তাঁবুর উপর শত্রুর নজরই পড়েনি।

দ্বীপে পৌঁছাবার পর, হেডলাইট বন্ধ করে দেয় ক্যাট। পরিণত হয় শিকার এবং শিকারিতে। এরপর হওয়া গেরিলা যুদ্ধ দুই পক্ষের কাউকেই বাড়তি কোন সুবিধা দেয়নি। স্নো-ক্যাটের উইন্ডশীল্ডে দুটো বুলেটের গর্ত দেখা যাচ্ছে। ক্যাট জানে, বিনিময়ে ও নিজেও তিনটা স্নো-মেশিনের দফারফা করেছে।

আচমকা পরিস্থিতি পট পরিবর্তন করল।

'যাও, জলদি যাও!' লেকের বরফে গাড়ির চাকা আঁটকে যেতেই বলে উঠল তাগাক। দুই দিক থেকেই ছোট ছোট অনেকগুলো আলোকবিন্দু ছুটে আসছে ওদের দিকে। শত্রুপক্ষের বাহনগুলো অনেক বেশি দ্রুত। তবে আসল বিপদটা ওদের দিক থেকে নয়।

আকাশে নিচু হয়ে নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে বজ্র। চারিদিকে নেচে বেড়াচ্ছে সে, বরফের উপর আছড়ে পড়ছে প্রচন্ড আক্রোশে। বিশাল সব ফাটল ধরেছে বরফে। মাথার উপরে ঘুরতে শুরু করেছে মেঘদল।

শাখের করাতের মধ্যে পড়েছে স্নো-ক্যাটটা।

তারচেয়ে বড় বিপদের কথা, মেঘটা যেন লালচে আভায় জ্বলজ্বল করছে। মনে হচ্ছে বুঝি কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওটার অভ্যন্তরে!

সম্ভবত ধারণাটা সত্যি, ভাবল ক্যাট।

ঝড়ের কাছে পৌঁছে গেল ক্যাট, পৌঁছাল অ্যান্টনের লোকরাও। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল ওরা, শিকারের কথা ভুলে গিয়েছে, এখন যে করেই হোক পালাতে চাচ্ছে।

সাফিয়া আর রোরির কাছে পৌঁছাতে হবে ক্যাটের, ওদেরকে নিয়ে পালাতে হবে উপত্যকা ছেড়ে।

আচমকা খানখান শব্দে ভেঙে গেল পেছনের জানালা। আঁতকে উঠল জন, কান আঙুল দিয়ে ঢাকবার প্রয়াস পেল।

'মাথা নিচু করো!' চিৎকার করে উঠল ক্যাট।

তাগাক পেছনে গিয়ে যোগ দিল বাবার সাথে। রাইফেলটাকে জানালার গর্ত দিয়ে বের করে আন্দাজে গুলি ছুঁড়ল।

এদিকে গতি বাড়িয়ে দিয়েছে ক্যাট, বজ্রপাতের চমক ওর রেটিনায় ছাপ ফেলে দিচ্ছে। আচমকা ভাঙা বরফে চাকা পড়তেই একপাশে কাত হয়ে গেল স্নো-

ক্যাটটা। কিন্তু গতি কমালো না ক্যাট, অনেকটা টেনে-হিঁচড়েই উঠে এল শক্ত বরফের উপর।

আন্দাজে এখনও গুলি ছুঁড়ছে তাগাক। কিন্তু অন্ধকারে ছুটছে অ্যান্টন, আলো জ্বালেনি। ক্যাট জানে, রাশিয়ান লোকটা পিছু ছাড়েনি। এই ঝড়ের মাঝে আর কে একগুঁয়ের মতো ধাওয়া করবে?

আচমকা ওর ডান দিকের বরফে কিছু একটা প্রবল শক্তিতে আঘাত হানল। এতটাই জোরে হলো বিস্ফোরণ যে কেঁপে উঠল স্নো-ক্যাট। প্রথমে মেয়েটার মনে হলো, কেউ সম্ভবত মর্টার ফেলেছে। পরক্ষণেই আকাশ যেন উগড়ে দিল তার সব ক্রোধ।

বরফের বড় বড় চাই আছড়ে পড়ল হ্রদের উপর, কুমড়ার মতো বড় বড় শীল নেমে আসতে শুরু করল। সেগুলোর তীব্রতায় বাহনটার ছাদ পর্যন্ত বসে যেতে শুরু করল।

গতি কমাবার সাহস হলো না ক্যাটের।

অনেকক্ষণ পর শিলাবৃষ্টির এলাকা থেকে বেরোতে সক্ষম হলো ক্যাট, কিন্তু তাই বলে বজ্র আর বরফের টুকরা ওর পিছু ছাড়ল না। গতি না কমিয়ে ছুটতে থাকল সে।

রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকাতেই, ঝড়ের মধ্যে পরিবর্তন দেখতে পেল ও। একটু আগের তীব্র আগ্রাসনের ফলে, ওটা যেন কিছুটা হলেও শক্তি হারিয়েছে। ঘূর্ণায়মান মেঘ খণ্ড খণ্ড হয়ে, সেই ফাঁকে উঁকি দিয়েছে আকাশ। নীল আসমানে এখনও প্লাজমার রাজত্ব। তবে বজ্রের প্রকোপ কমেনি। আকাশকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চাইছে যেন তা। ক্যাটের মনে হলো, নানা দুনিয়ার মাঝে থাকা পর্দা সরে গিয়েছে। এক টুকরা নরক দেখতে পাচ্ছে ও।

বাইবেলে বর্ণিত সেই সপ্তম প্লেগের কথা মনে পড়ে গেল ওর: আসমানের দিকে লাঠি তুলে ধরলেন মোজেস। প্রত্যুত্তরে শিলা, বজ্র আর আগুন পাঠিয়ে দিলেন প্রভু।

বজ্রের লকলকে জিহ্বা, বরফের বিস্ফোরিত রাগ আর আকাশে নেচে বেড়ানো আগুন দেখতে পেল ক্যাট।

এ আমি কী দেখছি?

আস্তে আস্তে আবার বন্ধ হয়ে গেল মেঘের ভেতরের ফাঁকা স্থানগুলো। এখন আরও বেশি ঘন কালো মনে হচ্ছে। লালচে আভা কমেনি একবিন্দু।

'সাবধান!' পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল তাগাক।

রিয়ারভিউ মিররের উপর থেকে নজর সরিয়ে সামনের দিকে তাকাল ক্যাট।

সামনের বরফেও প্রায় একই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, তবে এই দৃশ্য আরও বেশি আধি-ভৌতিক। ছোট ছোট অবয়ব নেচে বেড়াচ্ছে ওর সামনে। তাদের খুরের শব্দ ঢাকা পড়ে গিয়েছে ঝড়ের উন্মত্ত চিৎকারে। সামনে ছুটতে থাকা ক্যারিবুর পালটাকে দেখে মনে হচ্ছে বুঝি অবাস্তব কোন শিল্পকর্ম।

কিন্তু না, ওগুলো কোন অবাস্তব দৃশ্য নয়।

আচমকা একটা বড় হরিণ এসে উপস্থিত হলো স্নো-ক্যাটটার সামনে। ওটাকে বাঁচাতে ক্যাট ঘুরিয়ে দিল বাহনটার নাক। পশুটা বিনা আঁচড়ে পার হলো বটে, কিন্তু স্নো-ক্যাট পুরো তিনশো ষাট ডিগ্রী ঘুরে গেল।

প্রাণপণে স্টিয়ারিঙয়ের সাথে লড়াই শুরু হয়ে গেল ক্যাটের, বুকের ভেতরে হৃদপিন্ড শুরু করেছে উথাল-পাথাল নাচন।

আচমকা চামড়ার তাঁবুটা নজরে পড়ল ক্যাটের।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

লক্ষ্য খুঁজে পেয়ে, সেদিকে চলতে শুরু করল ও। কিন্তু আগ্রহের আতিশয্যে মিস করে বসল বরফের ফাটল। ফাটলের ভেতর পড়ে গেল গাড়ির দেহ। এবার আর গতি পক্ষে নেই ক্যাটের যে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে আসবে। আস্তে আস্তে বাঁকা হতে শুরু করল বাহনটা।

'বেরোও!' দরজার দিকে ইঙ্গিত করে যেন চিৎকার ছাড়ল ক্যাট।

তাড়াহুড়ো করে ওটার দিকে এগোল সবাই। ক্যাট যখন বের হয়েছে, তখন প্রায় ডুবে গিয়েছে স্নো-ক্যাটটা। দরজার উপরে পা রেখে লাফিয়ে বরফের উপর নেমে এল ও। প্রায় সাথে সাথেই ডুবে গেল বাহনটা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জন, 'এরচাইতে স্লেজ ভালো।'

আপত্তি করল না ক্যাট।

নিজেদেরকে একটু সামলে নিয়ে, তাঁবুর দিকে রওনা দিল ওরা। পঞ্চাশ গজের মতো গিয়েছে কি যায়নি, এমন সময় হালকা আওয়াজ ভেসে এল বাঁ-দিক থেকে। হেডলাইটের আলো নিভিয়ে, ঝড় ভেদ করে ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে একটা স্নো-মেশিন।

'দৌড়াও!' সামনের দিকে ইঙ্গিত করে বলল ক্যাট। মনে আশা, হয়তো ওদেরকে দেখতে পায়নি ওই স্নো-মেশিনের আরোহী। ডুবন্ত স্নো-ক্যাট থেকে পালাবার তাড়াহুড়োয়, অস্ত্রের কথা ভুলে গিয়েছে ওরা। এখন প্রার্থনা একটাই, কোনক্রমে যদি চামড়ার তাঁবুতে পৌছানো যায়, আর সেই সাথে যদি শত্রুর চোখে ধরা না পড়ে

পরস্পরের সাথে প্রায় লাগোয়া অবস্থায় এগোল ওরা, যেন কারও নজরে না পড়ে।

ইঞ্জিনের আওয়াজের আশঙ্কায় কান পেতে আছে ক্যাট। কিন্তু স্নো-মেশিনের পাশাপাশি কাছিয়ে এসেছে ঝড়ও। তাই পেল না কিছু। কপাল ভালো, বিনা সমস্যায় সাফিয়াকে রেখে আসা তাঁবুর কাছে পৌঁছে গেল ওরা।

তবে পর্দার দিকে হাত বাড়িয়েছে কি বাড়ায়নি, গর্জে উঠল একটা বন্দুক। সাথে সাথে ঘুরে তাকাল সে।

পাশের তাঁবুর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল অ্যান্টন, সেই সাথে পার্কা পরিহিত আরও একজন। দু'জনের হাতেই অ্যাসল্ট রাইফেল। নিশ্চয়ই স্নো-মেশিন অন্য কোথাও রেখে ওঁত পেতে ছিল তারা।

দুই ইনুইটকে আদেশ করল অ্যান্টন, 'হাঁটু গেঁড়ে বসো, মাথার উপরে হাত থাকবে।'

ইতস্তত করল দু'জন, কিন্তু ক্যাটের ইঙ্গিতে মেনে নিল আদেশ।

অ্যান্টনের সঙ্গী ওদের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

'রোরি, বেরিয়ে এসো!' ডাকল অ্যান্টন।

তাঁবুর পর্দা সরিয়ে বের হয়ে এল যুবক, ক্যাটের দিকে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে তাকাল একবার। রোরির পরনে একটা নতুন পার্কা।

'আমি দুঃখিত,' নিচের দিকে চেয়ে বলল সে। 'আচমকা ঘিরে ধরেছিল আমাদেরকে। এসব ঘটুক, তা আমি চাইনি।'

চাইনি তো আমিও

কিন্তু ছেলেটার পার্কা দেখে বোঝা যাচ্ছে, চলে যাবার জন্য প্রস্তুত সে।

'সাফিয়ার কী খবর?' জানতে ক্যাট।

ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল রোরি। 'খুব খারাপ। ঝড় যত বাড়ছে, তত খারাপ হচ্ছে ওর অবস্থা।'

কথাটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, খুলে গেল তাঁবুর পর্দা। রোরি আর অ্যান্টনের মাঝে টলতে টলতে এসে দাঁড়াল সাফিয়া। ওর দৃষ্টি উত্তর দিক থেকে ধেয়ে আসা ঝড়ের দিকে। এক মুহূর্তের জন্য ক্যাটের মনে হলো, জ্বলজ্বল করে জ্বলছে মেয়েটার চোখ দুটো।

এক হাত আকাশের দিকে তুলে ধরল মেয়েটা।

এরপর সব ঘটনা যেন ঘটতে শুরু করল অতি ধীরে।

ক্যাটের পেছনে দাঁড়ান প্রহরী নিশ্চয়ই ভেবেছিল, সাফিয়া অস্ত্র বের করতে যাচ্ছে। গুলি ছুঁড়ল সে। এদিকে রোরি ওকে দেখতে পাচ্ছিল বলে চিৎকার করে নিজেকে সাফিয়ার সামনে ছুঁড়ে দিল ও। 'না!'

এদিকে অ্যান্টনের শরীর যেন অবচেতনভাবেই সারা দিল, গিল্ডের প্রশিক্ষণ ভুলে যায়নি ওর দেহ। রোরির সামনে চলে এল ও, দ্বিতীয় প্রহরীর দিকে পিঠ দিয়ে ছিল বলে সরাসরি শিরদাঁড়ায় এসে লাগল গুলি। রোরির বাড়ানো হাতে ধরা পড়ল ও।

উভয়ে মাটিতে পড়ে যেতেই, নিচু হয়ে লাফ দিল ক্যাট। অ্যান্টনের অস্ত্রটা আঁকড়ে ধরে ঘুরে দাঁড়াল। গুণে গুণে তিনটি গুলি ছুঁড়ল সে।

একটা লাগল প্রহরীর গলায়, গলার প্রায় পুরোটাই খুইয়ে বসল বেচারা।

পুরো ঘটনা ঘটতে সময় লাগল মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড।

মাত্র একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও।

সাফিয়া .এক মুহূর্তের জন্যও ওর চোখ সরেনি আকাশ থেকে।

কথা বলে উঠল সে, যেন ঝড়কেই শোনাচ্ছে, 'অসম্ভব .এমনটা হতেই দেয়া যাবে না

বিকাল ৫:৩২

মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে যেন আগুন ধরে গিয়েছে ওর। দুইজোড়া চোখ দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ও।

একজোড়া পুরাতন, একজোড়া নতুন।

ঠান্ডা একটা ঝড়কে উত্তপ্ত মরুভূমি পাড়ি দিয়ে রক্ত লাল নদীর দিকে এগোতে দেখেছে ও। দেখেছে একটা জমাটবাঁধা হ্রদ, যেটা তার উপরে উড়তে থাকা আগ্নেয় ঝড়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শুয়ে আছে। দুইটি দৃশ্যই কাঁপতে কাঁপতে একে অন্যের উপর বসে যেতে চাইছে . .যেন যুদ্ধে মেতেছে আগুন আর বরফ।

কিন্তু সেদিকে নজর নেই মেয়েটির, এসব কিছুই যে বাহুল্য তা সে ভালো করেই জানে।

ওর নজর আরও সামনের দিকে। সামনে কোথাও উজ্জ্বল কোন আলো ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

থামাতেই হবে।

বিকাল ৫:৩৩

'আমাদেরকে কী করতে বলছ?' অবিশ্বাসের সুরে জানতে চাইল পেইন্টার।

পাইলট আর লোডমাস্টারের সাথে ফ্লাইট ডেকে বসে আছে সে। লোডমাস্টার আবার কো-পাইলট হিসেবেও কাজ করছে। ওদের পেছনে অবস্থিত সিঁড়ির গোড়ায় ভর করেছে অন্যান্যরা, বসের কথা শুনছে রেডিয়োতে।

'অরোরায় ক্রাশ ল্যান্ড করাতে হবে জেটটাকে,' বলল হার্টনেল, ভয়ের আভাস পরিষ্কার শোনা গেল লোকটার কণ্ঠে। 'সরাসরি টাওয়ারে।'

ফ্লাইট ডেকের জানালা দিয়ে জ্বলন্ত প্লাজমার স্তম্ভের দিকে তাকাল পেইন্টার। কী হয়েছে, তা এরইমাঝে জানিয়ে দিয়েছে হার্টনেল। ব্যর্থতার পাশাপাশি ওর পরিকল্পনা যে আরও বড় এক ঝামেলার সৃষ্টি করেছে, তা-ও জানিয়েছে। সাইমনের বলা সার্কিটটা কল্পনার চোখ দেখল সিগমা ডিরেক্টর। একেবারে খুঁটিনাটি বুঝতে না পারলেও, মোদ্দাকথা ঠিক ধরতে পেরেছে।

হার্টনেল আর কাপুর অনেক চেষ্টা করেও সার্কিটটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি, তবে একটু সময় এনে দিতে পেরেছে। কথাটার সত্যতা বোঝার জন্য বাইরে একনজর তাকানোই যথেষ্ট। আগ্নেয় ঘূর্ণি বেড়েই চলছে ক্ষণে ক্ষণে।

হাজারো পারমাণবিক বোমার সমপরিমাণ শক্তি নিজের মাঝে বহন করে চলছে ওটা।

ওটা যদি সার্কিটের সংস্পর্শে আসে, তাহলে আর দেখতে হবে না।

পেইন্টারের হিসাবমতো, বড়জোর আর বিশ মিনিট আছে হাতে।

তর্ক করার সময় নেই।

'ঠিক আছে, আমরা করব কাজটা।' বলল ও।

পাইলট ওর দিকে তাকাল একবার, লোকটার চেহারা ভয়ে সাদা। সে-ও বুঝতে পারছি, যান্ত্রিক পাখিটাকে কারও না কারও চালিয়েই ক্রাশ ল্যান্ড করাতে হবে। বাইরে যে ঝড় চলছে, তাতে অটো ল্যান্ডিং সম্ভব হবে না।

আর একটাই মাত্র সুযোগ মিলবে তাদের।

পাইলটের পাশে লাগিয়ে রাখা ছবিগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে পেইন্টার: হাস্যরত এক স্ত্রী আর দুইটি বাচ্চার ছবি। লোকটার কাঁধে চাপ দিল ও। 'আমি করছি।'

ভ্রু কুঁচকে তাকাল পাইলট। 'আগে কখনও সি-১৭ গ্লোবমাস্টার চালিয়েছ?'

'এত বড়টা চালাইনি। কিন্তু আমার তো আর এটাকে ল্যান্ড করাতে হবে না। আঘাত করতে হবে ওই টাওয়ারে।'

সন্দিহান দেখাল পাইলটকে, মনে হলো বুঝি পেইন্টারের সাথে তর্ক করব। শক্ত হয়ে এল ওর চেহারা। 'তোমাকে একেবারে প্রাথমিক কিছু বিষয় শিখিয়ে দেই। যদি মনে হয় যে পারবে না, অথবা আমার মনে হয় যে তোমাকে দিয়ে হবে না, তাহলে আমিই পাখিটাকে নিচে নামাব।'

'ঠিক আছে।' থ্রটলের দিকে ইঙ্গিত করল পেইন্টার। 'ওটা দিয়েই তো প্লেন নাড়ায়, তাই না?'

পাইলটকে হতাশ দেখাল।

হ্যাসল পেইন্টার। 'ওটা থ্রটল। ওইটা এইচ.ইউ.ডি., আর ওটা হলো পি.এফ.ডি। চলবে?'

ঘোঁত করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল পাইলট। 'হুম। চলো, কাজে নামা যাক।'

কালক্ষেপণ না করে প্লেনের সবাই পালাবার পরিকল্পনা বানিয়ে ফেলল। পাইলট ব্যস্ত অরোরার দিকে যাবার সেরা পথটা বেছে নিতে। ঝড়ের অংশটায় পাইলট নিজেই চালাবে বিমান। এরপর একটু শান্ত বাতাসে নামলে, বিমানটাকে সোজা করে সবাইকে প্যারাস্যুট ব্যবহার করে পালানোর সুযোগ দেয়া হবে। সব শেষে বিমান ছাড়বে পাইলট নিজে। বাকিটা পেইন্টারের হাতে।

এখন পরিকল্পনা কাজে দিলে হয়।

'সবাই শক্ত হয়ে বসো,' রেডিয়োতে সবাইকে জানিয়ে দিল পাইলট। 'আমরা নিচে নামছি।'

উইলেটের পেছনের সিটে বসে রইল পেইন্টার। সামনের দৃশ্যগুলো মোটামুটি দেখতে পাচ্ছে।

খাড়া নিচের দিকে নামতে শুরু করল বিমান। ডান দিকে আগুন আর বাঁ দিকে ঘূর্ণায়মান মেঘ দেখতে দেখতে নামল সে। দুটোর ভেতরে দূরত্ব অনেকটাই কমে এসেছে, এত দ্রুত কমবে তা আন্দাজ করতে পারেনি পেইন্টার। অবশ্য সেটার কারণও ধরতে পারল। আয়নোস্ফেয়ারে চলতে থাকা প্লাজমার ঝড়ের অবনতি হয়েছে। ফুঁসছে অরোরা, জমিনের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে অগ্নি-স্তম্ভ।

এর মাত্র একটাই অর্থ দাঁড়ায়।

সাইমন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে।

পাইলট নিজেও সম্ভবত ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল, আরও খাড়া করে দিল নাকটা। 'শক্ত হয়ে বসো!'

গ্লোবমাস্টারটা কালো মেঘ ভেদ করে নামছে। সিট আঁকড়ে ধরল পেইন্টার। ঝড়ের ভেতর দিয়ে নামতে হচ্ছে বলে, খারাপ হয়ে গেল বিমানের অবস্থা। প্রচন্ড দক্ষতায় নিয়ন্ত্রণ করছে ওটাকে পাইলট। উইন্ডশীল্ডের বাইরে দেখে মনে হচ্ছে, অন্ধকার গিলে খেয়েছে সবকিছুকে। কতক্ষণ ধরে নামছে ওরা, জানে না বেচারা। অবশেষে মেঘ ছেড়ে বেরিয়ে এলো ওরা। বরফ, সাদা হিমবাহ আর কালো পাহাড় দেখা গেল।

বিমানটার নাক এবার সোজা করতে শুরু করল পাইলট। তারপর কিছু সুইচ ঠিকঠাক করে পেইন্টারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার তোমার পালা।'

সিট থেকে উঠে দাঁড়াল পেইন্টার। পাইলটের সাথে স্থান পরিবর্তন করল।

'যাও,' লোকটা যাচ্ছে না দেখে বলল সে। 'সবাইকে সাহায্য করো।'

মাথা নেড়ে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। 'ধন্যবাদ।'

'এখনও ধন্যবাদ জানাবার সময় হয়নি।'

পেইন্টারের কাঁধে চাপড় দিল পাইলট, তারপর চলে গেল ফ্লাইট ডেক থেকে।

আরেক মুহূর্ত অপেক্ষা করল উইলেট। 'সময় কিন্তু বেশি পাবে না।'

'আমি জানি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনের দিকে তাকাল লোডমাস্টার। বিমানের একদম সামনে, নীলচে আলোতে জ্বলছে যেন ঝড়।

'আমার থাকতে আপত্তি নেই।' বলল যুবক, কিন্তু কণ্ঠ শুনেই বোঝা যাচ্ছে- নিজের উপর প্রচন্ড জোর খাটাতে হচ্ছে বেচারাকে।

পেছন দিক দেখাল পেইন্টার। 'মি. উইলেট, আমার বিমান থেকে বিদায় হোন; এটা ক্যাপ্টেনের আদেশ।'

হাসল যুবক। স্যালুট ঠুকে বলল, 'আই, আই, ক্যাপ্টেন।'

উইলেট বেরিয়ে গেলে কানে একটা রেডিয়ো এয়ারপিস ঢোকাল পেইন্টার। কন্ট্রোলের সাথে নিজেকে পরিচিত হয়ে নেবার জন্য সময় দিল এক মিনিট। মাথার উপরে ও চোখের সামনে হাজারো সুইচ রয়েছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র যে হাঁটুর কাছে থাকা স্টিক, সেটা জানা আছে ওর।

আমি পারব।

উইলেটের কণ্ঠ আবার ভেসে এল এয়ারপিসে। 'বাসা ছেড়ে বিনা সমস্যায় চলে গিয়েছে পাখি। বিমান এখন তোমার।'

মনকে অন্য দিকে নেবার জন্য উচ্চতা প্রদর্শক যন্ত্রের দিকে তাকাল ও: বিমানের অবস্থান, গতি আর গতিপথ দেখে নিয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনল কিছু। লক্ষ্যের মাত্র দুই মিনিট দূরে থাকতে হালকা ছাড় দিল থ্রটলে।

অবশেষে, শেষের হোক শুরু

মাইক্রোয়েভ রেডিয়োর একটা সুইচ চাপল পেইন্টার। 'হার্টনেল, শুনতে পাচ্ছ?'

অবাক শোনাল লোকটার কণ্ঠ। 'পেইন্টার? তুমি বিমানটাকে নামাচ্ছ!'

'তোমার ঝামেলা তো কাউকে না কাউকে মেটাতে হবে, নাকি? জানাবার জন্য যোগাযোগ করেছি যে, আর একশো সেকেন্ড দূরে আছি আমি। তাই কাপুরকে নিয়ে শেল্টারে চলে যাও।'

'ড. কাপুরকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখানে কাউকে না কাউকে থাকতে হবে। তোমাকে বাড়তি দুটো সেকেন্ড জোগাড় করে দিতে পারলেও হয়।'

'কতক্ষণ আছে আমার হাতে?'

'যে দুটো সেকেন্ড জোগাড় করে দিতে পারব, সেটা দারুণ কাজে আসবে।'

মনে মনে গাল বকল পেইন্টার, থ্রটলটা ঠেলে দিল সামনে।

যেখানে আছে, সেখান থেকে অ্যান্টেনার অ্যারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নীল হয়ে আছে ওটা শক্তিতে, আলো চড়াচ্ছে। ওটার ঠিক মধ্যখান থেকে উঠে আসছে প্লাজমার স্তম্ভ।

গতি আরও বাড়িয়ে দিল পেইন্টার। গতি কমাবে ভেবেছিল, কিন্তু এখন আর তা করার সাহস হচ্ছে না। বুঝতে পারছে, পালাবার পরিকল্পনা কাজে লাগাতে হবে নিখুঁত দক্ষতায়। এক মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না।

আচমকা চিৎকার করে উঠল হার্টনেল। 'পেইন্টার!'

ও নিজেও দেখতে পেল জিনিসটা। খনির গর্ত থেকে উঠে আসছে প্লাজমার একটা গোলক। যাচ্ছে আয়নোস্ফিয়ারের দিকে। শক্তি এখন আর নিচের দিকে যাচ্ছে না, উল্টে গিয়েছে টাওয়ারের প্রান্তিকতা .যেকোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়বে। আকাশের দিকে আবার নজর গেল পেইন্টারের, সাথে সাথে বুঝতে পারল কারণটা।

আকাশ দখল করে রাখা গ্লাস আকৃতির আগ্নেয় ঝড় এসে হাজির হয়েছে! ওটার বাইরের দিকটা অরোরা স্টেশন থেকে নির্গত হতে থাকা প্লাজমা স্তম্ভকে স্পর্শ করবে যেন।

আর সময় নেই পেইন্টারের হাতে।

নিচের দিকে নামিয়ে দিল ও বিমানের নাক। মিসাইলে পরিণত হলো বিশালদেহী গ্লোবমাস্টার।

এবার জান বাঁচাবার পালা। নড়তে শুরু করেছে, এমন সময় বাতাসের ঝাপ্টা লাগল বিমানটার পাশে। ভাগ্যকে গালি দিয়ে আবার বসে পড়তে হলো ওকে, বিমানটার গতিপথ ঠিক করার প্রয়াসে। বেশ কয়েকটা দামী মুহূর্ত খরচ হয়ে গেল ওর।

অবশেষে সন্তুষ্ট হয়ে, সোজা কার্গো ডেকে চলে এল পেইন্টার। ডেকের উপর ধপধপ শব্দ তৈরি হচ্ছে ওর পায়ের। প্যারাস্যুট নিয়ে এত নিচ থেকে লাফ দেয়া যাবে না, আবার এতটা উপরে আছে যে প্যারাস্যুট ছাড়াও চলবে না।

তাই নতুন এই ফন্দি এঁটেছে সে।

খোলা দরজার কাছে এসে আগে থেকেই তৈরি করে রাখা জিনিসটা নিয়ে পিঠে বাঁধল সিগমা ডিরেক্টর, সেই সাথে আঁকড়ে ধরল একটা অ্যাসল্ট রাইফেল। অস্ত্রটাকে আগেই জায়গামত রেখে দিয়েছিল সে।

হ্যাচের উদ্দেশ্যে নিজেকে প্রায় ছুঁড়ে দিল ও। ঠিক সেই মুহূর্তে বিমানটার দুই পাখা স্পর্শ করল অ্যান্টেনার মাথা, পেট দিয়ে আঘাত হানল সামনে থাকা ইস্পাতের দেহে।

ধুশ, শালা

পেছনে হাত নিয়ে ইনফ্লেশন ট্যাঙ্কের সুইচ চাপল পেইন্টার।

পিঠের ব্যাগে থাকা বেলুনটা সাথে সাথে বেরিয়ে এল, বিমানকে ঘিরে থাকা বাতাসে সংস্পর্শ পেয়ে বেচারাকে পুতুলের মতো টেনে নিয়ে এল বাইরে।

উপরে উঠতে শুরু করল পেইন্টার। এদিকে পেটমোটা গ্লোবমাস্টারটা ছুটছে তার লক্ষ্যে।

বিকাল ৫:৫২

দাঁড়িয়ে রয়েছে সাইমন হার্টনেল।

বিশাল কার্গো জেটটার আগমন বার্তা শুনতে পেয়েছে ও। এখন শুনছে ওটার আছড়ে পড়ার আওয়াজ। টাওয়ারের দিকে নজর দিল একবার, শক্তির প্রচন্ডতায় আগুন জ্বলছে তীব্রভাবে। নিজের ব্যক্তিগত এইচ.এম.এস. এরেবাস বা টেরর বলে মনে হচ্ছে ওটাকে। পেইন্টারের কথা মনে পড়ে গেল তার, মনে পড়ে গেল লোকটার ভর্ৎসনার কথা।

কেউ কেউ ক্ষমতার চাইতে একটু বেশিই চাপ নিয়ে ফেলে।

কিন্তু মানতে পারছে না সাইমন, একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে নিজের মাস্টারপিসের দিকে।

চেষ্টা করে বিফল হওয়াটা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার চাইতে শতগুণে ভালো।

আচমকা বিস্ফোরিত হলো ওর দুনিয়া

.ওর জীবন

.আর ওর স্বপ্নের হলো পরিসমাপ্তি!

বিকাল ৫:৫৩

উপর থেকে গ্লোবমাস্টারটাকে তার লক্ষ্যে আঘাত হানতে দেখল পেইন্টার।

মোটা পেট নিয়ে উজ্জ্বল অ্যারের ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে টাওয়ার মাথায় আছড়ে পড়ল বিশাল বিমানটা। নিজের ওজনের চাপে ধ্বসিয়ে দিল টাওয়ারটাকে, সেই সাথে আগুনটাও নিভিয়ে দিল।

এক মুহূর্তের জন্য ওর রেটিনায় রয়ে গেল সেই প্রতিচ্ছবি, দেখতে পেল প্লাজমার অবশিষ্ট অংশটুকু উড়ে যাচ্ছে আকাশের দিকে। পরক্ষণেই নেই হয়ে গেল তা।

তারও এক মুহূর্ত পর বিস্ফোরিত হলো বিমান। আগুনের বিশাল এক গোলক জন্ম নিল আকাশে, পরিণত হলো ধোঁয়ার স্তম্ভে।

বিপদের আশঙ্কা নেই পেইন্টারের, তবে নিরাপদও নয় এখনও। হাতের অ্যাসল্ট রাইফেলটা নিয়ে গুলি করল মাথার উপরে বেলুনে। দারুণ সাবধানতার সাথে তাক করেছে ও, আস্তে আস্তে বাতাসকে বেরিয়ে যেতে দিচ্ছে। অবশেষে থেমে গেল ওর ঊর্ধ্বগতি, নিচে নামতে শুরু করল। ধুপ করে নামতে হবে বলে ভেবেছিল পেইন্টার, তবে শেষ পর্যন্ত নামল আরামেই।

দলা-পাকিয়ে পড়ে থাকা বেলুনটাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল সিগমা ডিরেক্টর, তবে হাত থেকে অস্ত্র ছাড়েনি। আন্দাজে মনে হচ্ছে, অরোরা স্টেশন থেকে কয়েক মাইল দূরে এসে পড়েছে, পথিমধ্যে কোন মেরু-ভালুক পড়ুক, সেটা চাচ্ছে না।

তারপরও একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল ও, নজর আকাশের দিকে। অ্যারেটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বলে, আকাশের ঝড়টাও আস্তে আস্তে শান্ত হতে শুরু করেছে। হালকা লাল আলোটা আর নেই।

তবে পেইন্টার জানে, আবহাওয়া ঠান্ডা হলেও, এখনও অনেক কাজ পড়ে আছে সামনে। এই পুরোটা দ্বীপ যে কোন পর্যায়ে সংক্রমিত হয়েছে, তা বলার কোন উপায় নেই। আর তাছাড়া, বিদ্যুতের ফলে বাতাসে ছড়িয়ে যাওয়া সব অণুজীব মরে গিয়েছে-সেটার ধরে নেয়া উচিৎ হবে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাটির দিকে মন ফিরিয়ে আনল পেইন্টার, রওনা দিল অরোরার দিকে। পার্কা পরে আছে, তারপরও ঠান্ডা লাগছে খুব। মাথাটা হাতের তালু দিয়ে স্পর্শ করল একবার।

জ্বর এসেছে আমার।

সন্ধ্যা ৬:২৫

'এখন কেমন লাগছে?' জানতে চাইল ক্যাট।

ইনুইটদের চামড়ার তাঁবুতে বসে আছে সাফিয়া। হাতে ধরে আছে মাছের গরম স্যুপ, তাগাক আর জনের সৌজন্যে। 'ভালো।'

আপাতত ওরা ছাড়া আর কেউ নেই তাঁবুতে। রোরি অন্য একটায় আছে। জনও আছে সেখানে, অ্যান্টনকে যতটা আরামে রাখা সম্ভব, রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু বুলেটের আঘাতটা মারাত্মক। বেচারার শিরদাঁড়ায় গিয়ে লেগেছে ওটা, ফলে কোমর থেকে পায়ের নিচ পর্যন্ত অবশ হয়ে গিয়েছে। বের হয়েছে বুক ভেদ করে, কাশির সাথে দমকে দমকে বেরোচ্ছে রক্ত।

মনে হয় না বাঁচবে।

রোরি তা বুঝতে পেরে অন্তিম সময়টুকু একসাথে কাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

'তোমার হয়েছিল কী?' জানতে চাইল ক্যাট। 'স্বপ্ন দেখছিলে?'

'আমারও পুরোপুরি মনে নেই। নাকে এসে লাগছিল পচতে থাকা পশুর গন্ধ, পায়ের নিচে টের পাচ্ছিলাম উত্তপ্ত বালুর উপস্থিতি। কিন্তু শেষের দিকে, মানে পড়ে যাবার ঠিক আগে দেখতে পাচ্ছিলাম আরও শক্তিশালী সব দৃশ্য। মনে হচ্ছিল যেন দুইজোড়া চোখ আমার। একজোড়া দিয়ে দেখছি এখানকার ঝড়, আরেকজোড়া দিয়ে রক্তভরা নীল। একদম বাস্তব মনে হচ্ছিল দৃশ্যটা, এখানকার বরফের মতোই।'

তাঁবুর পর্দার দিকে নজর গেল ক্যাটের, আচমকা শান্ত হয়ে গিয়েছে আবহাওয়া। বজ্রপাত আর শিলাবৃষ্টি, দুটোই কমে গিয়েছে। সাফিয়া বরফে আছড়ে পড়ার মুহূর্ত থেকেই এই অবস্থা।

'রোরি, আর ওর বাবাও, বিশ্বাস করে যে অণুজীবটাই তোমার সব স্বপ্নের জন্য দায়ী।' খুলে বলল ক্যাট। 'সম্ভবত সেই প্রাচীন মিশরের স্মৃতিও তারা নিজেদের মাঝে ধরে রেখেছে।'

শ্রাগ করল সাফিয়া। 'কী জানি! আমার তেমন কিছু মনে নেই!'

'অজ্ঞান হয়ে ছিলে যখন, তখন রোরি প্রাচীন মিশরীয় কপ্টিকে তোমার নাম জিজ্ঞাসা করেছিল। তুমি সেই একই ভাষায় উত্তর দিয়েছিলে-সাবাহ।'

অবাক দেখাল সাফিয়াকে। 'সিংহাসনে বসে থাকা আমির নামও তাই ছিল।' চেহারা স্পর্শ করল সে, কীভাবে সংক্রমিত হয়েছিল তা মনে করছে।

'এখন ভালো লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

বরফে আছড়ে পড়ার কিছুক্ষণের মাঝেই আবার জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল মেয়েটা। হঠাত করে নেমে গিয়েছিল তার জ্বর। ক্যাট ভয়ে ভয়ে ভাবছিল তখনও, মেয়েটা সুস্থ হলো? নাকি আবহাওয়ার এই বিদ্যুতের কারণেই এই অবস্থা। এখনও সাফিয়ার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চায় ও।

আরেকটা প্রশ্ন তাই ঝুলছে ওর সামনে।

এতক্ষণ পার হয়ে গেল, এখনও ও নিজে আর রোরি ভালো আছে কী করে?

গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ধরতে পারছে না ওরা।

আচমকা তাঁবুর পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল রোরি, চোখ ফুলে আছে ছেলেটার।

'অ্যান্টন?' জানতে চাইল ক্যাট।

মাথা নেড়ে মেঝেতে বসে পড়ল রোরি। একা থাকতে চাইছে না এই মুহূর্তে। হতভম্ব দেখাচ্ছে ওকে। কী হারিয়েছে তা বুঝে উঠতে পারেনি এখনও!

'আমি দুঃখিত,' বলল সাফিয়া।

ক্যাট মনের মধ্যে করুণা খুঁজে পাচ্ছে না, কিন্তু একটা কথা মানতেই হবে: সাফিয়াকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল রোরি, তাই ছেলেটার উপস্থিতি সহ্য করছে।

লম্বা করে দম দিল রোরি। 'তোমার জানা দরকার .আমি আগে বলতে পারিনি।'

'কী?' জানতে চাইল ক্যাট।

'তুমি আমাকে মমিটার ট্যাটুতে পাওয়া টপোগ্রাফিক ম্যাপটা নিয়ে গবেষণা করতে বলেছিলে,' সাফিয়ার দিকে তাকাল সে। 'তোমার পদ্ধতি ব্যবহার করে আমি মিশরীয় হায়ারোগ্লিফকে হিব্রুতে পরিণত করেছি। বেশ কিছুদূর এগিয়ে ছিলাম, কিন্তু ' অ্যান্টনের লাশ যেখানে রয়েছে, সেদিকে ইঙ্গিত করল রোরি।

'তারপর?' চাপ দিল ক্যাট। 'কী জানতে পারলে?'

'মমিটাই ছিল প্রতিষেধক।'

ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্যাট। 'কী?'

'মানে ওই দেহটাতেই ছিল প্রতিষেধক, সেই সাথে মাথায় বহন করছিল অণুজীব। তবে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। বাবা বারবার ওই মেয়ের কোষ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন। একবার না, কয়েকবার। কিন্তু অসুস্থ করতে সক্ষম, এমন কিছুই পাননি তিনি। প্রতিষেধক তো দূরের কথা।' ভ্রু কুঁচকে গেল ছেলেটার। 'কিছু একটা ধরতে পারেননি।'

সাফিয়ার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'তবে সাফিয়া কিন্তু এজন্যই আবার সুস্থ হয়ে উঠেছে। সংক্রমণটা ওর দেহে রোগ তৈরি করেছে না, কাজ করেছে টীকা হিসেবে। হয়তো কিছুটা জ্বরে ভুগতে হয়েছে ওকে, কিন্তু বড় ধরনের কোন ক্ষতি করেনি।'

'মমির ট্যাটু থেকেই সবকিছু বুঝে ফেললে?'

'অনেক কিছুই আন্দাজ করে নিতে হয়েছে। তাছাড়া রূপান্তরের কাজও পুরোপুরি শেষ হয়নি। তবে আমার ধারণা, এজন্যই আমরা এখনও পর্যন্ত আক্রান্ত হয়নি। সাফিয়ার সংক্রমণ ছড়াবার ক্ষমতাই নেই।'

মেয়েটার দিকে তাকাল ক্যাট। 'তাহলে তো ওর রক্ত বা দাঁড়ার রস ব্যবহার করে একটা ওষুধ বানাবার চেষ্টা করা যায়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল রোরি। 'জানি না কেন, ওভাবে কাজ হবে না। এটুকু পরিষ্কার বুঝতে পারছি। প্রতিষেধক বা ওষুধ রয়েছে মাত্র একটাই। আর সেটা সরাসরি উৎস থেকেই সংগ্রহ করতে হবে।' ক্যাটের দিকে এগিয়ে এল ও। 'অথচ আমরা সেই উৎসকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছি।'

দৃশ্যটা মনে পড়ল ক্যাটের।

সত্যিই তাই

সাতাশ
জুন ৩, রাত ১০:৫৬ সি.এ.টি.
আকাগেরা ন্যাশনাল পার্ক, রোয়ান্ডা

হাতিদের গর্জন যেন বন্ধ হতেই চাইছে না, উল্টো চারপাশের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলছে শব্দের তীব্রতা।

ওদের অদ্ভুত আচরণে চিন্তিত হয়ে, নিজের দলটাকে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল গ্রে। কে জানে, দলের কারও কোন আচরণে পালটা আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ে কিনা! অবশ্য এহেন আচরণের কারণ আন্দাজ করতে কষ্ট হচ্ছে না ওর। ছোট জায়গাটার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে সাদা ত্বকের রাণী অন্ধ চোখ তুলে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। মনে হচ্ছে যেন আসমান জুড়ে নৃত্যরত অরোরা দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার!

অবশেষে, মিইয়ে আসলে শুরু করল সব চিৎকার-চেঁচামেচি। শক্তির সাদা মেঘ সবগুলো তারাকে যেন গিলে খেল।

শব্দ করে দম ছাড়ল গাইড, মনে হলো বুঝি অনেকক্ষণ ধরে আটকে রেখেছে। 'এমন দৃশ্য এর আগে দেখিনি।' আকাশের দিকে হাত নাড়ল সে। 'মনে হয় না এই হাতির এই পালটা এর আগে এত শব্দ কখনও করেছে। আশেপাশের একশো মাইলের মধ্যে আর কেউ শুনতে বাকি রাখেনি।'

পুরোটা সময় নোয়ার কাছে কাছে রইল রোহো। বোঝা গেল, সুরের এই মূর্ছনা ওর পছন্দ হয়নি। পছন্দ হয়নি আরও একজনের। কোয়ালস্কি কান ঘষতে ঘষতে বলল, 'আর কোনদিন মনে হয় ঠিকমত কিছু শুনতে পাব না।'

জেনের হাত ধরল ডেরেক। 'ওদের গান শুনেছ? মনে হলো না ভয় পেয়ে বা রাগ করেছে।'

'হুম, বরঞ্চ দুঃখ মিশে আছে বলে মনে হলো।' বিড়বিড় করে বলল জেন। 'যেন পুরো পালটা একসাথে দুঃখজনক কোন স্মৃতি মনে করেছে!'

উপরে-নিচে মাথা দোলাল নোয়া। 'ঠিক বলেছ তুমি। আগেও পালের সদস্যকে হারানো হাতির বিলাপ শুনেছি। তেমনটাই মনে হলো আমারও।'

'কিন্তু কী মনে করছে এরা?' আকাশের দিকে তাকাল ডেরেক। 'এদের কেউ ইহজীবনে আগে কখনও অরোরা দেখেছে বলে তো মনে হয় না।'

'হুম, এরা নিজেদের জীবদ্দশায় হয়তো দেখেনি।' জেন আর রোহোর দিকে একনজর তাকিয়ে বলল গ্রে। কেবলমাত্র এই দু'জনকে আলাদা করে নেয়ার দৃশ্যটা

মনে পড়ে গেল। 'তবে সম্ভবত অনেক প্রাচীন কোন স্মৃতির সাথে মিলিয়েছে। হয়তো অনেক আগের কোন দুঃখের স্মৃতি নিজেদের মাঝে বহন করে চলছে-'

ডেরেককে তবুও সন্দিহান দেখাল। 'তোমার মতে-অতি প্রাচীনকালে সিংহসহ এক মহিলা এসে উপস্থিত হয়েছিল এখানে, সেই স্মৃতি এখন ওরা মনে করছে?'

'হুম। বিশাল এক বন্যা হয়েছিল। যে বন্যায় ডুবে গিয়েছিল এই উপত্যকা, অণুজীব ভেসে গিয়ে দুষিত করে তুলেছিল নীল নদের পানি।' হলল গ্রে। 'যদি সেই বন্যার কারণ হয় থেরা আগ্নেয়গিরির হঠাৎ জেগে ওঠা, তাহলে আনুসাঙ্গিক আবহাওয়া পরিবর্তনের মাঝে, অরোরা একটা হতে পারে।'

ওর নজর অনুসরণ করে আকাশের দিকে তাকাল জেন। 'আমরা জানি, থেরা অভূতপূর্ব শক্তির সাথে ফেটে উঠেছিল। কিন্তু তাতে আকাশে পরিবর্তন আসবে কীভাবে?'

'কেননা অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্টি ছাইয়ে থাকে অপরিসীম শক্তি। যদি থেরা থেকে প্রবল শক্তি আকাশের দিকে যায়, তবে এই এলাকায় অরোরা জন্ম নেবার কথা।' কান পেতে বিলাপের শেষটা শুনল ও। 'সেই স্মৃতিই ধারণ করে রেখেছে এই প্রাণিরা। তার সাথে হওয়া সব মৃত্যুর স্মৃতিও।'

সামনের দিকে তাকাল নোয়া। 'তোমার কথা সত্যি হলে, ওই নানা রঙে রাঙানো জঙ্গলের একটা কারণ বুঝে আসে। কে জানে, হয়তো বিশেষ কোন প্রাচীন স্মৃতির পুনরুত্থানের জন্য ওই কাজ করেছিল হাতিরা। প্রশ্ন হচ্ছে এই আচরণের উৎপত্তি কোথায়?'

গ্রে-র মনে পড়ল, বনের ভেতর আবহাওয়া কতটা পবিত্র মনে হচ্ছিল তখন। 'এর পরপরই আমরা এসে হাজির হলাম এক মেয়ে আর একটা সিংহকে নিয়ে। এইজন্যই হয়তো কোন ঝামেলা করা ছাড়াই আমাদেরকে মেনে নিয়েছে এরা।'

মাথা ঝাঁকাল নোয়া। 'আমাদের আগমনকে সুপ্রাচীন স্মৃতির সাথে মিলিয়ে নিয়েছে।'

বৃদ্ধা রাণীর দিকে তাকাল জেন। 'আচ্ছা, সেই প্রাচীন কালেও কী এরা জানত- এই উপত্যকা থেকে কী ভয়াবহ এক বিভীষিকা মুক্ত হতে চলেছে? হয়তো এজন্যই টিকে আছে ওই দেয়াল, যেটা চাইলে এই হাতিরা মুহূর্তে ধ্বসিয়ে দিতে পারত। হয়তো এজন্যই, সেই আদ্যিকালে আগত মিশরীয়দের শিখিয়েছিল এই রোগের প্রতিষেধক। কিন্তু আমরা কী শিখলাম এসব থেকে?' কথা শেষ করল জেন। 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

একটু একটু করে বুঝতে শুরু করেছে গ্রে, তবে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ওকে। বয়োবৃদ্ধ রাণীর অদৃশ্য কোন ইঙ্গিত পেয়ে ফিরে এসেছে বিশালদেহী মদ্দা। ওদের দলটার দিকে তাকিয়ে আক্রমণাত্মক অঙ্গ-ভঙ্গি করছে এখন।

'সম্ভবত আমাদেরকে আর পছন্দ করতে পারছে না ওরা,' বলল কোয়ালস্কি। 'এখন গলা-ধাক্কা দিতে চাইছে।'

প্রাণিগুলোর ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখিয়ে, সামনে এগিয়ে গেল গ্রে। রাণীর পাশ দিয়ে গিয়ে, ফাটলের দিকে এগোল ওরা। কেউ কথা বলছে না, বিগত একটা ঘণ্টার জাদুময় অভিজ্ঞতা, ওদের সবাইকে চুপ করিয়ে দিয়েছে। ফাটল ধরে বড় ক্যানিয়নে চলে এল ওরা, চারপাশের উপত্যকার দিকে তাকাল গ্রে। অরোরার আলো আর নেই বললেই চলে। সেই হালকা আলোতেই মিশরীয় অভিযাত্রীদের মানসিক অবস্থা কল্পনা করার প্রয়াস পাচ্ছে।

'দেখ,' ডেরেক ছোট্ট ডোবাটার দিকে ইঙ্গিত করল।

পানির রঙ এখন উজ্জ্বল লাল, তবে সেটা উপরে থাকা জোনাকির আলো প্রতিফলনের কারণে নয়। মনে হচ্ছে, পানির গভীর থেকে আলোটা আসছে।

'বাতাসের শক্তির প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।' বলল গ্রে।

ওর দিকে ফিরল ডেরেক, চোখ বিস্ফারিত হয়ে আছে। 'সম্ভবত তুমি ঠিকই বলেছিলে।' হাতিদের দিকে তাকাল ও। 'হয়তো এই শক্তিই জাগিয়ে তুলেছে বেদনাদায়ক স্মৃতি, ফলশ্রুতিতে সেই বিলাপ। নিজেদের মাথায় বয়ে নিয়ে চলা আগুন যে স্মৃতিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে।'

অরোরার সাথে তাল মিলিয়ে কমে আসছে পানির উজ্জ্বলতাও। শান্তি ভর করল মনে, পরক্ষণেই ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অশান্তি।

গুলির আওয়াজ শুনে দৌড়াতে শুরু করল ওরা।

গ্রে-র ইয়ারপিসে সেইচানের কণ্ঠ ভেসে এল, 'উপরে তাকাও! আমরা আক্রান্ত হয়েছি।'

আকাশের দিকে তাকাল গ্রে, প্রথম প্রথম কিছুই দেখতে পেল না। কিছুক্ষণ পর নজরে ধরা পড়ল আকাশ থেকে খসে পড়তে থাকা কিছু অবয়ব। ওগুলো ক্লিফের কাছে পৌঁছাতেই, খুলে দিল নিজেদের প্যারাস্যুট।

সেই সাথে উপর থেকে ছুটে আসতে লাগল গুলি।

গাছ ভেদ করে ওদের চারপাশে বৃষ্টির মতো ঝরতে শুরু করল ওগুলো।

গ্রে বুঝত পারল, ওর জ্বলতে থাকা হেলমেটের আলোই শত্রুপক্ষের জন্য লক্ষ্য হিসেবে কাজ করছে। ওটাকে বন্ধ করে দিল সে, অন্যদের অনেকটা ঠেলে-ধাক্কিয়ে নিয়ে চলল ক্লিফের আশ্রয়ের দিকে।

'আড়াল নাও! জলদি, লুকিয়ে পড়ো!' কোয়ালস্কির দিকে ইঙ্গিত করল ও। ওদেরকে 'নিরাপদে রাখ!'

'কীভাবে।'

'মাথা খাটাও!'

প্রয়োজনীয় জিনিসটা নিয়ে, ফিরে আসা পথে আবারও চলতে শুরু করল গ্রে। একবার নজর তুলে তাকাল ক্যানিয়নের প্রবেশ পথের দিকে, যেখানে রয়েছে প্রাচীন মিশরীয়দের বানানো দেয়াল। একবার মন চাইল, সেইচানের সাথে রেডিয়োতে কথা বলে। কিন্তু না, শত্রুপক্ষ শুনে ফেলতে পারে।

চুপ করে রইল তাই। মনে মনে বলল, নিজের দিকে খেয়াল রেখো।

রাত ১১:০৯

দেয়ালের উপর থেকে গ্রে-র হেলমেটের বাতি নিভে যেতে দেখল সেইচান।

নিজেকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা হচ্ছে ওর, আরও আগে কেন হুমকিটা দেখল না। গত দুই ঘণ্টা ধরে ঠায় বসে আছে সে। উঁচু জায়গা থেকে নজর রাখছিল, অবশ্য মনোযোগের প্রায় পুরোটা ছিল ওর দল যেখান দিয়ে বের হবে, সেই অন্ধকার ফাটলের উপর।

তাই একদম ঘাড়ের উপর এসে পড়ার আগে অবয়বগুলোকে দেখতে পায়নি সে। হয়তো বিমানের হালকা শব্দটা শুনতে না পেলে একদমই টের পেত না। হাতিদের সম্মিলিত বিলাপ শেষ হবার পরপরই শুনতে পেয়েছিল শব্দটা। সদা-সতর্ক সেইচান সাথে সাথে খুঁজতে শুরু করেছিল আকাশে, উপর থেকে ক্যানিয়নের দিকে নামতে থাকা ছোট বিন্দুগুলো নজরে পড়ে প্রায় সাথে সাথেই।

গ্রেকে সাবধান করে দেয়ার জন্য একটা গুলি ছোঁড়ে তাই মেয়েটি, সেই সাথে রেডিয়োতেও জানিয়ে দেয়।

এখন র‍্যাম্পের দেয়ালের উপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে সেইচান। ডান দিকে ঘুরে দলের সাথে একত্রিত হবার তীব্র ইচ্ছাটাকে গলা টিপে খুন করেছে ও। গেলে মন্দ হতো না, গ্রে-র দলটার শক্তি বৃদ্ধি পেত। কিন্তু কালো সূর্যের ট্যাটু অঙ্কিত সাদা একটা চেহারা মনে পরে যাওয়ায় গেল না।

তুমি তো তাই চাও? আমি উপত্যকায় নেমে যাই, তাই না?

আকাশ থেকে আক্রমণ হবার আর কোন কারণ মাথায় আসছে না ওর। এতে করে সবার নজর আটকে রাখা যাবে ক্যানিয়নের দিকে। পাঁচটা প্যারাস্যুট গুণতে পেরেছে ও। কিন্তু আরও একজন যে হুমকি হয়ে আছে, তা জানে ভালো করেই। সুদানেও তাই হয়েছিল, মলিন চেহারার আততায়ী তার দলকে ওদের পেছনে পাঠিয়ে, নিজে রয়ে গিয়েছিল মাটির উপর। বেরোবার পথে অ্যাম্বুশ করেছিল।

আরেকটু হলে কাজেও দিত বুদ্ধিটা।

এবার আর না

রাত ১১:১১

জঙ্গলের ভেতর দিককার একটা জায়গা বেছে নিয়েছে ভালিয়া।

মিনিট দশেক আগে ক্লিফের বাইরের দিকে এসে নেমেছে ও। ঠিক সেই মুহূর্তেই দূরের এক ক্যানিয়ন থেকে ভেসে এসেছে গুলির আওয়াজ। তবে ভয় পায়নি মেয়েটা, শান্ত ভঙ্গিতে গুটিয়ে এনেছে প্যারাস্যুট।

একা আসেনি ও, সঙ্গী হয়েছে র‍্যাভেন ইউ.এ.ভি.টা। যন্ত্রটার ইনফ্রারেড চোখ ব্যবহার করে ফাটল আর তার চারপাশের জঙ্গলটা দেখে নিয়েছে। কোন ধরনের চমক চায় না সে।

সাবধানে মাটিতে নামার পর, এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে ও। ফাটলের মুখটা এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেল পাথরের স্তূপ। একজন স্নাইপারের জন্য এরচাইতে ভালো জায়গা আর হয় না। একটা কম্বল বের করে এনে পাথরের পেছনে বিছিয়েছে। তারপর উবু হয়ে বসে ছোট ট্রাইপডে বসিয়েছে হেকলার অ্যান্ড কচ এমপি৭এ১ অস্ত্রটাকে। সাথে নাইট সাইট আর সাইলেন্সারও আছে। তাই এই অন্ধকারে ওর অবস্থান বোঝা শত্রুর পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

কম্বলের উপরে তিনটি বাড়তি ম্যাগাজিন রেখে তৈরি হয়ে নিল ও, তবে একটা রাখল বেল্টে। যদি তাড়াতাড়ি সরে পড়ার দরকার হয়, তখন কাজে আসবে।

অবশেষে পোর্টেবল রিসিভারটা কনুইয়ের কাছে রাখল ভালিয়া। ক্যানিয়ন থেকে সরাসরি দেখা যাবে না ওটাকে, একটা পাথরের আড়ালের আছে। সন্তুষ্ট হয়ে সাইটে চোখ রাখল মেয়েটা, কানে ভেসে এল গোলাগুলির আওয়াজ। নিচে কী হচ্ছে, সেটা বুঝতে পারছে না এখনও। ক্রুগারের দলটাকে রেডিয়োতে নীরাবতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে সে। অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্যানিয়নে দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত।

যাই হোক, একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ভালিয়া।

মেয়েটা আমার পিছু ধেয়ে আসবেই।

রাত ১১ঃ১৩

চারপাশের পাথরে ছুটে এসে মাথা কুটছে গুলি, এই পরিস্থিতিতেই গ্রে মাথা নিচু করে ঢুকে পড়ল সরু ফাটলে। সামনেই হাতির গোরস্থান, প্রথম বাকেই ঘুরে দাঁড়াল ও। ক্যানিয়নের দাঁড়ানো কেউ এখন সরাসরি ওকে দেখতে পাবে না বুঝে,

কনুইয়ের ফাঁকে হেলমেট গুঁজে নিভিয়ে ফেলল বাতি। হাতের অন্যটা এবং মাথাটারও আলোও নিভিয়ে দিল।

বাড়তি দুটো জেন আর ডেরেকের।

একটা বুলেট এসে আঘাত হানল ফাটলের বাকে, আবার দৌড়াতে শুরু করল ও।

বুদ্ধিটা কাজে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কতটা?

কোয়ালস্কি অন্যদেরকে সাথে নিয়ে ক্যানিয়নের দেয়ালের আড়ালে চলে যাবার পর, উল্টো দিকে দৌড়াতে শুরু করে গ্রে। আশা ছিল, শত্রুরা ওকে টার্গেট করবে। ফাঁদ পাতার জন্য ব্যবহার করেছিল হেলমেটের বাতিগুলো। মোটামুটি নিশ্চিত ছিল ও যে পাঁচ জনের আক্রমণকারী দলটার সবার কাছেই নাইট ভিশন আছে। তাই তিনটি উজ্জ্বল আলো অন্ধকারে তীব্রভাবে জ্বলন্ত মশালের মতোই দেখাবে ওদের কাছে। এ-ও ধারণা করেছিল, আলোর উজ্জ্বলতার কারণে মাত্র একজন যে সবগুলোকে বহন করছে, সেটাও বুঝতে পারবে না তারা।

গোরস্থানের দিকে দৌড়ে গেল গ্রে। অনেকক্ষণ পর খোলা জায়গাটায় এসে উপস্থিত হলো ও, পায়ের নিচে পড়ে শব্দ করে ভেঙে যাচ্ছে হাড়।

আবার হেলমেট তিনটার আলো জ্বালিয়ে সবগুলোকে পেছন দিকে ছুঁড়ে দিল ও। একমাত্র পালের রাণী আছে এখানে, গুলির আওয়াজে চমকে উঠেছে. .তবে ভয় পায়নি।

বেচারাকে সমূহ বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে তাড়াবার ভঙ্গি করল সে। 'হি-ইয়াহ! ভাগো! ভাগো!'

কাজটা অপছন্দ হলো রাণীর, শুঁড় উঁচু করে প্রতিবাদ জানাতেও দ্বিধা করল না। চারপাশ একবার দেখে নিয়ে পিছিয়ে গেল অবশ্য।

এতেই চলবে।

তিনটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ল্যাম্পের দিকে তাকাল গ্রে। আক্রমণকারীর মনোযোগ অন্য দিকে সরিয়ে নেবে ওগুলো, অন্তত ওর সেটাই আশা। সন্তুষ্ট মনে একটা হাড়ের স্তূপের আড়ালে আত্মগোপন করল কমান্ডার, হাতে ধরে আছে বিশ্বস্ত সিগ সয়্যার।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

একটা অবয়ব দেখা গেল ফাটলে। এক মুহূর্তের জন্য মাথা বের করে সব দেখে নিল আক্রমণকারী, পরক্ষণেই চলে গেল আড়ালে। সম্ভবত কীভাবে এগোবে, তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

দক্ষ লোক।

কান পেতে রয়েছে গ্রে, যদি কিছু শোনা যায়। তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছে পরিষ্কার-একা এসেছে লোকটা!

যেহেতু দলের অন্যদেরকে নিয়ে আসার ভুল করেনি, তাই ধরে নেয়া যায় যে এটাই দলনেতা। সম্ভবত সুদানের ওই সমাধিতে এই লোকটাই ওদের পিছু নিয়েছিল। যদি তাই হয়, তাহলে হারামজাদা প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত হলেও গ্রে অবাক হবে না।

বন্ধুদের চিন্তায় চোয়াল শক্ত হয়ে এল গ্রে-র।

রাত ১১:১৮

আত্মগোপন করে আছে ডেরেক।

গ্রে-র কাছ থেকে আলাদা হবার পর, দলটা আশ্রয় নিয়েছে ক্যানিয়নের দেয়ালে। লুকাবার সবচেয়ে আদর্শ জায়গাটা আবার একই সাথে সবচাইতে বিপজ্জনকও! দূষিত ডোবাটা এখন আর আলো ছড়াচ্ছে না। কিন্তু ওটার উপরে ঝুলে থাকা গুহার ছাদ থেকে এখনও আভা ঠিকরে পড়ছে। ডেরেকের আশা-আভাটুকু কারণে শত্রুপক্ষের নাইট-ভিশন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাড়তি সুবিধাটুকু আর পাবে না তারা। জানে, এই সামান্য আলোও ওই স্পর্শকাতর যন্ত্রের জন্য অনেক বেশি!

তাই সাবধানে ডোবাটার পেছনে দিকে চলে এসেছে ওরা। একটা নিচু গুহা খুঁজে বের করে লুকিয়ে পড়েছে তাতে। অবশ্য কোয়ালস্কির বিশাল দেহটা আটেনি। এতে অবশ্য মন খারাপ করেনি লোকটা, ওদেরকে উদ্দেশ করে মাত্র একটা বাক্য উচ্চারণ করেই বিদায় নিয়েছে সে।

আমার একটা পরিকল্পনা আছে।

ডেরেকের পেছনে, নোয়া-কে সাথে নিয়ে লুকিয়ে আছে জেন; তাদের পেছনে আশ্রয় নিয়েছে রোহো।

অস্ত্র হাতে ডোবার ওপাশে একটা অবয়ব এসে দাঁড়াতেই, দম আটকে ফেলল ওরা। গুহার আরও ভেতরের দিকে যাওয়ার প্রয়াস পেল ডেরেক। মনে মনে প্রার্থনা করতে শুরু করে দিয়েছে, যেন অবয়বটা এগিয়ে যায়। কিন্তু না, থমকে দাঁড়াল আক্রমণকারী; মনে হলো-নাইট ভিশন গগলসের ওপাশে থাকা চোখ জোড়া সোজা তাকিয়ে আছে ওদেরই দিকে।

কুঁচকে গেল ডেরেক, নিজের পছন্দ করা লুকাবার জায়গাটার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

এগিয়ে যাও

কোয়ালস্কিই ভরসা এখন, আশা করা যায়-লোকটা এতক্ষণে ওদেরকে রক্ষা করার জন্য দৌড়ে আসছে। কিন্তু না, আচমকা শটগান গর্জে উঠল কোথাও। সেই সাথে শোনা গেল আর্তচিতকার। শব্দটা মনে হচ্ছে ক্যানিয়নের মাঝখান থেকে আসছে। সম্ভবত কোয়ালস্কির হাতের কাজ। আফসোসের কথা হলো, এর মানে ওদেরকে সাহায্য করার জন্য আশপাশে কোথাও নেই বিশালদেহী লোকটা।

তবে চিৎকারটা শাপে বর হয়ে গেল। সাথে সাথে নিচু হয়ে গিয়েছে অবয়ব, অস্ত্রের মুখ এখন চিৎকারের উৎসের দিকে। কিছুক্ষণের মাঝেই এগিয়ে গেল ওদিকে।

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল ডেরেকের।

কিন্তু ঝামেলা বাঁধাল আরেকজন।

গুঙিয়ে উঠল রোহো, কণ্ঠে অনুযোগের ছোঁয়া।

আস্তে করে ওকে বকা দিল নোয়া, হাতের স্পর্শেই শান্ত করে ফেলল সিংহটাকে। কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গিয়েছে।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে অবয়বটা, বিভ্রান্তি ফুটে উঠেছে তার হাবেভাবে। কিছুক্ষণের মাঝেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে, অনুসন্ধানের জন্য এগিয়ে এল।

ঘাড়ের উপর দিয়ে পেছনে তাকাল ডেরেক। অস্ত্র বলতে আছে কেবল নোয়ার ম্যাচেটি। কোয়ালস্কি তার শটগান নিয়ে গিয়েছে। এদিকে বাচ্চা হাতিটাকে উদ্ধার করার সময়, মনের ভুলে রাইফেল ফেলে এসেছে নোয়া।

রোহোর দিকে নজর গেল ডেরেকের। কিন্তু নোয়ার কথা মনে পড়ে গেল সাথে সাথেই। শাবকটার বয়স কম, অনভিজ্ঞ সে। এখনও শিকার করা শিখছে! নিশ্চয়ই তাকে মানুষখেকোতে পরিণত করতে চাইবে না নোয়া। আর তাছাড়া, শাবকটার কাঁপুনি দেখে বোঝা যাচ্ছে, রোহো প্রেমিক হতে পারে, শিকারি না!

তাই সামনের দিকে তাকাল ডেরেক, বুঝে ফেলেছে সত্যটা।

যা করার, তা আমাকেই করতে হবে।

এখনও ম্যাচেটি ধরে আছে নোয়া, তবে ব্যাকআপ হিসেবে।

এতক্ষণে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে অস্ত্রধারী, ডোবার ধার ধরে এগোচ্ছে সে। জোনাকি পোকা তাড়ানোর জন্য হাত নাড়ল একবার। বোঝাই যাচ্ছে যে পোকাগুলোর হালকা আলোতেও অসুবিধা হচ্ছে লোকটার। তাই বলে চোখ থেকে গগলস খুলল না কিন্তু!

একই সাথে ক্যানিয়ন আর ডোবার দিকে নজর রাখার প্রয়াস পাচ্ছে অস্ত্রধারী।

চুপচাপ বসে রইল ডেরেক। লোকটা কয়েক গজের ভেতরে আসতেই লাফ দিল অবয়বটা লক্ষ করে। বুঝে-শুনেই দিয়েছে। কেননা সেই মুহূর্তে লোকটার পুরো মনোযোগ ছিল ক্যানিয়নের দিকে।

দুঃখের কথা, একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরতে পারল না তাকে। ডেরেকের পায়ের হালকা আওয়াজেই ফিরে দাঁড়াল অস্ত্রধারী।

কিন্তু ফিরে আসার উপায়ও নেই ডেরেকের।

দুই হাত দিয়ে লোকটার গলা টিপে ধরল সে, সেই সাথে ধাক্কা দিল শরীর দিয়ে। একসাথে ডোবার উপর গিয়ে পড়ল ওরা। ব্যাপারটা ডেরেকের পরিকল্পনায় ছিল না, তবে জানত যে এমন কিছু হতে পারে।

জেনের জন্য এই ঝুঁকি নিতে আপত্তি নেই ওর।

হাঁচড়ে-পাচড়ে উঠল সে। তারপর চিৎকার করে বলল, 'এখন!'

হাত উঁচু করে ধরল জেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই উঁচু হলো অস্ত্রধারীর রাইফেলটাও। তবে জয় হলো মেয়েটারই, বোতাম টিপে ধরল সে। লোকটার গলায় যে শক-কলার লাগিয়ে দিয়েছিল ডেরেক, সেটা জ্বলে উঠল। সর্বোচ্চ ক্ষমতায় সেট করা আছে ওটা। তারপরও যে দৃশ্যটা দেখা গেল, সেটা আশা করেনি কেউ। শিকারকে কেবলমাত্র অবশই করে দিল না ওটা, সেই সাথে যেন আগুন ধরিয়ে দিল দেহটায়

.ডোবার পানিতেও

.যেন জমা করে রাখা সমস্ত বিদ্যুত এক লহমায় ছেড়ে দিয়েছে ডোবার অণুজীবগুলো

চিৎকার করে উঠল অস্ত্রধারী, বাঁকা হয়ে গিয়েছে পিঠ।

লোকটার দেহ যখন পানিতে আছড়ে পড়ল, তখনও বিদ্যুত নেচে চলছে পানিতে। ক্লান্ত পায়ে সরে এল ডেরেক। 'উম, জেন, এখন বোতামটা ছাড়তে পারো।'

'ওহ, তাই তো।' বলে ওর দিকে এগিয়ে এল মেয়েটা।

সাথে সাথে পিছিয়ে গেল ডেরেক, দেহের সাথে কী লেগে আছে তা পরিষ্কার জানে। 'না .

পাত্তাই দিল না জেন, জড়িয়ে ধরল ওকে। 'ওসব বলে আর লাভ নেই, এখন আমরা আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়েছি।'

মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরতে ভয় করছে ডেরেকের, কিছুক্ষণ তাই দুই হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যখন বুঝতে পারল, মেয়েটা ঠিকই বলেছে, তখন ভাবল-এর জন্য মরতেও আপত্তি নেই।

অবশ্য এখন মরতে না হলেই খুশি হই।

রাত ১১:২৪

ডেরেককে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে জেন। আচমকা ক্যানিয়ন থেকে ভেসে আসা বিস্ফোরণের শব্দ ওদের মনোযোগ কেড়ে নিল। চুপচাপ তাকিয়ে রইল ওরা সেদিকে।

কী হচ্ছে ওখানে?

তাড়া লাগাল ডেরেক। 'আমাদের আর এখানে থাকা চলবে না।'

কথাটার সত্যতা টের পেল জেন। তাই দেয়াল ধরে এগিয়ে চলল ওরা, ছায়া হিসেবে পেল উপরে থাকা ক্যানোপিকে। ক্যানিয়নটা অন্ধকার, তবে চাঁদ-তারার আলোয় অদ্ভুত এক দৃশ্যের সাক্ষী হতে হলো ওদের।

হাতিদের একটা পাল .সংখ্যায় না হলেও বিশ হবে .চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

চোখ পিটপিট করে তাকাল জেন। 'ওরা কী করছে-'

আচমকা আরেক দফা শটগানের আওয়াজ পেল ওরা। কোয়ালস্কি করছে, তা গুলির রং দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু শত্রুর দিকে গুলি ছুঁড়ছে না ও। বিশালদেহী লোকটা দাঁড়িয়ে আছে পালটার পেছনে। মনে হচ্ছে যেন হাতিগুলোকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে সে। সেই সাথে আছে গালাগালির তুবড়ি। অন্য সময় হলে হয়তো লজ্জায় লাল হয়ে যেত জেন, কিন্তু এখন লোকটার উদ্ভাবনী ক্ষমতার ভক্ত হয়ে গেল যেন!

অবশেষে কাজ হলো, ক্যানিয়নের মেঝে ধরে এগোতে শুরু করল দলটা। উজ্জ্বল আলো ওদেরকে ভড়কে দিয়েছে, সেই সাথে আছে পাছায় খাওয়া বিদ্যুতের শক। অবশেষে আর সহ্য করতে পারল না। মুহূর্তেই শুরু হলো স্ট্যাম্পিড!

লক্ষ্যটাও পরিষ্কার।

মুহুর্মুহু গুলি ছুটে আসতে শুরু করল। একজন উপর থেকে, আর অন্যজন নিচ থেকে ছুঁড়ছে। গ্রেনেডও বিস্ফোরিত হলো কোথাও। মাটির ঝর্ণা জন্ম নিল এক মুহূর্তের জন্য। তবে সম্ভবত আতঙ্কিত হয়ে কাজগুলো করেছে দুই আক্রমণকারী, তাই লক্ষ্যভেদ করল না একটাও। অবশ্য ওদেরকেও দোষ দেয়া যায় না। এমন স্ট্যাম্পিডের সামনে পড়লে কে না আতঙ্কিত হবে!

নিচে থাকা লোকটা ঢাল বেয়ে উঠার প্রয়াস পেল। কিন্তু বালুময় তল বিশ্বাসঘাতকতা করল বেচারার সাথে। আছড়ে পড়ল সে, পরক্ষণেই হারিয়ে গেল পালের পায়ের নিচে। এক মুহূর্ত পর আরেকটা চিৎকার শোনা গেল। বুঝতে পারল ডেরেকরা-দুই আক্রমণকারীই খতম।

স্ট্যাপিডরত পালটা ছুটে গেল পাথরের দিকে, সম্ভবত বনে আশ্রয় নিতে চাইছে।

নতুন করে শুরু হওয়া গোলাগুলির শব্দে ক্যানিয়নের অন্য দিকে চলে গেল ওদে নজর।

বোঝাই যাচ্ছে, যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি।

রাত ১১:৩২

এত বোকা ভেবেছ আমায়?

এখনও লুকিয়ে আছে গ্রে। এরইমাঝে আরেকবার উঁকি দিয়েছে আক্রমণকা অন্ধের মতো গুলি ছুড়েছে ভেতরে। গ্রে-কে গুলি ছোঁড়ার জন্য টোপ দিচ্ছে আর ওর অবস্থান জানতে চায়।

ছোট ক্যানিয়নের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা বুড়ো রাণীর উপস্থিতি টের পাচ্ছে অপরাধবোধে ভরে গেল ওর মন। জানে, ওর উপস্থিতিই এতদিনের শান্ত পরি তছনছ করে দিয়েছে।

ওর চিন্তা বুঝতে পেরেই যেন সেদিকে গুলি ছুঁড়ল আক্রমণকারী। পরক্ষ ভেসে এল একটা আর্তচিকার।

হারামজাদা কোথাকার

সব ঠিক আছে কিনা, দেখতে চাইল গ্রে। ও নড়ে উঠতেই, স্তূপের উপর থে নিচে গড়িয়ে পড়ল একটা হাড়।

ছুট লাগাল না গ্রে, জানে যে আপেক্ষমান আততায়ী ঠিক ধরে ফেলবে তাহলে উল্টো গড়ান দিয়ে সরে গেল জায়গা ছেড়ে। ঠিক সেই মুহূর্তেই স্তূপের পা আছড়ে পড়ল একটা গ্রেনেড। ওটার বিস্ফোরণের ধাক্কায় আরও সরে গেল বেচা উপর থেকে বৃষ্টির মতো করে ঝড়ছে হাড় আর ডালপালা।

এতকিছু পরেও, সিগ সয়্যারটা ছাড়েনি ও, তাক করেই ছুঁড়ে দিল গুলি প্রতিপক্ষের গালি শুনে বুঝতে পারল যে লক্ষ্যভেদ করেছে।

উপুড় হয়ে শুয়ে আছে গ্রে। লক্ষ্য স্থির হলেও, আছে খোলা জায়গায়। দেহে নিচে সাদা, ক্রিস্টালের মেঝে। দৌড়ানো তো দূরে থাক, নড়তে গেলেও শব্দ কর উঠবে ওগুলো।

প্রথমে ধৈর্য হারাল প্রতিপক্ষই, অন্ধের মতো গুলি ছুঁড়তে শুরু করল।

যদি লেগে যায়

আরেকটু হলে সফলও হয়েছিল। গ্রে-কে গান শুনিয়ে উড়ে গেল একটা বুলেট।

গুলি ছুঁড়ল গ্রে-ও। কিন্তু সফল হলো না।

আরেক দফা গোলাগুলি হলে টিকব না।

গ্রে-র পেছন থেকে ভেসে এল ভারী পায়ের শব্দ, ডাল ভাঙার আওয়াজ পেল ও। এক মুহূর্তের জন্য পিছু ফিরে দেখল, রাণী ছুটে আসছে! রক্ত লেগে আছে সাদা ত্বকটায়, বুকের পাশ দিয়ে বেয়ে পড়ছে। প্রায়ান্ধ চোখ দিয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে প্রাণীটা, আফসোস খেলা করছে ওখানে, তবে সেই সাথে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও। গ্রে-র ঠিক সামনে এসে বসে পড়ল রাণী।

বুঝতে পারল গ্রে।

মারা যাচ্ছে, অথচ তারপরও আমাকে রক্ষা করতে চাইছে রাণী।

বুটের সাথে ঘাস ঘষা খাবার আওয়াজ ভেসে এল গ্রে-র কানে। রাণীর তরফ থেকে পাওয়া নিরাপত্তার উপহারকে মাথা পেতে নিল ও। বিশাল পিঠটার উপর দিয়েই তাক করল আক্রমণকারীর দিকে, প্রথম গুলিটাও ছুঁড়ল সে-ই। এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা, তবে রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেল না।

ওর উদ্দেশ্যেও ছিল না সে।

মনোযোগটা কেবল আমার দিকেই রাখো।

তাই করল আক্রমণকারী, বের করে আনল গ্রেনেড লঞ্চার।

বেচারা জানে না, ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে বিশাল একটা অবয়ব। চুপচাপ উপস্থিত হয়েছে মদ্দা সেই হাতিটা, রক্ষীর দায়িত্ব পালন করার জন্য। ধীরে ধীরে, যেন কোন অপার্থিব নাটকের কুশীলব হয়ে, একটা দাঁত ঢুকিয়ে দিল সে আক্রমণকারীর পিঠে। তুলে আনল তাকে মাটি থেকে, আস্তে আস্তে আরও উপরে।

রক্ত ছলকে পড়ল, তার সাথে পাল্লা দিয়ে আছড়ে পড়ল অস্ত্রও।

মাথার এক ঝটকায় দেহটাকে ছুঁড়ে ফেলল মদ্দা। যেন ঘোষণা করল, অপবিত্র কোন পায়ের ছাপে আর কলুষিত হতে দেবে না এই পবিত্র মাটি।

হাঁটু গেঁড়ে বসল গ্রে, রাণীর শুকিয়ে যাওয়া গালে হাত রেখে বলল, 'আমি দুঃখিত।'

শুঁড় তুলে ওকে আদর করে দিল রাণী, যেন মহান আভিজাত্যে মেনে নিচ্ছে গ্রে-র দুঃখ প্রকাশ। তারপর ওর কব্জি আঁকড়ে ধরে উঠিয়ে দিল। কিন্তু এগিয়ে এল মদ্দাটা, রক্তাক্ত চোখে ক্ষমার কোন চিহ্ন নেই।

মাথা পেতে অনুযোগ মেনে নিল গ্রে। একেবারে শেষ মাথায় এসে ফিরে তাকাল একবার। মাথা নত করে আছে মদ্দাটা, শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে আছে মৃতপ্রায় রাণীকে। চোখ ফিরিয়ে নিল গ্রে, এরপরের দৃশ্যগুলোর সাক্ষী হতে চাইছে না।

একই সাথে লজ্জা আর স্বস্তিকে সঙ্গী করে এগিয়ে গেল কমান্ডার।

দলের অন্যদের ওকে বড়ই দরকার।

রাত ১১:৩৯

মাইল খানেক লম্বা ফাটলের এক মাথা থেকে চল্লিশ গজ দূরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সেইচান। সাবধানে এখানে আসার পথে দূর থেকে আসা গুলির আওয়াজ ওর কান এড়ায়নি। ভয়কে দূরে সরিয়ে রেখেছে এই মুহূর্তে, জানে যে কোন লাভ নেই। বিশ্বাস আছে ওর গ্রে-র উপরে, এমনকী কোয়ালস্কির উপরেও! অন্যরা নিরাপদেই থাকবে।

নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে ওকে এখন।

কান খুলে রেখেছে প্রাক্তন আততায়ী, শুনছে চারপাশের আওয়াজ। তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে চাইছে অস্বাভাবিক কোন নড়া-চড়া।

নীরব-নিঃস্তব্ধ একটা পরিবেশ, তবে ধোঁকা খায়নি ও।

আমি জানি, তুমি আছি। আছ আশপাশেই কোথাও!

ওর প্রতিটি স্নায়ু চিৎকার করে তাই জানাচ্ছে।

দুটো পথ খোলা আছে ওর সামনে। গিল্ডের হাতে পাওয়া প্রশিক্ষণ সেটাই জানাচ্ছে সেইচানকে। ছায়া অথবা আগুন।

ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে চুপচাপ এগিয়ে যেতে পারে সে। চুপচাপ হারিয়ে যেতে পারে ক্লিফের ওপাশে। অথবা দেহের রক্তে আগুন ধরিয়ে দৌড়াতে পারে চোখ বুজে।

করল না কোনটাই, গিল্ডের প্রশিক্ষণের বাইরে গিয়ে তৃতীয় একটা পথ বেছে নিল সে। এই শিক্ষা পেয়েছে গ্রে-র কাছ থেকে। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আর অন্তরাত্মার মিশ্রণ জানিয়ে দেবে সেই পথটাকে।

আজ রাতের জন্য তাই কোয়ালস্কিকেই গুরু মানবে সেইচান।

শত্রুপক্ষ এসে উপস্থিত হবার আগেই, তাদের আগমনের নিচু আওয়াজ শুনতে পেয়েছে সেইচান। তবে জায়গা ছেড়ে নড়েনি এক পা-ও। তবে যখন টের পেল যে পায়ের নিচের মাটি কাঁপছে, তখন উঠে গিয়েছে ক্লিফ ধরে

কয়েক মুহূর্ত পর, হাতির স্ট্যাম্পিডটা দৌড়ে গিয়েছে ওর পাশ দিয়ে! চাইলেই হাত বাড়িয়ে তাদেরকে স্পর্শ করতে পারত মেয়েটা। সুযোগের অপেক্ষায় তাকিয়ে ছিল, তাই ধারে কাছে একটা বিশাল মাদীকে পেতেই লাফ দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল ওটার লেজ। পাজোড়া শক্ত করে স্থাপন করেছিল মোটা উরুর পেছন দিকটায়।

অনাহুত যাত্রীর উপস্থিতি অনুভব করা মাত্র গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল প্রাণীটা, ঝেড়ে ফেলতে চাইছিল ওকে। কিন্তু সেইচান কি আর সহজে মানার মানুষ? তাছাড়া ওর দরকারও বেশি না, মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড।

কিছুক্ষণের মাঝেই দুই পাশ থেকে হারিয়ে গেলে ক্লিফের দেয়াল।

ঘাসের অপেক্ষায় ছিল সেইচান, সেটা পাওয়া মাত্র লাফিয়ে পড়েছে। এক মুহূর্তও নষ্ট না করে দৌড় দিয়েছে একগাদা গাছের আড়ালে লুকাবার জন্য।

ওখান থেকেই দেখছিল পালটার উন্মত্ত দৌড়। আচমকা, ওর ডান দিকে, একটা বিশাল মদ্দা আছাড় খেল পাথরের সাথে। ওটা ভেঙে পড়া মাত্র কালো কিছু একটা নজরে এল ওর, পরক্ষণেই আবার সেটা হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

এবার যাবে কোথায়? পেয়েছি যে আমি তোমায়।

তবে কথা হলো, ধাতব কিছু একটা ঝলসে ওঠাও নজর এড়ায়নি সেইচানের।

নিশ্চয়ই অস্ত্র আছে সাথে।

থাকবে না, এমনটা আশাও করিনি।

শিকারের দিকে এগিয়ে গেল সেইচান, পরিকল্পনায় পরিবর্তন এসেছে।

রক্তে আগুন লাগানো যাক!

রাত ১১:৪৩

নিচু হয়ে বনের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে ভালিয়া।

চারপাশটা দখল করে নিয়েছে হাতির পাল, ওকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্লিফ থেকে। দ্রুতই পায়ের নিচে পানির ঝলক খেয়াল করল সে। আস্তে আস্তে বেড়ে চলছে তার গভীরতা। আচমকা চোখের সামনে দেখতে পেল বিস্তৃত এক হ্রদ। অবশেষে কমে এল হাতির পালের দৌরাত্ম্য, কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে তারা।

অবশ্য, থামল না মেয়েটা। অস্ত্রটা একবার পরখ করে নিল। নাইট-সাইট নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু জিনিসটা এখনও কাজ করছে। আফসোসের কথা হলো, র‍্যাভেনটার কন্ট্রোলার নিয়ে আসার সময় মেলেনি। ঝামেলা শুরু হবার ঠিক আগ মুহূর্তে দেহের উত্তাপ দেখতে পেয়েছে ইউ.এ.ভি.টার সেন্সরে।

মানুষ-তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে পরিচয় বোঝা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু নড়া-চড়া দেখে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে ভালিয়া, কে ওই মানুষ।

চুপচাপ বসে রয়েছে তাই, সেইচান কী সিদ্ধান্ত নেবে? ছায়া? নাকি আগুন?

আচমকা র‍্যাভেনের চোখে দেখতে পেল ভালিয়া, দেহ-উত্তাপের একটা স্রোত যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল মানব দেহের চিহ্নটাকে। কী দেখছে, সেটা বুঝতে সময় লেগে গেল কিছুটা। ফলে সময়মতো প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারল না। কোনক্রমে বাঁচল ধাবমান হাতির পালের পা থেকে!

সমস্যা একটাই, সেইচানকেও হারিয়ে ফেলেছে।

কী হলো মেয়েটার?

হাতির পায়ের নিচে পড়ে থেঁতলে গিয়েছে?

উত্তরটা জানাই আছে ভালিয়ার-না।

ওর মাথার কাছেই, গাছের গায়ে লাগা বুলেট ধারণাটার সত্যতা প্রমাণ দিল।

মাথা নিচু করে গড়ান খেল ভালিয়া, নিজের আর শত্রুর মাঝখানে দাঁড় করল গাছটাকে। আন্দাজে গুলির উৎস লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে ভুল করল না। অবশ্য জানে, সেইচান এরইমাঝে সরে গিয়েছে জায়গা ছেড়ে। নিজেও তাই করল।

নিচু হয়ে ছুটতে শুরু করল সে, ঘন জঙ্গলের দিকে। গুলির শব্দ শুনে বুঝে ফেলল, সেইচান পিস্তল নিয়ে এসেছে কেবল। নিজের সাব-মেশিনগানটার ওজন দেখে নিল একবার, সেই সাথে কোমড়ে হাত বুলিয়ে দেখে নিল, চল্লিশ রাউণ্ডের এক্সট্রা ম্যাগাযিনটা জায়গামতোই আছে!

আগুনের এই খেলায়, জিততে চায় ভালিয়া।

দরকার কেবল একটা আড়ালের।

সেটা পেয়েও গেল।

ঘন বনে প্রবেশ করেছে সে, মোটা মোটা অনেকগুলো গাছের কাণ্ডকে তাই ব্যবহার করতে পারবে আড়াল হিসেবে। কারও নজরে না পড়েই এক আড়াল থেকে আশ্রয় নিতে পারবে আরেক আড়ালে।

আচমকা কাঁধের উপর অনুভব করল হাতুড়ির বাড়ি, সাথে কানে এল পিস্তলের আওয়াজ। সাথে সাথে ঘুরে গেল দেহটা।

মন থেকে ব্যথা সরিয়ে দিল সে, বনের আরও ভেতরে চলে গেল মেয়েটা।

আরেকটা গুলির আওয়াজ।

মনে হলো যেন চারপাশে শুরু হয়ে গুলির গুঞ্জন।

ভয়ে চক্কর খেল মেয়েটা।

মানে কী?

পরক্ষণেই বুঝতে পারল, ভুল খেলায় নাম লিখিয়েছে সে। আগুনের খেলায় নামেনি সেইচান, নেমেছে ছায়ার খেলায়! গোপনীয়তা আর ধোঁকাবাজি-ই এই খেলার দুই অস্ত্র। সেইচান নিশ্চয়ই ওর লুকাবার জায়গা খুঁজে পেয়েছে, ইউ.এ.ভি.-র কন্ট্রোলটা এখন তার হাতে!

'এবার খেলনা নিয়ে আমার খেলার পালা।' মেয়েলি কণ্ঠের চিৎকার শুনতে পেল ভালিয়া।

গাল বকে উঠল সে।

প্রথমে ছায়া .আর এখন আগুন।

রেডিয়োটা বের করে আনল সে, পাইলটকে নির্দেশ দিল চিৎকার করে। 'দুটো হেলফায়ার মিসাইলই ছুঁড়ে দাও। ক্যানিয়নকে টার্গেট করো। এখনি।'

রাত ১১:৪৮

হেলফায়ার

সেইচান জানে, ওকে শুনিয়েই শব্দগুলো উচ্চারণ করেছে ভালিয়া।

মিসাইলগুলো কি আসলেই আছে কপ্টারে? নাকি ফাঁকা হুমকি?

সুদানের কথা মনে পড়ে গেল ওর। অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা না পড়াই ভালো।

'আমাকে শিকার করো, আর নয়তো তোমার বন্ধুদের রক্ষা করো। সিদ্ধান্ত তোমার।' আবারও চিৎকার করে উঠল মেয়েটা।

ওকে অগ্রাহ্য করল সেইচান, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় শুরু করল ক্লিফ লক্ষ্য করে। দলের সদস্যদের সাহায্য করতেই হবে।

তবে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা সেরে নিল একটা।

আমাদের আবার দেখা হবে, মেয়ে।

রাত ১১:৫০

'দৌড়াও!' তাড়া দিল গ্রে। 'জলদি, জলদি!' ক্যানিয়নটাকে ফাঁকা করার প্রয়াস পেল।

দুই মিনিট আগে রেডিয়োতে যোগাযোগ করেছিল সেইচান, আতঙ্কিত কণ্ঠে বলেছিল, 'এখুনি ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে পড়ো!'

সাথে সাথে সবাইকে এক করেছে গ্রে। যার যার হেলমেটের বাতি জ্বালিয়ে, ক্যানিয়নটা থেকে হাতির পাল সরিয়ে নেবার প্রয়াস পাচ্ছে তারা। সেইচানও চেষ্টা করছে সাহায্য করার। দখল করা ড্রোনটা পাঠিয়ে দিয়েছে সমভূমির দিকে।

আবার রেডিয়োতে যোগাযোগ করল সেইচান। 'সেসনা তোমাদের কাছে চলে এসেছে। হেলফায়ার মিসাইল কিন্তু তৈরি।'

'আমাদেরকে আরেকটু সময়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

'চেষ্টা করছি।'

আচমকা মাথার উপর শটগান তুলে গুলি ছুঁড়ল কোয়ালস্কি; যে কয়টা হাতি এখনও দ্বিধায় আছে, তাদের সঠিক দিকে যাবার প্রণোদনা দিল আরকি।

নোয়া-র কার্যপ্রণালী অবশ্য আরও নম্র। বয়স্ক একজোড়া হাতিকে স্পর্শ করে, নম্রস্বরে তাদের সাথে কথা বলে-কাজ উদ্ধার করতে চাইছে ও।

ডেরেক আর জেনও বসে নেই। কপাল ভালো যে একটু আগের স্ট্যাম্পিডে প্রায় সব হাতিই ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে গিয়েছে।

অন্ধকার ক্যানিয়নের দিকে তাকিয়ে আছে গ্রে। বিশালদেহী মদ্দাটার দেহ এখনও দেখতে পাচ্ছে সে। বুঝতে পারল, রাণী আর নেই! এখনও ক্যানিয়নে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা প্রাপ্তবয়স্ক হাতি, আফসোস করছে তারা।

মদ্দাটার মাঝেও নড়ার কোন লক্ষণ নেই।

আচমকা চিৎকার করে উঠল জেন। 'ঘাসের ভেতর! একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি!'

ঘুরে দাঁড়াল সবাই, কিন্তু জেন ওদের চাইতে উঁচু অবস্থানে আছে বলে দেখতে পাচ্ছে। অথচ ওরা পাচ্ছে না। দৌড়ে এগোল কোয়ালস্কি। 'কই?'

পথ-নির্দেশনা দিল জেন।

সেইচানের কণ্ঠ শুনতে পেল গ্রে। 'গ্রে! সেসনাটা এসে পড়েছে প্রায়! ড্রোন আর কাজ করছে না।'

আকাশের দিকে তাকাল কমান্ডার, কানে এসেছে ইঞ্জিনের গুঞ্জন।

বাজে পরিস্থিতি।

দুই হাত গোল করে মুখের সাথে লাগাল গ্রে। 'কোয়ালস্কি, ফিরে এসো!' অন্যদের দিকে হাতও নাড়ল। 'যতদূর পারো, পেছনে চলে যাও!'

'বাচ্চাটাকে দেখতে পাচ্ছি!' দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল বিশালদেহী।

ঘাসের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে। পরক্ষণেই দেখা গেল ওকে, বাচ্চা একটা হাতিকে কোলে তুলে নিয়ে দৌড়াচ্ছে। কম করে হলেও দুইশো পাউন্ড হবে ওটার ওজন!

সময়মতো আসতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।

তারার আলোতে দেখতে পেল, ক্যানিয়নের উপর বোমা বর্ষণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে প্লেনটা। এরপর শুনতে পেল বজ্রের আওয়াজ।

ক্যানিয়নের পেছন থেকে, দৌড়ে এল মদ্দাটা। সম্ভবত বাচ্চাটার চিৎকার শুনে, অথবা কোয়ালস্কির সাহায্য করার ইচ্ছা দেখেও হতে পারে! বিশালদেহী লোকটাকে ধরে ফেলল মদ্দা, বাচ্চাটাকে ওর কোল থেকে কেড়ে নিয়ে দেয়ালের দিকে এগোতে লাগল।

হালকা হওয়ামাত্র গতি বেড়ে গেল কোয়ালস্কির।

সেসনাটা ছোট ক্যানিয়নের দিকে নেমে এল। একটা পাখার নিচে দেখা গেল আগুনের ঝলকানি। কান ফাটানো চিৎকার করে মাটির দিকে ছুট দিল মিসাইল। পরক্ষণেই কেঁপে উঠল মাটি, আকাশ ছোঁবে বলে লাফিয়ে উঠল আগুন আর ধোঁয়া। এক মুহূর্ত পরেই মাটির টানে চলে এল নিচে!

সামনে সামনে দৌড়াচ্ছে বিশাল মদ্দাটা, তার পেছনে কোয়ালস্কি আর গ্রে। ওদের পেছনে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবার ঠিক আগ মুহূর্তে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে

সক্ষম হলো ওরা। তবে একেবারে নিরাপদে না, বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে গেল দুইজনেই।

শুয়ে থেকেই মন্তব্য করল কোয়ালস্কি। 'পরের বার তোমার কথা শুনতে বাধ্য করো কিন্তু!'

উঠে দাঁড়াল গ্রে, তবে গোঙাতে গোঙাতে। ওদের সাথে যোগ দিল অন্যরা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে দেয়ালের উপরে উঠে এল ওরা।

বাঁ দিক থেকে ভেসে এল মাটিতে কিছু একটা আছড়ে পড়ার আওয়াজ। পরক্ষণেই আসমান দখল করে নিল কালো ধোঁয়া।

'গ্রে?' ওর কানে ভেসে এল সেইচানের কণ্ঠ।

'আমি ঠিক আছি।'

'খুব ভালো। ড্রোনটা আবার কাজ করছে।'

ধোঁয়ার দিকে তাকাল গ্রে। বুঝতে পারছে যে সেইচান ধ্বসিয়ে দিয়েছে সেসানাটাকে। 'মন্দের ভালো তো বটে!'

ওদের সাথে যোগ দিল জেন এবং ডেরেক। মন খারাপ করে তাকিয়ে আছে তারা সমভূমির দিকে। পেছনের দিকটায় যেন হাট বসিয়েছে ধোঁয়া এবং পাথর। ওদের চোখের সামনেই ধ্বসে পড়ল আরও অনেকটা দেয়াল। কবর হয়ে গেল ডোবাটার।

'সব শেষ!' বলল জেন। 'প্রতিষেধকটা আর কখনওই মিলবে না।'

'তাতে কিছু যায় আসে না।' বিড়বিড় করে বলল গ্রে।

শক্ত চোখে তাকাল ডেরেক। 'তাই নাকি? আমার যায় আসে। এই মাত্র ডোবাটায় গা ধুয়ে এসেছি আমি!'

'আমি বলতে চাইছি, প্রতিষেধকটা কখনোই ছিল না ওখানে .অন্তত আমাদের ব্যবহারের জন্য ছিল না!'

দুইজনের কাউকেই দেখে খুব একটা আনন্দিত বলে মনে হলো না।

নিশ্চিত করার ভঙ্গিতে বলল গ্রে, 'আমি জানি প্রতিষেধকটা কই!'

'তাই নাকি!' আঁতকে উঠল জেন। 'কোথায়?'

ঘুরে দাঁড়াল গ্রে, এগোতে শুরু করল ও। 'যেখান থেকে শুরু হয়েছে আমাদের যাত্রা!'

আটাশ

জুন ১৮, সকাল ১০:২৩ বি.এস.টি.
মিল হিল, ইংল্যান্ড

দুই সপ্তাহ পরের কথা, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে গ্রে। দেখছে ফ্রান্সিস ক্রীক ইনস্টিটিউটের একটা ছোট সার্জিক্যাল স্যুইটের ভেতরের দৃশ্য। লন্ডনের ঠিক বাইরেই অবস্থিত ওটা। সিল করা ঘরটার ভেতরে, চাদর দিয়ে ঢাকা দেহটার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

তোমার প্রতি আমরা সবাই কৃতজ্ঞ।

একগাদা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, অবশেষে আগামীকাল আমেরিকা ফেরার অনুমতি পেয়েছে গ্রে। সেইচান আর কোয়ালস্কিও অনুমতি পেয়েছে, একই সাথে ফিরবে ওরা। তবে এখানে আসার কোন আগ্রহ দেখায়নি দুইজনের কেউই। কোয়ালস্কি এক কথায় জানিয়ে দিয়েছে ওর মনের কথা-জীবনেও আর কোন মমির দর্শন চাই না।

কথাটা মনে আসতেই হেসে ফেলল গ্রে। লোকটা যে না বুঝেই অনেক বড় একটা কথা বলে ফেলেছে, তা ভেবেই হয়তো। মাটির নিচে শুয়ে থাকা সেই দেবীর দেহাভ্যন্তরে দেখা মৃত চেহারাগুলোর কথাও মনে পড়ে গেল ওর।

ওটাই ছিল সবচাইতে বড় সূত্র। এমনকী প্রথম দেখার সেই মুহূর্তে কী ভাবছিল, সেটাও মনে আছে ওরঃ এসবই আসলে শিক্ষার নিমিত্তে।

আসলেও তাই। তবে এই সফরে শেখার আরও অনেক কিছু পেয়েছে গ্রে।

রাণী হাতির জেনকে নিজের কাছে টেনে নেবার দৃশ্য মনে পড়ে গেল ওর। বয়স্কা প্রাণীটা নিজের জ্ঞান ওর সাথে ভাগ করে নিচ্ছিলেন। আসলেই, ওই ক্যানিয়নে কোন প্রতিষেধক ছিল না।

ছিল শুধু শিক্ষার একটা পাঠ।

জেনকে যা শেখানো হয়েছে. . ওদেরকে যা দেখানো হয়েছে. তা ছিল প্রতিষেধক তৈরি করার পদ্ধতি। প্রতিষেধক নয়।

ওর পেছনের দরজা খুলে গেল আচমকা। দুটো পরিচিত চেহারা দেখতে পেল গ্রে।

আকর্ণ হাসি দেখা যাচ্ছে মঙ্কের মুখে, বন্ধুকে জড়িয়ে ধরেছে সে। ড. কানো শুধু মাথা নাড়ল।

পাশের ঘরের দিকে তাকাল মঙ্ক, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। 'চক্র তাহলে পূর্ণ হলো! এক মমি থেকে তুমি-আমি মিলে এসে দাঁড়ালাম আরেক মমির সামনে।'

কথাটা সর্বাঙ্গে সত্য।

এই মেডিকেল কমপ্লেক্সেরই অন্য একটা জায়গায় আগুন ধরিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল সাইমন প্রফেসর ম্যাককেবের মমিকৃত লাশ। সেই দিনের কথা মনে আছে গ্রে-র পরিষ্কারভাবেই।

আসলেই পূর্ণ হয়েছে চক্র।

তবে এবার এই টেবিলে প্রফেসর ম্যাককেব নেই।

আফসোসের দৃষ্টিতে দেহটার দিকে তাকাল ইলিয়ারা। 'ভদ্রলোক নিজের কাজ শেষ করেছেন। আগামীকাল তাকে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবীতে পাঠানো হবে।'

ব্রিটিশ টানে কথা বলার প্রয়াস পেল মঙ্ক, ব্যর্থ হলো চরম ভাবে। 'ড. লিভিংস্টোন নিশ্চয়ই?'

মাথা নাড়ল গ্রে।

রোয়ান্ডা থেকে গ্রে-র দলটা ফেরার পরপরই, কবর থেকে তুলে আনা হয়েছিল ডেভিড লিভিংস্টোনের দেহ। এত বেশি স্যাম্পল নেয়া হয়েছে লোকটার লাশ থেকে যে কোন কিছু অবশিষ্ট আছে বলে মনেই হয়নি গ্রে-র।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্যাম্পলটা ছিল তার মাথায়।

প্রতিষেধকটা...

সামনে শায়িত রহস্যময় লোকটার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল মঙ্ক। 'আমি টুকরা টুকরা কিছু গল্প শুনেছি, পুরোটা শুনতে পাইনি।'

বন্ধুর কাহিনি শোনার দাবী বুঝতে পেরে ঘুরে দাঁড়াল গ্রে। 'কোত্থেকে শুরু করব?'

'মোজেসের কাহিনি থেকেই শুরু করো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গ্রে, সেই সাথে হাসলও। 'কী ঘটেছে তা যদি পুরোপুরি বুঝতে চাও, তাহলে আরও আগে থেকে শুরু করতে হবে। সেই প্রাচীন সময় এক পাল তৃষ্ণার্ত হাতি খুঁজে পেয়েছিল অদ্ভুত এক জলাধার। যে জলাধারের পানি সব ধরনের প্রাণীর জন্য প্রাণঘাতী!'

নোয়ার কথা মনে পড়ে গেল ওর, লোকটা বলতে গেলে পূজা করত হাতির। 'সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত দক্ষ হাতিরা, তাই নিজেদের কোন ক্ষতি হবে না-এমন এক উপায় বের করে সেই জলাধারের পানি পান করার ব্যবস্থা করল তারা। কীভাবে? তা জানতে চেয়ো না, সম্ভবত আমরা কোনদিনই সেই পদ্ধতি জানতে পারব না। তবে আমার ধারণা, পূর্বপুরুষদের হাড়ের প্রতি তাদের সম্মান দেখাবার পদ্ধতির সাথে তা সম্পর্কিত।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল ইলিয়ারা। 'এই ধরনের অদ্ভুত সম্পর্ক প্রকৃতিতে অহরহ দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা সেই রহস্যের সমাধান করতে পারি না।'

চিবুক ঘষল গ্রে। 'সে যাই হোক, মোদ্দা কথা হচ্ছে-হাতির পাল একটা উপায় আবিষ্কার করে। মোবোলা গাছের পাতা আর ডাল দিয়ে তাদের মরদেহ ঢেকে

রাখার পদ্ধতি আবিষ্কার করে তারা। ওই গাছের বাকল থেকে নির্গত রাসায়নিক প্রবেশ করে মরদেহে, তারপর প্রাণঘাতী জীবাণুকে তা পরিণত করে প্রতিষেধকে।'

'ল্যাবের পরীক্ষায় আমরা দেখেছি,' যোগ করল ইলিয়ারা। 'কেউ একজন মারা গেলে, তার ভেতরে আশ্রয় নেয়া অণুজীবগুলো সুপ্তাবস্থায় চলে যায়। সম্ভবত মস্তিষ্ক থেকে আর কোন তড়িৎ পায় না বলেই। ঠিক তখনই তারা ওই বাকলের রাসায়নিকের প্রতি সংবেদী হয়, তার আগে না। ওটা এই অণুজীবের কিছু জিনের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়, ফলে সেটা পরিণত হয় নিরীহ অণুজীবে। শুধু তাই নয়, সেটা রক্তে তার কোন সমগোত্রীয়ের খোঁজ পেলে সেটাও নিরীহ বানিয়ে ফেলে।'

'অন্য ভাষায়-সেটাই আমাদের প্রতিষেধক।' জানাল গ্রে।

মাথা চুলকাল মঙ্ক। 'তারমানে, প্রতিষেধক পেতে হলে, সংক্রমিত মরদেহকে বাকলের নিচে রেখে দিতে হবে। তারপর এক কি দুই বছর পর গিয়ে নিয়ে আসতে হবে অণুজীবের নিরীহ ভার্সনটাকে?'

মা হাতির হাড় চূর্ণ করে বাচ্চাকে খাওয়াবার দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল গ্রে-র।

'কিন্তু কথা হচ্ছে, এই পদ্ধতিটা প্রজাতির জন্য আলাদা। তাই সংক্রমিত এবং মৃত হাতির হাড় আমাদের কোন কাজে আসবে না। হাতির হাড় হাতির জন্য।'

মুখ কুঁচকে ফেলল মন। 'আর মানুষের জন্য মানুষের হাড়।'

'এজন্য অবশ্য খুলির হাড়ই সবচেয়ে ভালো।' জানাল ইলিয়ারা। 'ওখানেই সবচেয়ে বেশি অণুজীব পাওয়া যায়। আধুনিক পদ্ধতির আশির্বাদে আমরা সহজেই সেটাকে বের করে আনতে পারি। কিন্তু আগেরকার দিন হলে, হাড় চূর্ণ করেই খেতে হতো!'

'বুঝলাম, তা মোজেসের গল্প শুরু হবে কখন?' জানতে চাইল মঙ্ক।

হাতঘড়ি দেখল গ্রে। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের সুযোগ পেয়ে আনন্দিত। 'মহামারীগুলোর কথা তো? গল্পের ওই অংশটার শুরু কোন এক বিশেষ ঋতুতে। সম্ভবত আগ্নেয়গিরির উৎপাতের ফলে তখন পরিবর্তন এসেছিল আবহাওয়ায়। হাতিদের যে বিশেষ পানির উৎসের কথা বললাম, এই ঋতুতে বন্যায় ডুবে যায় সে উৎস। ফলস্রুতিতে মারাত্মক এই অণুজীব পানির সাথে চলে আসে নীল নদের অববাহিকায়। তারই অনুষঙ্গ হিসেবে শুরু হয় অন্যান্য মহামারীগুলো। যাই হোক, এর বেশ কিছুদিন পরের কথা। মিশর থেকে এক দল অভিযাত্রী বেরিয়ে পড়ে এই উৎসটাকে খোঁজা জন্য। হাতিদেরকে আবিষ্কার করে তারা। ওদেরকে বিনা সমস্যায় পানি পান করতে দেখে, নজর রাখে প্রাণীগুলোর উপরে। আর এভাবেই তারা প্রতিষেধক আবিষ্কারে সমর্থ হয়।'

হাতিদের দেখে প্রসবের সময় বিশেষ পাতা চেবানো শেখা কেনিয়ান এই উপজাতির কথা মনে পড়ে গেল গ্রে-র। মানুষের অভিযোজন ক্ষমতায় মুগ্ধ না হয়ে পারল না।

জীবন একটা না একটা উপায় ঠিকই খুঁজে নেয়!

হাতে সময় কম বুঝতে পেরে আবার শুরু করল ও। 'এই অভিযাত্রীরা প্রতিষেধক নিয়ে ফিরে আসে উত্তরে। বিশেষ একটা গোত্র সেই জ্ঞানের সংরক্ষক হয়ে দাঁড়ায়। এই গোত্রটা তুতু দেবতার এক নারী রূপকে পুজো দিত। স্বপ্ন আর ঘুমের দেবতা ছিলেন তুতু।'

'নারী রূপ কেন?' জানতে চাইল মঙ্ক।

'আমার ধারণা, আদি যে অভিযাত্রী এই প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন, তিনি ছিলেন একজন মহিলা। খুব সম্ভবত সেই মহিলা ছিলেন হিব্রু এবং তার সাথে ছিল একটা সিংহ। অন্তত হাতির পালের বয়স্কা রাণীর ব্যবহার দেখে তাই মনে হয়। আরও কারণ থাকতে পারে। এই অণুজীবটা পুরুষ বংশধরদের মাঝে পরিবর্তন আনে-এটাও একটা কারণ হতে পারে।' কাঁধ ঝাঁকাল গ্রে। 'যাই হোক, অণুজীবটা মস্তিষ্কে প্রবেশ করে ভ্রমের জন্ম দেয় বলে তারা স্বপ্নের দেবতাকে বেছে নেয়।'

এই বিষয়ে নিজস্ব একটা তত্ত্বও আছে গ্রে-র। ওর ধারণা-অণুজীবগুলো শক্তিশালী স্মৃতিকে রেকর্ড করে সেটা আবার নতুন পোষকের মস্তিষ্কে পৌঁছে দিতে পারে। তবে সেকথা এখন আর টানল না।

'এই ধরো খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০০ সালের দিকে, মিশর জড়িয়ে পড়ে একের পর এক যুদ্ধে। তাই এই সংরক্ষক গোত্রটা ভয় পেয়ে যায়, ধরে নেয় যে এতদিন ধরে রক্ষা করে আসা জ্ঞানটা বুঝি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই দেবীর উদ্দেশ্যে একটা সমাধিক্ষেত্র বানায় তারা। সেটাও দুটো উদ্দেশ্যে প্রথমত সেই সমাধির দেয়ালে তারা খোদাই করে লিখে রাখে প্রতিষেধক বানাবার পদ্ধতি। আর সেই সাথে মমি করে দেহের অভ্যন্তরে দিয়ে যায় খোদ প্রতিষেধকটাকেও।

'এরপর হাজারো বছর চুপচাপ মাটির নিচে শুয়ে থাকে সেই সমাধি।' বলে উঠল মঙ্ক।

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই চাপা থাকে না। কোন রহস্যই গোপন থাকে না আজীবন। স্থানীয় অনেকেই জানত সেই সমাধির ব্যাপারে। এরা সম্ভবত সেই সংরক্ষক গোত্রের নুবিয়ান ভৃত্যের বংশধর। অবশেষে একদিন নীল নদের উৎপত্তি খুঁজতে তাদের মাঝে গিয়ে উপস্থিত হয় এক শ্বেতাঙ্গ। লোকটাকে ভালোবেসে ফেলে তারা, শ্রদ্ধা করতে শুরু করে।'

টেবিলের উপর শুয়ে থাকা দেহটাকে একনজর দেখে নিল গ্রে।

'তাকে সম্মান দেখাবার জন্য এ রহস্যের পুরোটাই উন্মোচন করে দেয় তারা। এমনকী লোকটাকে বিশেষ এক তালিসমান উপহারও দেয়! সেই রহস্যকে গোপন রাখার জন্য, আবার একই সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যেন একেবারে হারিয়ে না যায় সেই জ্ঞান-সেজন্যই বন্ধু স্টানলিকে কোড করা ম্যাসেজ পাঠান তিনি। তারপর যখন লিভিংস্টোনের মৃত্যু হয়, তখন মমি বানানো হয় তার দেহটাকে। লাশটা লন্ডনে যখন পৌঁছায়, তখনও সেইভাবেই পৌঁছায়। মোবোলা গাছের কাঠ দিয়ে বানানো কফিনে করে।'

মাথা নাড়ল ইলিয়ারা। 'তারপর, উনিশ শতকের শেষের দিকে, কেউ একজন লিভিংস্টোনের রেখে যাওয়া তালিসমান খুলে বসে। যার ফলে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ছড়িয়ে পড়ে অণুজীব।'

আবার ঘড়ি দেখল গ্রে।

আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

মঙ্কের দিকে ফিরল ও। 'ঠিক। কিন্তু ওই ব্যাপারে পেইন্টার এবং ক্যাট আমার চাইতে ভালো জানে। বিশেষ করে এর সাথে টোয়েন, টেসলা আর স্টানলির সম্পৃক্তির ব্যাপারটা। বিস্তারিত জানতে চাইলে তাই বউকে জিজ্ঞাসা কোরো। পেইন্টারকেও প্রশ্ন করতে পারো। কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড়া পেয়েছেন শুনলাম।' হাতে হাত ঘষল ও। 'আমাকে যেতে হবে। বিশেষ এক রমণীর সাথে লাঞ্চ খাওয়ার কথা। দেরী করলে বারোটা বাজবে। তাকে যদি জানাই যে দেরী হবার কারণ তুমি, তাহলে তোমারও...'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল মঙ্ক। 'আর বলতে হবে না, জলদি যাও। সেইচানকে রাগাবার দুঃসাহস আমার নেই।'

তাই করল গ্রে, কিছুক্ষণের মাঝে এসে উপস্থিত হলো সূর্যালোকে। ট্যাক্সি ডেকে রওনা দিল সেইচানের দেয়া ঠিকানার উদ্দেশ্যে। রাখ-ঢাক করেছে খুব মেয়েটা। আর মেয়ে বলেই, ব্যাপারটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে গ্রে।

ঠিকানায় পৌঁছে গ্রে দেখে, ফুটপাতে ভিড় জমে আছে। গাড়ি থেকে নেমে চোখের উপর হাত দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করল গ্রে। ওখানে-

ওর কনুই আঁকড়ে ধরল একটা হাত। 'দেরী করে ফেলেছ।'

'এই মঙ্কটা না...এত কথা বলে!'

ভিড়ের কাছ থেকে টেনে ওকে কর্নারে নিয়ে এল সেইচান। সামনে কী আছে দেখে, হা হয়ে গেল গ্রে। দ্য লন্ডন আই, টেমস নদীর উপর অবস্থিত বিখ্যাত ফেরিস হুইল দেখতে পাচ্ছে সে। বড় বড় কম্পার্টমেন্টগুলোয় আরামসে কয়েকজন মানুষ এঁটে যাবে!

লাইনের একদম সামনে এনে ওকে দাঁড় করাল সেইচান। 'একে অপেক্ষা করাতে কী পরিমান টাকা লাগে জানো? শুধু শুধু তো আর সময়মতো আসতে বলিনি, তাই না?'

'কী-'

'চুপ করো তো।'

আপেক্ষমান একটা কম্পার্টমেন্টের দিকে ওকে নিয়ে গেল সেইচান। ভেতরে একটা প্রাইভেট টেবিল সাজানো হয়েছে, ওটার উপরে রয়েছে দামী লিলেন। পাশেই আছে একটা কার্ট। বরফের বালতিতে রাজসিক ভঙ্গিমায় শুয়ে আছে ওয়াইনের বোতল।

গ্রে-কে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আপেক্ষমান অপারেটরকে ইঙ্গিত দিল মেয়েটা।

লজ্জায় লাল হয়ে গেল সেইচান, 'তোমাকে দেখি কোনভাবেই অবাক করা যায় না!'

হাসল গ্রে। 'এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তো বেঁচে আছি।'

নড়তে শুরু করল কম্পার্টমেন্ট। এক পা এগিয়ে এসে গ্রে-কে জড়িয়ে ধরল সেইচান। 'তাহলে আজ রাতে আরও বেশি করে চেষ্টা করতে হবে।'

'আপত্তি নেই আমার।'

টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল ওরা, এখান থেকে নদী সুন্দর দেখা যায়।

'এত কিছুর দরকার কী? আমার চাই সঙ্গ।' প্রেমিকার সাথে ঘন হয়ে বসল গ্রে।

'ভাবলাম, এসব আমাদের প্রাপ্য।'

'এই বুদ্ধি কোথায়-' বলতে বলতেই থেমে গেল কমান্ডার। 'ডেরেক আর জেন খার্তুমে যে ফেরিস হুইলে চড়েছিল, সেখান থেকে বুদ্ধি ধার করেছ!'

হাসল সেইচান। 'কিছুই দেখি তোমার নজর এড়ায় না।' এবার প্রেমিককে সে-ই কাছে টেনে নিল। 'কে বলেছে যে আমরা ওদের মতো আনন্দ করতে পারব না?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গ্রে। আসলেই, এমন মুহূর্ত খুব একটা মেলে না।

চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ ওরা, নীরবতা যেন শত শত বাক্য উচ্চারণের কাজ করে দিচ্ছে।

নড়ে উঠল সেইচান, ওর দিকে ফিরে বলল, 'ক্যাটের কাছে একটা খবর শুনলাম।'

'কী?'

নদীর দিকে তাকাল সেইচান। 'গতকাল, কানাডায়, অ্যান্টন মিখাইলোভের কবরে কেউ একটা একটা সাদা গোলাপ রেখে গিয়েছে।'

মেয়েটার চিন্তার কারণ ধরতে পারল গ্রে। আফ্রিকায় মুখোমুখি হবার পর থেকে, মলিন চেহারার আততায়ীটার আর কোন খবর নেই।

ভালিয়া মিখাইলোভ।

সেইচানের হাত স্পর্শ করল গ্রে। 'নিশ্চিত করে তো আর বলা যায় না যে-'

ওর হাত আঁকড়ে ধরল মেয়েটা। 'সাদা গোলাপটার একটা মাত্র পাপড়ি ছিল কালো!'

সকাল ১১:৩৮

'কয়েকজন আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন।' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল ক্যাট।

তাড়াতাড়ি শোয়া থেকে উঠে বসল পেইন্টার।

অবশেষে!

ফ্রান্সিস ক্রিকের সংক্রামক ব্যাধি ওয়ার্ডে দীর্ঘ সময় ধরে আটকা পড়ে আছে বেচারা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা-সমীক্ষা, সবই করা হচ্ছে ওর উপরে। তাই মন অন্যদিকে সরাতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ক্যাটের পিছুপিছু প্রবেশ করল সাফিয়া। 'রোগির খবর নিতে আসলাম।' একগাদা বেলুন নিয়ে এসেছে মেয়েটা। 'একটু আনন্দ-ফূর্তি করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।'

গুঙিয়ে উঠল পেইন্টার। 'বেলুন! আবার! আর চাই না।'

হাসল মেয়েটা। 'তাহলে নাহয় এক পুরাতন বন্ধুর সাথে মোলাকাত করো?'

আবার খুলে গেল দরজাটা। এক লম্বা, প্রশস্ত কাঁধের অধিকারী পুরুষ প্রবেশ করল ঘরে।

হাসি ফুটে উঠল পেইন্টারের চেহারায়। 'ওমাহা ডান...

উত্তরে হাসল লোকটাও। হাসির চোটে চোখের কোণে জন্ম নিল কুঞ্চন। ভেতরে ঢুকেই সাফিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরল সে। 'তোমার নিরাপত্তায় বউকে রেখে গেলাম, আর আরেকটু হলে তাকে মেরে ফেলার বন্দোবস্ত করেছিলে! এই নিয়ে কিন্তু দুইবার হলো।'

শ্রাগ করল পেইন্টার। 'কী আর করব বলো? একেবারে নিঃস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল ওর জীবন। এই একটু উত্তেজনা উপহার দিলাম।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল সাফিয়া, এগিয়ে গিয়ে বেলুনগুলো যোগ করল উপহারগুলোর সাথে। পরবর্তী কয়েক মিনিট একে-অন্যের জীবন নিয়ে কথা বলে কাটিয়ে দিল ওরা।

'বলো কী?' আশ্চর্য হবার ভান করল ওমাহা। 'পটিয়ে-পাটিয়ে এক মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছ? কই সেই অভাগিনী?'

মুখ কুঁচকে ফেলল পেইন্টার। 'লিসা আছে ডি.সি.তে, সবকিছু সামলাচ্ছে। ফ্রান্সিস ক্রিকে অন্যদের সাথে থাকব, সেটা ওর পছন্দ হয়নি। এই জায়গা বলতে গেলে সিগমার ইউ.কে. শাখায় পরিণত হয়েছে। তবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে আরকী। এই অণুজীবটার ব্যাপারে ফ্রান্সিস ক্রিকের চাইতে ভালো আর কেউ জানে না।

সিগমা ডিরেক্টর বিছানায় বসল সাফিয়া। 'অরোরা আর এলেসমেয়ার দ্বীপের কী খবর?'

'ভজঘট লেগেই আছে। মেরু ভালুকের চাইতে এই মুহূর্তে ওখানে মাইক্রোবায়োলজিস্ট আর সংক্রামক ব্যাধি বিশেষজ্ঞের সংখ্যা বেশি। হার্টনেলের ওই পাগলামী যে কী প্রভাব পরিবেশের উপর ফেলবে, সে ব্যাপারে আমাদের কোন ধারণাই নেই। তবে আপাতত আমরা আশাবাদী। আর্কটিকের তাপমাত্রার যে অবস্থা, তাতে বেঁচে থাকার মতো উষ্ণ পরিবেশ পাবে না অণুজীবগুলো।'

'তাহলে চলো প্রার্থনা করি, আর্কটিক যেন আরও ঠান্ডা হয়!'

মাথা নেড়ে সায় জানাল পেইন্টার।

ক্যাটকে প্রশ্ন করল ওমাহা। 'এবার বেচারাকে ওর আসল উপহারটা দেখাও।'

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল পেইন্টার। 'উপহার মানে?'

হাসল ক্যাট। 'আপনি কোয়ারান্টাইন থেকে বের হলে দিতে চেয়েছিলাম, যেন নিজ হাতে স্পর্শ করতে পারেন।' ব্রিফকেস খুলে ফেলল ও। ভেতর থেকে বের করে আনল হলদে হয়ে আসা এক তা কাগজ। 'এটা ডেভিড লিভিংস্টোনের সমাধিতে পেয়েছি।'

হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল পেইন্টার। বিশেষ করে ওটার নিচে লেখা সইটা দেখে আগ্রহ দমাতে পারল না।

'মার্ক টোয়েনের লেখা!' ফিসফিস করে বলল সে।

টেসলার জার্নালে লেখা সেই ১৯৮৫ সালের কথাগুলো মনে পড়ে গেল পেইন্টার। সেই সাথে লিভিংস্টোনের রেখে যাওয়া সূত্রগুলোও।

গল্পের এই শেষ অংশটা আগ্রহ নিয়ে পড়ল পেইন্টার। তারিখ হিসেবে ২০ আগস্ট, ১৯৮৫ লেখা।

যে ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহোদয়া পড়ছেন চিঠিটা, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি,

প্রথমত, আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিৎ। বেচারা ডেভিড লিভিংস্টোনের কবরের শান্তি নষ্ট করেছেন আপনারা...বালির কবরগুলোও ছাড়েননি। সে যাই হোক, আপনাদের সৌভাগ্যের এবং আপনাদের সুবিবেচনার (অথবা দুটোর!) জন্য অভিনন্দন। হ্যাঁ হ্যাঁ, যে বিবেচনা আপনাদেরকে বেচারা লিভিংস্টোনের শান্তি নষ্ট করতে বাধ্য করেছে, সেই বিবেচনার কথাই বলছি। বেঁচে থাকলে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই আপনাদের সাহায্য করতেন আনন্দের সাথেই। সেই সাথে আরেকটা কথা জানিয়ে রাখি-যথেষ্ট পরিমাণে ওষুধ রেখে দিয়েছি আপনাদের জন্য।

তবে সাবধান, এই চিকিৎসার কিন্তু বেশ কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। আমি নিজেই সাবধানতা হিসেবে চিকিৎসা গ্রহণ করেছি। জ্বরে আচ্ছন্ন অবস্থায় দেখেছি এমন সব দৃশ্য, যা আমার নিজ চোখে দেখা দৃশ্য না। শুনেছি এমন সব আওয়াজ-যা কোনদিন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি। আমার স্মৃতির লাগাম এমন কেউ ধরেছিল, যে

আসলে আমি নই। সে কে শুনবেন? আপনাদের সামনে যে লোকটা শুয়ে আছেন, তিনি!

আমি দেখেছি নীল হ্রদ, অথচ নিজের চোখে না। পায়ের নিচে দলিত করেছি এমন সব জঙ্গলের ঘাস, যেখানে কোনদিন আমার পা পড়েনি। দেখেছি মানুষের ভেতরে পশুত্বকে। আবার অনুভব করেছি লিভিংস্টোনের নিজের মনুষ্যত্ব। যারা কম সুবিধাপ্রাপ্ত, তাদের প্রতি ওর মমত্ববোধকে ধারণ করেছি নিজের মাঝে। লিভিংস্টোন বিশ্বাস করতেন এমন এক ঈশ্বরে, যিনি সবাইকে ভালোবাসেন; যিনি অপার কৌতূহলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে চান দিগন্তের ওপারে কী আছে?

আমাকে কোন ভাবেই বিজ্ঞানের লোক বলা চলে না, বললে বলতে পারেন সাহিত্যের মানুষ। তাই পৃথিবী কীভাবে কাজ করে, সে রহস্য জানার দাবী আমি করব না। তবে আমার আশা, আমার মতোই অন্যের চোখে যেন সবাই দেখতে পায় ধরণীকে। অন্যের আত্মাকে যেন বিচার করতে পারে নিজের আত্মা দিয়ে। তা সে কেবল জ্বরের ঘোরেই হোক না কেন।

দুনিয়ার খোল নলচেই পাল্টে যাবে।

তাই আপনার বা আপনাদের সামনে রাখা পানীয়টা শেষ করে ফেলুন, আপনার সামনে যে দিনগুলো আছে সেগুলোকে উপলব্ধি করুন।

কেননা একদিন না একদিন, লিভিংস্টোনের মতো আমাদেরকেও শুয়ে পড়তে হবে চিরতরে।

মৃত্যুকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। আশা করি সেদিন আসার আগে জীবনকে আমরা কাজে লাগাতে পারব, যেমনটা কাজে লাগিয়েছেন আমাদের প্রিয় ড. লিভিংস্টোন।

শেষ কথাটা শুনে হাসল পেইন্টার।

যথার্থ বলেছেন মহান সাহিত্যিক।

এই চিঠি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, টোয়েন এবং স্ট্যানলি লিভিংস্টোনের মমিকৃত দেহের গুরুত্ব আগে থেকেই জানতেন। অণুজীবের কথা তারা কতটুকু জানতেন, সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। তবে মিশরীয় ওই অভিযাত্রী এবং হাতিদের মতোই, প্রতিষেধক যে আসলে লিভিংস্টোনের দেহটাই-তা পরিষ্কার ধরে ফেলেছিলেন।

তবে মার্ক টোয়েনের নোটের একটা অংশ নজর কাড়ল তার। 'টোয়েন তার লেখায় মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে ডেভিড লিভিংস্টোনের স্মৃতিই দেখেছেন তিনি। এই সম্ভাবনাটা নিয়ে আমরাও আলোচনা করেছি।' সাফিয়ার দিকে ফিরল সে। 'তোমারও নাকি তেমনই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। টোয়েন সংক্রমিত হয়েছিলেন লিভিংস্টোনের অণুজীব দিয়ে। তার তুমি হয়েছ মরুভূমিতে পাওয়া মমির অণুজীবে।'

সাফিয়া মাথা নাড়ল, প্রশ্নের উত্তর অস্বস্তিবোধ করছে। 'আমার এখন আর মনে নেই। স্বপ্নের মতো মনে হয় সবকিছু।'

মাথা দোলাল পেইন্টার। 'আমারও কিন্তু তেমন কোন অভিজ্ঞতা হয়নি।'

'হয়তো আপনি ল্যাবরেটরিতে জন্মানো অণুজীব দিয়ে সংক্রমিত হয়েছেন বলে,' একটা ব্যাখ্যা জানাল ক্যাট। 'প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত অণুজীব দিয়ে নয়।'

'ল্যাবে জন্মানো?' মুচকি হাসল ওমাহা। 'সত্যি করে বলো পেইন্টার। পনির আর ঘুরতে থাকা চাকার স্বপ্ন দেখনি তো?'

লোকটাকে অগ্রাহ্য করল পেইন্টার, হাতের চিঠিটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তারপরও...কে বলতে পারে যে...'

'কী?' জানতে চাইল ক্যাট।

মাথা নাড়ল ডিরেক্টর। 'কিছু কিছু ব্যাপার মিলছে না।'

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল ক্যাট। 'যেমন?'

'প্রফেসর ম্যাককেব কেন সাত নাম্বার মহামারীটাকেই গোল করে রাখলেন?' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। 'সুমেরুর কথাই ভেবে দেখো। মনে হচ্ছিল যেন বাইবেলের কোন চ্যাপ্টার চোখের সামনে দেখছি।'

'জ্বর এখনও ছাড়েনি আপনাকে,' বলল ক্যাট। 'রোজির সাথে আরও কথা হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি, সুদান প্রজেক্টের কাছে পাওয়া একটা মিশরীয় স্মৃতিস্তম্ভ পেয়েছিলেন প্রফেসর। ওটার গায়ে খোদাই করা হায়ারোগ্লিফে এই সাত নম্বর প্লেগের কথা লেখা ছিল। এই আবিষ্কারটা তিনি করেছিলেন শুরুর দিকে, মরুভূমিতে উধাও হবার আগেই।'

'তারপরও...হয়তো সুমেরুতে আমরা যেসব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম, সেগুলোরই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এতে। হতে পারে না?'

'আমার তা মনে হয় না,' পেইন্টারের বুকের দিকে ইঙ্গিত করল ক্যাট। 'ডাক্তার ডাকছি, আপনাকে পরীক্ষা করে দেখবে।'

ভ্রূ কুঁচকে সহকারীর দিকে তাকাল সিগমা ডিরেক্টর। 'ভাবছিলাম আরকী!'

উরুতে চাপড় মেরে উঠে দাঁড়াল ওমাহা। 'জীবন মানেই চমক, আর চমক মানেই জীবন। কিন্তু তারপরও, আমাদের এগিয়ে যেতে হয়।'

'ঠিক বলেছে ও,' এগিয়ে এসে পেইন্টারকে জড়িয়ে ধরল সাফিয়া। তারপর ফিসফিস করে ওকে শোনাল। 'ধন্যবাদ।'

সহ্য হলো না ওমাহার। 'পেইন্টার, উল্টা-পাল্টা কিছু করলে কিন্তু তোমার বউকে ফোন দেব।'

হাসল সাফিয়া। দুই হাত দিয়ে পেইন্টারের গাল চেপে ধরল মেয়েটা, 'ধন্যবাদ।'

'ব্যাপার না, সাফিয়া।'

দুপুর ১:০৭

লন্ডনের ট্রাফিক জ্যাম ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে ট্যাক্সিক্যাবটা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সাফিয়া। ওমাহা বসে আছে ওর পাশেই, ধরে আছে মেয়েটার হাত।

জানালার বাইরে দিয়ে ভালোবাসার শহরটার কর্ম-ব্যস্ততা দেখছে সাফিয়া। পাবটা ভরে আছে মানুষে, হাসছে-খেলছে-খাবার শেষ করে লাফিয়ে উঠছে ডাবল-ডেকার বাসে।

কিন্তু এসবকে ছাপিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে নতুন এক দৃশ্য।

উত্তপ্ত সূর্যের নিচে জ্বলজ্বল করছে আগ্নেয় বালু...পিরামিডের চূড়ায় প্রতিফলিত হচ্ছে সূর্যালোক...বালিয়াড়ি ধরে হেঁটে যাচ্ছে উটের দল...

শক্ত করে ওমাহার হাত আঁকড়ে ধরল সাফিয়া। আস্তে আস্তে কমে আচ্ছে এসব মরীচিকা। তাই আজকাল আর ওসব নিয়ে কথাও বলে না। তবে জানে, ওর এসব কথা নিয়ে কারও সাথে আলোচনা না করার আরও কারণ আছে। এমনকী সুমেরুর সেই অভিজ্ঞতার খুব অল্পই জানিয়েছে ক্যাটকে। শত শত মহিলার অনুভূতি...তাদের স্মৃতি নিজের মাঝে অনুভব করেছে ও...জীবনের এক সফল ধারা যেন।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো, অনুভূতিটা যেন ওকে আগে বাড়ার শক্তি জুগিয়েছে!

আস্তে আস্তে হালকা হতে শুরু করেছিল সেই স্মৃতি, তার স্থান করে নিয়েছিল ভবিষ্যতের দৃশ্য। কী হতে চলছে, তা আগে থেকেই বুঝতে পারছিল। জানত, আরও অনেক সমস্যা অপেক্ষা করছে ভবিষ্যতে। কী-তা পরিষ্কার বুঝতে পারছিল না যদিও। আবছা-আবছা দেখতে পাচ্ছিল সব।

এজন্যই পেইন্টারের মতো মানুষ আছে বলে, নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে ও। সিগমার মতো একটা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দেয় সেই লোক, সরাসরি ঝড়ের ভেতর ঝাঁপ দিতেও ভয় পায় না...দ্বিধা করে না। এজন্যই হাসপাতালে শব্দটা উচ্চারণ করেছিল সাফিয়া।

ধন্যবাদ।

ওমাহা সম্ভবত কিছু একটা অনুভব করতে পেরেছে, স্ত্রীকে কাছে টেনে বলল, 'স্যাফ, কোন সমস্যা?'

ঘন হয়ে বসল মেয়েটা। 'কিছু না,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'কিচ্ছু না।'

বিকাল ৪:২৪

আর কিছুই বাকি নেই।

এক দিনের জন্য অ্যাশওয়েলে ফিরে এসেছে জেন। পারিবারিক কুটিরের ধ্বংসাবশেষের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। আগুন গিলে নিয়েছে সবকিছুই। বাকি আছে কিছু পুড়ে প্রায় কয়লা হয়ে যাওয়া বর্গা।

'নতুন করে বানানো যায় কিন্তু সব।' মন্তব্য করল ডেরেক।

কথাটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল জেন, কিন্তু না। এই কুটিরের সাথে মিশে আছে কষ্টদায়ক স্মৃতি। এখন সামনে তাকানো দরকার। আলতো করে ডেরেকের আঙুল আঁকড়ে ধরল মেয়েটা। দুই সপ্তাহ ফ্রান্সিস ক্রিকের কোয়ারাইন্টানে থাকার পর, খোলা বাতাসে শ্বাস নিতে পেরে শান্তিবোধ করছে। এখানে কিছু পাবে বলে ভাবেনি, কিন্তু এই দিনটার দরকার ছিল ওর। পিতার স্মৃতিকে বিদায় জানাবার আর কোন উপায় জানা নেই ওর।

'প্রফেসর ভেবেছিলেন, ওষুধ নিয়ে আসছেন তিনি।' ডেরেক মনে করিয়ে দিল ওকে, যেন পরিষ্কার পড়তে পারছে মেয়েটার মনের কথা।

'কিন্তু নিয়ে এসেছিলেন মহামারী।'

যথেষ্ট সময় পেয়েছিল ও গত দুই সপ্তাহে। তাই প্রফেসর ম্যাককেবের অতীত জোড়া লাগাবার কাজে লাগিয়েছে সময়টুকু। রোরির এসবে যে ভূমিকা, তা শুনে খুব কষ্ট পেয়েছে বেচারী। এখনও পাচ্ছে।

ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করার ইচ্ছা হচ্ছে না ওর। কানাডার একটা সামরিক জেলখানায় আটকে রাখা হয়েছে রোরিকে।

সাইমন হার্টনেলের ব্যাপারেও সব শুনেছে জেন, সেই সাথে নিকোলার হারানো লেখার সম্পর্কেও। ওগুলো অনুসরণ করেই ওর বাবা খুঁজে পেয়েছিলেন অণুজীবটাকে। মানবজাতির হাতে ওষুধ তুলে দেবার প্রচেষ্টায় প্রাণটাই হারাতে হয়েছে তাকে।

হাতিদের তৈরি করা ছোট ছোট স্তূপের কথা মনে পড়ে গেল ওর। এখন জানে, ওগুলো মোবোলা গাছে বাকল এবং কাঠ দিয়ে বানানো। ওই গাছের ট্যানিন ব্যবহার করে মমি বানাবার বিশেষ পদ্ধতিটার ফলেই তৈরি হয় প্রতিষেধকটার।

কিন্তু বাবা সেটা জানলেন কী করে?

ট্যানিন কেবল মাত্র মৃত দেহের সুপ্তাবস্থায় থাকা জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে। রাসায়নিকটা প্রতিষেধক নয়, তাই বাকলগুলোকে কখনওই গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

সেই সাথে রোরির বক্তব্য থেকে এটাও জানতে পেরেছে যে, সিংহাসনে বসা মমিটাকে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন বাবা। পেয়েছিলেন সত্যিকারের প্রতিষেধকটাকে। বিশেষ পরীক্ষা ছাড়া প্রতিষেধক জীবাণু এবং সংক্রামক জীবাণুর মাঝে পার্থক্য করা সম্ভব ছিল না।

দুই বছর পরিশ্রমের পর প্রফেসর বুঝতে পারলেন, মমিটার দেহে আঁকা ট্যাটুগুলো আসলে প্রাচীন হিব্রু ভাষায় লেখা। তবে বর্ণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে মিশরীয় গ্লিফ। মমিকৃত দেহটায় লিখে রাখা গল্পই সূত্র জুগিয়েছে প্রফেসরকে, মমিকরণের সাথে প্রতিষেধকের সম্পর্ক ধরিয়ে দিয়েছে। হার্টনেলকে সত্যটা জানাতে চাননি তিনি, তাই জেনের জন্য গুপ্ত পথ-নির্দেশনা দিয়ে নিজের উপরেই মমিকরণের পদ্ধতি শুরু করেছিলেন। দুই কি তিন মাস ধরে চালিয়েছেন পদ্ধতিটি, তারপর নিজের ভেতর ধারণ করেছেন অণুজীবটাকে। তার আশা ছিল, বাকলের ট্যানিন সংক্রামক অণুজীবকে প্রতিষেধকে পরিণত করবে।

'অনেক কাছে এসেছিলেন আপনি।' কালো ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল জেন।

'তার ব্যর্থতা কিন্তু অনেকটা আমাদের উপরেও এসে বর্তায়।' মন্তব্য করল ডেরেক। 'তিনি ওষুধ আনছিলেন আমাদের জন্য। জানতেন যে মৃত্যু বরণ না করলে প্রতিষেধক প্রস্তুত হবে না। আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে সময়ের আগেই তার খুলি উন্মোচন করি। তাই প্রতিষেধকের জায়গায় বেরিয়ে আসে মহামারী।' মেয়েটাকে কাছে টানল ও। 'কিন্তু তোমার সাথেও যোগাযোগ করেছেন তিনি। আমার ধারণা, শেষের দিকে এসে তিনি বুঝতে পারছিলেন যে হার্টনেল তোমার ভাইকে...মানে রোরি...'

'রোরি আমাদের সবার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।' তিক্ত কণ্ঠে বলল জেন। 'আমাকে আমার বাবার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। ওর জন্যই ভাবতে বাধ্য হয়েছি-আমার বাবা এবং ভাই মৃত!'

'আমি জানি,' জেনের চিবুক স্পর্শ করে চেহারাটা ঘুরিয়ে দিল ডেরেক। 'কিন্তু জেন, তোমার বাবা জানতেন, তুমি তার পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারবে। সেটা ছিল তার বিকল্প পরিকল্পনা। ঠিক ছিলেন তিনি, তুমি সফল হয়েছে।'

'উহু...আমরা সফল হয়েছি।'

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল ডেরেক। 'একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ অন্য কারও সাথে কৃতিত্ব ভাগাভাগি করছে! তুমি আসলেই হ্যারল্ডের মেয়ে তো?'

ছেলেটার কাঁধে আলতো করে চাপড় বসালো জেন। রাস্তার দিকে ঠেলে নিয়ে বলল, 'চলো, এক পাইন্ট হয়ে যাক।'

দ্য বুশেল অ্যান্ড স্ট্রাইকের দিকে এগোল ওরা।

জেনের হাত ধরল ডেরেক। 'জেন, শেষ পর্যন্ত কিন্তু প্রফেসর ম্যাককেব তার উদ্দেশ্যে সফল হয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ করতে পেরেছিলেন-মহামারীর গল্পটা কিচ্ছা নয়, সত্য। বাইবেলে বর্ণিত এক্সুডাসের গল্প ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাস পাল্টে দিয়েছেন তিনি।'

মাথা দোলাল মেয়েটা, কিছুটা হলেও শান্তিবোধ করছে। ধন্যবাদ দেয়ার ভঙ্গিতে ডেরেকের হাতে চাপ দিল সে। নীরব হয়ে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিল তারা।

'ওহ, ভালো কথা। নোয়া সকালে খবর পাঠিয়েছিল।' নীরবতা ভাঙল ডেরেক।

'হাতিগুলোকে খুঁজে পেয়েছে?'

'পায়নি বলে, তবে ওর কথা আমার বিশ্বাস হয়নি। পেলেও তো আর কাউকে জানাবে না।'

'ভালো,' ডেরেকের কাছে এল সে। 'ওদেরকে নিজেদের মত থাকতে দেয়াই ভালো-'

ঘণ্টার আওয়াজে থেমে গেল জেনের কথা। চার্চের বেল টাওয়ারটা সম্ভবত নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। অশুভকে হার মানিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সভ্যতা।

ডেরেককে নিয়ে চার্চের দিকে এগোল জেন। দরজা দিয়ে ভেতরে পা রাখা মাত্র নাকে ভেসে এল ধুপের গন্ধ। ডান দিক থেকে ভেসে আসছে কোরাসের গন্ধ। শত বছরের পুরাতন পাইপ অর্গানের পাশের একটা ছোট চ্যাপেলে ডেরেককে নিয়ে গেল ও।

'কী করছি আমরা?'

'চুপ।'

একটা থামের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল জেন। পাথরের খোদাইয়ের উপর আঙুল চালাল একবার। পিতার সাথে অনেক ছোটবেলায় এসেছিল একবার। চারকল এবং কাগজ ব্যবহার করে গ্রাফিতি এঁকেছিল সেদিন। লেখাটা ছিল ল্যাটিনে-

প্রাইটেরিও ফিউনি টেম্পোরি ইন চেলো পেস।

ফিসফিস করে আপন মনেই উচ্চারণ করল রূপান্তরটা, 'মৃত্যুকে বরণ করে আমি পেতে চাই স্বর্গের শান্তি...'

গ্রাফিতির উপর হাত রাখল বেচারি, বাবার অনেক কাছে চলে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। তার সব স্মৃতিই কষ্টদায়ক নয়। গাল বেয়ে একটা অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ল ওর।

'জেন?'

ডেরেকের দিকে তাকাল মেয়েটা, যুবকের চোখের তারায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে দুশ্চিন্তা। ওকে কাছে টেনে এনে চুমু খেল জেন।

প্রেমিক-প্রেমিকাকে দেখতে পেয়ে বন্ধ হয়ে গেল কোরাস, হাততালিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তারা।

লজ্জা পেয়ে সরে গেল জেন। শত শত বছর ধরে গর্বের সাথে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা চার্চটাকে দেখল একবার প্রাণভরে। হাজারো ঝড়, হাজারো ঝাপ্টা অগ্রাহ্য করে এখনও স্বস্থানে আছে ওটা। অবশেষে ডেরেকের দিকে ফিরল সে।

'আমি আমার বাড়ি আবার বানাতে চাই।'

শেষ কথা

৩০ জুলাই, সকাল ১০ঃ১৩ ই.ডি.টি.
টাকোমা পার্ক, মেরিল্যান্ড

কথা দাও।

নার্সিং হোমে, বাবার বিছানার পাশে বসে আছে গ্রে। শব্দগুলো জ্যাকসন পিয়ার্সের মুখে শোনার পর থেকে ওগুলোর অর্থ বোঝার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল ও। এখন বুঝতে পারছে সব। বাবার চেহারার দিকে তাকাল সে।

গর্বিত একজন মানুষ ছিলেন তিনি। অক্ষমতার কারণে আঘাত পেয়েছিল তার সেই অহংবোধ। কাজ করতে হয়েছে গ্রে-র মাকে, আর সেই সময়টা ওর বাবার কেটেছে দুই দুরন্ত ছেলেকে দেখে রাখার কাজে। যত দিন গিয়েছে, সেই দুই ছেলের দুরন্তপনা বেড়েছে বই কমেনি।

এর জন্য দায়ী তোমার ওয়েলশ রক্ত। মা প্রায়ই বলতেন কথাটা।

ওয়েলশ এর ব্যাপারটা ভুল করেছিলেন তিনি, কিন্তু রক্ত-এর ব্যাপারটা ভুল করেননি।

ওর সাথে বাবার গোলমালের আসল কারণটা ধরতে পারছে এখন গ্রে। তারা দুইজন প্রায় অবিকল একে অন্যের মতো। একই রক্ত বইছে যে তাদের দেহে।

ভাঁজ পড়া চেহারাটা আবারও পড়ার প্রয়াস পেল গ্রে। অনেক খুঁজেও সেই আগুন, সেই অহংবোধ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলো বেচারা। ইস, যদি তিনি আবার আগের মতো হতেন! তার বকা খাওয়ার জন্যেও এখন মন আঁকুপাঁকু করছে গ্রে-র।

কথা দাও।

বিছানার সাথে যেন প্রায় মিশে গিয়েছেন বাবা। মুখ খোলেন না বলতে গেলে। ঘুমিয়ে থাকেন যখন, দেখে মন হয় লড়াই করছেন কোন দানবের সাথে। বাতাসে মুঠো ছোঁড়েন শুধু, লাথি দিয়ে সরিয়ে দিতে চান তাকে। এই কাজ করতে করতে গোড়ালিতে ক্ষতের জন্ম হয়ে গিয়েছে!

দায়িত্বরত নার্সের সাথে গতকাল আলোচনা করেছে গ্রে। ও যখন ছিল না, তখন ছোট খাটো একটা স্ট্রোকের শিকার হয়েছিলেন বাবা। নার্সের মতে, এখন বিপদ কেটে গিয়েছে। রক্ত তরলীকরণের জন্য ওষুধও খাচ্ছেন তিনি। তবে বর্তমান পরিস্থিতির যে উন্নতি হবে-এমনটা আশা না করাই ভালো। এই অবস্থাতেই মাস...এমনকী বছরও কেটে যেতে পারে।

বসে আছে, বাবার হাত আঁকড়ে ধরে। পাতলা চামড়ার উপর দিয়ে বুলিয়ে দিল নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি। শেষ কবে এভাবে হাত ধরেছিল, তা মনেই পড়ে না তার। সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল সে।

ঘুমের মধ্যেই গুঙিয়ে উঠল ওর বাবা। আঙুল থেকে নজর উঠালো বাবার চোখের দিকে। এক দৃষ্টিতে ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন।

'হাই, ড্যাড। তোমাকে ঘুম থেকে জাগাতে চাইনি।'

নড়ে উঠল শুষ্ক, ফেটে যাওয়া একজোড়া ঠোঁট। ঢোক গিলে আবার চেষ্টা করলেন তিনি। 'গ্রে.   '

দশ দিন হয়ে গিয়েছে, অথচ ওর বাবা ওকে একবারের জন্যও চিনতে পারেননি।

'গ্রে, তোমার মা   তোমার মা আসছেন।'

বাবার হাতে চাপড় বসাল সে। লোকটার স্মৃতি অনুসারে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল সে। 'তাই নাকি? কখন?'

'হাহ?'

'কখন আসছেন মা?'

'কে? হ্যারিয়েট?'

'জি।'

বালিশ থেকে মাথা তুলে চারপাশ দেখলেন তিনি। কোনার একটা ফাঁকা চেয়ারের দিকে তাকালেন। 'কী বলছ এসব? হ্যারিয়েট তো ওই চেয়ারেই বসে আছে।'

খালি চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে রইল গ্রে, তারপর আবার বাবার দিকে। মাথা আবার বালিশে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তবে এখনও তাকিয়ে আছেন চেয়ারের দিকে। মুখ নড়ছে তার, মনে হচ্ছে বুঝি ওখানে বসে থাকা কারও সাথে কথা বলছেন।

পরক্ষণেই চোখ বন্ধ করে ফেললেন তিনি, আবার বাস্তবতার উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন।

কথা দাও.

বাবা কী বোঝাতে চাইছেন, তা বুঝতে পারল ও। এর পরের শব্দগুলো নিজেই বসিয়ে নিল।

.যখন সঠিক সময়টা আসে.

বাবার হাত ধরে আছে এখনও গ্রে। কিন্তু অন্য হাতে ধরে আছে আই.ভি. লাইনের সাথে সংযুক্ত মরফিনের প্লাঞ্জার।

সময় হয়েছে, বাবা।

সামনে ঝুঁকে জ্যাকসন পিয়ার্সের কপালে চুমু খেল গ্রেসন পিয়ার্স।

'মায়ের কাছে যাও।' ফিসফিস করে বাবার কানে বলল সে।

শেষবারের মতো হাতটা চেপে ধরল সিগমা কমান্ডার, তারপর ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিল।

নার্সিং হোমের সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ও। সূর্যালোকে অপেক্ষারত মেয়েটার সাথে মিলিত হলো। গতি না কমিয়েই মেয়েটার হাত আঁকড়ে ধরল সে, এগিয়ে গেল দৃপ্ত পায়ে।

'পালাবে আমার সাথে?' জানতে চাইল ও।

মুচকি হেসে শক্ত করে প্রেমিকের হাত আঁকড়ে ধরল মেয়েটা। 'তা আর বলতে?'

১

শ্বাশত . . . অজ্ঞাত

সরু ক্যানিয়ন ধরে পথ দেখিয়ে পালটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিশালদেহী মদ্দাটা। দুইপাশের লতা-পাতা ঘষা খাচ্ছে ওর কাঁধের সাথে।

ওর পেছনে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে নতুন আবাস। উষ্ণ জলধারার কারণে বাসযোগ্য একটা গভীর সমভূমি ওটা। গাছ স্বাভাবিকের চাইতে বড় ওখানে। ক্যানোপি ওদের আগের বাড়ির চাইতেও ঘন। দু'পাশের উঁচু দেয়াল বেয়ে নামছে পানি, জমা হচ্ছে ডোবায়।

নিঃসন্দেহে বাস করার জন্য ভালো একটা জায়গা।

যে লোকটা ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে, সে-ও আসছে পিছু পিছু। তাতে অবশ্য কিছু মনে করছে না মদ্দাটা। লোকটার কাছ থেকে কোন হুমকির ভয় করছে না সে। লোকটা যেন ওদের পালের একজনে পরিণত হয়েছে। তাই ওর আসাই উচিৎ!

আবাস স্থলের পেছন দিককার একটা গুহার ভেতর দিকে অবস্থিত ডোবার কাছে চলে এল মদ্দাটা। ছোট এই ডোবার ভেতর আগের আশ্রয় থেকে নিয়ে আসা পানি মিশিয়ে দিয়েছে সে। এখন হালকা আভা দেখা যাচ্ছে পানি থেকে।

তবে সেজন্য এখানে আসেনি পালটা।

পালটাকে অন্য পাশে নিয়ে যাবার জন্য এসেছে।

এখানকার পাথর মসৃণ। সেই মসৃণ পাথরের উপর বিশ্রাম নিচ্ছে একটা ভাঙা দেহ। পরিপূর্ণ না হলেও, কাজ চালাবার জন্য যথেষ্ট। সেই লোকটাই ওদের প্রাক্তন আবাস খুঁড়ে এগুলো নিয়ে এসেছে এখানে।

সবার প্রথমে এসে উপস্থিত হলো মদ্দাটা। মাংস পোড়ার গন্ধ পেল নাকে, কিন্তু মৃত রাণীর মাথায় শুঁড় স্পর্শ করে বড় করে শ্বাস নিল।

আলতো করে লাশটার উপর ডাল রেখে রাণীর দেহাবশেষের পাশে এসে দাঁড়াল সে।

এরপর এল অন্যরা। একজন একজন করে এসে ঢেকে দিল লাশটা। সব শেষে এল লোকটা, হাতে ধরা ডালটা দিয়ে ঢেকে দিল লাশ। যখন সরে দাঁড়াল, তখন দেখা গেল-লোকটার পেছনে রয়েছে আরও একজন।

এই একজনই ওকে রক্ষা করবে।

মদ্দাটা জানে-কেননা রাণী মারা যাবার আগে ওকে সেটাই দেখিয়েছে।

সাদা চামড়ার সিংহটা এগিয়ে এল। দাঁতে করে নিয়ে এসেছে একটা বাকল। সমতল নাকটা দিয়ে ভালোভাবে বসিয়ে দিল বাকলটাকে।

লোকটার দিকে এগিয়ে গেল সিংহটা, আলতো চাপড় পেল বিনিময়ে।

শুঁড় তুলে আসমানের দিকে তাক করল মদ্দাটা। পরক্ষণেই শোনা গেল তার বৃংহতি। শোকসন্তপ্ত, কিন্তু আশাবাদী; সম্মানের ছোঁয়া আছে, সেই সাথে আছে পরিবর্তনেরও। পালের অন্যরা অনুসরণ করল মদ্দার। শ্বাশত ডাকে ভরে উঠল চারপাশ।

সামনে এগিয়ে এল সিংহটা, লম্বা গ্রীবা বাঁকালো

জীবনে প্রথমবারের মতো গর্জে উঠল সে।

পাঠকের কাছে লেখকের কথা
সত্য নাকি কল্প-কাহিনি?

বলা যায়-আমি আসলে এক রুটির টুকরো সংগ্রহকারী; ওসব ছোট ছোট বিজ্ঞান এবং ইতিহাস একসাথে মিশিয়ে তৈরি করেছি আস্ত একখানা গল্প। সেই রুটির শেষে তাই চেষ্টা করবো কাহিনির পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা অন্তর্নিহিত সত্যগুলো তুলে ধরতে।

তাহলে, শুরু করা যাক।

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

এইসব ঐতিহাসিক ব্যক্তিরা শুধুমাত্র একে অপরের খুব ভালো বন্ধুই ছিলেন না, বরং একে অন্যের জীবনে সরাসরি সম্পৃক্তও ছিলেন। তাই ভাবলাম, এদের সবাইকে একত্রিত করব আমি। জানি, আমি এমন কিছু লিখতে চাই, যাতে এই সব মহান ব্যক্তিত্ব একসাথে থাকতে পারে। তার জন্য চাই, অসাধারণ এক অভিযানের।

স্ট্যানলি এবং লিভিংস্টোন ঃ

এই দুই চরিত্র নিয়ে গবেষণা করার সময়, দু'জনের চরিত্রের বৈপরীত্য দেখে হোঁচট খেয়েছি। সাধারণ মানুষের কাছে ঢাকঢোল মেরে প্রকাশ করা হয়েছে, হেনরি মর্টন স্ট্যানলি উদ্ধার করেছেন ড. ডেভিড লিভিংস্টোনকে। রঙ-চঙ মাখিয়ে বলা হয়েছে, লিভিংস্টোন এমন এক অদক্ষ পরিব্রাজক যিনি কিনা নিজের আনাড়িপনায় প্রাণ বিপন্ন করে ফেলেছেন! কিন্তু একটু গভীর নজরে ইতিহাস ঘাঁটলে বোঝা যায়, আফ্রিকার ওই কাহিনির আসল নায়ক মিশনারি ডেভিড লিভিংস্টোন। আফ্রিকার মানুষদের উন্নতির জন্য খেটেছেন তিনি। প্রাণ বিপন্ন হওয়ার পরেও, সুস্থ হয়ে ওখানেই দাসপ্রথার বিরুদ্ধে লড়তে থাকেন লিভিংস্টোন। অন্যদিকে, তথাকথিত নায়ক স্ট্যানলি ছিলেন লক্ষণীয়ভাবে বর্ণবাদী। জোর করে এই অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল তাকে, নিজের মুটে এবং আদিবাসীদের প্রতি আচরণও ছিল যথেষ্ট নির্মম ও নিষ্ঠুর। পরিস্থিতি আরও বিগড়ে যায়, যখন বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড দুই-এর অধীনে কঙ্গো খুলে দেন তিনি। ফলাফলস্বরূপ শুরু হয় আদিবাসীদের নির্বিচারে গণহত্যা এবং দাসবৃত্তি; বেলজিয়ামের রাজার দখলে চলে যায় পুরো কঙ্গো!

এই পার্থক্যের জন্যেই লিভিংস্টোনের কবর হয়েছে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবেতে, অন্যদিকে স্ট্যানলির জায়গা হয়নি ওখানে। তাই, আমার কাহিনিতে, লিভিংস্টোনের

জীবন এবং মৃত্যুর প্রতি আলোকপাত করেছি আমি। সত্যিই তার মৃতদেহ মমিকরণ করেছিল স্থানীয় আদিবাসীরা, গাছের ছালে পেঁচিয়ে দেহটা পাঠিয়ে দিয়েছিল ইংল্যান্ডে। কিন্তু তার হৃদয় ছিল আফ্রিকায়, মোবোলা পাম গাছের নিচে দাফন করা হয়েছিল ওটা।

স্ট্যানলি এবং টোয়েন

হ্যাঁ, হেনরি মর্টন স্ট্যানলি এবং স্যামুয়েল ক্লেমেন্স (বা মার্ক টোয়েন) দুই বন্ধু। দু'জনের অন্তরঙ্গতা এবং ঘনিষ্ঠতার স্বাদ পাওয়ার জন্য, তাদের বন্ধুত্ব নিয়ে লেখা একটি বই পড়ার পরামর্শ দেব আমি-টোয়েন এন্ড স্ট্যানলি এন্টার দ্য প্যারাডাইস, অস্কার হিউলোস। তবে, মনে হয় না মিশরে কোন অভিযানে গিয়েছিলেন দুজন। কিন্তু কল্পনা করতে তো আর বাঁধা নেই?

টোয়েন এবং টেসলা

এই দু'জনের সম্পর্ক বেশ মজার। মার্ক টোয়েন এবং নিকোলা টেসলা খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। এমনকী টেসলার ল্যাবে সময় কাটাতেন টোয়েন, সাহায্য করতেন বন্ধুর গবেষণায়। আমার বিশ্বাস-সেই সাথে কিছুটা উৎপাতও করতেন তিনি। টেসলার ভূমিকম্প যন্ত্র পরীক্ষা করেছেন টোয়েন, এই ছোট কাহিনি সত্য। বিজ্ঞানীর বড় যন্ত্রটায় উঠেছিলেন তিনি, অবশ্য একটু পরেই ক্ষমা চেয়ে চলে গিয়েছিলেন বিশ্রামকক্ষে।

তাই, আবার, এমন এক কাহিনি লিখতে হলো আমাকে, যেখানে টোয়েন এবং টেসলা সিগমার ন্যায় রোমাঞ্চকর অভিযানে সম্পৃক্ত হোন নিজেরাই। যাই হোক, টেসলার কথায় আসি। নিকোলা টেসলা সত্যিই একজন স্বপ্নদর্শী প্রতিভা ছিলেন। অবশ্য তার সব গবেষণা বিষয়বস্তু সহজে কারও বোধগম্য হয়নি এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রও ছিল সীমাবদ্ধ। পাতার পর পাতার লিখতে পারবো আমি এই ব্যক্তির জীবন, কাজ এবং তা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ সম্পর্কে। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে তা করতে হবে না আমাকে, কয়েকটা বইয়ে টেসলার বিস্ময়জনক বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এই কাহিনি লেখার সময় এই দুটো বই বেশ কাজে এসেছে:

নিকোলা টেসলা: ইমেজিনেশন এন্ড দ্য ম্যান দ্যাট ইনভেন্টেড দ্য টুয়েন্টিথ সেঞ্চুরি, শন পেট্রিক।

টেসলা: ইনভেন্টর অফ দ্য ইলেকট্রিক্যাল এজ, ডব্লিউ. বার্নার্ড কার্লসন

কিন্তু, এই উপন্যাসে বর্ণিত টেসলার বিশেষ জীবন নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না। তিনি সত্যিই তারবিহীন শক্তিতে বিশ্বাস করতেন। ওয়ার্ডেনক্লাইফ নিয়ে যা

বলেছি-সব বাস্তব। এমনকী পরবর্তীতে উল্লেখিত শক্তির নতুন উৎসটাও, যা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। তার আবিষ্কার এবং দাবি এতটাই চিন্তিত করে তুলেছিল ইউ.এস. সরকারকে যে, মৃত্যুর পর সাথে সাথেই টেসলার সমস্ত কাগজপত্র সরিয়ে নেয়া হয়। বছরের পর বছর চাপ প্রয়োগ করে টেসলার ভাতিজা অল্প কিছু ফেরত পেয়েছে। তবে যেই বিশেষ নোটবুকটা ওকে নিরাপদে রাখতে বলেছিল, তা খুঁজে পাওয়া যায়নি এখনও। এবং হ্যাঁ, দ্য ন্যাশনাল ডিফেন্স রিসার্চ কমিটির উপর দায়িত্ব বর্তেছিল এই সব কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার। সংস্থাটি তখন পরিচালনা করতেন নিউইয়র্কের রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী (বা হয়তো ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট, যেহেতু বইটি ২০১৬'র নির্বাচনের পূর্বে লেখা) ব্যক্তিত্বের চাচা জন জি. ট্রাম্প।

চলুন, উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যাচাই করি। কিন্তু, এর জন্য বেশ কিছুটা সময় পিছিয়ে যেতে হবে।

দ্য বুক অফ এক্সোডাস এবং বাইবেলের মহামারী

এক্সোডাসের সময়কাল আলাদা বলা হয়েছে এই উপন্যাসে। এই নতুন কালপঞ্জি সম্পর্কে জানার জন্য, আমি এই দুটো বই পড়তে বলবো:

এক্সোডাস: মিথ অর হিস্ট্রি, ডেভিড রোল

দ্য লর্ডস অফ এভারিস, ডেভিড রোল

অনেকেই চেষ্টা করেছেন মোজেসের সময়ে মিশরে সংঘটিত এই দশটি মহামারী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে, তাই আমিও সেই সুরে গলা মিলিয়েছি। এখানে লেখা প্রতিটি কথাই অনুমান এবং বিবেচনাধীন, তবে সবগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। উদাহরণস্বরূপ, ভূমধ্যবর্তী আগ্নেয়গিরি থেরার অগ্নুৎপাত ঘটেছে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে, এবং এর মতো শক্তিশালী নিক্ষেপ এখনও দেখেনি মানুষ। আবহাওয়া এবং বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটেছিল উল্লেখযোগ্য হারে, সেই সাথে অ্যাশ প্লাম তো ছিলই। নিরক্ষীয় অবস্থান থেকে ঊষাকালের জন্ম ঘটায়নি তো ওটা? ২০০৬ সালে আলাস্কার অগাস্টিন আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত নিয়ে গবেষণা হয়েছিল, নাটকীয় আলোর সাথে প্রচুর অ্যাশ প্লামের কারণে। বলা হয়, এতটাই শক্তিশালী ছিল ওটি, প্রভাব ফেলেছিল অরোরা বোরিয়ালিসের উপর।

এখন উপন্যাসের কিছু বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় যাই আমরা।

তড়িৎ ব্যাকটেরিয়া এবং আর্কিয়ন কিংডমঃ

উপন্যাসে বেশ মারাত্মক কিছু ক্ষুদ্র মাইক্রো-অর্গানিজমের কথা আছে, কিন্তু পুরোটাই সত্য। কাদামাটিতে তড়িৎ প্রবাহের মাধ্যমে, বিজ্ঞানীরা বিশাল সংখ্যক এমন তড়িৎ-খাদক ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেছেন। বিশ্ব জুড়ে নানা গবেষণাগারে এমন অদ্ভুত নতুন জীবাণু নিয়ে খোঁজ চলছে। এমনকী ওগুলো ব্যবহার করে জ্যান্ত বায়ো-কেবল তৈরির চেষ্টা হচ্ছে, ন্যানোমেশিনে বিদ্যুৎ সরবারহের জন্য। ইন্ডাস্ট্রির পাশাপাশি, পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতেও ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে এই ব্যাকটেরিয়া।

আর্কিয়ন জীবাণু নিয়ে উপন্যাসে যা বলা হয়েছে সব সত্য। ব্যাকটেরিয়া থেকে এই গোত্র সম্পূর্ণ আলাদা, লম্বা তন্তুর জন্য সহজেই আকার পরিবর্তন করতে পারে (মস্তিষ্কে নতুন ওয়্যারিংয়ের জন্য নিখুঁত আকৃতি)। তৃতীয় শ্রেণীর এই জীবসত্ত্বার বেড়ে উঠছে ভাইরাসের পাশাপাশি, একত্রিত করছে ওসবের জিনেটিক বস্তু। এই উপন্যাসে, সম্পূর্ণ আলাদা একটি রোগ নিয়ে এলাম আমি। মারাত্মক প্যাথোজনিক আর্কিয়ন, অনেকটি জিকার মতো ভাইরাস, যা গর্ভের সন্তানের ত্রুটির কারণ হতে পারে। যখন জানলাম, কিছু কিছু আর্কিয়ন পানির রং লাল পরিণত করতে সক্ষম (ইরানের এক হ্রদ এবং লবণাক্ত হ্রদ উতাহ থেকে), তাই ভাবলাম এই জীবাণু বাইবেলের মহামারীর জন্য একদম নিখুঁত (হয়তো দশটির জন্যই)।

এই গল্পের আরও একটি অংশ সত্য: পৃথিবীর বরফগুলোর বাহিরের অংশে তৈরি হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল কলোনি, নিজেই নিজেই বংশবৃদ্ধি করছে ওরা ওখানে।

আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং সুমেরুর অবস্থা

উপন্যাসে বলেছেন টোয়েন-আমাকে কোন ভাবেই বিজ্ঞানের লোক বলা চলে না, বললে বলতে পারেন সাহিত্যের মানুষ। তবুও, আমি এই বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা করতে এবং আবহাওয়া বিজ্ঞানের যোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক করতে, অথবা মানুষের অবদানকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেও চাই না। কিন্তু, সত্য হলো-সুমেরু উত্তপ্ত হচ্ছে দিন দিন, ছোট হচ্ছে আইস ক্যাপ, খুলে যাচ্ছে উত্তরের রাস্তা। ক্রুজ শিপ চলাচল করে উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রপথে, এই পথ অতীতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বলেই খ্যাত ছিল। কত শত অভিযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে এই পথে চলতে গিয়ে, তার কোন হিসাব নেই। এসবের মধ্যে এইচ.এম.এস. ইরেবাস এবং টেররও নামের জাহাজ দুটোও আছে।

যাই হোক, এই সাংঘাতিক অভিযানের স্বাদ নিতে চাইলে, আমার প্রিয় লেখকের এই বইটি পড়তে সুপারিশ করব:

দ্য টেরর, ড্যান সিমেন্স

আবহাওয়া বিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন, পৃথিবী বিপন্নের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা। জিও-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে কয়েকজন গবেষক সম্ভাব্য সমাধান খুঁজতে চেয়েছেন। বিশাল বড় প্রকল্প ওসব, পৃথিবীকে সৌরবর্মে আটকে দেওয়া অথবা মৃত উপত্যকায় বন্যা বইয়ে দেওয়া, অথবা গ্রিনল্যান্ডকে চাদরে মুড়ে ফেলা। কিন্তু, এসব বাস্তবায়িত করার একটিই প্রতিবন্ধকতা, প্রকল্পের খরচ এবং বাস্তবায়নের সাধ্য থাকা, অজানা প্রতিবন্ধকতা-বিপদের মোকাবিলা করার সক্ষমতা, দুনিয়া জুড়ে আকস্মিক দুর্যোগের আবির্ভাব হওয়া। এমন বিশাল বড় প্রকল্পে যেকোন মুহূর্তে অঘটন ঘটে যেতে পারে, ঝুঁকিটাও তাই বিশাল। তাই, অবশ্যই কী ঘটতে পারে তা অনুসন্ধান করতে চেয়েছি আমি।

আলাস্কার হার্প স্থাপনার কথা উল্লেখ আছে বইয়ে, সেই সাথে ওটা ঘিরে হওয়া ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এবং গুজব। এখানে, অরোরা স্টেশনকে হার্পের বৃহৎ সংস্করণ বলা হয়েছে। গুজব সব সত্য প্রমাণিত করেছি আমি, সেই সাথে আকাশে জ্বালিয়ে দিয়েছি আগুন (হার্পের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটাও ছিল)।

মমিকরণ এবং উল্কি আঁকা মমি

এই বইয়ের প্রথমেই আত্ম-মমিকরণ প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ আছে। সত্যিই প্রক্রিয়াটি বেশ কষ্টসাধ্য এবং ভীতিজনক। জাপানের বুদ্ধ সন্ন্যাসীরা নিজেদের দেহ সংরক্ষণ করে একই প্রক্রিয়ায়। উপবাস, বিশেষ গাছের কান্ড এবং চা গ্রহণ, পাথর গেলা এবং সবশেষে জীবিত কবরে প্রবেশ করার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় মমিকরণ। একই পদ্ধতি চীন এবং ভারতেও পরিলক্ষিত হয়।

উল্কিওয়ালা বারোটা মমি পাওয়া গিয়েছিল মিশরে। আধুনিক ইমেজিং সফটওয়্যার এবং ইনফ্রারেড স্ক্যানারের সাহায্যে প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই উল্কিতে প্রাণ আনতে সক্ষম হয়েছেন।

হাতি

এই উপন্যাসে হাতি সম্পর্কে যা লেখা তা বেশ আশ্চর্যজনক, কিন্তু চিড়িয়াখানা বা জঙ্গলের হাতিদের মধ্যে আসলেই এমন আচরণ পরিলক্ষিত হয়। এর মাঝে ছবি আঁকা, মানুষের কণ্ঠ নকল, মৃত্যু অবলোকন, ভাঁড়ামি, এমনকী আত্মসম্মোহন গুণও আছে।

কেনিয়ার মানুষের, হাতির কাছ থেকে প্রসব ব্যথা কমাবার জন্য পাতা চিবানো শেখার ঘটনা সত্য। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বেঁচে থাকার কৌশল অতীত থেকেই শিখে আসছে মানুষ, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদেই।

হাতিগুলোর আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় এগারো পাউন্ড ওজনের মস্তিষ্কের নির্দেশে, মানুষের সমান নিউরন আছে ওদের। ভালো কাজে মস্তিষ্ক খাটায় প্রাণিগুলো। সমস্যার সমাধান, যন্ত্র ব্যবহার, এমনকী পরোকপকারি মনোভাবও দেখা যায় ওদের ভেতর। নিজেরা সচেতন এবং শিল্পের সমজদারও হাতি।

তাই, দয়া করে ওদের খুন করা বন্ধ করুন।

আরও কিছু ত্রুটির টুকরো

অ্যাশওয়েলের সান্তা মেরি চার্চে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। মোটামুটি সব বর্ণনাই সঠিক, কিন্তু বারো বছরের পুরনো স্মৃতি ধোঁকা দিতেও পারে। কিন্তু, গির্জার আশেপাশে গ্রাফিতিগুলো এখনও আঁকা রয়েছে, কয়েকটি অর্থবোধক আবার বেশ কয়েকটি মজার। পাশেই পার্কের ঠিক মাঝেই একটি ঝর্ণা, যাওয়ার পথে পাথর বিছানো। অ্যাকশন সিকুয়েন্সের জন্য কিছুটা পাল্টেছি অবস্থান, কিন্তু বাকি সব হুবহু লেখা।

নোয়ার নৌকার উচ্চতার তৈরি একটি বাহন সোয়াম্প স্প্রাইটের কথা লেখেছি আমি, বেশ মজার এটি। তাই বইয়ে লিখতে বাধ্য হয়েছি।

কোয়ালস্কির পিয়ার শটগানের ক্ষেত্রেও তাই। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এমন এক শটগান তৈরি করেছে যা থেকে পাইযোইলেক্ট্রিক ক্রিস্টাল ছুটে যায় দেড়শো ফুট দূরের লক্ষবস্তুতে, সেই সাথে টেজার ওয়্যার তো আছেই। তাই, অবশ্যই সিগমা এই অস্ত্র পরীক্ষার দাবীদার।

সবশেষে, এই বইয়ে মস্তিষ্কের স্মৃতি সংরক্ষণে ইলেকট্রিক প্রভাবের উল্লেখ আছে। হিপ্পোক্যাম্পাসের সাময়িক প্রতিক্রিয়া থেকে স্মৃতি সংরক্ষিত হয় মস্তিষ্কে। ইলেকট্রিক স্টিমুলেশনের ফলে এই স্মৃতিগুলো আরও শক্তিশালী এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তবে কী হবে, তড়িৎখাদক একটি অণুজীব রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যদি? অভিজ্ঞতা হওয়ার বদলে শুধু লিখতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করব আমি।

এটিই মূলত এই বইয়ের মূল বিষয়গুলর ব্যাখা। আরও হাজার এমন ক্ষুদ্র টুকরো আছে যা সত্য। কিন্তু সবগুলোর ব্যাখ্যা দিতে গেলে আরও অনেকগুলো পাতা ভরে যাবে। তাই, পুরো উপন্যাসটাই বিশ্বাস করতে প্রস্তাব দেব আমি।

উপন্যাসের কয়েক জায়গায় নিকোলা টেসলার কথা উদ্ধৃতি দিয়েছি আমি। আরও একটি দিচ্ছি এখন। এই একটি কথায় পুরো মানব সভ্যতা সম্পর্কযুক্ত করা যায়ঃ

আমরা সবাই চিন্তা এবং কর্মের দিক থেকে মুক্ত হলেও, সবাই একসাথে জড়িত, অনেকটা মহাকাশের অবিচ্ছেদ্য তারাগুলোর মতো।

কিন্তু এখন আমাদের আলাদা হতেই হবে-অন্তত সিগমা নতুন কোন ঝামেলায় জড়ানোর আগ পর্যন্ত, যা হতে খুব বেশি সময় লাগবে না।